পিতৃপক্ষ
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সুমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়
কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়
আত্মজনেষু

পিতৃপক্ষ

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

কাল বাবার সঙ্গে দেখা হবে। প্রায় বাইশ বছর পর। উত্তেজনা নয়, এক ধরনের অস্থিরতায় ঘুম আসছে না বরুণের।

তখন দশ বছর বয়স, বাবার সঙ্গে শেষ দেখা। ঝাপসা স্মৃতি। সেইসব চলমান স্মৃতির সঙ্গে বাড়ির অ্যালবামে রাখা বাবার স্টিল ফটোর কোনও মিল নেই।

গত বাইশ বছর ধরে বাবার উন্মাদ অবস্থা। প্রথম দিকে বাড়িতে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। বরুণ অবশ্য সেই বাবাকে দেখেনি, মানুষ হয়েছে স্কুল হস্টেলে।

ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্ট ছিলেন। দাদা দেখেছে। বোন খুবই ছোট, কিছুই বুঝত না। বাবাকে রাখতে হয়েছিল অ্যাসাইলামে। বরুণদের আর্থিক পরিস্থিতি তখন ভাল না। সাধারণ মানের মানসিক হাসপাতালে ছিলেন বাবা। অবস্থার যেমন যেমন উন্নতি হয়েছে, বাবার অ্যাসাইলামের মান গেছে বেড়ে। বাবা নিশ্চয়ই টের পাননি।

বরুণরা দু ভাই এক বোন কোনওদিনই হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যায়নি। মা চাইত না যেতে দিতে। মায়ের এরকম একটা ধারণা সম্ভবত ছিল, পাগলামি বুঝি সংক্রামক। বিশেষ করে নিজের রক্তধারায় দ্রুত ছড়ায়।

বাবার না থাকাটাতেই অভ্যস্ত ছিল বরুণরা। মা সেই সময় খুব কষ্ট করে সংসার চালিয়েছে। পাশে সেজমামা সব সময় ছিল। কম হলেও, বাবার অফিস থেকে টাকা আসত নিয়মিত। দুজন আশ্রিত ছিল বরুণদের সংসারে। বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর স্ত্রী আর মেয়ে। যমুনাকাকি এবং বৃষ্টি।

এত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মা যে কীভাবে দুই ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলল, বিয়ে দিল বৃষ্টির আর বোনের, ম্যাজিক মনে হয়!

এখন সংসারে কোনও টানাপড়েন নেই। দাদা জার্মানিতে প্রফেসারি করে। বরুণ বহুজাতিক কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। থাকে দিল্লিতে। বরুণ বিবাহিত। একটি বছর চারেকের ছেলে আছে তার।

দেবপাড়ার এই বাড়িটা বাবা নিজে দাঁড়িয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। বরুণ যেহেতু ছাত্রজীবনটা হস্টেলে কাটিয়েছে, দেবপাড়ার বাড়ি নিয়ে হোমসিক হয় না।

বাবাকে নিয়েও তার তেমন কোনও কৌতূহল নেই। মা চিঠিতে এমনভাবে অনুরোধ করল, না এসে পারল না। তনিমা আসতে চেয়েছিল, বরুণ রাজি হয়নি। বলেছে, আগে দেখে আসি কতটা সুস্থ হয়েছেন। তারপর তুমি যেয়ো।

বিয়ের পর তনিমা প্রায়ই বায়না ধরত, চলো না, অ্যাসাইলামে গিয়ে তোমার বাবাকে দেখে আসি।

এড়িয়ে গেছে বরুণ। ওখানে গিয়ে বাবাকে নির্ঘাত প্রণাম করবে তনিমা। ভীষণ অপমানিত লাগবে বরুণের। পাগলাগারদে প্রণামের রেওয়াজ নেই।

মা চিঠিতে লিখেছিল, তোর বাবা এখন অনেকটাই সুস্থ। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, বাড়িতে এনে রাখতে। চেনা পরিবেশ পেলে তাড়াতাড়ি সব কিছু মনে পড়বে। উনি আর আগের মতো রেগেটেগে ওঠেন না। ডাক্তারদের মত, যত বয়স বাড়বে শান্ত হয়ে যাবেন। তোর মামার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম, তোর এ সময় একবার আসা দরকার। উনি যদি বাড়ি, ঘরদোর, আমাদের নাও চেনেন, তোকে চিনবেন ঠিক। ভীষণ ভালবাসতেন যে তোকে! হয়তো তোর সূত্র ধরে উনি আমাদেরও চিনবেন।

বাবার যে তার প্রতি এক ধরনের বিশেষ দুর্বলতা ছিল, একথা বহুবার শুনেছে বরুণ। স্মৃতি হাতড়ে তার কোনও উদাহরণ পায়নি সে।

চিঠি পেয়ে বরুণ অবাক হয়েছিল, একই সঙ্গে দুটো মানুষ, মামা আর মা, কী করে এই অবাস্তব, সেন্টিমেন্টাল ধারণা করে বসল!

যে-লোকটা সদ্য অ্যাসাইলাম থেকে ছাড়া পেয়েছেন, কী করে মেলাবেন দশ বছরের বরুণের সঙ্গে বত্রিশ বছরের বরুণকে। আর একটা আশঙ্কার কথাও মাথায় আসছে বরুণের,

বাবা হয়তো তেমন সুস্থ হননি, মেন্টাল হোমের লোকেরা রোজ এক মুখ দেখে দেখে, বোর হয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাড়ি।

সে যাই হোক, মায়ের চিঠি এড়াতে পারেনি বরুণ। আজ সকালেই দেবপাড়ায় পৌঁছেছে। এসে দেখে, পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে বাড়ি। সবার মুখেই চাপা খুশির আভাস। সবাই বলতে, সেজমামা, মামি, যমুনাকাকি আর মা। বিয়ের আগে সেজমামি বরুণের ছোটবেলার দিদিমণি ছিল। বাইশ বছর পরেও এদের প্রতীক্ষা কত সজীব! মানুষটার মধ্যে নিশ্চয়ই তেমন কিছু একটা ছিল। বাড়ির পরিবেশ বরুণকে দ্রবীভূত করেছে। বুকের মধ্যে কুলকুল শব্দে বেড়ে চলেছে বাবার সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই অনুভূতিটাই অস্থির করেছে বরুণকে। ঘুম আসছে না।

মশারি তুলে বিছানা থেকে নেমে আসে বরুণ। জানলার কাছে গিয়ে সিগারেট ধরায়। পাড়াটাকে চেনা যায় না। কত বদলে গেছে। এই জানলার মুখোমুখি ছিল মন্দিরাদের বাড়ি। বরুণের বাল্যসখি। বাড়িটা ভেঙে চারতলা হয়েছে। মন্দিরা এখন কোথায় কে জানে!

পাড়াটা বদলে গেলেও বরুণদের বাড়ি একই রকম আছে। ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনও প্রায় এক। যেন ১৯৭৩ সাল খানিকটা ছিঁড়ে গিয়ে লেগে আছে এ-বাড়ির গায়ে। বাড়ির কিছু বদল করতে চায় না মা, পাছে বাবার চিনতে অসুবিধে হয়। কোনও না কোনওদিন তো ফিরবেই।

কী রে, এখনও ঘুমোসনি। রাত একটা বেজে গেল যে।

মায়ের গলা। ঘাড় ফেরায় না বরুণ। আধখাওয়া সিগারেটটা ফেলে দেয় জানলার বাইরে। মায়ের উদ্দেশে বলে, তুমিও তো জেগে আছ।

আমার আবার ঘুম। বয়স হচ্ছে না!

মিথ্যে অজুহাত দিচ্ছে মা। বাবা ফেরার উত্তেজনায় চোখের পাতা এক করতে পারছে না।

পিঠের কাছে এসে মা বলে, কী এত চিন্তা করছিস?

কিছু না।

আমি জানি, কী ভাবছিস। মনে করার চেষ্টা করছিস বাবাকে। ভাল করে মনে কর। ছোটবেলার একটা-দুটো ঘটনাও যদি ওঁর সামনে বলতে পারিস, হয়তো স্মৃতি ফিরতে সুবিধে হবে।

মায়ের কথা শেষ হতেই বরুণের চিন্তা অন্য খাতে বইতে শুরু করে, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, বাবা সবাইকে চিনলেন, আমাকে পারলেন না। আমি তো তখন নন-এনটিটি হয়ে যাব। বরুণের কেন জানি মনে হয়, তার এই ভাবনাটা অনেক আগেই এ-বাড়ির বাসিন্দাদের গ্রাস করেছে। একজন পাগলের শনাক্তকরণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে তাদের অস্তিত্ব।

বেকবাগানের অ্যাসাইলাম। রাত জেগে কাজ করতে করতে উৎকর্ণ হয়ে আছেন সুপার। কখন তিন নম্বর রুম থেকে 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার ভেসে আসে। দিন সাতেক হল : আসছে না। অবিনাশ চ্যাটার্জি শান্ত হয়ে গেছেন। রেসপন্স করছেন বাইরের জগতের ডাকে। দু-একটা কমন, রেগুলার প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না বলছেন। যেমন, খিদে পেয়েছে? একটু বেড়াবেন? চান হয়েছে?

সঠিক সাড়া দিচ্ছেন। হাইপার অ্যাকটিভিটি প্রায় নেই বললেই চলে। মানুষটা অনেকদিন ছিলেন এখানে, সুপারের মায়া পড়ে গেছে। কাল ওঁর বাড়ির লোক এসে নিয়ে যাবে।

খুব লম্বা-চওড়া না হলেও ভদ্রলোকের চেহারাটা খুবই অভিজাত। যখন শান্ত থাকেন, ওঁর চলাফেরায়, উদাসীনতায়, বিড়বিড়ানি থেকে উঠে আসা কণ্ঠস্বরে টের পাওয়া যায় এক সময় বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ভুলক্রমে মাথার কোনও এক অন্ধকার কুঠুরিতে ঢুকে পড়ে, দরজা খুঁজে পাচ্ছেন না। একথা অবশ্য বিজ্ঞান বলে না। মানুষের ভাবনার শৌখিন বিলাস। জানেন সুপার। তবু এভাবে ভাবতে ইচ্ছে হয়। -

মানুষটা আজ যেন একটু বেশিই শান্ত। সুপারের মন খুঁতখুঁত করে, ঠিকঠাক আছেন তো? প্রায় স্বাভাবিক অবস্থার মানুষটাকে পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারলে, শান্তি। নিজের ঘরের টেবিল থেকে উঠে আসেন সুপার। হেঁটে যান তিন নম্বর রুমের দিকে। যদি আত্মহননের ঝোঁক চাপে, এই ভয়ে পেশেন্টদের রুমে ছিটকিনির ব্যবস্থা নেই, দরজা ভেজানো থাকে। ঠেলেন সুপার। দেখেন, অন্যান্য দিনের মতোই কুঁকড়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছেন অবিনাশ চ্যাটার্জি।

দরজা টেনে নিশ্চিন্ত মনে ঘরের দিকে ফেরেন সুপার।

পাশ ফিরে শুয়ে থাকলেও চোখ চেয়ে আছেন অবিনাশ। সুপার খেয়াল করেননি। তিন নম্বর রুমের জানলা খোলা। স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো গাছের ছায়া নিয়ে পড়েছে দেওয়ালে।

দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি নিয়ে অবিনাশ তাকিয়ে আছেন দেওয়ালের চৌখুপি আলোছায়ায়। ছায়া নড়ছে। কী যেন চাইছে বলতে। ধরতে পারছেন না অবিনাশ। সেই কবে, কতদিন আগে অবিনাশকে তুলে দেওয়া হয়েছিল অন্ধকার ট্রেনে। কামরায় একগাদা পাগল। তারা দৌড়োদৌড়ি করছে, হাসছে, কাঁদছে, নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে। সেই ট্রেনে কোনও ড্রাইভার নেই। ট্রেনের গন্তব্য পৃথিবীর মাটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া।

এই ট্রেনে শুধু দিন আর রাত হয়। ভোর নেই, নেই বিকেল, গোধূলি, সন্ধে... দিনটাও খুব একটা পরিষ্কার নয়। ধোঁয়াটে মতন। রাত যত বাড়ে, অন্ধকার ঘন হয়। তীব্র বেগে ছুটতে থাকে ট্রেন। গোড়ার দিকে ভয় পেয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার জুড়ে দিতেন অবিনাশ। এখন ভয় পান না। চিৎকারটা করে যান, নিজেকে নিজেই জানান দেন, তিনি আছেন। হারিয়ে যাননি অন্ধকারে।

কদিন ধরেই এক ভদ্রলোক এসে বলে যাচ্ছেন, ভাল হয়ে গেছেন আপনি।

কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারেন না অবিনাশ। তবে টের পান ট্রেনের গতি ক্রমশ কমছে। দিনের আলো আগের থেকে অনেক উজ্জ্বল। 'বাঁচাও' বলে চিৎকারটা ছেড়ে দিয়েছেন অবিনাশ। একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে, আওয়াজটা ছিল অসময়ের সঙ্গী।

আজ নতুন একজন এসেছিল। বলল, জামাইবাবু আপনি ভাল হয়ে গেছেন। কাল এসে বাড়ি নিয়ে যাব। বাড়ি, আর জামাইবাবু শব্দ দুটো চেনা চেনা ঠেকেছিল। ওই শব্দ দুটো এখন দেওয়ালের ছায়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। উদ্ধার করবে অতীত। অবিনাশ অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন সেইসব ঘটনা। যার অনেকটাই নিজের চোখে দেখা, কিছুটা শোনা। শ্রবণের সঙ্গে মিশেছে কল্পনা।

মনের গভীর অন্তস্তলে স্থান পেয়েছে সেইসব। শ্রবণ, কল্পনা, স্বীয় দর্শন সমস্ত কিছু মিলেমিশে এখন দেওয়ালে। ওখানে ফুটে উঠছে ১৯৭৪ সাল। রাত দশটা। সমস্তিপুর চিনি মিলের কুলি লাইন.... প্রায়ান্ধকার কলোনির রাস্তা। আলোর সামান্য উৎসটুকু হচ্ছে চিনি মিলের একতলা কোয়ার্টার। মৃগাঙ্ক রোজকার মতো হেঁটে আসছেন। রাস্তা শুনশান। যেমন রোজ থাকে। মৃগাঙ্ক লেংচে হাঁটেন। নেশা করে থাকলে ল্যাংচানিটা ছন্দ হারায়। পরিচিত দৃশ্য হলেও কুকুরগুলো চেঁচায় রোজ। আজ তাদের কোনও হাঁকডাক নেই। ব্যাটারা নেমন্তন্নবাড়ি গেল নাকি জোট বেঁধে? ওদেরই হয়তো কারও ছেলেমেয়ের বিয়ে—নিজের রসিক ভাবনায় মিচকি মিচকি হাসেন মৃগাঙ্ক। একই সঙ্গে বুঝতে পারেন আর ঘণ্টাখানেক পরে নেশাটা আরও খোলতাই হবে। এক একদিন নেশাটা গোড়াতেই এমন পেড়ে ফেলে, কানাইয়ার ঝোপড়া থেকে নিজের কোয়ার্টার মিনিট পনেরোর রাস্তা। দু-চারবার ডিগবাজি খাওয়া হয়ে যায়। তবে কোনওক্রমে বলাইদার কোয়ার্টারের সামনে পৌঁছতে পারলে বাকি পথটুকু বলাই সেনগুপ্ত নিজে কাঁধে করে ঘরে দিয়ে যান। এরকম যেন বলাকওয়া আছে। অথচ বলাইদার সঙ্গে মোটে পটে না মৃগাঙ্কর। হাঁটতে হাঁটতে আর একটা মজার কথা মাথায় আসে, কানাই নেশা করায়, বলাই বাড়ি পৌঁছে দেয়। মৃগাঙ্কর নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথেও ঈশ্বরের বাস। ভগবান বরাবর মৃগাঙ্কর পাশে পাশে থেকেছেন। দুঃখী, নিরীহ ঈশ্বর, নিয়তির কাছে, অবিরত মার খাওয়া মৃগাঙ্ককে সান্ত্বনা, শুশ্রূষা দিয়েছেন, মাঝে মাঝে পাইয়ে

দিয়েছেন ভাগ্যের সামান্য সহায়তা। ওতেই বেশ চলে যাচ্ছে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের। ভগবানকে কোনওদিনই তেমন গুরুত্ব দেননি মৃগাঙ্ক, তাই হয়তো ভগবান তাঁর ক্ষেত্রে ততটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন না। মৃগাঙ্কর ভগবান আসলে একজন মানুষ, অবিনাশদা। সে এখন অনেক দূর চলে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের দেবপাড়া নামে একটা জায়গায়। কলকাতা থেকে সেটা খুব দূরে নয়। অবিনাশদা চিঠি দেয় না। আলেকালে আসে সমস্তিপুরে, মানে তার পৈতৃক ভিটেতে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে গিয়ে ভুলেই গেছে বিহার। তবে এখানে এলেই খোঁজ করে মৃগাঙ্কর। দেখা হলে বলে, একবার চল আমার ওখানে। দেখবি তোর বউদি কেমন গুছিয়ে সংসার করছে।

যেতে ইচ্ছে করে না মৃগাঙ্কর। তিনি জানেন তাঁর হিরো আর পাঁচটা ভদ্র বাঙালির মাঝে পড়ে অনেক নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সমস্তিপুরে থাকলে অবিনাশদার পাঞ্জাবি থেকে যে আলো ঠিকরোয়, কলকাতায় সেরকমটা হয় না। অবিনাশদার কর্মকাণ্ড সমস্তিপুরের আলো-বাতাস, মানুষ, রাস্তা, ল্যাম্পপোস্ট, গাছপালা যতটা জানে, আর কোথাকার কেউ তেমন জানে না। আর লোকটা এতটাই চাপা, আগবাড়িয়ে নিজের কথা কাউকে বলবে না। সাত নাকি আট বছর হয়ে গেল অবিনাশদা বদলি নিয়ে চলে গেছে। ইদানীং সমস্তিপুরে তার কথা বিশেষ ওঠে না। আরও দশ বছর পর হয়তো কেউ মনেও রাখবে না। সাক্ষী থাকবে মৃগাঙ্কর খোঁড়া পা। এই খোঁড়া পায়ের ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অবিনাশদা। তার বোঝার ভুলেই মৃগাঙ্ক আজ ল্যাংড়া। তা নিয়ে অবশ্য কোনও ক্ষোভ নেই মৃগাঙ্কর। এই খুঁতটার জন্য তিনি অনেক কিছু পেয়েছেন, চিনি মিলের চাকরি, স্বাধীনতাসংগ্রামীর পেনশন। এখনও মাতাল মৃগাঙ্ককে বাঙালিটোলায় পনেরোই আগস্টে ডাকা হয়। ফ্ল্যাগ হয়েস্ট করেন বৈদ্যনাথ মজুমদার। খাঁটি কংগ্রেস। চারবার জেল খেটেছেন। মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে থাকেন ঠিক তাঁর পাশটিতে। সেদিন সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন মৃগাঙ্ক, নেশা করেন না। সারাদিন কেমন একটা পুজো পুজো ভাব।

নতুন জেনারেশন উঠে আসছে। তারা মৃগাঙ্কর খোঁড়া পায়ের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকালেও মুখের দিকে তাকায় ঘৃণাভরে। এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না মৃগাঙ্কর। সামনের বছর ওরা হয়তো আর পনেরোই আগস্টে ডাকবে না, তাতে বয়ে গেল। তাঁর এই খোঁড়া পায়ের জন্য অবিনাশদা তাঁকে ভুলতে পারেনি। এটাই সব থেকে বড় কথা। এখনও যখন অবিনাশদা সমস্তিপুরে আসে, মৃগাঙ্ককে নিভৃতে পেলেই বলে, মৃগাঙ্ক, তুই নিশ্চয়ই আজও আমাকে ক্ষমা করতে পারিসনি, না?

কেন একথা বারবার বল অবিনাশদা। আমি তো বলেছি, কপালে আমার এটাই লেখা ছিল। তুমি নিমিত্ত মাত্র। তা ছাড়া স্বাধীনতা আদায় করতে গিয়ে কত বিপ্লবীর প্রাণ গেল, আমি তো সামান্য একটু লেংচে হাঁটি।

না রে, যতই বলিস আমি তো জানি তুই স্বাধীনতার বিনিময়ে খোঁড়া হসনি। স্বাধীনতা ব্যাপারটা তুই ভাল করে বুঝতিস না। তুই ছিলি আমার ল্যাংবোট। আমার বোঝার ভুলেই গুলিটা তোর পায়ে লেগে গেল।

একেবারে নির্জলা সত্যি কথা। অবিনাশদার বিমর্ষ মুখটায় খুশি জাগাতে অযথা হাসেন মৃগাঙ্ক। বলেন, ছাড়ো তো ওসব। এই দ্যাখো তোমায় হেঁটে দেখাচ্ছি, কী এমন অসুবিধে হচ্ছে। আমি যে কোনওদিন সিধে হয়ে হাঁটতাম ভুলেই গেছি।... দ্যাখো না, দ্যাখো কেমন হাঁটছি, খুব কি বোঝা যাচ্ছে—শেষের কথাগুলো অস্ফুটে কলোনির অন্ধকারকে বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছেন মৃগাঙ্ক। রাস্তার দুপাশে অন্ধকার গাছ। বাতাস বইছে না। মাথার ওপর দিয়ে গাছ বদল করছে পেঁচা। কেমন যেন থম মারা পরিবেশ। আর খানিকটা গেলেই বলাইদার কোয়ার্টার। নেশাটা কি জমল না তা হলে! কানাইয়া জরুর পানি ডালছে ঠাররায়।

বৃষ্টির আগে প্রকৃতি এরকম গুম মেরে থাকে। আকাশের দিকে তাকান মৃগাঙ্ক, নাঃ, দিব্যি চাঁদ তারাগুলো ধুয়ে মুছে অন্ধকার আকাশে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। আজ কেন জানি ভীষণ অপরিচিত লাগছে চারপাশ। কিছু কী বলতে চাইছে প্রকৃতি? কুকুরগুলো ফিরে এল না

এখনও। —এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন পার করে গেছেন পানি ট্যাঙ্ক, বলাইদার বাড়ি ছাড়িয়ে এসেছেন অনেকক্ষণ, হঠাৎই চোখে পড়ে রাস্তার ওপারে গামার গাছতলায় কুকুরদের জটলা। রাজ্যের কুকুর তা হলে এখানে এসেই জুটেছে। ওদের মুখে কোনও আওয়াজ নেই। বৃত্তাকার হয়ে কুকুরগুলো কী যেন দেখছে। একটা দুটো কুকুর, দল থেকে বেরিয়ে এসে ফের ফিরে যাচ্ছে বৃত্তে।

রাস্তা ক্রস করেন মৃগাঙ্ক। খুঁড়িয়ে হেঁটে যান কুকুর পরিবৃত জায়গায়। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ না করে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ায়, কোনও একটা ব্যাপারে কুকুরগুলো বিমূঢ় হয়েছে। মৃগাঙ্ক এখন অভিভাবক।

কাপড় জড়ানো একটি শিশু। সাড়াশব্দ নেই। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। যতটা চমকানো উচিত, তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না মৃগাঙ্কর, সম্ভবত নেশা তাঁকে অবশ করেছিল। শিশুটিকে রক্ষা করা কর্তব্য মনে করে, যেই না তুলেছেন দু হাতে, থমকে থাকা বাতাস কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল শিশু।... অবিনাশের তিন নম্বর রুমের দেওয়ালে সেই অতীত প্রতিফলিত হল এতক্ষণ। আলোছায়ার অস্পষ্ট খেলায় অবিনাশ পুরোটা দেখতে পেলেন না। শিশুটির উদ্ধারপর্ব তিনি ঘনিষ্ঠ স্বজনদের মুখে শুনেছেন। মৃগাঙ্ক যদি সেদিন বাচ্চাটিকে তুলে না নিত, আর একটু যদি বেশি নেশা হয়ে যেত তার অথবা কুকুরগুলো শিশুটিকে টেনে নিয়ে মৃগাঙ্কর দৃষ্টির অগোচরে রাখত, অবিনাশকে হয়তো ড্রাইভারহীন অন্ধকার ট্রেনে তুলে দেওয়া হত না।

ঘুম আসছে না। বিছানায় টান টান হন অবিনাশ। চোখ বোজেন। জানলা খোলাই থাকে। ছায়ারা চলমান হয়... বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে অন্ধকার রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন মৃগাঙ্ক। মুখে আপনভোলা হাসি। কুকুরের দল পিছন পিছন আসছে। বাড়ি পৌঁছতে আর মিনিট খানেক। মৃগাঙ্কর মুখে আপন-হাসির কারণ, শিশুটি চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে বহু দিনের রুদ্ধ এক আকাঙ্ক্ষার দ্বার হঠাৎ খুলে যায়। সন্তানাকাঙ্ক্ষা। দশ বছর বিবাহিত জীবনে আজও নিঃসন্তান মৃগাঙ্ক। খোঁড়া মৃগাঙ্কর খুব শখ ছিল দুচোখ ভরে নিজের সন্তানের গটগট করে হেঁটে যাওয়া দেখবেন। বলা যেতে পারে এই আকাঙ্ক্ষাতেই দেরিতে হলেও বিয়েটা তিনি করেন। যমুনা তাঁর থেকে বছর পনেরোর ছোট। যমুনা তাঁকে কোনও সন্তান দিতে পারেনি, নাকি তিনিই পারেননি, এ ব্যাপারে একটা ধন্ধ থেকে গেছে। বড় ডাক্তার-বদ্যি এখনও তেমন দেখানো হয়নি। অবিনাশদা বারকয়েক বলেছে, কলকাতায় আয়, আমি ভাল ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে দেব।

সে আর হয়ে ওঠেনি। আসলে মৃগাঙ্কর কেন জানি মনে হয়, উনিশশো চুয়াল্লিশে লাগা গুলিটা তাঁর বীর্য বিষিয়ে দিয়েছে।

চিনি মিলের এক বড়কর্তার কোয়ার্টারের আউট হাউসে থাকেন মৃগাঙ্ক। নিয়ম অনুযায়ী এটা তাঁর প্রাপ্য নয়। পৈতৃক বাড়ি কাছেই, তাজপুর রোডে। তবু বড়কর্তাটির অনুগ্রহে থাকার জায়গাটি পেয়েছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ার সুবাদে এই খাতির। বিহারে এ ব্যাপারটা বেশ মান্য করা হয়।

নিজের বাড়িতে না থাকতে পারার কারণ মৃগাঙ্ক স্বয়ং। তাঁকে নিয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত থাকত ভাই, ভাইবউ। ভাই শশাঙ্ক হাইস্কুলে মাস্টারি করে। সমাজে তার একটা মানসম্মান আছে। মাতাল, খামখেয়ালি, ল্যাংড়া দাদাকে সে আর কতদিন সামলাবে। শশাঙ্ক প্রায়ই মেজাজ হারিয়ে ছোটবড় কথা বলে ফেলত, নিজেরই তো ভাই, গায়ে মাখতেন না মৃগাঙ্ক। যমুনা পরের বাড়ির মেয়ে, আড়ালে চোখের জল ফেলত। সেটাই সহ্য করতে না পেরে মৃগাঙ্ক বড়বাবুকে এসে ধরেন, মেহেরবানি করকে এক কোয়ার্টারকা বন্দবস্ত কর দিজিয়ে। মেরা ছোটাভাই ঘর পে রহনে নেহি দেতা। ইতনা পরেসান...

সব শুনে বড়কর্তা দীনেশ যাদব তাঁর কোয়ার্টারের পিছনেই ব্যবস্থা করে দেন। তাতেও ছোট ভাই কথা শোনাতে ছাড়েনি। বলেছে, ওইসব মেনিয়াল আউট হাউসে জমাদার থাকে। কদিন পর দেখো তোমাকে দিয়ে সাফাইয়ের কাজ করাবে।

কোনওদিনই করাননি মিস্টার যাদব। বরং মৃগাঙ্ক যখন নেশা ছাড়া স্বাভাবিক থাকেন,

যাদব সাহেব হনুমান চালিসা পড়তে ডাকেন মৃগাঙ্ককে। ময়লা পরিষ্কারের কাজটা সম্ভবত আজই প্রথম করছেন মৃগাঙ্ক। এই শিশুটি কার কে জানে! কে যে ফেলে দিয়ে গেল?

কোয়ার্টারের মূল ফটক ছাড়াও বাড়ির পিছনের দিকে একটা ছোট লোহার গেট আছে। ওটা দিয়েই যাতায়াত করেন মৃগাঙ্ক। শিশু কোলে গেটের কাছে এসে দাঁড়াতে, কুকুরের দলও থেমে গেল। মৃগাঙ্ক পিছন ফিরে রাস্তাটা দেখলেন, কেউ কি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে? আরও একবার খুঁটিয়ে দেখলেন, না, মনে হচ্ছে বিভ্রম। অবলা কুকুরগুলো ছাড়া আর কোনও সাক্ষী রইল না। তা হলে! বাগানের পাশ দিয়ে ইট পাতা রাস্তা ধরে এগিয়ে যান মৃগাঙ্ক। নিজের বাড়ির টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে। যমুনা এ সময়টা রুটি বানায়। মাতাল স্বামীর পাতে গরম গরম তুলে দেবে।

বারান্দায় উঠে মাল পাচারকারীর মতো চাপা স্বরে মৃগাঙ্ক ডাকেন, যমুনা! যমুনা! কণ্ঠে এতটুকু জড়তা নেই। কেমন যেন অচেনা লাগে গলাটা। ফুলে ঢোল হয়ে ওঠা রুটিটা চিমটে দিয়ে উনুন থেকে নামিয়ে আর একটা ডাকের অপেক্ষা করেন যমুনা। এই আউট হাউসের ওপর তার কোনও বিশ্বাস নেই, তেনাদের ফিসফিসানি, খরো পায়ে চলা-হাঁটা প্রায়ই শোনা যায়। এক্ষুনি শোনা ডাকটা নিশির হতে পারে।

যমুনা! দরজা খোলো। তাড়াতাড়ি।

একই রকম চাপা স্বর। তবে এটা যে তাঁর স্বামীর বুঝতে অসুবিধে হয় না যমুনার এত রাত্রে স্বামীর জড়তাহীন কণ্ঠস্বর শুনে মনটা কু ডাকল। শাড়িতে হাত মুছে উঠে এলেন।

দরজা খুলে দেখেন, মৃগাঙ্ক বুকের কাছে কী যেন জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই যমুনাকে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকে আসেন মৃগাঙ্ক। স্বামীর কোলে সদ্যোজাতকে দেখে ভয়ে 'ও, মা গো' বলে আঁতকে ওঠেন যমুনা।

চুপ, একদম চিল্লাবে না। কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। চোখ পাকিয়ে বলেন মৃগাঙ্ক।

অবোধ শিশু এই নাটকের কিছুই টের পাচ্ছে না। চোখের পাতা ফেলছে পিটপিট দৃষ্টি হয়তো বিগত জন্মে। তবে একটা ব্যাপারে সহযোগিতা করছে খুব। একদম কাঁদছে না। মৃগাঙ্ক ওকে মাটি থেকে তুলে আনার সময় একবারই যা কেঁদেছিল।

ও কাদের বাচ্চা তুমি চুরি করে নিয়ে এলে? ঘসঘসে গলায় জানতে চান যমুনা। আশঙ্কায় চোখ এখনও বড় বড়।

'চুরি' শব্দটা প্রয়োগ করা ঠিক হল না যমুনার। সন্তানাকাঙ্ক্ষাটা সযত্নেই চেপে রাখেন মৃগাঙ্ক। বরং সময় সময় যমুনাকে নানান প্রবোধ দেন। সেগুলো যে মিথ্যে, যমুনা তার মানে টের পায়। মৃগাঙ্ক কাপড় মোড়া বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, চুরি করতে যাব কেন! রাস্তায় পড়েছিল। আর একটু হলে কুকুর-শিয়ালে ছিঁড়ে খেত।

বাচ্চাটাকে কোলে নেন যমুনা। মুখে মা মা আভা ফুটে ওঠে। বলেন, ছেলে না মেয়ে? এই রে, সেটা তো দেখা হয়নি। বোকা বনে যাওয়া গলায় বলেন মৃগাঙ্ক। শিশুটির কাপড় সরাতে সরাতে যমুনা হাসেন, মেয়ে হলে কি ফেলে দিয়ে আসতে?

মৃগাঙ্কর চোখে সরল হাসি। দৃষ্টি শিশুটির ওপর স্থির। যমুনা বলেন, বেশ হয়েছে। এ তো দেখছি মেয়ে।

বাচ্চাটাকে ফের কোলে নেন মৃগাঙ্ক। বলেন, আমি মেয়েই চেয়েছিলাম। এর একটা ভাল নাম দিতে হবে।

উ, কার না কার মেয়ে, কাল সকালেই এসে ফেরত চাইবে, এখনই নাম দেওয়ার জন্য তাড়া পড়ে গেল!

ফেরত চাওয়ার হলে ফেলে দিয়ে যেত না। এ এখন আমাদের মেয়ে।

মৃগাঙ্কর সিদ্ধান্তে সতর্ক হন যমুনা। বলেন, অমন অবুঝ কথা বোলো না। রাস্তায় পড়ে থাকা বাচ্চা, পুলিশকে আগে জানানো উচিত। তারপর দেখো মেয়েটা কোন জাতের। মানুষ করব বললেই তো হল না।

মৃগাঙ্কর মুখটা থমথমে হয়ে যায়। অভিব্যক্তির মধ্যে মিশে আছে বালকের বায়না পূরণ না

হওয়ার আক্রোশ। যমুনাকে ফেরত দেন বাচ্চা। হতাশ হয়ে বিছানায় গা ছেড়ে দিলেন। যমুনা বাচ্চাটাকে কোলে দুলিয়ে আদর করছে। অদ্ভুত সব আদুরে শব্দ করছে মুখে। অথচ বলছে মেয়েটাকে জমা দেবে থানায়। মেয়েদের কোনওদিনই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন না মৃগাঙ্ক।

তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও, খেতে দিচ্ছি। বলে যমুনা বাচ্চাসুদ্ধু চলে যান রান্নাঘরে। মৃগাঙ্কর শরীর জুড়ে একটা অস্থিরতা শুরু হয়। সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, মেয়েটিকে নিয়ে কী করবেন। ঘরের মধ্যেই শুরু করেন পায়চারি। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে অবিনাশদার কথা। সে যদি এখানে থাকত। কোনও অসুবিধেই হত না সিদ্ধান্ত নিতে। অবিনাশদার সাদা ধুতি পাঞ্জাবির চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করেন মৃগাঙ্ক। কল্পনায় তাকে এই ঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিছুতেই আসছে না। অবিনাশদাকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়? চিঠির মাধ্যমেই করণীয় জেনে যাওয়া যাবে।

কাগজ পেন খুঁজতে বেগ পেতে হল। এ-বাড়িতে লেখাপড়ার চল নেই। যমুনার ট্রাঙ্কে বাহারি প্যাডের পাতা, নতুন পেন আর নীল কালির দোয়াত পাওয়া গেল। বিয়েতে পেয়েছিল হয়তো। কালি শুকিয়ে গেছে। জল ঢেলে নিলেন। দ্রুত পেনে কালি ভরে চিঠি লিখতে বসেন মৃগাঙ্ক। পূজনীয় অবিনাশদা, লেখার পরই থেমে যান। কী হবে লিখে, এই চিঠি পৌঁছবে সাতদিন পরে, উত্তর আসতে আরও সাত-দশ দিন। কিন্তু ততদিনে মেয়েটার ভাগ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে।

প্যাড পেন পড়ে রইল বিছানায়, মৃগাঙ্ক উঠে যান রান্নাঘরের দিকে। চৌকাঠে পা রেখেই সম্মোহিত হয়ে পড়েন। কী অপূর্ব দৃশ্য! কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জীবনের সব প্রত্যাশা। রান্নাঘরে বসে যমুনা তার দুধহীন স্তন তুলে দিয়েছে বাচ্চাটার মুখে, স্তনবৃত্তের পাশে গোপনে দুধ ভর্তি ঝিনুক রেখে মেয়েটাকে খাওয়াচ্ছে। ভীষণ আগ্রহে মেয়েটা তাই খাচ্ছে। খিদে পেয়েছিল হয়তো। ঠিক এই মুহূর্তে দুটো প্রশ্ন মাথায় আসে মৃগাঙ্কর, যমুনা ঝিনুক কোথায় পেল? মরিয়া সন্তানাকাঙ্ক্ষায় কিনে রেখেছিল কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, জাত না জেনে বাচ্চাটার মুখে স্তন তুলে দিতে যমুনার গা ঘিনঘিন করেনি?—প্রশ্ন দুটো না করে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় চিত্রার্পিতর মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন মৃগাঙ্ক।

সেই রাতে ঘুম আসছিল না মৃগাঙ্ক, যমুনার। প্রহর জানান দিয়ে ডাকছিল শিয়াল, দুজনের মাঝে শুয়ে থাকা মেয়েটা চমকে চমকে উঠছিল। ঘুমের মধ্যে হাসছিল মেয়ে। যেন জানালা গলে চাঁদটা নেমে এসেছে দুজনের মাঝখানে। কত আবোলতাবোল কথা হচ্ছিল দম্পতির মধ্যে। মেয়েটাকে থানায় জমা দেওয়ার প্রসঙ্গ আসছিল না। ভোরের একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েন মৃগাঙ্ক। ঠিক কতক্ষণ পরে কে যেন তাঁকে ধাক্কা দেয় বারবার। চোখ কচলে ধড়মড় করে উঠে বসেন মৃগাঙ্ক, বাইরে বেরোনোর শাড়ি পরা যমুনাকে দেখে অবাক হয়ে যান। যমুনাই ঠেলে তুলেছে। বলছে, মেয়েকে নিয়ে আমি দিদির বাড়ি যাব। আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো। এখানকার লোকেদের বলবে পেটে বাচ্চা এসেছে, বাপের বাড়ি গেছি।

হতভম্ব মুখে গোটা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন মৃগাঙ্ক। যমুনার দিদি গীতা থাকে গোরক্ষপুর। জামাই রেলে চাকরি করে। মানুষ ভাল। ওদের একটাই সন্তান, পুত্র। ওদের বাড়িতে আত্মগোপন করে কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানকে নিজের করতে চাইছে যমুনা। আর বাপের বাড়ি হচ্ছে মজফফরপুর। বাচ্চা হতে মেয়েরা বাপের বাড়ি যায়। লোকে সহজেই বিশ্বাস করবে। বাপের বাড়ি না গিয়ে যমুনা দিদির বাড়ি যাচ্ছে মানে, মা, দাদাকেও আসল কথাটা জানতে দিতে চায় না। নিজের দিদিজামাইবাবুকে ভীষণ বিশ্বাস করে যমুনা।

মৃগাঙ্ক শয্যা থেকে ওঠেন। যমুনার সিদ্ধান্তে কোনও মতামত দেন না। আসলে নিজেই ঠাহর করতে পারছেন না ব্যাপারটা কতটা ঠিক হচ্ছে। কলঘরের দিকে যান।

ভোরের আলো সেভাবে ফোটেনি। সেপ্টেম্বরের শেষে এই সময়টা একটু হিমভাব থাকে। রাস্তায় মানুষজন থাকার কোনও প্রশ্ন নেই। যমুনা চাদর মুড়ি দিয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে চলেছেন, পাশে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন মৃগাঙ্ক। দুরে গণ্ডক নদীর ওপর নেমে এসেছে আবছা

কুয়াশা। মাঠ সারতে এক দুজনকে কি দেখা যাচ্ছে ওখানে? যমুনাকে তাড়াতাড়ি পা চালাতে বলেন মৃগাঙ্ক। গোরক্ষপুরের লোকালটা আজ আবার লেট না করে।

স্টেশনে তেমন ভিড় নেই। গাড়ি সময়মতো এল। যমুনাকে জানলার পাশে বসিয়ে, কোলের মেয়েটার দিকে তাকান মৃগাঙ্ক। বাচ্চাটা জুলজুল করে যেন মৃগাঙ্ককেই দেখছে। এক রাতের স্নেহাশ্রয়ে কত আপন হয়ে গেছে মেয়ে। যমুনার মতোই বেশ ধবধবে মেয়েটা। চট করে কেউ সন্দেহ করবে না। কোল আলো করে শুয়ে থাকা মেয়েটার গাল ছুঁয়ে আদর করেন মৃগাঙ্ক। বলেন, মা আমার।

ট্রেন হুইশেল দেয়। মৃগাঙ্ক নেমে আসেন কামরা থেকে। এক্ষুনি বাড়ি ফিরে অবিনাশদাকে সব কথা লিখতে হবে। কাজটা কতটা ঠিক হল কে জানে!

মৃগাঙ্ক ট্রেন থেকে নেমে যেতে কামরার চারপাশটা সতর্ক চোখ বুলিয়েছিলেন যমুনা, চেনাজানা কেউ নেই তো? পরক্ষণেই খেয়াল হয় মৃগাঙ্ক হয়তো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের জানলা দিয়ে মৃগাঙ্ককে খুঁজেছিলেন যমুনা, পাননি।

ট্রেন চলেছে ঝাইঝিকিস, গতি পায়নি এখনও। শহর ফুরিয়ে দুপাশে মাঠ নিয়ে চলেছে ট্রেন। এই কামরাটায় অন্তত যমুনার পরিচিত কেউ নেই। সমস্তিপুরের বাঙালিরা যমুনাকে একবার দেখেই চিনতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম। তিনি বাইরে খুব একটা বেরোন না, ভবঘুরে মাতাল স্বামীর কাছে দরকার ছাড়া আসে না কেউ। যমুনার ঘরকুনো স্বভাব। সন্তানহীনতার কারণে সেটা আরও বেড়েছে। অথচ ওর নিপাট ঘর-গৃহস্থালি দেখলে ওই দুটো ক্ষতের উপস্থিতি কেউ টেরই পাবে না।

প্রিয় ঘরসংসার ফেলে এ-কার মেয়েকে নিয়ে যমুনা চলেছেন অজ্ঞাতবাসে! এই মেয়েটা তাঁর কে হয়! কেউ হয় না, এখনও অবধি হয়নি। পরের বাচ্চাকে দেখলে যেমন আদর করতে ইচ্ছে জাগে, এ তেমনই। এখনই যদি শক্তিশালী কেউ এসে বাচ্চাটাকে কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়, একটুও মন কেমন করবে না শিশুটার জন্য। কষ্ট হবে মৃগাঙ্ক কথা ভেবে। কাল রাতে যখন বাচ্চা কোলে ঘরে এসেছিল মৃগাঙ্ক, চোখে ছিল পিতৃত্বর আকুল প্রত্যাশা। এমনভাবে আঁকড়ে ছিল মেয়েটাকে যেন কেড়ে নিতে গেলেই পশুমাতার মতো আঁচড়ে কামড়ে দেবে। মৃগাঙ্কর এই সন্তানাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা টের পান যমুনা। দুজনকেই একবার ভাল ডাক্তার দেখানোর কথা বললে, এড়িয়ে যায় মৃগাঙ্ক। বলে, কী হবে জেনে, কার দোষ। যার খুঁতে বাচ্চা হচ্ছে না, সে যে সারাজীবন অনুতাপ করে যাবে। তার থেকে চলো না, আমরা দুজনেই দুঃখটা ভাগ করে নিই। অদ্ভুত লোক! ডাক্তার যখন দেখানোই যাবে না, যমুনা আর কী করেন, জুড়িবুটি, টোটকা খান। ভোলানাথ মন্দিরে মানত করেন। গত ছ বছর ধরে ছট মাইয়ার উপবাস করছেন। এখনও অবধি ফল হয়নি। হয়তো হবে। তার আগেই কোলে করে বাচ্চাটাকে নিয়ে এল মৃগাঙ্ক। যমুনার সাহস হল না ফিরিয়ে দিতে।

এতদিনে একটা বিষয়ে যমুনা নিশ্চিত হয়েছেন, ছেলেপুলে না হওয়ার জন্যই তাঁর স্বামী এতটা অস্বাভাবিক। মানুষটার কত গুণ। লোকের আপদে-বিপদে সর্বদা ছুটে যায়। বাঙালি, বিহারি, জাত-বেজাতের তোয়াক্কা করে না। এক পয়সা আত্মসাৎ করে না কারও। জুয়ো খেলার অভ্যেস নেই, লটারির টিকিট কেনেন না। এমনকী ভগবানের কাছেও দু হাত জোড় করে কখনও কিছু চায়নি। এই দেবতুল্য লোকটা শুধুমাত্র নেশা করার জন্যই সমাজ পরিবারের কাছে হেয় হয়ে রইল। বিয়ের পরপর মানুষটা এমন ছিল না। বিশেষ করে পাত্রী দেখতে আসার দিনটা যমুনার বারবার মনে পড়ে। সেদিন কী বার ছিল মনে নেই, মাসটা ছিল ফাল্গুন। সকালে বাবা হঠাৎ ঘোষণা করলেন, পাত্রপক্ষ আজ যমুনাকে দেখতে আসবে।

মা হতভম্ব। দু মাসও হয়নি বড়মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সংসার একেবারে হাঁড়ির হাল। বাবা চাকরি করেন রেলে। খুব নিচু পোস্ট। মাইনে কম। এর মধ্যেই মেজমেয়ের বিয়ে। তারপরেও আর একটা মেয়ে অপেক্ষা করছে। —সকাল থেকে গাইগুই শুরু করলেন মা। বৃথাই সেই প্রতিবাদ। বাবার কথাই সংসারে চলে। তিন কন্যার জনক হিসেবে বাবা

হতাশাগ্রস্ত, ফলত বদমেজাজি। বললেন, এমন পাত্র সহজে পাওয়া যাবে না। উচ্চবংশ। চিনি মিলে পার্মানেন্ট চাকরি। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিল। পেনশন চালু হচ্ছে, অ্যাপ্লাই করেছে। পাবেই। আন্দোলন করতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছে। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। সব থেকে বড় কথা, পাত্র বলে দিয়েছে সে পণ নেবে না। মেয়েকে সিঁদুর-আলতা-শাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

সত্যিই প্রবাসে এমন বাঙালি পাত্র পাওয়া একটু দুর্লভ। সম্বন্ধটা এনে দিয়েছিলেন বাবার অফিসের এক সহকর্মী। তাঁর আদি বাড়ি সমস্তিপুরে। পাত্রকে ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। কিছুদিন হল পাত্রর মা মারা গেছেন, বাবা গত হয়েছেন আগেই। পৈতৃক বাড়িতে এখন দুই ভাই। ছোট ভাই মাস্টারি করে। সংসারের হাল ধরতে হবে যমুনাকে গিয়ে।

মনে মনে প্রস্তুত হন যমুনা। তাঁর জন্য যে পক্ষীরাজ চেপে পাত্র আসবে না জানতেন। ফরসা হলেও দিদির মতো অত সুন্দরী নন যমুনা। পড়ালেখা লোয়ার স্কুল পর্যন্ত। তারপর সেলাই-ফোঁড়াই সংসারের কাজ, এই তো পুঁজি। এখন কথা হচ্ছে পাত্রটি কতটা খুঁতো? আত্মীয়পরিজনরা হাসাহাসি করবে না তো? নিজের জন্য চিন্তা নয়, মা-বাবার অপমানের কথাটাই ভাবছিলেন যমুনা। আত্মীয়রা আবার না বলে গরিব বাবা মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিল।

দুপুরবেলা পাত্রর সামনে মাথা নিচু করে বসে এসব কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবছিলেন যমুনা। পাত্রর সঙ্গে এসেছে কাকা, কাকিমা। ভাই আসেনি। কাকা-কাকিমা যতই আপনভাব করুন বোঝা যাচ্ছিল সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

যমুনাকে কয়েকটা প্রথাগত প্রশ্ন করে, চলিয়ে ফিরিয়ে কাকারা বললেন, আমরা পাশের ঘরে আছি, ছেলেমেয়ে একে অপরের সঙ্গে কথা বলে নিক।

অভিভাবকদের আধুনিকতায় একটু অবাক হয়েছিলেন যমুনা। এসব কলকাতায় চালু হয়েছে শুনেছেন। এত তাড়াতাড়ি বিহার পর্যন্ত প্রভাব পড়ে গেল। পরে জেনেছেন, এটা ঘটেছিল মৃগাঙ্কর নির্দেশে। এমনটাই বলে এনেছিলেন কাকা-কাকিমাকে।

ওঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই মৃগাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, শোনো যমুনা, আমি জানি তোমার মনের মধ্যে এখন কী হচ্ছে।

আকস্মিক এই কথায় যমুনা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন মৃগাঙ্কর দিকে। মৃগাঙ্ক বলছেন, তুমি ঘরে এসে থেকে আমাকে বসা অবস্থায় দেখছ। এখনও জানো না আমি কতটা খোঁড়া। আমি তোমাকে হেঁটে দেখাচ্ছি। তারপর তোমার মতামত তুমি আমাকে জানিয়ো। তোমার মতটা আমি নিজের বলে গুরুজনদের জানাব। তোমাকে খামোকা বকাঝকা খেতে হবে না।

কথা শুনে যমুনা পলক ফেলতে ভুলে গেছেন। তার মাঝেই হাঁটা শুরু করলেন মৃগাঙ্ক। বলে যাচ্ছেন, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকার সৈন্যরা একবার সমস্তিপুরের ওপর দিয়ে ট্রেনে করে যাচ্ছিল। ব্রিটিশদের সাহায্য করতে এসেছিল ওরা। টমি বলা হত ওদের। ওরা গুলি চালিয়েছিল সমস্তিপুরে। একটা গুলি লেগে যায় আমার পায়ে। আমেরিকা খোঁড়া করে দিয়ে যায় আমাকে... আরও কীসব বলে যাচ্ছিলেন মৃগাঙ্ক। কিছুদিন আগেও কাউকে লেংচে হাঁটতে দেখলে হাসি পেত যমুনার। সেদিন পাচ্ছিল না। যমুনা দেখছিলেন ছোট পা-টা একটু পরে, ভীষণ কুণ্ঠাভরে মাটি ছুঁচ্ছে। তখনই যমুনা বুঝেছিলেন, এই মানুষটার আমাকে খুব দরকার।

'চায়ে গরম, চায়' ডাকে সংবিৎ ফেরে যমুনার। কোলের দিকে তাকান, মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। ওকে কিছু খাওয়াতে হবে। চা-ওলাকে ডেকে বলেন, ভাইয়া, বাচ্চাকে লিয়ে থোড়া দুধ কা বন্দবস্ত হোগা।

কাহে নেহি হোগা দিদি, পুসা রোড আনে দিজিয়ে, ম্যায় কোশিস করতা হুঁ।

এধার ওধার দু-চারজন যাত্রীকে চা দিয়ে চাওলা চলে যায়। এক ভাঁড় যমুনারও খাওয়ার ইচ্ছে করছিল, মেয়েটাকে খাইয়ে নিয়ে খাবেন। পাশে বসা দেহাতি বউটা ঢুলে ঢুলে পড়ছে গায়ে। বউটার তিনটে বাচ্চা। একটা কোলে। পাশে একটা মায়ের শাড়ি আঁকড়ে ঘুমোচ্ছে। আর একজন বছর তিন-চারেকের হবে, দিব্যি হেঁটে চলে, পাশের কুপে চলে যাচ্ছে। মা

দিয়েছে পরম নিশ্চিন্তের ঘুম। বউটার সঙ্গে স্বামী নেই। যমুনা খেয়াল করেছেন, বউটার মরদ ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেছে। রাতের ঘুম ট্রেনে সম্পূর্ণ করছে বউটা। বাচ্চাগুলোর দিকে খেয়ালই নেই। এদেরকেই ভগবান দেন। হয়তো গতজন্মে কোনও পুণ্য করেছিল বউটা। এ জন্মে পাচ্ছে সুখ। ওর যে-বাচ্চাটা টলটলে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পাশের কুপে চলে যাচ্ছে, না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে যমুনার। নিজের কোলের মেয়েটার জন্যেও চিন্তা হচ্ছে, পারবেন তো বাঁচিয়ে রাখতে? মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলার একটা ঘটনা। তখন তিন বোন খুব ছোট ছোট। তাদের বাড়ির এঁটো খাওয়া বিড়ালটা পাঁচটা বাচ্চা দিল কয়লার ঘরে। মা বলে, দুর কর, দুর কর। সারা বাড়ি নোংরা করবে।

নর্দমা পরিষ্কার করে মেঘু, চলে এসেছিল বিড়াল বাচ্চাগুলোকে ফেলে দিতে। টের পেয়ে তিন বোন বাচ্চাগুলোকে প্যাকিং বাক্সে সরিয়ে ফেলে। কদিন ধরে চলল খুব পরিচর্যা। দুধ খাওয়ানো, নিজেদের ভাগ থেকে বিড়াল মাকে মাছ দিয়ে দেওয়া। বাচ্চাগুলোর তখন চোখ ফোটেনি। বাবা-মা সবই জানলেন, কিছু বললেন না। তিন মেয়ে নতুন খেলা পেয়েছে, খেলুক।

প্রথম মরল বিড়াল মা। একদিন দুপুরবেলা ছোটবোন শান্তা কাঁদতে কাঁদতে এসে খবর দিল, পেয়ারাগাছতলায় মেনি মরে পড়ে আছে।

পরের দিন থেকে মরতে থাকল বাচ্চাগুলো। শূন্য প্যাকিং বাক্সের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকত তিন বোন। সেই শূন্যতা ঢুকে গেল যমুনার পেটে। বাকি দুই বোনই ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে ঘরসংসার করছে। শান্তার তো বিয়ের এক বছরের মাথায় মেয়ে হল। যমুনার গতজন্মের কোনও পাপের শাস্তি দিচ্ছেন ঈশ্বর। কী সেই গুরুতর পাপ? এদিকে ভগবানের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মৃগাঙ্ক রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা বাচ্চা কোলে দিয়ে মা করে দিল যমুনাকে। উচিত হল কি? মা ষষ্ঠীর কোপে পড়বে না তো মেয়েটা!

মৃগাঙ্কই বা কী করবে, বাচ্চাটাকে ওই অবস্থায় ফেলে আসাও তো অন্যায়। মেয়েটার মুখের দিকে তাকান যমুনা। একটু উশখুশ করছে। পরমুহূর্তে টের পান কাপড় ভিজিয়েছে।

ঝোলা থেকে শুকনো কাপড় বার করেন যমুনা। কাঁথা করার সময় পাওয়া যায়নি। দিদির বাড়ি গিয়ে করতে হবে। যারা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল মেয়েটাকে, কাঁথা, অয়েল-ক্লথসুদ্ধ রেখেছিল। সেসব মস্ত প্রমাণ। যমুনা ওই কাপড়গুলো একদম লুকিয়ে রেখে এসেছেন। এখন মনে হচ্ছে পুড়িয়ে দিয়ে আসলেই ভাল হত। এমনও হতে পারে মেয়েটার মা জানে না তার কন্যাকে বিদেয় করা হচ্ছে। হয়তো ঘুমোচ্ছিল মা। ঘুম ভেঙে দেখে মেয়ে নেই। সেই মা এখন সমস্তিপুর তোলপাড় করে মেয়েকে খুঁজছে। নাঃ জিনিসগুলো পুড়িয়ে দিয়ে এলেই ভাল হত।

কাপড় বদলে দিতে মেয়ে একটু সুস্থির হয়েছে। জুলজুল করে দেখছে যমুনাকে। সত্যিই কী মিষ্টি দেখতে! ভীষণ এক ধরনের মরিয়া মায়া তৈরি হচ্ছে। এর আসল মা যদি মেয়েকে এখন ফেরত চায়, বুকে ধরে দিতে পারবেন কি যমুনা? মেয়েটা যে কদিনের যমুনা ধরতে পারছেন না। এর মুখ যদি একবার ওর মা দেখে থাকে, সারা জীবনেও পারবে না ভুলতে।

অর্থাৎ অলক্ষ্যে যমুনার বাকি জীবনে একজন অনুসরণকারিণীর সৃষ্টি হল। যার থেকে সর্বদা লুকিয়ে থাকতে হবে।

পুসা রোডে ট্রেন থেমে ফের চলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠছে বাচ্চাটা। খিদে পেয়েছে। এখনও যে কেন চা-ওলা দুধ নিয়ে এল না কে জানে! একটু পরে যদি খুব কাঁদতে শুরু করে, কী দেবেন খেতে? ত সব উলটোপালটা জিনিস উঠছে কামরায়। রামদানা, কলা, ছোলা... এসব কিছুই দেওয়া যাবে না। সত্যি ভীষণ ভুল হয়ে গেছে দুধের ব্যবস্থা না করে ট্রেনে উঠে। সঙ্গে শুধু ঝিনুকটা আছে।

দেখতে দেখতে চিলচিৎকার শুরু করল মেয়ে। যমুনা ঠিক করতে পারছেন না কী করবেন। বড্ড দিশেহারা লাগে। গায়ে ঢুলে পড়া বউটার ঘুম ভেঙে গেছে। বলে, কাহে লা আপ ছাতি কা দুধ নেহি পিলা রেহী হ্যায়! ঠিক সেই সময় ফিরে আসে চা-ওলা। হাতে তার

দুধ নেই, এমনকী চায়ের কেটলিও না। সঙ্গে একজন রেল-পুলিশ। যমুনার দিকে হাত বাড়িয়ে পুলিশকে কী যেন বলে চা-ওলা।

॥ দুই ॥

যমুনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন মৃগাঙ্ক। হাতমুখ ধুয়ে চিঠি লিখতে বসেছেন। পূজনীয় অবিনাশদা লেখাই ছিল, তারপর লিখলেন আরও অনেক কথা। কাল রাতে মেয়েটাকে কুড়িয়ে পাওয়ার বৃত্তান্ত, বাচ্চাটাকে নিয়ে যমুনার দিদির বাড়ি চলে যাওয়া সব...। শেষে লিখলেন, তোমার কথা এসময় বড্ড মনে পড়ছে। যদি কদিনের ছুটি নিয়ে একবার আসতে পারো খুব ভাল হয়। তুমি তো জানই আমার মতো হ্যাবাক্যাবলা মানুষের বিয়ে করাই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তার ওপর মেয়ে। কীভাবে সব সামলাব বুঝতেই পারছি না। তা ছাড়া মেয়ের মাথায় তোমার আশীর্বাদটাও খুব দরকার। নইলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।... এত অবধি লিখে অন্যমনস্ক হলেন মৃগাঙ্ক চোখে ভেসে উঠল তাঁদের কৈশোর, মিলন মন্দির নামে এক সংঘে অবিনাশদা, মৃগাঙ্করা লাঠিখেলা, কুস্তি এবং নানা রকম খেলাধুলো করতে যেতেন। ওঁরা টের পেতেন, সংঘের ভিতরে গোপনে স্বদেশি কাজকর্ম হয়। ভোলাদা ছোটদের অনুশীলন করাতেন। তিনি যে বড় সারির নেতা নন, সেটা বুঝতে অসুবিধে হত না। ভীষণ বদরাগী এবং চঞ্চল মনের মানুষ ছিলেন। মাঝেমধ্যে সমিতির ঘরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অচেনা মানুষের আগমন হত। তাঁদের হাঁটাচলায়, কথাবার্তায় সব সময় সতর্ক ভাব। মৃগাঙ্করা নিশ্চিত জানতেন এঁরাই সেই বিপ্লবী যাঁদের ব্রিটিশ পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে।

ওঁরা এলেই ভোলাদা সংঘের ছেলেদের ছুটি দিয়ে দিতেন। তারপর চলে যেতেন সমিতির ঘরে। মৃগাঙ্করা বাড়ি ফেরার পথে আগন্তুককে নিয়ে আলোচনা করতেন। বাঙালি ছেলেরা বলত, উনি এসেছেন কলকাতা থেকে। দেখলেই বোঝা যায় বাঙালি। চাপাস্বরে বাংলাতেই কথা বলছিলেন।

বিহারি ছেলেরা সেটা মানতে চায় না। বলে, পাটনা সে আঁয়ে হ্যায়। হিন্দিমে বাত কর রহে থে। —কেউ বলে দিল্লি।

ওঁদের আলোচনায় যোগ দিত না অবিনাশদা। একটু তফাত রেখে গম্ভীর মুখে হেঁটে যেত। মুখে লেগে থাকত অভিমান। বাইরে থেকে কেউ এলেই কেন মাঝপথে অনুশীলন বন্ধ হয়ে যাবে? এ নিয়ে প্রায়ই মৃগাঙ্কর কাছে বিরক্তি প্রকাশ করত অবিনাশদা। বলত, এভাবে যদি চলতে থাকে, আমরা কবে তৈরি হব বলতে পারিস? কবে থেকে দেশের কাজে লাগতে পারব?

ওরা কি আমাদের নেবে অবিনাশদা? অনিশ্চয়তার সুরে জানতে চাইতেন মৃগাঙ্ক। অবিনাশদা বলত, নেবে না মানে, আলবাত নেবে। দেশের জন্য কিছু করার অধিকার আমাদেরও আছে।

অবিনাশদার কথা শুনে মৃগাঙ্ক ভয় পেতেন। মনে হত, না বলেকয়ে অবিনাশদা একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে। সমস্তিপুরের শিক্ষিত দেশদরদি অভিভাবকরাই তাঁদের ছেলেদের সমিতিতে শরীরচর্চার জন্য পাঠাতেন। তার মানে এই নয়, তাঁরা চাইতেন ছেলেরা ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী হক। সন্তানরা ব্রিটিশদের সামনে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াক, এই ছিল তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু অবিনাশদার ধরনধারণ ভাল ঠেকছিল না মৃগাঙ্কর। মৃগাঙ্ক, অবিনাশদার বাড়ি পাশাপাশি। ব্রজজেঠু মানে অবিনাশদার বাবাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অবিনাশদার মতিগতি বলে দিলে ভাল হয়। কিন্তু অন্য মুশকিল হবে, দুজনেরই যাওয়া বন্ধ হবে মিলন মন্দিরে। তৎসঙ্গে অবিনাশদার হাতে ঠ্যাঙানি অনিবার্য।

এরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাচ্ছেন মৃগাঙ্ক, এমন সময় অবিনাশদা ঘটাল এক সাংঘাতিক কাণ্ড। ঘটনাটা কিছুটা যেন অলৌকিক। তখন অবিনাশদার কত আর বয়স হবে, পনেরো-ষোলো। একদিন অনুশীলন সেরে বাড়ি ফিরছিলেন মৃগাঙ্ক, অবিনাশ এবং ভোলাদা। বাকি

সব ছেলেরা একটু আগে এ-গলি সে-গলি দিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে। মৃগাঙ্করা বড় রাস্তা ধরে হাঁটছেন। আর একটু এগোলেই সমস্তিপুর কোর্ট চত্বর। অবিনাশদা হঠাৎই ভোলাদাকে বলে বসে, এবার দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ দিন। অনেকদিন তো অনুশীলন করলাম।

চোখ কুঁচকে অবিনাশদার দিকে তাকালেন ভোলাদা। অবিনাশদা দৃষ্টি সরাল না। মৃগাঙ্কর তখন ভয় করছিল খুব, এই বুঝি প্রচণ্ড ধমকে উঠবেন ভোলাদা। কিন্তু না, কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর ভোলাদা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। তারপর অবিনাশদার উদ্দেশে বললেন, দেশের জন্য কাজ করবি? দাড়া তোর একটা পরীক্ষা নিই।

কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনজন। ভোলাদা হাত তুলে বলেন, ওই টমটমটা কার বল তো?

ঘোষাল উকিলের। বলেছিল অবিনাশদা।

ঘোষাল লোকটা কেমন?

বাজে। সাহেবদের সঙ্গে বড্ড মেলামেশা। ওদের হয়ে কথা বলে। সেই জন্যই তো ওকে সবাই কালা সাহেব বলে।

ঠিক। তুই পারবি ওর টমটমটা রাস্তায় কাত করে ফেলে দিতে?

উত্তর না দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে অবিনাশদা, আজও মৃগাঙ্কর চোখের সামনে ভাসে সেই দৃশ্য। ভাগ্যিস ঘোড়া দুটো জোতা নেই গাড়ির সঙ্গে। একটু দূরেই কচোয়ানের দেওয়া ঘাস খাচ্ছে।

অবিনাশদা সোজা ঢুকে গেল টমটমের নীচে। তারপর কাঁধের চাপে তুলে ধরল ওই ভারী কাঠের গাড়ি, হাত দুটো দিয়ে চাগাড় মেরে সত্যিই কাত করে দিল ঘোষাল উকিলের বাহারি টমটম। সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না তখন। এতদিন পাশে থেকেও মৃগাঙ্ক জানতেন না অবিনাশদার গায়ে এত জোর। ইতিমধ্যে কোর্টের সামনে হুলুস্থুল পড়ে গেছে, কচোয়ান হইহই করে ছুটে এসেছে অবিনাশদাকে ধরতে। দৌড় লাগিয়েছে অবিনাশদা। মৃগাঙ্কও দৌড়তে যাচ্ছিলেন। হাত ধরে নেন ভোলাদা। বলেন, তুই পারবি না। ধরা পড়ে যাবি।

পালিয়ে অবিনাশদা শেষমেশ কোথায় যাবে, তা জানতেন একমাত্র মৃগাঙ্ক। সাহেবদের কবরস্থান। সেখানে বসে অনেক দুপুর, সন্ধে কাটিয়েছেন মৃগাঙ্ক, অবিনাশ। ওটা ওঁদের গোপন আস্তানা।

ভোলাদা নিজের বাড়ির দিকে চলে যেতে, মৃগাঙ্ক রেললাইন পেরিয়ে চললেন কবরস্থানের দিকে। তখন বুড়িগন্ডকের ওপারে সূর্য পাটে বসছেন। কবরস্থানের ক্রুশগুলোর মাথায় লালচে আভা।

ঘন ঘাসজঙ্গল মাড়িয়ে পিছন রাস্তায় কবরস্থানের পাঁচিল ডিঙোলেন মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ, যা আন্দাজ করেছিলেন তাই। অবিনাশদা বসে আছে নির্দিষ্ট চাতালে। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছে।

মৃগাঙ্কর পায়ের চাপা শব্দ শুনেই সচকিত হয় অবিনাশদা। চোখ তুলে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসে। বলে, আয়!

অবিনাশদার পাশে গিয়ে বসেন মৃগাঙ্ক। ওঁদের ঘিরে আছে নিশ্ছিদ্র নির্জনতা। এদিকটায় কেউ বড় একটা আসে না। সন্ধে নেমে গেলে তো প্রশ্নই নেই।

খানিকটা সময় নিয়ে মৃগাঙ্ক বলেন, তুমি কী করে অত বড় গাড়িটা চাগালে অবিনাশদা?

অবিনাশ তাকিয়ে আছেন সামনে। এদিকটা পূর্ব। অন্ধকার নামছে আগে। মৃগাঙ্কর একবার জিজ্ঞাসায় উত্তর দেন না। ফের যখন জিজ্ঞেস করেন মৃগাঙ্ক, অবিনাশ বলেন, জানি না।

'জানি না' বলার মধ্যে বিস্ময় মেশানো ছিল। যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না ঘটনাটা। মৃগাঙ্ক বলেন, জানি না মানে?

সত্যি বিশ্বাস কর, আমিও ভাবতে পারিনি অত বড় গাড়িটা উলটে ফেলে দিতে পারব!

কোন সাহসে এগিয়ে গেলে তা হলে?

তাও জানি না। যখনই ভোলাদা কাজটা করতে বলল আমাকে, কে যেন ভর করল আমার শরীরে। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো এগিয়ে গেলাম।

কথাটা শুনেই ভয়ে ভয়ে সিমেট্রির চারপাশটায় চোখ বুলিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক। চিন্তার কূল হারানো গলায় অবিনাশদা বলে, জানিস মৃগাঙ্ক, আমার মনে হয় তিনিই আমার দেহে ভর করেছিলেন।

বিস্ময়ে বাকরহিত মৃগাঙ্ক। 'তিনি'টি কে? কার কথা বলছে অবিনাশদা? মৃগাঙ্কর মনের অবস্থা বুঝে, অবিনাশ শান্ত গলায় বলেন। তোকে বলা হয়নি, মানে প্রসঙ্গ আসেনি বলার মতো, তাই জানিস না।—একটু অন্যমনস্ক হন অবিনাশ। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলেন। আমাদের বংশে একজন অবতারের জন্ম নেওয়ার কথা আছে।

মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল মৃগাঙ্কর। অবুঝ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন অবিনাশদার দিকে।

অবিনাশ বলে যাচ্ছিলেন, এরকমই হওয়ার কথা, তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করার আগে আমাদের বংশের পুরুষদের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রকাশ পাবেন। যত ঘন ঘন হবে প্রকাশ, বুঝতে হবে সময় হয়েছে তাঁর প্রত্যাবর্তনের

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মৃগাঙ্ক অতি কষ্টে বলেছিলেন, তুমি এত সব জানলে কোথা থেকে?

বাবা বলেছেন। আমার ঠাকুর্দার সঙ্গে এক হিমালয়বাসী সাধুর সঙ্গ হয়েছিল। সেই সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্বাণীটা করেছিলেন। থামে অবিনাশদা। মৃগাঙ্কর মুখের তাকিয়ে বুঝতে পারে, কথাটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

সামান্য হেসে অবিনাশদা বলে, জানি, তুই বলবি, সাধুবাবারা এরকম উটপটাং অনেক কিছুই বলে। সত্যি বলতে কী, সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীর কুড়ি-পঁচিশ বছর পর অবধি আমাদের বংশের সবাই অপেক্ষায় ছিল অবতারের। তারপর বিষয়টা ঠাট্টার পর্যায় চলে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা বেঁচে ওঠে এক অদ্ভুত ঘটনায়, আমাদের মা তখন মারা গেছেন। আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে বড়দার বয়স প্রায় দশ। সেই সময় পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের এক পিরবাবা আমাদের বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনিও বাবার কপাল দেখে একই কথা বলেন।... একদম থেমে গেল অবিনাশদা। বেশ কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল বাড়ি ফিরি। আর নিশ্চয়ই কচোয়ানটা আমাকে খুঁজছে না।

অবিনাশদা এগিয়ে গেলেও মৃগাঙ্ক ছিলেন দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের আধো অন্ধকার চিরে মজফফরপুর লাইনের ট্রেন আসছে। হেডলাইট উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। মৃগাঙ্কর কেন জানি একবার মনে হয়েছিল, অবিনাশদাই সেই অবতার নয় তো?

দরজায় ঠকঠক। চিন্তা ছিঁড়ে যায়। কে এল এত সকালে? যমুনা ফিরে এল না তো!—অবিনাশদাকে লেখা চিঠিটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে বিছানার তোশকের তলায় রাখেন মৃগাঙ্ক। তারপর যান দরজা খুলতে।

দরজার বাইরে বলাইদাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে যান মৃগাঙ্ক, তুমি এ সময় কী ব্যাপার!

কেন আসতে নেই নাকি! তোদের ঘটিদের আবার অন্য রকম নিয়মটিয়ম আছে বুঝি! কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে এসেছে বলাইদা। ঘটি বাঙাল তুলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা বলাইদার স্বভাব। কী আনন্দ পায় কে জানে! লোকটাকে শুধু একটা ব্যাপারেই সমীহ করেন মৃগাঙ্ক, মাল খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলে, এই বলাইদাই কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

বলাইদা খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। মৃগাঙ্ক বলেন, সাতসকালে এলে, তেমন ভালমন্দ খবরটর আছে কিছু?

মাথা নাড়ে বলাইদা। মুখে বলে, তোর বউ কোথায়? চা চাপাতে বল।

যমুনা বাপের বাড়ি গেছে।

সে কী। কবে গেল? কাল সন্ধেবেলা যেন দেখলাম তোর ঘরে আলো জ্বলছে।

আজ ভোরবেলায় গেছে।

কেন? এত ভোর ভোর বউকে পাচার করে দিলি।

'পাচার' কথাটা খচ করে কানে লাগে মৃগাঙ্কর। বলাইদা আর কিছু বলছে না। ঘরের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে। নাক টানছে কি? মৃগাঙ্ক আশঙ্কায় ভুগতে থাকেন। বাচ্চাটার গন্ধ ঘরের বাতাসে রয়ে যায়নি তো?

তখনই বলাইদা বলে ওঠে, কাজটা ঠিক করলি না মৃগাঙ্ক।

বুকটা ধড়াস করে উঠলেও, মুখটা নির্বিকার রাখেন মৃগাঙ্ক। না বোঝার ভান করে বলেন, কোন কাজের কথা বলছ বলাইদা?

বাচ্চাটাকে সরিয়ে দেওয়ার কথা।

মৃগাঙ্ক বুঝতে পারেন, ধরা পড়ে গেছেন। হাতলভাঙা চেয়ারটা টেনে, বলাইদার মুখোমুখি বসেন। মাথা নিচু।

বলাইদা বলে, কাল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছি, দেখি, গামার গাছতলায় একটা রিকশা এসে দাঁড়াল। রিকশার পাদানিতে পুটুলি মতো কী একটা যেন। রিকশাওয়ালা গাড়ি থেকে নেমে পুটুলিটা তুলে গামার গাছতলায় রাখল, তারপর রিকশা চালিয়ে হাওয়া। —আমি ভাবছি কী হল এটা। বাড়িতে কিছু না বলে চুপি চুপি বাইরে যাই। রাস্তার এপার থেকেই দেখতে পাই, কী রেখে গেছে। বাড়ি ফিরে আসি। তোর বউদিকে কিছু বলি না। বললেই, কার না কার নোংরা ঘরে তুলতে হত। ফের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, বাচ্চাকে কুকুরগুলো ঘিরে ধরেছে। তারপরই দেখলাম তুই টলতে টলতে এসে বাচ্চাটাকে তুলে নিলি। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোকে ফলো করলাম। — দম নিল বলাইদা। তারপর বলল, ভেবেছিলাম সকালে এসে তোকে বোঝাব। বেওয়ারিশ বাচ্চা তুলে এনে মানুষ করা ভীষণ হুজ্জোতের। জানি এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি বলে তোর একটা আক্ষেপ আছে। কিন্তু রক্তের ব্যাপারটা অস্বীকার করবি কী করে!

রক্ত। ভ্রূ কুঁচকে বলাইদার দিকে তাকালেন মৃগাঙ্ক।

হ্যাঁ, রক্ত। হিন্দু, মুসলমান, নাকি খ্রিস্টান সেটা দেখতে হবে না। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুই বেজাতের বাচ্চা মানুষ করবি!

এর বিরুদ্ধে বলার মতো যুক্তিবুদ্ধি মৃগাঙ্কর আছে। নিরুত্তাপ গলায় বলেন, শিশুর আবার জাত-বেজাত কী! আমাদের কাছে মানুষ হবে, হিন্দু হিসেবেই লোকে জানবে।

লোকে কী জানল সেটা বড় কথা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে বাচ্চাটার সঙ্গে কোনওদিনই তোদের মিলমিশ খাবে না। জাত তো আর আকাশ থেকে সৃষ্টি হয়নি, রক্তের ধারা থেকে তৈরি হয়েছে, যখনই সেটা ভাঙতে গেছে মানুষ, প্রচুর গোলমাল হয়ে গেছে, তেজি উচ্চবর্ণের বংশ হয়ে পড়েছে নিস্তেজ। ইতিহাসে এর হুদোহুদো প্রমাণ আছে।

বলাইদার কথা একদম ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। তবু নিরীহ কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলেন, আমি তো আর ইতিহাসের রাজাগজা নই, চিনি মিলের লেবার। আর বংশগৌরবও তেমন কিছু নেই আমাদের। রাজা, জমিদারদের পূজারি বামুন ছিলাম আমরা।

সে বড় কম কথা নয়। সমাজে সব থেকে উঁচুতে তোদের স্থান। যাক সেসব, এখন গেছে, তা বলে তুই তো আর কাক হয়ে যাসনি।

মানে? মৃগাঙ্কর চোখে ঘোর বিস্ময়।

বুঝলি না। বাচ্চাটা হচ্ছে কোকিল ছানা। বড় হলেই ফুড়ুৎ। তোদের পুঁছবে না। রক্তের টান নেই যে। একটু থেমে প্রসঙ্গ ঘোরাল বলাইদা, ও, ভাল কথা। বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে।

পুরোটাই ঠকে গেলি। এখন পরের মেয়ে মানুষ কর। বিয়েশাদি দে।

কাক, কোকিলের উপমাটা পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেল। দ্রুত এর পালটা যুক্তি খুঁজছেন মৃগাঙ্ক। পেয়েও গেলেন, ধরো আমার যদি একটা মেয়ে হত, দিতেই হত বিয়ে। এই মেয়েটাকেই নিজের বলে মনে করি না কেন?

উত্তরে বলাইদা বলে, তোর সঙ্গে কথা বলার এই এক মুশকিল, একদম পড়াশোনা নেই।

হিন্দু ধর্ম, বর্ণাশ্রম বিষয়ে কিছুই জানিস না। আরে বাবা, মেয়েটা মনে কর মুসলমানের। হিন্দুর ঘরে মানুষ হল। বিয়ে দিলি হিন্দুর ঘরে, শুধু হিন্দু কেন, ব্রাহ্মাণ ঘরে,, ভেজাল মিশে গেল না ধর্মে। আর ওইসব ভেজাল মিশেই তো সমাজের এই অবস্থা। ভেজাল মিশেছে দু ধর্মেই। নষ্ট হয়েছে শুদ্ধতা। ঈশ্বরের এমনটা অভিপ্রায় ছিল না।

ভারী ভারী কথায় মৃগাঙ্কর মাথা প্রায় নুয়ে গেছে। রাস্তায় গড়াগড়ি খাওয়া মাতাল মৃগাঙ্ক সামান্য একটা কাজ করেছেন, যমুনার খালি কোলের জন্য তাঁর আক্ষেপ হয়, মন খারাপ করে। সেই জন্যই কাজটা করা, তার দায় যে এতটা, ধারণাই করতে পারেননি!

বিড়ি খাবি?

বলাইদার ডাকে মুখ তোলেন মৃগাঙ্ক। একটা বিড়ি মৃগাঙ্ককে বাড়িয়ে, বলাইদা নিজে একটা ধরায়। আগুন দেয় মৃগাঙ্ককে। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আশ্বাসের সুরে বলে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। চল না একটু খোঁজ করা যাক, মেয়েটা কোন জাতের। হিন্দু হলে তবু একটু সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।

আবার অবাক হন মৃগাঙ্ক। বলেন, অদ্ভুত কথা বলছ তুমি! আমি কোথায় মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য যমুনাকে বড়শালির বাড়ি পাঠালাম, তুমি বলছ ওর মা-বাবাকে খুঁজে বার করতে।

মৃগাঙ্কর কথার মধ্যে ছোট্ট ভুলটা চট করে ধরে নেয় বলাইদা। বলে, শালির বাড়ি গেছে, মানে গোরক্ষপুর? তুই যে বললি বাপের বাড়ি।

মেঝেতে চোখ নামিয়ে নিয়েছেন মৃগাঙ্ক। বলাইদা বলে, তার মানে যমুনার দিদি-জামাইবাবু বাদে আর সব আত্মীয়স্বজনের কাছে মেয়েটাকে নিজের বলে চালাবি। ভাল! ভাল। তবুও মেয়েটার অরিজিনটা একবার জানা দরকার। মানুষ করতে সুবিধে হবে।

সেটা কি করে সম্ভব বলাইদা? অসহায় সুরে জানতে চাইলেন মৃগাঙ্ক।

খুবই সম্ভব। সমস্তিপুরের প্রায় সব পরিবারকেই আমরা চিনি। সামান্য লোকজন। এবারের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রিফিউজিরা এখানে এখনও আসেনি। বাকি সব বাঙালি আমাদের পরিচিত। বিহারিরা এভাবে বাচ্চা ফেলে যাবে না। ওদের বাচ্চা মানুষ করার ব্যাপারে কোনও অনিচ্ছে নেই। শিশুকে ঈশ্বররূপে মানে তারা। আর রইল তাজপুর রোডের পাঞ্জাবি, ওরা যথেষ্ট বড়লোক। ওদের ঘরে এসব ঘটবে না। মারোয়াড়ি, গুজরাটিরা সংখ্যায় এত কম, পোয়াতি নিজের পেট লুকানোর সুযোগই পাবে না।

তা হলে? প্রশ্ন করলেন মৃগাঙ্ক। 'প্রশ্নটা শুধু করতে হয় বলেই করা, ভিতরে কোনও জিজ্ঞাসা নেই। মাথাটা পুরোপুরি ভ্যাবলা মেরে গেছে।

- খাট-থেকে-নেমে এসেছে বলাইদা। আঙুলের ফাঁকে নিভে যাওয়া বিড়ি। কোথায় ফেলবে ঠিক করতে পারছে না। দরজার দিকে এগিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেয়। তারপর মৃগাঙ্ককে বলে, ডিউটিতে আসছিস তো?

ঘাড় হেলান মৃগাঙ্ক। বলাইদা বলে, ছুটির পর একটু খোঁজতল্লাশে বেরোব। সঙ্গে থাকবি।

তুমি এখন জনে জনে জিজ্ঞেস করবে নাকি? প্রবল আশঙ্কায় জানতে চান মৃগাঙ্ক।

মৃদু হাসে বলাইদা। বলে, তুই কি আমায় এতটাই বোকা ভাবিস! তা ছাড়া আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, বাচ্চাটার আসা খুব দরকার ছিল তোর জীবনে। মেয়েটা সৌভাগ্য বহন করে এনেছে তোর।

বিচ্ছিরি একটা রহস্য তৈরি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বলাইদা। মেয়েটাকে কুড়িয়ে পাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মানুষটা জীবনভর ল্যাজে খেলাবে, না ভাল করবে, কিছুই বুঝতে পারছেন না মৃগাঙ্ক। বিছানার তোশক তুলে অবিনাশদাকে লেখা চিঠিটা বার করেন। পুনশ্চে লেখেন, চিঠিটা পড়িবা মাত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

ট্রেন গোরক্ষপুর পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। এই লাইনে যা হয়, মাঝে মাঝেই চেনপুল হয়েছে। তাই এত দেরি। তবু মেয়ে কোলে নির্বিঘ্নে প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেন যমুনা। এর আগে

যতবার একলা দিদির বাড়ি এসেছেন, কেউ-না-কেউ ঠিক নিতে এসেছে। এবার তো খবর দেওয়ারই সময় হল না।

কাঁখে মেয়ে, অন্য কাঁধে ঝোলা নিয়ে এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন যমুনা, দেখে বোঝারই উপায় নেই সন্তানটি ওর গর্ভজাত নয়। এই ক'ঘণ্টাতেই আশ্চর্য এক অভ্যস্ততা তৈরি হয়েছে। এর পিছনে অবশ্য বেইমান চা-ওলাটার যথেষ্ট অবদান আছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রিকশায় ওঠেন যমুনা। বলেন, গোলঘর চল।

রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। রিকশা ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। আচ্ছা, দিদিরা বাড়ি আছে তো? যদি গিয়ে দেখি নেই। কোথাও বেড়াতে গেছে। কী করব তখন? কোথায় উঠব?— ভাবনাটা তাড়াতাড়ি মাথা থেকে তাড়ান যমুনা। যত সব অশুভ সম্ভাবনার কথা ঘুরছে মাথায়। দিদিদের বাড়ির আশেপাশে অনেক বাঙালি পরিবার। প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় আছে যমুনার। দিদিরা না আসা পর্যন্ত কারও বাড়ি গিয়ে থাকলেই হল। চিন্তাটা আবার হোঁচট খেল, এ কী ভাবছেন তিনি। সঙ্গে মেয়ে আছে, নানান প্রশ্ন করবে প্রতিবেশীরা। কী উত্তর দেবেন?

মাইজি, গোলঘর আ গ্যায়া, অব কাঁহা যাঁয়ু। রিকশাওলা জানতে চাইল।

সচকিত হয়ে চারপাশে চোখ বোলান যমুনা, হ্যাঁ, বাজার এলাকায় চলে এসেছেন। চারপাশটা বড্ড স্পষ্ট। ঝলমলে বিপণি। রিকশাওলাকে বলেন, ডগতর নন্দীকা চেম্বার পহচানতে হো?

জরুর। বলে বাঁদিকের রাস্তা ধরল রিকশাওলা। মেয়েটা কোলে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মেয়েটার পরম নিশ্চিন্ত নিদ্রিত মুখটা দেখে যমুনার কেমন যেন বিশ্বাস হয় দিদিরা বাড়ি থাকবে। ওর মুখে লেগে আছে নিশ্চিত আশ্বাস। তা যদি না হবে, বদমাইশ চা-ওলার থেকে কী করে বাঁচলেন মেয়ে আর যমুনা। ঘুমিয়ে থাকলেও, মেয়েটা যেন নিজেই নিজের ভাগ্য নির্দিষ্ট করছে। চাওয়ালাটার আসলে সন্দেহ হয়েছিল। সকালের দিকে কোনও মা সন্তানের দুধের বন্দোবস্ত না করে ট্রেনে ওঠে না। ব্যতিক্রম যমুনা। তা ছাড়া মেয়েটাকে কোলে নেওয়ার ভঙ্গিতে কোথাও কোনও ফাঁক থেকে থাকবে। চাওয়ালা মনে করেছিল যমুনার কোলের শিশুটি চুরি করা। তাই সে পুসা রোড স্টেশন থেকে পুলিশ ডেকে এনেছিল।

লাভ হয়নি। পুলিশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে দুধহীন স্তন মেয়েটার মুখে তুলে দিয়ে কান্না থামিয়েছিলেন যমুনা। তারপর পুলিশের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, মানে কোথা থেকে আসছেন, যাবেন কোথায়, কার কাছে?—অবশেষে বৈধ টিকিট দেখিয়ে নিস্তার পান। যদিও এসব জেরার মাঝে একটা পরিচয় খুব কাজ দিচ্ছিল, সেটা হচ্ছে তিনি বাঙালি। বাঙালিদের সম্বন্ধে এখানকার মানুষদের একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধাবোধ আছে। বাঙালিরা চট করে খারাপ কাজ করতে পারে না। মেয়েরা তো নয়ই। এই ব্যাপারটা কতদিন থাকবে কে জানে!

দিদিদের বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্ট চিনতে পেরে রিকশা থামাতে বলেন যমুনা। রিকশাওলাকে পয়সা মিটিয়ে এগিয়ে যান বাড়ির দিকে। একটু যেন আলো কম লাগছে বাড়িটায়। দিদিরা কী সত্যিই নেই?

অন্ধকার বারান্দায় উঠে শুনতে পেলেন রেডিওর শব্দ। অনেক অবাঞ্ছিত আওয়াজ সরিয়ে ক্ষীণ স্বরে বাজছে কলকাতার বাংলা অনুষ্ঠান। তার মানে জামাইবাবু বাড়ি আছে। তপনদার এই একটা স্বভাব, যতক্ষণ বাড়ি থাকে কলকাতা স্টেশন খুলে রাখে। জীবনে চারবার কলকাতায় গেছে, মানুষ হয়েছে এই গোরক্ষপুরে। তবু কলকাতার প্রতি তীব্র টান।

ধীরে কড়া নাড়েন যমুনা। একটু পরে দরজা খুলে যায়। যমুনাকে দেখে তপনদার মুখে আন্তরিক হাসি, আরে তুমি। কোনও খবর... বলেই থেমে যায়। চোখ পড়েছে কোলে। হাসি মিলিয়ে যায়। বলে, এসো।

চটি ছেড়ে ঘরে ঢোকেন যমুনা। জানতে চান, দিদি, বাবুই নেই?

আছে। পাশে চাঁদসি ডাক্তারের কাছে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়বে।

কার কী হল? উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চান যমুনা।

তপন বলেন, তেমন কিছু নয়। বাবুইটার দু-একটা ফোঁড়া হয়েছে।

বাচ্চাকে খাটে শুইয়ে তপনের দিকে তাকান যমুনা। তপনদা পাশের ঘরে চলে যাচ্ছে। বেশ গম্ভীর। অন্য সময় কত মজা করে। যমুনা বলেন, কী ব্যাপার, মেয়েটা কে জানতে চাইলেন না তো?

চেষ্টাকৃত হাসে তপনদা। বলে, শুনব। তোমার দিদি আসুক এক সঙ্গেই শুনব।

কেমন চমকে দিলাম বলুন। ইচ্ছে করেই আপনাদের বলিনি। ঠিক করেছিলাম মেয়ে কোলে নিয়ে এসে অবাক করে দেব। মেয়েকে দেখে এবার বলুন তো দেখি, কার মতো দেখতে হয়েছে, ওর বাবার না আমার মুখ পেয়েছে? —কথাগুলো বলছেন বটে যমুনা, জোর নেই। অভিনয় ভাল হচ্ছে না। সুরটা নিজেকে ঠাট্টা করার মতো হয়ে যাচ্ছে। তবু একটা নকল হাসি ধরে রাখেন মুখে। তপনদা হাসছে না। আবার খুব একটা গম্ভীর হয়েও নেই।

নিরুত্তাপ অথচ নিশ্চিত কণ্ঠে বলে, যমুনা তোমার হয়তো খেয়াল নেই, তোমার দিদি মাস ছয়েক আগে তোমাদের বাড়ি ঘুরে এসেছে। আর গীতা আজ অবধি কোনও কথা আমার কাছে লুকোয়নি।

যমুনার একবার ইচ্ছে হয় বলতে, দিদিকে আমিই বারণ করেছিলাম। বলা হয় না। শুনতে ছেলেমানুষের মতো লাগবে। তা ছাড়া তিনি তো মিথ্যে বলতে চাননি, শুধু পরীক্ষা করছিলেন মেয়েটা তাঁর নিজের মনে হচ্ছে কিনা। পরে এ-বাড়িতে সত্যিটাই বলতেন।

যাও, তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, আমি ততক্ষণ বাচ্চাটাকে খেয়াল রাখছি। বলল তপনদা।

পাশের ঘরে গিয়ে আলনা থেকে দিদির একটা শাড়ি নেন যমুনা। তারপর কলঘরে ঢুকে যান। চান করবেন কি? বালতির জলে হাত ছোঁওয়ান। বেশ ঠান্ডা। এই সময়টা সন্ধের দিকে একটু হিমেল ভাব থাকে। চান থাক, হাতমুখটাই সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নেবেন। শরীরটা যেন কেমন করছে! জলটা ছোঁওয়ার পর থেকে কাঁটা দিয়ে আছে গায়ে। দিদির শাড়িটা দেওয়ালের আংটায় ঝোলানোর আগে গা-টা আবার পাক দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে দিদির শাড়িটাকে দিদিই মনে হচ্ছে। শাড়িটায় মুখ গুঁজে উবু হয়ে বসে পড়েন যমুনা। কাঁদছেন অঝোরে। কেন, জানেন না।

কলঘরে কতক্ষণ আছেন খেয়াল নেই। সংবিৎ ফিরল বাবুই আর দিদির কলস্বরে। ওরা ফিরেছে। হাতমুখ ধোওয়ার বদলে প্রায় গা ধুয়ে ফেলেছেন যমুনা। দিদির শাড়িটা পরে বাইরে আসেন।

মেয়েটার ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে দিদি, বাবুই। তপনদা একটু তফাতে। তবে মুখটা আগের থেকে নরম। তাকিয়ে আছে বাচ্চাটার দিকে। মেয়েটাকে খুব আদর করছে দিদিরা। বাবুই একটা আঙুল এগিয়ে দিতে ধরার চেষ্টা করছে মেয়ে। কী তাড়াতাড়ি আপন হয়ে গেছে। দিদির বাড়িটাই এরকম।

যমুনা বেরিয়ে এসেছেন টের পেয়ে গীতা এক মুখ হাসি নিয়ে ঘুরে তাকান। বলেন, কোথায় পেলি রে মিষ্টিটাকে?

দিদি এমনভাবে কথাটা বলল, যেন সন্তান পেতে গেলে পেটে না ধরলেও চলে, প্রকৃতি থেকেও পাওয়া যায়। দিদির মনটা চিরকালই এরকম সাদাসাপটা। দিদি আরও বলে যাচ্ছে, ভাগ্যিস বাবুইয়ের ছোটবেলার জামাকাপড়গুলো ফেলে দিইনি, সব হয়ে যাবে এর গায়ে। হ্যাঁ রে যমুনা, কী নাম রেখেছিস এর?

নিশ্চিত্ততার হাসি ফুটে ওঠে যমুনার মুখে। বলেন, বলছি। এগুলো মেলে দিয়ে আসি।

ভেজা শাড়ি, গামছা নিয়ে বারান্দায় আসেন যমুনা। বাড়ির সামনে প্রায়ান্ধকার রাস্তা জমি। সেদিকে তাকিয়ে কাকে যেন খোঁজেন যমুনা! সেই অনুসরণকারিণী, মেয়েটার আসল মা। নিশ্চয়ই এত দূর আসেনি।

আচ্ছা, বলাইদা তুমি কেন ধরেই নিচ্ছ বাচ্চাটা সমস্তিপুরের কারও, বাইরে থেকে এসেও

তো কেউ ফেলে দিয়ে যেতে পারে।

মৃগাঙ্কর প্রশ্নের তক্ষুনি কোনও উত্তর দিলেন না বলাই। গম্ভীর মুখে হেঁটে যাচ্ছেন কলোনির রাস্তা ধরে। বাড়ি ফিরছেন। সন্ধে উতরে গেছে বহু আগে। চারদিন কেটে গেছে। এখনও কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটার কোনও উৎস মেলেনি। মৃগাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে সমস্তিপুরের সব পাড়া ঘোরা হয়ে গেছে। কোথাও কোনও নতুন লোক আসেনি। খুব সন্তর্পণে ভিতর ভিতর অনুসন্ধান চালিয়েছেন দু-একজন মারফত, সুরাহা হয়নি। যাদের দিয়ে খোঁজ নিয়েছেন, আসল কারণটা বলেননি তাদের। মৃগাঙ্কর যে এ-ব্যাপারে খুব উৎসাহ আছে তা নয়, শুধু বলাইদাকে সঙ্গ দিয়ে গেছেন। এক এক সময় হাল ছেড়ে বলেছেন, তুমি খামোকা এত উঠে-পড়ে লাগছ কেন বল তো! মা-বাবা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, চেপে যাও।

উত্তরে বলাই বলেছেন, চেপে যাওয়াটা ঠিক হবে না মৃগাঙ্ক। রাস্তাঘাটে বাচ্চা ফেলে যাওয়াটা এই অঞ্চলের পক্ষে খুবই অশুভ লক্ষণ। সমস্তিপুরের জন্য খুব খারাপ সময় আসছে। মানুষ কত নিষ্ঠুর হয়ে গেলে এভাবে শিশুকে রাস্তায় ফেলে পালায়।

মৃগাঙ্কর কেন জানি মনে হয় নিষ্ঠুর নয়, নিরুপায় হয়েই কেউ বাচ্চাটাকে ফেলে গিয়েছিল। কথাটা বলেছিলেন বলাইদাকে। বলাইদা কানে নেয়নি সেই যুক্তি। বলাইদা এখন নিরুপায়, আর নিষ্ঠুরের মধ্যে তফাত করতে পারছে না। তার একটাই কথা, ঘটনাটা একটা বিশৃঙ্খলা। সামাজিক সংকট। এলাকার বাসিন্দা হিসেবে আমাদের উচিত এই বিশৃঙ্খলা আর ঘটতে না দেওয়া।

কথার পিঠে মৃগাঙ্ক বলেছেন, তুমি নিজেকে এখানকার মানুষ বল কী করে। তুমি তো এসেছ পূব পাকিস্তান থেকে।

বলাইদা বলেছে, সেকথা ঠিক। দেশভাগের পর দু বছর ওখানে ছিলাম। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না দেশটা ভাগ হয়ে গেছে। মানুষের নিষ্ঠুরতাই বুঝিয়ে দিল দেশটা সত্যিই আর আগের মতো নেই। কলুষিত হয়ে গেছে বসতি। কত অত্যাচার, অনাচার দেখেছি চোখের সামনে। তারপর চলে এলাম এখানে। আবার যেন ফিরে পেলাম পুরনো ভারতবর্ষকে। হিন্দু, মুসলমান পাশাপাশি বাস। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ নেই। আরও কত ভাষাভাষীর লোক এখানে। সবাই মিলেমিশে দিব্যি আছে। যদিও জানি এক সময় সমস্তিপুরের ওপরেও দাঙ্গার আঁচ এসেছিল, এখন তার কোনও ছাপ নেই। এখানকার জলহাওয়া, সরল মানুষজন, খাঁটি খাবারদাবার পেয়ে আমি বেশ ভুলে গিয়েছিলাম ছেড়ে আসা পিতৃপুরুষের ভিটের কথা। রাস্তায় পড়ে থাকা বাচ্চাটাই সব গোলমাল পাকিয়ে দিল। মনে হচ্ছে ভিতর ভিতর এই এলাকাটাও কলুষিত হচ্ছে। আমরা টের পাচ্ছি না।

এই বলাইদাকে মৃগাঙ্ক চেনেন না। চিনি মিলের কেমিস্ট, এর তার পিছনে লাগে। হইচই করেই সময় কাটিয়ে দেয়। সমস্তিপুরের যে-কোনও অনুষ্ঠানে, সামাজিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দারুণ সুন্দর রান্না করে বলাইদা। এরকম একটা আমুদে লোক এত গভীরভাবে ভাবতে পারে জানা ছিল না মৃগাঙ্কর। শুধু নিজে ভাবছে না, মৃগাঙ্ককেও ভাবিয়ে ছাড়ছে।

এত খটোমটো ভাবনা মৃগাঙ্ক ভাবতে পারেন না। নেশার আশ্রয় নিতে হয়। বলাইদার পাল্লায় পড়ে মাঝের দুদিন কানাইয়ার ঠেক স্লিপ করে গেছে। কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে মোদক দিয়ে। আজ তিনি একবার কানাইয়ার ঝোপড়ায় যাবেনই। তাই বাড়ি না ঢুকে বলাইদাকে এগিয়ে দিচ্ছেন। বলাইদা বাড়ি চলে গেলে, দু মিনিট হেঁটে সমস্ত চিন্তার অবসান।

সেই গামারগাছটার কাছে চলে এসেছেন দুজনে। যেখানে মেয়েটাকে পাওয়া গিয়েছিল। বেশ খানিকক্ষণ আগে করা প্রশ্নটা ছোট করে আবারও করেন মৃগাঙ্ক, মেয়েটা তো সমস্তিপুরের নাও হতে পারে।

দাঁড়িয়ে পড়ে বলাইদা। গামারগাছের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে, রিকশাওয়ালার হাঁটা-চলা খুব চেনা চেনা লেগেছিল সেদিন। ব্যাটা নির্ঘাত সমস্তিপুরের। দিনের আলোয় লোকটাকে চিনতে পারছি না। বাইরের মানুষ এসে রিকশাওয়ালার হাতে বাচ্চা দিয়ে বলবে, 'যাও ইসকো ফেক দো'——এটা সহজে হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া বাইরের লোক

সমস্তিপুরকে বেছে নেবে কেন? রিকশাওয়ালাও দুম করে এ ধরনের কাজে রাজি হবে না। আমার মনে হয় যাদের বাচ্চা, তাদের সঙ্গে রিকশাওয়ালার বিশেষ যোগাযোগ আছে।

মৃগাঙ্ক প্রমাদ গোনেন। বলাইদা ছাড়াও আর একটা সাক্ষী বেড়ে গেল, রিকশাওয়ালা। এত কজন সাক্ষীর চোখের সামনে মেয়েটাকে সমস্তিপুরে কী করে বড় করবেন কে জানে।

বেশ কিছুটা দুজনে চুপচাপ হাঁটলেন। মৃগাঙ্কর খেয়াল হয় বলাইদা বাড়ি না ঢুকে এগিয়ে এসেছে। বোধহয় অন্যমনস্ক।

কী হল, বাড়ি যাবে না? জানতে চান মৃগাঙ্ক।

নাঃ, ভাল লাগছে না। চল তোর সঙ্গে কানাইয়ের ডেরায় গিয়ে বসি।

মৃগাঙ্ক অবাক হন। বলাইদা কালেভদ্রে মদটদ খায় ঠিকই, তবে সেসব বিলিতি। ঝোপড়ায় বসে দেশি মদ খাওয়ার লোক বলাইদা নয়। চিনি মিলের কেমিস্টের পক্ষে সেটা মানায় না। মৃগাঙ্ক বলেন, না বলাইদা, তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। মান যাবে।

আমার মান অত ঠুনকো নয়। বলে, হাঁটতে থাকে বলাইদা।

মৃগাঙ্কর মন ঠিক সায় দেয় না। মুড়িমিছরি যদি এক হয়ে যায়, মানুষ তুলনা টানবে কী করে?

কানাইয়ার ডেরা আজ জমজম করছে। অনেক খরিদ্দার। রেল কোম্পানির মাইনে হয়েছে কাল। প্রবল উশকানিতে মাঠের এদিক ওদিক জ্বলছে লম্ফের আলো। যা প্রায় মশালের আকার ধরেছে। দু-একটা মাতাল ইতিমধ্যেই ঘটি ওলটানো অবস্থায়। কানাইয়ার ছেলে রঘুপতি ওদেরকে সোজা করার চেষ্টা করছে সস্নেহে। না পারলে কাঁধে ঝুলিয়ে ডেরার বাইরে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে আসছে।

এত কিছুর মধ্যে নির্বিকার নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে বলাইদা। মদ নেয়নি, চানা, পাঁপড়ও না। কী যেন ভাবছে। মৃগাঙ্কর দু গ্লাস সাবাড়। মাথা এখন পরিষ্কার, ঝকঝকে ছিটেফোঁটা মেঘ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। তাই তিনি বলেন, আচ্ছা বলাইদা, তুমি কিন্তু ভাই দুধরনের কথা বলছ। একবার বলছ, বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া আমার ভুল হয়েছে। আবার বলছ, যারা ওকে রাস্তায় ফেলে গেছে, অন্যায় করেছে। তা হলে বাচ্চাটা যাবে কোথায়? কারও ভুলভ্রান্তিতে যদি বাচ্চাটার জন্ম হয়েই যায়, তাকে মেরে না ফেলে গাছতলায় নামিয়ে দিয়ে গেছে, ভালই করেছে।

বলাই কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। সম্ভবত মৃগাঙ্কর উচ্চারণ জড়িয়ে যাচ্ছে বলেই। উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে মৃগাঙ্ক বলেন, তুমি বলবে বিশৃঙ্খলা। হিসেবে গণ্ডগোল। জাতির মধ্যে ভেজাল মিশে যাচ্ছে। তা একটু মিশুক না। কী এমন ক্ষতি হবে? এত বড় জাতি, এত লোকসংখ্যা...

মৃগাঙ্কর কথার মাঝে একটা ঢোলা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোক কানাইয়ার ডেরায় ঢুকে আসে। লোকটা বেশ লম্বা, একটু ঝুঁকে হাঁটছে। বলাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মানুষটার দিকে। একদম অপরিচিত। আগে কখনও দেখেননি। লোকটা একটু আড়ষ্ট পায়ে কানাইয়ার সামনে দাঁড়ায়। কানাই খরিদ্দারকে মাল দেওয়ায় ব্যস্ত। আগন্তুক দ্বিধাভরা গলায় বলে, মাল আচ্ছা হ্যায় তো? পানি দেওন নাই তো বেশি?

নেহি বাবু। মাল আচ্ছা হ্যায়। আপ বৈঠিয়ে না। ইতনা আদমি পি রাহা হ্যায়। মুখ তুলে বলে কানাই।

গোটা ব্যাপারটা খেয়াল করেননি মৃগাঙ্ক। হাঁটুতে হঠাৎ যেন কুমিরের কামড়। চটকা ভাঙতে দেখেন, বলাইদা হাঁটু খামচে ধরেছে। তারপর চাপা গলায় বলে, মৃগাঙ্ক, লোকটা নতুন এসেছে। বাঙাল।

॥ তিন ॥

দেবপাড়া নবারুণ সংঘের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব চলছে। সপ্তাহ জুড়ে নানা অনুষ্ঠান। আজ রবিবার। সকালবেলা একটু অন্য রকমের ফুটবল ম্যাচ। ক্লাবের যুবকদের সঙ্গে মধ্যবয়স্কদের। মৃগাঙ্কর হিরো অবিনাশদা বহুদিন পর হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল মাঠে নামলেন।

লাস্ট খেলেছিলেন সমস্তিপুর কে এ এইচ স্কুল মাঠে। একটা ফ্রেন্ডশিপ ম্যাচে। ততদিনে অবিনাশ বিবাহিত হয়েছেন, এক পুত্রের জনক। তা প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। তারপর আর ফুটবলে পা দেননি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসার পর তো নয়ই। এখন তিনি দুই সন্তানের জনক। দ্বিতীয় পুত্র বরুণের বয়স ন বছর। এই প্রীতি ম্যাচটায় তিনি পাড়ার লোকেদের মজা দিতে নেমেছেন। তিনি ভেটারেনদের দলে। বিষয়টা মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি বয়স্কদের দিকে চলে গেলেন। বয়স তাঁর চুয়াল্লিশ ছুঁই ছুঁই। খেলোয়াড়ি বয়স আর নেই, তা বলে ভাঁড়ামি।

এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। পশ্চিমবাংলার পাড়া কালচার ভীষণ স্ট্রং। এদের সঙ্গে থাকতে হলে অনেক অপছন্দের কাজ করতে হয়। আর বাংলার সঙ্গে মিশতেই তো বিহার ছেড়ে এখানে আসা। দেবপাড়া কলকাতা থেকে একুশ কিলোমিটার দূরের মফস্বল। ট্রেনে হাওড়া পৌঁছতে লাগে ষোলো মিনিট। প্রায় কলকাতার হাতায় বাস করছেন তিনি। তবু কলকাতার সঙ্গে এখানকার মানুষজনদের কোথায় একটু তফাত আছে। মফস্বলিদের আন্তরিকতার মধ্যে একটু যেন গাজোয়ারি ভাব।

সমস্তিপুর থেকে চলে আসার পর বছর দুয়েক বউবাজারে ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। নিজের খারাপ লাগত না। কিন্তু চারদিকে নকশালদের এমন দাপট, কথায় কথায় বোমা, ছুরি, খুন। ইলা ভয় পেয়ে গেল। দেবপাড়ার ভালমামা বউবাজারের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, ওঁর উৎসাহে এবং ব্যবস্থাপনায় দেবপাড়ায় জমি কিনে বাড়ি করেন অবিনাশ। বাঙালি হিসেবে বাংলায় একটুকরো জমির আকাঙ্ক্ষা অবিনাশের বহু দিনের। ঠিক মতন দেখতে গেলে তাঁদের বংশের কারওই বাংলায় জমি নেই। বাবা এক সময় কলকাতায় এসেও ফিরে গিয়েছিলেন বিহারে। অবিনাশ এলেন এবং স্থায়ী ঠিকানাও হল। এ ব্যাপারে তাঁর একটু অহঙ্কারবোধ আছে। সেই অহঙ্কারের বিনিময়ে হাফপ্যান্ট পরে মাঠে নামা।

মাঠের ধারে একটু ছোটাছুটি করে ওয়ার্মআপ করে নিচ্ছেন অবিনাশ। শরীরে মেদ জমেছে, ভুড়িও হয়েছে সামান্য। খুব কি বেমানান লাগছে। মাঠের ওপাশটায় তেজি ঘোড়ার মতো টগবগ করছে ইয়াং প্লেয়ারস। অবিনাশকে দেখে ভেটারেন টিমের প্লেয়াররা গা গরম করতে নামলেন। অনধিক ষাটের বিভিন্ন বয়সি প্লেয়ার। রংবাহারি তাঁদের খেলার পোশাক। ওয়ার্মআপের বহর দেখে ভয় হচ্ছে। খেলার আগেই না সবাই এলিয়ে যান। অবিনাশরা হারবেন নিশ্চিত। যদি না ছোটরা জিতিয়ে দেয়। সেটা আরও অপমানের। যদিও এই বোধটা সম্পূর্ণ নিজস্ব। এখানকার মানুষরা জানে না, অবিনাশ ফুটবলটা এককালে ভালই খেলতেন। স্কুল, কলেজ টিমে ছিলেন অতি নির্ভরযোগ্য প্লেয়ার। তাঁদের তাজপুর ক্লাব ছিল প্রায় অপ্রতিরোধ্য। দূর দূর গ্রাম-শহর থেকে অবিনাশকে ভাড়া নিয়ে যেত ক্লাবগুলো। অবিনাশের এরকম আরও অনেক গুণাগুণের পরিচয় এখানকার মানুষ জানে না। জানাতে চান না তিনি। তাতে মিশতে অসুবিধে হয়। তা ছাড়া তাঁরও অনেক কিছু শেখার আছে। জন্মসূত্রে বাঙালি হলেও তিনি তো প্রায় গোটাটাই বিহারি। পুরোপুরি বাঙালি হতে গেলে একটু বিনয় থাকা জরুরি বইকি! কিন্তু তা বলে কে আর হাসির খোরাক হতে চায়। আজকের এই প্রহসন তো প্রায় তাই।

রেফারি পালিতবাবু মাঠের মাঝখানে চলে গেছেন। বাঁশি বাজিয়ে ডাকছেন প্লেয়ারদের। সাইডলাইন বরাবর যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়েছে। তাদের হইচই যেন একঝাক বোলতার গান। অতীত দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে চুয়াল্লিশ বছরের পুরনো

হৃৎপিণ্ড।

চলো ভায়া। নেমে পড়ি। পিঠে হাত রেখে বলেন বেণীবাবু।

হ্যাঁ চলুন। বলে অবিনাশ সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে হেঁটে যান মাঝমাঠে। যেতে যেতে চোখ বোলান সাইডলাইনের ওপর। ইলা আসবে বলেছিল। এখনও আসেনি মনে হচ্ছে। এলে প্রামাণিকদের দেওয়ালের কাছটায় দেখা যেত। পাড়া থেকে এসে মাঠে পৌঁছনোর সব থেকে কম দূরত্ব ওটাই। মেয়ে-বউরা তো আর মাঠ ঘুরে অন্য জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে না।

ইলাও আসবে মজা দেখতে। কাল অফিস থেকে ফেরার পর রোজকার মতো ব্যাগ হাঁটকে টিফিনবাক্স বার করতে গিয়ে কাগজ মোড়া নতুন হাফপ্যান্টটা উঠে এসেছিল ইলার হাতে। মোড়ক খুলে ইলার কী হাসি, তুমি এটা পরে কাল খেলতে যাবে!

গম্ভীর ছিলেন অবিনাশ। হাসিতে যোগ দেননি। বিয়ের পর পর তাঁর খেলা দেখেছে ইলা। এখন এভাবে হাসার কারণ ইলাও তাঁকে বুড়ো বলে গণ্য করছে। হাসির রেশ ধরে ইলা বলেছিল, আমি কিন্তু কাল দেখতে যাব।

অবিনাশ হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি। সাধারণত তিনি স্ত্রীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর হস্তক্ষেপ করেন না। এ ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে ভুল বোঝে। হয়তো স্ত্রৈণ বলে আড়ালে। সামনে এ ব্যাপারে সামান্য কটাক্ষ করার ক্ষমতা গুরুজনদেরও নেই। এমনই শীতল অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব অবিনাশের।

টিমের ক্যাপটেন হরেনদা রেফারির কাছে গিয়ে বলল, এই যে পালিত ভায়া, অফসাইডের নিয়মটিয়ম নেই তো?

হ্যাঁ দাদা, আছে। বলেন রেফারি।

সে কী গো! আমরা যে তাহলে খেলতেই পারব না। আমাদের সময় ছিলই না ওসব আইন।

রেফারি পালিত বলেন, আপনাকে অত ভাবতে হবে না হরেনদা। আপনাদের বেলায় ছাড় থাকবে।

কেন থাকবে? জেরার ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন অবিনাশ।

না, মানে এসব খেলায় একটু বয়স্কদের দিকে টেনে খেলাতে হয়। বললেন পালিত।

সেটা ঠিক নয়। নিয়ম সব সময় নিরপেক্ষ থাকা উচিত। নইলে খেলার প্রাণটাই চলে যায়। ম্যাচটা কতটা সিরিয়াসলি নেওয়া হবে সেটা ঠিক করবে বাইশ জন প্লেয়ার, আপনি নন।

অবিনাশের সওয়ালে রীতিমতো কাহিল রেফারি পালিত। বলেন, আপনাদের যেমন ইচ্ছে, ঠিক আছে।

সেন্টারে বল বসিয়ে বাঁশিতে ফুঁ মারলেন পালিত। অবিনাশের উদ্দেশে হরেনবাবু বলেন, বাঁশটা যেচে নিলে তো! একটা গোলও করতে পারব না আমরা। আমাদের কজন বোঝে অফসাইডের ব্যাপারটা।

বোঝা উচিত ছিল। যে-নিয়মটা ১৯৩০ সাল নাগাদ স্কটল্যান্ডে তৈরি হয়েছে ১৯৭৪-এ ইন্ডিয়ানরা কেন অভ্যস্ত হব না। বলেন, অবিনাশ।

আরিব্বাস, তুমি তো দেখছি ফুটবলের অনেক কিছু জানো। ভাল খেলো নিশ্চয়ই। হরেনদার বিস্ময়ের উত্তরে অবিনাশ মৃদু হাসেন। বলেন, তেমন কিছু খেলি না। নিয়মগুলো শুধু জানি। বিহারে আমাদের সময়ও অফসাইড ছিল না।

কথা শেষ করে অবিনাশ চলে যাচ্ছিলেন নিজের রাইট আউট পজিশনে। খেলা শুরুর আগে কে কোথায় খেলবে ঠিক করা হয়ে গেছে। হরেনবাবু এসে কনুই ধরে নিলেন অবিনাশের। বললেন, তুমি ভায়া সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলো। আমি নিমাইকে সরিয়ে নিচ্ছি। যদি পারো একটা গোল অন্তত ওদের দিয়ো।

না দাদা, আমি রাইট আউটেই খেলতাম। ওই পজিশনেই ফ্রি ভাবে খেলতে পারব। বলে, অল্প দৌড়ে নিজের পজিশান নিলেন অবিনাশ। আরও একবার চোখ চলে গেল

প্রামাণিকদের দেওয়ালে। না, ইলা আসেনি।

খেলা শুরুর বাঁশি বাজল। খুব জোর চেঁচিয়ে উঠল দর্শক। খেলার ওপর গভীর মনোযোগ স্থাপন করলেন অবিনাশ। তিনি ঠিক করে নিয়েছেন প্রথম পনেরো, কুড়ি মিনিট খেলার ভেতরে ঢুকবেন না। পর্যবেক্ষণ করে যাবেন। বল এলে পাস করে দেবেন সতীর্থকে। ওই সময়টুকুতে তিনি বুঝে নেবেন, নিজের দলের সক্ষমতা, অপনেন্টের দুর্বলতা। তারপর নিজেকে জড়াবেন খেলায়।

মিনিট পাঁচেক খেলা গড়াল। এখন অবধি যা দেখা যাচ্ছে, বয়স্করা একদমই ট্যাড়শ। ইয়াং প্লেয়ারের পায়ে বল থাকলেই সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এরকম আর মিনিট দশেক চললে দম ফুরিয়ে জিভ বেরিয়ে যাবে ভেটারেনদের। এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম শ্যামল। খেলছে ডিফেন্সে। এরই মধ্যে ইয়াং টিমের দুটো আক্রমণ নিষ্ক্রিয় করেছে। যদিও ছোটরা এখনও নিজেদের ক্ষমতার সিকিভাগও প্রয়োগ করেনি। বল এল অবিনাশের পায়ে। একটু দৌড়ে পাস বাড়ালেন নীহারবাবুকে। নিখুঁত পাস। ধরে রাখতে পারলেন না নীহারবাবু। ছিনিয়ে নিল ইয়াং প্লেয়ার।— এইভাবে খেলা গড়াতে লাগল। বাংলার ফুটবল ঘরানাটা আলাদা। অফিস কেটে ময়দানে ইতিমধ্যেই অনেক খেলা দেখে নিয়েছেন অবিনাশ। প্রথম প্রথম মনে হত এরা ভীষণ গা বাঁচিয়ে শৌখিন খেলা খেলে। এখন বুঝতে পারেন ওটা আসলে শৌখিনতা নয়, মেধার ঔজ্জ্বল্য। বাংলার খেলাটা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বেশি। অবিনাশরা বিহারে খেলেছেন স্কিল আর গায়ের জোরে।

ডিফেন্স ছেড়ে শ্যামল হঠাৎ উঠে গেছে ওপরে। সম্ভবত অধৈর্য হয়েই। বল পেয়ে অনেক দূর থেকে গোলে শট করে শ্যামল, অবধারিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দর্শকরা কার্পণ্য করে না, উৎসাহব্যঞ্জক চিৎকার করে ওঠে। মিনিট খানেকের মধ্যে শ্যামলের শটের জবাব দেয় ইয়াং টিম। গোলকিপার নন্দবাবুকে কাটিয়ে গোল লাইনে বল রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দবাবু ফের ঝাঁপালে বল ঠেলে দেয় জালে।

দর্শকরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে, টিটকিরি দিচ্ছে, ডিগবাজি দিয়ে ঢুকে আসছে মাঠে। অবিনাশ আর একবার তাকান প্রামাণিকদের দেওয়ালে। ঠিক বোঝা যায় না। বড্ড ভিড়।

হাফ টাইমের পর আরও দুটো গোল হয়ে গেল। ইয়াংরা জিতছে তিন শূন্য গোলে। বড়দের দম ফুরিয়েছে। ষাট মিনিটের খেলা। শেষের দিকে কী হবে কে জানে।

এখনও পর্যন্ত খেলায় তেমন গা লাগাননি অবিনাশ। লাগিয়ে কোনও লাভ হবে না। এত দুর্বল সহখেলোয়াড় নিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। বসে যাবেন কিনা ভাবছেন, ক্যাপটেনকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন, হরেনবাবু তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। চোখে অসহায় আর্তি। সম্ভবত টের পেয়েছেন অবিনাশ নিজেকে পুরোটা দিচ্ছেন না খেলায়।

চোখ সরিয়ে নেন অবিনাশ। খেলায় মন দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝমাঠ পেরিয়ে অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে যান বল। এবার আর কাউকে পাস করেন না। দৌড়তে থাকেন বল নিয়ে। ঠিক করে নেন এই মুভমেন্ট থেকে তাঁকে একটা রেজাল্ট করতেই হবে। বল নিয়ে হঠাৎ স্পিড বাড়ানো তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটাই প্রয়োগ করছেন এখানে, ঠিক জুতসই হচ্ছে না। বয়স আর বাংলার জলীয় আবহাওয়া এর জন্য দায়ী। সামনে বিপক্ষের একজন এল, অনায়াসে ডজ করলেন অবিনাশ। দর্শকদের বিস্মিত হইচই ভেসে এল। স্পিড আরও বাড়িয়েছেন। দর্শকরা চেঁচাচ্ছে। তবু যেন কীসের একটা অভাব বোধ করছেন অবিনাশ। আবার একজন সামনে এল, বাঁদিকে ঝুঁকে ডানদিকে কাটাতে ছেলেটা মাটি নিল। পেনাল্টি বক্স ফুট পাঁচেক দূরে। কীসের যেন অভাব, আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি পড়ছে। মনে হচ্ছে পারবেন না। দর্শকরা গলা ফাটিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে, এদের মধ্যে মৃগাঙ্ক অনুপস্থিত। বল ধরে এগোলেই মৃগাঙ্ক সাইড লাইন বরাবর দৌড়তে দৌড়তে চেঁচাত, নেট ফাড় দো অবিনাশদা। গোল চাহিয়ে, গোল।

আজ সমস্তিপুরের কেউ নেই। পেনাল্টি বক্সে ঢুকে পড়েছেন অবিনাশ। লাস্ট ডিফেন্ডারের পায়ের তলা দিয়ে বল গলিয়ে লাফিয়ে গেলেন। সামনে শুধু একা

গোলকিপার। শট নেওয়ার আগে তাঁর কথা স্মরণ করলেন অবিনাশ, সেই অবতার। অবিনাশদের বংশে যাঁর জন্মগ্রহণ নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যিনি কদাচিৎ অবিনাশের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছেন। শট নেওয়ার মুহূর্তের ভগ্নাংশে ঘোষাল উকিলের টমটম ওলটানোর ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।

গোল হল না। মাটিতে পড়ে আছেন অবিনাশ। শটটা নিয়েছিলেন ঠিকই, শেষ সময় ওদের ডিফেন্ডার বিচ্ছিরিভাবে চার্জ করল। ফাউল। পেনাল্টি দিলেন রেফারি।

মাঠের বাইরে প্রচণ্ড হইচই। বোঝাই যাচ্ছে সমস্ত চিৎকার ভেটারেন টিমের পক্ষে। অবিনাশ জানেন তিনি মানে সেই অবতার পুরুষ আজ প্রকাশিত হননি। হলে গোলটা হয়ে যেত। মাঠে বসে আছেন অবিনাশ। কনুইয়ে, পায়ের গোছে বেশ লেগেছে। হরেনবাবু হাত ধরে তুলতে তুলতে বলেন, খারাপ খেললে হ্যাটা দেবে, ভাল খেললে মার। আমরা যাই কোথায় বলতে পারো।

মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ান অবিনাশ। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, মোচকেছে মনে হয়। কনুইটাও জ্বালা জ্বালা করছে। অনেকেই এখন ঘিরে রয়েছেন অবিনাশকে। রেফারি হুইশেল বাজিয়ে পেনাল্টি মারতে ডাকছে। হরেনবাবু বললেন, যাও আসল কাজটা করে দিয়ে এসো।

আমি বোধহয় পারব না হরেনদা। শ্যামল মারুক। মাঠের বাইরে গিয়ে বসছি। বলে, লেংচে লেংচে সাইডলাইনের দিকে এগিয়ে গেলেন অবিনাশ। পরিবর্ত প্লেয়ার নামল। মাঠের ধারে বসে দেখলেন, কী বিপুল আক্রোশে গোলটা দিল শ্যামল। আক্রোশ সময়ের ওপর। যে ছিনিয়ে নিয়েছে তাজা বয়স।

বাড়িই চলে যেতেন অবিনাশ। ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না। প্রাইজ দেওয়ার অনুষ্ঠান আছে। এক দুজন করে দর্শক অবিনাশের কাছে আসছে। বিস্ময় ও প্রশংসা মিশিয়ে বলছে, আপনি দারুণ খেললেন তো! নিশ্চয়ই আগে ভাল প্লেয়ার ছিলেন। এখনও যদি রেগুলার প্র্যাকটিস...

কোনও প্রশস্তিই ছুঁচ্ছে না মন। এ সময় যদি মৃগাঙ্ক থাকত, ভিড় ঠেলে এসে পা তুলে নিত কোলে। গভীর উদ্বেগে জানতে চাইত, খুব লেগেছে অবিনাশদা?

বাইরের ঘরে জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন ইলা। মুখে একরাশ উৎকণ্ঠা। সামনে ছোট্ট চৌকো বাগানটার পরেই রাস্তা। খেলা দেখে দর্শকরা দল বেঁধে বাড়ি ফিরছে। এখনও তাঁর কর্তার ফেরার নাম নেই। এতক্ষণ পর্যন্ত মাঠ থেকে মাইকের শব্দ ভেসে আসছিল। তা যখন থেমে গেছে ফিরে আসারই কথা। যদিও পাড়ার অখিলবাবু, বাসবদা, নীহারবাবু কেউই ফেরেননি। সে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তাও করছে না তাঁদের গিন্নিরা। কেন করবে? তাদের কর্তারা অক্ষত। একমাত্র ইলার স্বামীই আহত। আঘাত কতটা মারাত্মক জানেন না ইলা। পাড়ার বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে হাসপাতাল যায়নি তো?

ও মা, বাবা কখন আসবে? ও মা... বরুণ গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করে যাচ্ছে বারবার।

বিরক্ত হন ইলা। ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন, ধুর বাবা, আমি কী জানি, কখন আসবে!

ন বছরের বরুণ বাবার অপেক্ষায় পাশের জানলার গরাদ ধরে দাঁড়ায়। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগে কাতর হওয়ার বয়স বরুণের হয়নি। ওর মুখের ভারাক্রান্ত ভাবটা মায়ের থেকেই ধার করা। তবে বাবাকে ওভাবে ছিটকে পড়ে যেতে দেখলে বরুণ নিশ্চয়ই ভয় পেত খুব। ইলা দেখেছেন, দেখে তো প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। তাঁর নিজের মানুষটাকে ওভাবে শেকড় ওপড়ানো গাছের মতো পড়ে যেতে এই প্রথম দেখলেন। কিছুক্ষণের জন্য দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ইলার! পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাড়ার গিন্নিরাও আঁতকে উঠেছিল। তারপর উনি যখন শোয়া অবস্থা থেকে মাঠে উঠে বসলেন, স্বস্তির শ্বাস ফেলে সবাই।

আর খেলতে পারলেন না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠের বাইরে গিয়ে বসলেন। খুব একটা অসুস্থ লাগছিল না। পাঁচজনের সঙ্গে কথাও বলছিলেন। ইচ্ছে থাকলেও তাঁর কাছে যেতে

পারেননি ইলা, কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে এসেছিলেন একা। পাড়ার অন্য গিন্নিরা রয়ে গেল।

ঘরে এসেই চুন-হলুদ গুলে রেখেছেন। উনি ফিরলে গরম করবেন স্টোভে। খেলা দেখতে যাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছে ছিলই, সেটা যে বাস্তবে ঘটবে ভাবেননি। মাঠ থেকে মাইকের শব্দ ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার তিন গিন্নি এসেছিল ইলার কাছে। তাদের স্বামীরাও খেলতে গেছে মাঠে। মিনতিদি বলল, চলো ইলা, দেখে আসি বুড়োরা কেমন খেলে।

ঊষা বউদি আর এককাঠি সরেস। বলে কিনা, রাতে আমাদেরই তো পা টিপতে হবে। খেলা দেখার মজাটা ছাড়ি কেন।

আমি মরে গেলেও বরের পা টিপি না। বলেছিল শ্রীলেখা।

দুপুরের রান্না মোটামুটি গুছিয়ে রেডি হয়ে নিলেন ইলা। বড় ছেলে অংশুকে বললেন, ভাইকে লক্ষ রাখবি আমি ঘুরে আসছি।

মাঠে গিয়ে দেখলেন আর সবাই দৌড়দৌড়ি করলেও অবিনাশ খেলার মাঝে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। যেন ইচ্ছেই নেই খেলার। বিয়ের পর দু-তিনবার মানুষটার খেলা দেখেছেন ইলা, কী বিদ্যুৎগতিতে ছোটাছুটি করে, চোখে হারায়। আজ কেন তাহলে এরকম হালছাড়া অবস্থায়! সেটা বয়সের কারণে, নাকি সমস্তিপুরের পরিবেশ ছাড়া মেজাজই পাচ্ছেন না খেলার?

বেশ কয়েকটা গোল খেয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙল তাঁর। বল পেয়েই দৌড় লাগালেন, সেই আগের মতোই গতি। হাত মুঠি করে ছিলেন ইলা। চটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল বসে যাচ্ছিল। কেন কী জানি মুহূর্তের জন্য মনে পড়েছিল শ্বশুরমশাইয়ের মুখে বারংবার শোনা মহাভারত কথার দ্রোণ পর্ব। সাত্যকি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে ভুরিশ্রবার কাছে। অর্জুন এসে ভুরিশ্রবার ডান হাত কাটল তির ছুড়ে। অর্জুন ভুরিশ্রবার তর্কযুদ্ধ হচ্ছে, সেই ফাঁকে সাত্যকি মুক্ত কৃপাণ হাতে ছুটে যায় ভূরিশ্রবাকে বধ করতে--সেইভাবে ছুটে যাচ্ছিলেন উনি। পারলেন না। একটা বছর কুড়ির ছেলে এসে পায়ে মারল। কী করে পারল মারতে। ছেলেটার তো ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার বয়স। ছেলেটাকে চিনে রেখেছেন ইলা। জানেন কিছুই করতে পারবেন না। ঘৃণা তো করতে পারবেন।

বড় অসহায়ভাবে পড়েছিলেন অবিনাশ। ইলার মনে পড়ে যাচ্ছিল সমস্তিপুরের যৌথ পরিবারের কথা। ভাশুর, জা, ননদ, শ্বশুর সবার মুখ ভেসে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য। ওদের ছেড়ে এসে নিঃসঙ্গ অবিনাশ পড়ে আছেন বাংলায়। কলকাতায় আসার জন্য যখন পাকাপাকিভাবে ট্রেন উঠছিলেন ইলা, শ্বশুরমশাইকে প্রণাম করতে উনি কান্নাচাপা গলায় বলেছিলেন, আমার ছেলেটাকে দেখো বউমা। ওকে দেখার আর তো কেউ রইল না। বড্ড গোঁয়ার...

অবিনাশ মাঠে উঠে দাঁড়াতে ইলা নিজের মধ্যে ফেরেন। তখনই ঠিক করেন, কর্তা বাড়ি ফিরলেই দিব্যি করিয়ে নিতে হবে, আর যেন কখনও এরকম হঠকারি খেলায় না নামা হয়।

এখনও যে কেন ফিরছেন না। যথেষ্ট বেলা হল। সেই কখন জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছেন। ছেলে দুটোর খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। জানলায় দাঁড়িয়ে ইলা পাশের বাড়ির উদয়কে যেতে দেখেন। জানতে চান, হ্যাঁ রে উদয়, তোর কাকাবাবু এখনও ফিরছে না কেন রে?

এইবার ফিরে আসবে কাকিমা। কাকাবাবুদের প্রাইজ লাস্টে দিল তো। বলে, উদয় বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ইলা রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে যান চুন-হলুদটা ফোটাতে। বরুণ চলেছে মায়ের শাড়ি ধরে। ছেলেটা ভীষণ মা নেওটা।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবিনাশ। মুখে পান। দুটো পা মেঝেতে এলানো। বাঁ পায়ে চুন-হলুদ। এখনও দপদপ করছে আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটা। অন্য রবিবার হলে পায়ের ওপর পা তুলে অল্প দোলাতেন। একটা ঝিমুনি আসত। এমন অভ্যেসটা

ওঁর পিতা ব্রজসুন্দরের ছিল। পুরোপুরি দিবানিদ্রা বাবা এড়িয়ে চলতেন, বলতেন শরীর রসস্থ হয়। দুপুরের ঘুম হচ্ছে তমোভাব।

বাবা ছিলেন প্রকৃতই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। এবং সদগুরু আশ্রিত। এ ছাড়াও ব্রজসুন্দরের তন্ত্র, মন্ত্র, যোগে এক ধরনের নিজস্ব ঝোঁক ছিল। বাবার ব্যাপার স্যাপার অবিনাশকে আকৃষ্ট করলেও প্রভাবিত করত না। তিনি নাস্তিক ছিলেন না বটে, আস্তিকতা নিয়েও বাড়াবাড়ি ছিল না। ইদানীং কেন জানি মনে হয় ঈশ্বরের প্রতি আরও একটু নির্ভরতা, বিশ্বাস দরকার ছিল তাঁর। তাহলেই অনেক পরাজয়, অপমান, পারিবারিক তুচ্ছতা পাশ কাটানো যেত। এসব কথা আজ বেশি করে মনে পড়ার কারণ সকালের অসম ম্যাচটায় মার খাওয়া। তিনি তো জানতেন ম্যাচটায় হারবেন। কেন মিছিমিছি মরিয়া হয়ে উঠলেন একটা গোল করার জন্য। মূঢ় অহঙ্কার। এমনকী গোল করতে যাওয়াকালীন মনে মনে বংশের সেই মিথটাকেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। যে-মিথে আকৈশোর আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। গল্পটা বাবার মুখে বারবার শোনা। বাবা নিজের শেষদিন অবধি বিশ্বাস করেছেন তাঁর বংশে অবতারের জন্মগ্রহণ আসন্ন। যিনি পতিত মানুষ জাতিকে উদ্ধার করবেন। কাহিনীটা শুরু হয়েছিল এরকম, অবিনাশের ঠাকুর্দা ঊষানাথ বসে আছেন ভাগলপুরের বাড়ির বারান্দায়। ভাগলপুরেই হচ্ছে অবিনাশদের আদি বাড়ি। বাবা ব্রজসুন্দর ওকালতি করতে কলকাতায় যান। বড় জ্যাঠামশাই কৃপাময় হাইকোর্টে ওকালতি করতেন, দাদার সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মনোমালিন্য হতে ব্রজসুন্দর ভাগলপুরে ফেরেন না, চলে আসেন সমস্তিপুরে। সে যাই হক, আপাতত ভাগলপুরের বাড়িতেই ফেরা যাক। বারান্দায় বসে ঠাকুর্দা দেখলেন, রাস্তা দিয়ে একজন জটাজুট সন্ন্যাসী হেঁটে যাচ্ছেন। তপঃক্লিষ্ট চেহারা কিন্তু শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত আভা। সাধুবাবা যে খাঁটি বুঝতে অসুবিধে হয়নি ঠাকুর্দার। ভাবছিলেন ডেকে নিয়ে আসবেন বাড়িতে। পরক্ষণেই দ্বিধা হচ্ছিল, কী দরকার বাবা ওইসব খাঁটি সাধুসন্তদের ঘাঁটিয়ে। কখন কী করে বসে, বলে বসে, কোনও ঠিক নেই। এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, সাধুবাবা বাড়ি পেরিয়ে চলে গেলেও, ফের ফিরে এলেন। এবং বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মতো। ভ্রূকুঞ্চিত চোখ, কী যেন খুঁজছেন বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

ঊষানাথ তো থতমত। তড়িঘড়ি চেয়ার ছেড়ে নেমে এসেছেন রাস্তায়। সন্ন্যাসীর উদ্দেশে জোড়হাত করে বলেন, ক্যায়া দেখ রঁহে হ্যায় স্বামীজি?

একটু পরে সাধুবাবা বলেন, মুঝ কো কুছ শুনাই দিয়া। বঢ়িয়া কুছ।

ক্যায়া শুনাই দিয়া বাবা? আকুল প্রশ্ন ঠাকুর্দার।

উত্তর না দিয়ে সাধুবাবা সোজা উঠে গেলেন বারান্দায়। তারপর ঘটালেন আর এক কাণ্ড, বারান্দায় উবু হয়ে বসে মেঝেতে কান পেতে দিলেন। ঊষানাথের তো তখন বাক্ হারা অবস্থা। কেন এসব, কী ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছেন না। সাধুবাবা উঠে দাঁড়ালেন, কান পাতলেন দেওয়ালে। তারপর আর এক দেওয়ালে। কিছু একটা শুনতে চাইছেন। সাধুবাবার পিছনে পিছন ঘুরছেন ঊষানাথ।

আচমকাই সাধুবাবা ভিতরবাড়ির দিকে চললেন। বাড়ির ভিতরে পুরুষের সংখ্যা কম, সবাই কাজে বেরিয়েছে। সাধুবাবাকে দেখে মেয়েমহলে হইচই পড়ে গেল। উনি কোনও দৃকপাত করলেন না। দেওয়ালে, মেঝেতে কান পেতে পেতে এগিয়ে যাচ্ছেন। আর বিড়বিড় করছেন।

এক সময় থামলেন। থমথমে মুখ। অলস পায়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। আসন পেতে বারান্দায় বসলেন। দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। বাড়ির সবাই সাধুবাবাকে ঘিরে বসেছে। ঊষানাথ পায়ের কাছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন ঠাকুর্দা, যদি সাধুবাবা নিজের থেকে কিছু বলেন। বলছেন না। অধৈর্য ঊষানাথ জিজ্ঞেস করেই ফেলেন, স্বামীজি, আপ ক্যায়া শুন রহে থে?

ঊষানাথের দিকে তাকান সাধুবাবা। জানতে চান, ইস পরিবার কা মুখ্য ব্যক্তি কৌন হ্যায়?

ম্যায় হুঁ স্বামীজি। বলেন ঊষানাথ

বাকি সব কো যানে বোলো।
সাধুবাবার আদেশে পরিবার সদস্যরা ভিতরবাড়িতে চলে যায়। রহস্যময় দৃষ্টি নিয়ে সন্ন্যাসী তাকিয়ে থাকেন ঊষানাথের দিকে। কিছুক্ষণ পর মৃদু হাসি যোগে বলতে থাকেন, তুমাহারা বংশ মে উনকা আবির্ভাব হোগা। কোই ভি এক বালককে অন্দর ঈশ্বর ছুপা রহে গা। তুমহারা বংশ কা উহু সন্তান হোগা অবতার পুরুষ। ম্যায় উনকাহি পদধ্বনি শুন রহা থা। বাজ রাহা হ্যায়, বহুত জোরসে বাজ রহা হ্যায়। সময় হো গ্যায়া আনে কা। তুম ভি মেহসুস করো গে। কভি কভি তুমাহারা পুত্রকে অন্দর উনকা ঝলক দেখো গে। উসি সময় কুছ চমৎকার করেগা লড়কা। বাদমে যাকে ঈশ্বর খুদ জনম লেগা তুমাহারা বংশ মে। সব শুনে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন ঠাকুদা।
কোনওক্রমে বলেন, ক্যায়সে পহেচানুঙ্গা উনকো?
ঠিক পহেচান যাওগে। উহ আপনা লীলা রচয়গা বচপন সে। বলে, মৌন হয়ে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী। দীর্ঘক্ষণ ওই বারান্দায় বসেই ধ্যান করেন। সন্ধে গড়িয়ে যায়। এক সময় চোখ মেলে বলেন, ম্যায় হিমালয় ওয়াপস যা রহা হুঁ। আগর জিন্দা রহা, তো অবশ্য ভগবান কো দেখনে আউঙ্গা।
ফল, মিষ্টি, জল দেওয়া হয়েছিল সাধুবাবাকে উনি কিছুই স্পর্শ না করে বিদায় নেন। তারপর প্রায় পঁচিশ বছর অবিনাশদের বংশ থমথমে অপেক্ষায় ছিল অবতারের। যখন দেখা গেল তেমন অলৌকিক কিছু ঘটছে না, কারও মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছেন না তিনি, বিষয়টা তখন গালগল্পে পর্যবসিত হয়। কিন্তু সেই মিথ স্বমহিমায় জেগে ওঠে আরও পঁচিশ বছর পর। অবিনাশরা তিন ভাই সদ্য মাতৃহারা হয়েছেন। শোক সামলাতে বাবা তখন অতিমাত্রায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন। ততদিনে তিনি বুঝে নিয়েছেন, তাঁর পুত্রদের মধ্যে কারওই অবতারের লক্ষণ নেই। তেমন লোকেদের সঙ্গেই মিশতেন বাবা যাঁদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ভগবতচিন্তা। একটা স্পিরিচুয়াল ক্লাবও খুলে ফেলেছিলেন বাবার বন্ধুরা। সেই সময় বাবার সঙ্গে দেখা হয় ফরিদপুরের এক পিরবাবার। ভাষার হেরফের ছাড়া সন্ন্যাসীর মতো হুবহু একই ভবিষ্যদ্বাণী করেন পিরসাহেব। ওই পিরবাবার কথার ওপর নির্ভর করে দ্বিতীয় বিবাহ করেন বাবা। দুঃখের বিষয় সৎমা অবিনাশদের দুটি মিষ্টি বোন দিলেও বাবাকে হতাশ করেন। দ্বিতীয় মা বেশিদিন রইলেন না পৃথিবীতে, ছ বছরের মধ্যেই সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন পরপারে। কিন্তু অবিনাশদের বংশে সেই প্রতীক্ষা বজায় থাকল। কেন না পঞ্চাশ বছর তফাতে দুই সন্ত একই ভবিষ্যদ্বাণী করাতে মিথটি মজবুত হয়েছিল। অবিনাশ ছোট থেকে নিজের রক্তের সম্পর্কের মধ্যে খুঁজেছেন সেই পুরুষকে। কখনও মনে হয়েছে আমিই সে। পরিবার ক্রমশ বড় হয়েছে, ছড়িয়ে গেছে। খোঁজা ছেড়ে দিয়েছেন অবিনাশ। এখন ধরে নিয়েছেন ওই ভবিষ্যদ্বাণীটি দুই সন্তের খামখেয়াল। এক আশ্চর্য সমাপতন। সম্ভবত দুই ঈশ্বরকাতর (সাধু ও পির) একটা বয়সে এসে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন দিব্যশক্তি দর্শনে। তারই ফলস্বরূপ ঘটেছিল এই ঘটনা। কিন্তু মজাটা হচ্ছে দুজনেই কেন অবিনাশদের বংশকে নির্ধারণ করলেন, ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে জন্ম নেবেন এখানেই? এ বিষয়ে একটি সহজ যুক্তি খাড়া করেছেন অবিনাশ, আসলে ওই দুই ঈশ্বরপিয়াসী কিছু মাইল অন্তর কোনও না কোনও বাড়িতে একই কথা বলেছিলেন নিশ্চয়ই। সেইসব পরিবারে অবিনাশদের মতোই ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করা হয়। হয়তো অনেক পরিবারে অচল হয়ে গেছে ওই গল্প। অবিনাশও আর বিশ্বাস করেন না। জনসংখ্যা এবং মানব সভ্যতা এখন যে পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোনও দিব্যপুরুষের পক্ষেই আর সম্ভব নয় সমাজকে প্রভাবিত করা। এসব ভাবতে ভাবতে জবাকুসুম তেলের গন্ধ পেলেন অবিনাশ। চোখ বোজা। তবু টের পেলেন ইলা এসে বসেছে ইজিচেয়ারের পাশে।
আরাম পাচ্ছ, নাকি এখনও ব্যথা লাগছে? মমতামাখা গলায় জানতে চাইলেন ইলা। নাঃ, ব্যথা তেমন নেই। একটু চিনচিন করছে।
ইলা বলেন, কাল আর যেতে পারবে না অফিস।

দেখি। বলে, খানিক চুপ করে থাকেন অবিনাশ। তারপর বলেন, ভাবছি, কদিন ছুটি নিয়ে সমস্তিপুর ঘুরে আসি। তোমাদের নিয়েই যাব।

হঠাৎ?

এমনিই। কদিন ধরেই মন টানছে।

পুজোর ছুটিতে চলো। এখন তো বরুণ, অংশুর পুরোদমে স্কুল চলছে।

একথার কোনও উত্তর দেন না অবিনাশ। ইজিচেয়ারে গা-ছাড়া অবস্থা থেকে উঠে বসেন। কী যেন ভাবছেন ভ্রূ কুঁচকে। ইলাও ভাবছিলেন সমস্তিপুরের বাড়িটার কথা। হঠাৎ কী একটা মনে পড়ে। বলে ওঠেন, এই যাঃ, দেখেছ, একদম ভুলে গেছি। কাল সমস্তিপুরের একটা চিঠি এসেছে, তোমাকে দেওয়াই হয়নি। কাল থেকে যা খেলা খেলা করে মাতলে!

চিঠি আনতে উঠে যান ইলা। অবিনাশ ভাবতে থাকেন কে দিতে পারে চিঠি। প্রায় সাত বছর হল সমস্তিপুর ছেড়েছেন। ছোটছেলে বরুণ তখন দুই। বাবার কোল থেকে এক প্রকার ছিনিয়ে আনতে হয়েছিল ছেলেকে। বাবা কোনওদিনই চিঠি দেননি। তবে দুবার দেবপাড়ায় ঘুরে গেছেন। বাকি সবাই প্রথম দিকে চিঠি দিত খুব। ধীরে ধীরে কমেছে। অবিনাশ জানেন, এমন দিন আসবে যখন শুধু বিজয়ার চিঠিতেই আত্মীয়তা রক্ষা হবে। রক্তের সম্পর্কদের বিষয় একথা ভাবতে খারাপ লাগে। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক। এখানে আসার আগে ভবিতব্য জানতেন অবিনাশ। ও-বাড়ির লোকেদের অবিনাশের ওপর ন্যায্য অভিমান আছে। ন্যায্য এই কারণে যে, বাবার বয়স হয়ে যেতে অবিনাশই ও-বাড়ির অভিভাবক ছিলেন। তিনি মেজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও এই অভিভাবকত্ব বর্তেছিল। কারণ তাঁর ঋজু ব্যক্তিত্ব, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আর অন্য দুভাইয়ের তুলনায় বেশি রোজগার। বাড়ির প্রত্যেকেই সানন্দে তাঁর অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছিল। তিনিই ছিলেন সংসারের খুঁটি। নিজেকে এভাবে সরিয়ে নেওয়াটা হয়তো স্বার্থপরতা মনে করে সবাই। তিনি কিন্তু কর্তব্যে কোনও ত্রুটি রাখেননি। দাঁড়িয়ে থেকে দুই বোনের বিয়ে দিয়েছেন। দাদা হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করে। পশার খুব একটা ভাল নয়। কলকাতা থেকে ওষুধ কিনে পাঠান অবিনাশ। তবু ওদের অভিমান যায় না। একেই বোধহয় বলে রক্তের সম্পর্কের দাবি।

এই নাও। খামে ভরা চিঠিটা বাড়িয়ে ধরেছেন ইলা।

হাতে নেওয়ার আগে অবিনাশ বলেন, কার?

বুঝতে পারছি না। লেখাটা চেনা নয়। ঠিকানাটা অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো নয়তো?

অবিনাশ একবারেই চিনতে পারলেন। বুকের মধ্যিখানটা হু-হু করে উঠল, আহা রে, আজকেই ছেলেটার কথা ভাবছিলেন। খামটা খুললেন অবিনাশ। অক্ষরগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল। ইলা জানতে চাইল, কার চিঠি গো?

মৃগাঙ্কর।

ওরে বাবা, মৃগাঙ্ক ঠাকুরপো এত বড় চিঠি লিখেছে!

ইলার কথা কানে না তুলে অবিনাশ বলেন, চা দেবে একবার, শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।

হ্যাঁ, যাই। বলে, মেঝেতে দু হাতের চাপ দিয়ে উঠে যায় ইলা। আগের থেকে চেহারাটা ভারী হয়েছে। গোলগাল লক্ষ্মীঠাকুর ভাব। চা আসলে ছুতো। ইলাকে এখন সরাতেই চেয়েছেন অবিনাশ। চিঠিটা তিনি নিভৃতে পড়তে চান।

পূজনীয় অবিনাশদা দিয়ে চিঠি শুরু, কিন্তু ক্রমশ যেন অচেনা, অপ্রত্যাশিত সংবাদ বহন করে এনেছে। এ কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়েছে মৃগাঙ্ক! রাস্তা থেকে একটা মেয়ে কুড়িয়ে এনে মানুষ করবে ঠিক করেছে। জীবনে এই প্রথম একা একাই কোনও সাহসী কাজ করল মৃগাঙ্ক। সুস্থ মস্তিষ্কে করেছে নাকি নেশার ঝোঁকে? মৃগাঙ্ক ইদানীং নেশা করা বাড়িয়েছে, খবর পেয়েছেন অবিনাশ। চিঠিতে কোনও অসংলগ্নতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু যেন নার্ভাস। পাশে চাইছে অবিনাশদাকে। চিঠির একদম শেষে 'পুনশ্চ' পড়ে কেমন যেমন খটকা লাগে। লিখেছে চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলতে। কেন? ও তো কোনও অন্যায় করেনি। কী লুকোতে চাইছে মৃগাঙ্ক? কপালে ভাঁজ পড়ে অবিনাশের, খাম হাতে উঠে

যান দেওয়াল আলমারির দিকে। তাক থেকে একটা বই বার করে খামটা রাখেন। চিন্তিত মুখে ফিরে আসেন চেয়ারে।

চা নিয়ে ঢোকেন ইলা। চা খেতে খেতে গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করেন অবিনাশ। ভাবনার ভেতর থেকেই স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, আমি একাই দিন চারেকের জন্য ঘুরে আসি।

ইলা ভীষণ অবাক হন। অফিস ইউনিয়নের কাজে বাইরে একা রাত্রিবাস করা বাদে সচরাচর স্ত্রীকে সঙ্গছাড়া করতে চান না অবিনাশ। হঠাৎ কী হল! উদ্বেগ গোপন করে ইলা জিজ্ঞেস করেন, কী লিখেছে, মৃগাঙ্ক ঠাকুরপো?

তেমন কিছু না। ছেলেটা নেশা করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে একটু বোঝানো দরকার।

যমুনাও নিশ্চয়ই খুব কষ্টে আছে।—একটু থেমে অবিনাশ বলেন, ভালমামাকে বলে দেব, আমি যে কটা দিন থাকব না, এ-বাড়িতে যেন রাত্তিরে এসে শোয়। কথাটা বলে অবিনাশ অপেক্ষা করেন স্ত্রীর উত্তরের। ইলা সামান্য দিশেহারা। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ফের অবিনাশ বলেন, কী, অসুবিধে হবে খুব?

না, তা নয়... কথা থেমে যায় ইলার। ভেতর ঘর থেকে ভেসে আসে অংশুর চিৎকার, ও মা দেখে যাও, ভাই কী করছে!

তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান ইলা। অংশুর অভিযোগে একটু যেন আশঙ্কা মিশে আছে।

অবিনাশও ওঠেন। ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে অবাক হয়ে দাঁড়ান। ছোটছেলে বরুণকে ধরে ইলা ঝাঁকাচ্ছে আর বলছে, কেন এমন করছিলি বল? বল বলছি।

মাথা নিচু করে গোঁজ মেরে দাঁড়িয়ে আছে ন বছরের বরুণ। অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, কী করেছে ও?

উত্তরটা দেয় অংশু। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, জানো বাবা, আমি রান্নাঘরে জল খেতে যাচ্ছি, দেখি ভাই এখানে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে লাথি মারছে, মেরেই যাচ্ছে। বারণ করলেও শুনছে না।

অংশুর কথা কেড়ে নিয়ে ইলা বলে, এই দেখো, কী করেছে পায়ের অবস্থা।

বরুণের ডান পা তুলে দেখায় ইলা। পায়ের গোছ ছড়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু রক্ত।

কষ্ট পাওয়ার বদলে বিস্মিতই বেশি হন অবিনাশ। ইলা আবার ছেলেকে ঝাঁকিয়ে বলে, তোকে বলতেই হবে কেন এমন করছিলি?

বরুণ কান্নারুদ্ধ গলায় বলে, বাবার পায়ে কেন লাগবে? কে মেরেছে বাবাকে?

একরত্তি ছেলে, বড় পাথর হয়ে ধাক্কা মারে অবিনাশের বুকে। ছেলেটা কি বাবার কষ্ট বোধ করতে চাইছে নিজের মধ্যে?

বরুণের সামনে উবু হয়ে বসেন অবিনাশ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন আত্মজর মুখ। একটু বেশিই সময় নেন যেন। ইলা অংশু টের পায় না অবিনাশ আসলে কাকে খুঁজছেন।

॥ চার ॥

দুপুর দুটো। চিনি মিলের ভোঁ পড়ছে। সকালের শিফটের ছুটি, দুপুরের শুরু। মৃগাঙ্ক শুয়ে আছেন বাতিল স্টোররুমের পিছনে। মিলের ভোঁ-টা মৃগাঙ্কর কানে স্কুল ছুটির ঘণ্টা হয়ে বাজছে। হিসেব মতো তাঁর এখন ডিউটি অফ হল। যদিও সকাল থেকে এসে কোনও কাজই করেননি। পা খোঁড়া বলে খুব একটা কাজ দেওয়া হয় না তাঁকে। অফিসার, কেমিস্টদের ফাইফরমাশ খাটতে হয়। আজকের মতো মাঝেমধ্যেই ডিউটিতে এসেও উধাও হয়ে যান তিনি। উধাও হয়ে কোথায় পড়ে থাকেন, মিলের স্টাফরা জানে। আজ কিন্তু সেখানে তিনি নেই, বলাইদা ধরে নিয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় জায়গা বদল করেছেন। আগে শুতেন স্টোররুমের দরজার কাছে, আজ শুয়েছেন পিছনে।

রোদ পড়েছে মুখে। চোখ খুলছেন না। সহ্যক্ষমতা পরখ করছেন। অন্য কেউ দেখলে ভাববে, নেশা করে বেহুঁশ।

নেশা তিনি করেছেন ঠিকই তা বলে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত নয়। কদিন ধরেই নেশা ঠিক জুতসই হচ্ছে না। কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটার আসল মাকে খুঁজতে গিয়ে ভীষণভাবে হয়রান হতে হচ্ছে। এদিকে বলাইদার কোনও ক্লান্তি নেই। খোঁজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আজই একটা হদিশ পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। বলাইদা বলে রেখেছে, ছুটির পর মৃগাঙ্ককে নিয়ে যাবে সেই জায়গায়, যেখানে মেয়ের আসল মায়ের দেখা পাওয়া যেতেও পারে। যদিও গোটা ব্যাপারটা অনুমাননির্ভর। তবে বলাইদার অনুমান বেশির ভাগ সময় ঠিকই হয়।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনটা ব্যাজার ছিল। আসল মাকে পাওয়া গেলে মেয়েটাকে দিয়ে দিতেই হবে। মেয়ের মা না চাইলেও বলাইদা রেখে আসবে ঠিক। আজ কারখানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বলাইদা এসে বলে গেল, ডিউটির পর কোথাও ভাগবি না, প্রোগ্রাম মনে আছে তো?

মনে না থেকে যায়! কদিন ধরে বিষম ছোটাছুটির সাময়িক অবসান হয়েছে গতকাল। কানাইয়ার মদের ভাঁটিতে সেই যে চারদিন আগে অচেনা লোকটাকে দেখা গিয়েছিল, সে মাঝের তিনদিন ছিল উধাও। লোকটা বেশ চালাক-চতুর, কানাইয়ার ডেরায় মদ খেতে খেতে ঠাহর করে নিয়েছিল, ওকে ওয়াচ করা হচ্ছে। কোনও এক মাতালকে নিয়ে শোরগোল বাঁধল ডেরায়, সেই ফাঁকে পাখি হাওয়া। তারপর থেকেই লোকটাকে গরুখোঁজা শুরু হল। কোথাও পাওয়া যায় না। কানাইয়ার আস্তানায় তো নয়ই, সন্ধেবেলা আরও চারটে দেশি মদের ডেরায় ঢুঁ মেরেও পাওয়া গেল না। আশ্চর্যভাবে গতকাল সন্ধেবেলা লোকটার দেখা মিলল মারোয়াড়ি বাজারে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে জিনিস কিনছিল সে। তেঢ্যাঙা বলেই সহজে চোখে পড়ল বলাইদার। থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ওই দেখ!

মৃগাঙ্ক এমন ভান করছিলেন যেন দেখতে পাচ্ছেন না। বলাইদা বলে, একদম বুঝতে দিলে চলবে না, চুপিসাড়ে ফলো করে যাব।

তাই করা হল। লোকটা মাড়োয়াড়ি বাজার ছেড়ে স্টেশনের রাস্তা ধরল। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে রেললাইন ক্রস করে এগিয়ে চলল রেলকলোনির দিকে। ওটাই রেলকলোনি যাওয়ার শর্টকাট। তার মানে মানুষটা এলাকায় নতুন হলেও, পুরনো কারও আশ্রয়ে আছে, অনুসরণ করতে করতে কথাটা বলেছিল বলাইদা। লোকটা দুবার পিছন ফিরে দেখে নিয়েছিল, কেউ ফলো করছে কিনা। এতটাই দুরত্ব রেখে হাঁটছিলেন মৃগাঙ্করা, টের পায়নি।

রেলের ফেনসিং গলে লোকটা শেষমেশ যে-কোয়ার্টারে ঢুকল, বলাইদা, এমনকী মৃগাঙ্কও তাই দেখে থ। নিত্যানন্দ বণিক। রেলের ক্লার্ক। বলাইদার দেশের লোক। দেশভাগের পর বিভিন্ন ক্যাম্পে কাটিয়ে এই দুটো ফ্যামিলি এক সঙ্গে সমস্তিপুরে ঢোকে। স্বগোত্র না হলেও, দেশ ছেড়ে আসার বেদনায় দুই পরিবারের সম্পর্ক আত্মীয়র মতো। মাঝে কিছুদিন ওদের বাড়ি যাওয়া হয়নি বলাইদার, সেই ফাঁকে কারা এল?

মৃগাঙ্ক বলাইদা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায়। মৃগাঙ্ক বলেন, কী হল, চলো দেখি।—প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিলেন মৃগাঙ্ক।

বলাইদা হাত সামনে রেখে বাধা দেয়। বলে, এখন নয়। যদি বাইরের কোনও মেয়েমানুষ এসে থাকে, সন্ধেবেলা লুকিয়ে রাখবে। কাল দুপুরে এসে হঠাৎ হানা দেব। খাওয়াদাওয়ার সময়।

পরিকল্পনা মতো আজ দুপুরেই সে-বাড়িতে যাওয়ার কথা। মৃগাঙ্কর কিন্তু একটুও ইচ্ছে করছে না। সেই কারণেই সকাল সকাল কারখানার পাঁচিলের ওপারে যোগেনের কাছে তাড়ি খেতে যাওয়া। মালটা আজ এনেওছে চমৎকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেশা ধরে গেল। তারপর সেই যে জায়গা বদলে স্টোররুমের পিছনে এসে শুয়েছেন, রোদের ঠেলাঠেলিতেও তাঁকে ওঠানো যায়নি। এবার খুঁজক না বলাইদা।

মিলের ভোঁ অনেকক্ষণ থেমে গেছে। কানে এখনও স্কুল ছুটির ঘণ্টার রেশ রয়ে গেছে মৃগাঙ্কর। অবিনাশদার উঁচু ক্লাস, দেরিতে ছুটি হত। মৃগাঙ্ক অপেক্ষা করতেন। ক্লাস শেষে যখন বেরিয়ে আসত অবিনাশদা, ঠিক আলাদা করে নজর পড়ত। ওর শার্ট, ধুতি পরার ধরনই বিশেষ রকম। অবিনাশদার চোখ খুঁজত মৃগাঙ্ককে।

ছুটির পর ওঁরা যেতেন আমবাগানে। প্রায় এক মাইল লম্বা আমবাগান। পাশে রেললাইন। কোনও একটা গাছের তলায় গিয়ে বসতেন। অবিনাশদার বইখাতার ভাঁজ থেকে বেরোত একদিনের পুরনো যুগান্তর। তখনও মোকামা ব্রিজ হয়নি। ট্রেন গঙ্গার ওপারে হাতিদা' অবধি আসত। নৌকা পেরিয়ে মোকামা ঘাট। ফের ট্রেন। কলকাতায় বিপ্লবী আন্দোলনের খবর বিহারে আসত একদিন দেরিতে। এখনও মৃগাঙ্কর মনে আছে কাগজে বেরোল রাসবিহারী বসুর টোকিও থেকে দেওয়া বক্তৃতা। অবিনাশদা পড়ে শোনাচ্ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজের সূর্য প্রায় অস্ত যেতে বসেছে। তার আর আগেকার প্রভাব ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এর সঙ্গে আপনাদের ভাগ্য আর জড়াবেন না... আমবাগানের আড়ালে অস্তমিত সূর্যকে ব্রিটিশদেরই মনে হত তখন। আর অবিনাশদাকে রাসবিহারী। মৃগাঙ্ক তখন টের পাননি, অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও একটা করে স্বর্ণালি দিন নিভে যাচ্ছে।

ও, তুই এইখানে পড়ে আছিস! বলাইদার গলা। চোখের পাতা নেচে উঠেই স্থির হয়ে যায় মৃগাঙ্কর। বলাইদা ফের বলে, চল ওঠ, অনেক নকশা হয়েছে। গোটা মিল খুঁজে মরছি তোকে।

মৃগাঙ্ক শুয়ে শুয়েই টের পান বলাইদা একটা হাত ধরে টানছে। উপায় নেই, উঠতেই হবে।

সামনে হাঁটছে বলাইদা, পিছনে খুঁড়িয়ে অনিচ্ছুক চলনে মৃগাঙ্ক, মনে মনে হিসেব করছেন বলাইদা আর অবিনাশদার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? অবিনাশদা খুঁজত স্বাধীন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল দিন। বলাইদা খুঁজছে স্বাধীন ভারতের তথা সমস্তিপুরের অন্ধকার।—ওজনদার কথাটা ভেবে খামোকা হোঁচট খেলেন মৃগাঙ্ক। টের পেয়ে বলাইদা পিছন ফেরে। বলে, চোখ চেয়ে হাঁটছিস, না কি বুজে?

ম্লান হেসে মৃগাঙ্ক অনুসরণ করেন বলাইদাকে। সত্যি কী দিন এল সমস্তিপুরে! স্বাধীনতার পর কত কিছু সব হবে গল্প করত অবিনাশদা। গাঁধীজি, সুভাষচন্দ্রের ভাব হয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্রই হবেন দেশের অধিনায়ক। নেহরুরও চান্স আছে। এশিয়ার সব থেকে শক্তিশালী দেশ হব আমরা। কিন্তু কোথায় কী, দেশ স্বাধীন হল ঠিকই, এক ধাক্কায় অনেক টাকাপয়সাওলা লোক উধাও হয়ে গেল সমস্তিপুর থেকে। চারপাশে শুধু গরিব আর মাঝারি লোকের ভিড়। নতুন তেরঙা পতাকা ছাড়া সবই কেমন যেন পুরনো অন্ধকার মাখা। সরকারের কাছে নাকি টাকা নেই, অনেক টাকার দরকার। অবিনাশদা ও যেন কেমন পালটে যাচ্ছিল। খেলাধুলো ছেড়ে নাটক, কবিতা নিয়ে মাতল। যত সব শৌখিন ব্যাপার। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল অবিনাশদা, নেতাজি প্লেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যাননি। যে-কোনও একদিন এলেন বলে।

সুভাষচন্দ্র আজও এলেন না। অবিনাশদাও এক সময় কলকাতায় চলে গেল। কলকাতা নাকি অনেক ঝকঝকে তকতকে। বাঙালির পীঠস্থান। অবিনাশদা লিখেছিল চিঠিতে, সবাই যখন চারপাশে বাংলায় কথা বলে, শরীরে কেমন একটা হয় যেন মৃগাঙ্ক, তুইও চলে আয়, ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

যাওয়া হয়নি। ততদিনে চাকরি, স্বাধীনতার পেনশন পেয়ে মৃগাঙ্কও কিছুটা থিতু। তা ছাড়া অবিনাশদার মতো সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার জ্ঞান-বিদ্যে মৃগাঙ্কর নেই। এসব বাদ দিয়ে আর একটা খুব গোপনীয় কারণ আছে কলকাতা না যাওয়ার। সেটা হচ্ছে, কলকাতায় গেলে ওখানকার লোক তাঁকে খোঁড়ামানুষ বলেই জানবে। স্বাধীনতা আদায় করতে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেছেন, বললেও বিশ্বাস করবে না।

নিত্যানন্দ বণিকের কোয়ার্টারের সামনে এসেছেন দুজনে। হাঁটা পালটে বেড়াতে আসার ধরন এনে ফেলে বলাইদা। মৃগাঙ্ককে বলে, যা বলার, করার, আমি করব। তুই মাঝে কোনও কথা বলবি না। শুধু আমার পাশে পাশে থাকবি। দরকার মতো সায় দিবি আমার কথায়।

এ আর নতুন করে বলার কী আছে, ঘাড় হেলিয়ে বলাইদার সঙ্গে কোয়ার্টারের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান মৃগাঙ্ক।

কড়া নাড়তেই খুলে যায় দরজা। নিত্যানন্দ মানে নিতুদা সামনে দাঁড়িয়ে। বলাইদাকে দেখে ভীষণ অবাক। ওই অবাক ভাবের মধ্যে শঙ্কা খোঁজার চেষ্টা করেন মৃগাঙ্ক। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নিতুদা বলে, কী রে বলাই, এ সময় হঠাৎ?

বলাইদা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, রোজই ভুলে যাচ্ছি তোকে বলতে, পুজোর নাটকের জন্য এবার তো মিটিংয়ে বসতে হয়। কবে বসা যায় বল তো?

এর লগে তুমি বাড়ি চলে আইলা। রোজই তো দেখা হয় আড্ডায়।

নিতুদার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না আগমনের হেতু। এখন দেখা যাক বলাইদা আর কী কী মিথ্যে বলে। বলাইদা বেতের সোফায় গিয়ে বসেছে। মৃগাঙ্ক পাশটিতে বসেন। বলাইদা বলে, আমাদের একটু জল খাওয়া আগে। বেশ রোদ বাইরে। ভিতর বাড়ির উদ্দেশে গলা উচিয়ে জল দিতে বলে, নিতুদা ফের সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে বলাইদার দিকে। অতি স্বাভাবিক ভঙ্গি, চিলতে হাসি যোগে বলাইদা বলে, তোদের দুপুরের সব খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, ক্যান তোমরা খাইতা? কও তো অ্যাহনও...

হাত তুলে কথা থামিয়ে বলাইদা বলে, না-না। আমাদের জন্য নয়। আসলে তোর সঙ্গে বেশ কিছু আলোচনা আছে, সময় লাগবে। তাই ভাবলাম যদি না খেয়ে থাকিস....

কী কথা? ভ্রূ কুঁচকে জানতে চায় নিতুদা।

এবার দু ভ্রূর মাঝখানে স্পষ্ট শঙ্কা দেখতে পান মৃগাঙ্ক। বলাইদা চেয়ারে আরাম করে হেলান দেয়। বলে, এবারের পুজোতে একটু অন্য ধরনের নাটক করতে চাই আমি। নাটকটা আমি বেছে রেখেছি। মিটিংয়ের দিন তো অনেকেই নাটক নিয়ে আসবে। তুই আমার নাটকের হয়ে ভোট দিবি।

সে নয় ঠিক আছে। অ্যাহন কও তো নাটকের মইধ্যে কী এমন আছে যে অন্য রকম? নাটক এখানে ঢোকার পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে, বিলক্ষণ জানেন মৃগাঙ্ক। তিনিই একমাত্র দর্শক। নিতুদার কথায় মাঝেমধ্যে বাঙাল ভাষা উঠে আসাটা বেশ লাগে। বলাইদা বলছে, নাটকটার মধ্যে কমিউনিস্টদের হয়ে বেশ কিছু কথা বলা হয়েছে। এখানকার কংগ্রেসিদের সেটা পছন্দ হবে না। তুই নাটকের বিষয়টা আমার থেকে....

সদর দরজা খোলাই ছিল। কথার মাঝে যে ঢোকে, তাকে দেখে সবাই চুপ করে যায়। সেই তেঢ্যাঙা মানুষটা। কোটরাগত চোখের জন্য দৃষ্টিটা ভীষণ তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। মৃগাঙ্কদের দিকে তাকাতেই লোকটার মুখের ভাব বদলে যায়। ত্রস্ত ভীরু চাউনি। মৃগাঙ্কদের চিনতে পেরেছে লোকটা। তড়িঘড়ি পায়ে ঘরের মাঝখান দিয়ে ভেতরে চলে যায়।

নিতুদার উদ্দেশে বলাইদা বলে, কে? চিনলাম না তো।

আমার মাসতুতো ভাই। কলকাতায় থাকে, এসেছে। ব্যবসায় ফেল মেরেছে ওখানে।

দেখি এখানে রেলে কিছু করে দেওয়া যায় কি না।
ষাটে দেশ ছেড়েছে, নাকি সত্তরে?
বলাইদার এই প্রশ্নটায় গাঢ় সন্দেহ। উত্তর দিতে ইতস্তত করছে নিতুদা। ঢোঁক গিলে বলে, ষাটে, আমাদের সঙ্গেই এসেছে।
জল নয়, নিতুদার বউ শরবত নিয়ে ঢোকে। কথাটা তখনকার মতো চাপা পড়ে যায়। শরবত খেয়ে বলাইদা ফের নাটকের বিষয়টা বলতে শুরু করে। এমন ঝরঝর করে বলে যাচ্ছে, বোঝা যায়, সত্যিই ওরকম একটা নাটক জোগাড় করেছে। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে বলাইদা বলে, তোদের বাথরুমে একবার যাব। পেচ্ছাপ পেয়েছে।
চকিতে সন্ত্রস্ততার ছায়া পড়ে নিত্যানন্দদার মুখে। বলে, দাঁড়াও, দেখে আসি কলঘরে কেউ আছে কি না।
নিতুদা চলে যেতে বলাই মৃগাঙ্কর দিকে ফেরেন। বিশেষ ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, ঠিক জায়গায় এসেছি। মনে হয় মেয়ের মাকে লুকোতে গেল।
বাথরুম থেকে ঘুরে এসে নাটকের বাকি অংশটা খুব ছোট করে সেরে নেয় বলাইদা। মৃগাঙ্ককে নিয়ে বেরিয়ে আসে ও-বাড়ি থেকে। রেলকলোনির চওড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন দুজনে। বলাইদা চিন্তান্বিত। এখনও বলেনি নিতুদার বাড়ির ভেতর সন্দেহজনক কাউকে দেখেছে কিনা। না দেখে থাকে তো ভাল। তবু কৌতূহল একটু থেকেই যায়। বেশ খানিকক্ষণ পর মৃগাঙ্ক বলেন, কাউকে দেখলে, ভেতরঘরে?
নাঃ। ওই লোকটাও কোথায় যেন সেঁধিয়ে গেল। আমি কিন্তু গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি, লোকটা রিসেন্ট বর্ডার ডিঙিয়েছে।
তুমি কী করে এতটা শিওর হচ্ছ? জানতে চান মৃগাঙ্ক।
বলাই বলেন, সেটা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। আসলে আমরাও তো দেশ ছেড়ে এসেছি, কিছুদিন চেহারায় দেশ ছেড়ে আসার একটা ছাপ থাকে, যা ওই লোকটার মধ্যে আছে। ধীরে ধীরে আবার ধাতস্থ হয়ে যায়।
কিছুটা রাস্তা চুপচাপ হেঁটে যান দুজনে। পড়ন্ত দুপুরের উষ্ণতা যথেষ্ট। দুপাশে গাছ থাকার কারণে রাস্তা ছায়া ঢাকা। গরম অতটা অসহনীয় ঠেকছে না। মৃগাঙ্ক বলেন, লোকটা তার মানে একলাই এসেছে, পরিবার আনেনি।
কপাল কুঁচকে হাঁটতে হাঁটতে বলাইদা বলে, হুঁ। একটু সময় নিয়ে বলতে শুরু করে, আমি যত দূর জানি, বাংলাদেশের আত্মীয়দের সঙ্গে নিতুর ভালই যোগাযোগ আছে। তাদের মধ্যে একজনই শুধু ছিটকে সমস্তিপুর চলে এল! যেখানে দলে দলে লোক ঢুকছে কলকাতায়। এর পিছনে রহস্য আছে।
কী রহস্য? জানতে চান মৃগাঙ্ক।
সেটাই তো ভেদ করতে পারছি না। বাড়ির ভেতরে ভাল করে নজর করলাম, কোনও স্যুটকেস, অচেনা শাড়ি, কাপড় কিছু না। বাইরের কারও উপস্থিতি টের পাওয়ার উপায় নেই।
আরও কিছুটা পথ নীরব থাকলেন দুজনে। এক সময় একটু যেন দ্বিধা, সংশয়যোগে মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করেন, তা হলে মেয়েটার সঙ্গে ওই লোকটার কোনও যোগসূত্র নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলাই বলেন, আপাতত তাই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু মেয়েটা এল কোথা থেকে?
আবার চিন্তায় ডুবে যান বলাই। মৃগাঙ্ক মনে মনে বলেন, আমি আর খোঁজাখুঁজিতে নেই। এবার তুমি একলা খুঁজে মর। প্রায় এক সপ্তাহের ওপর হতে চলল যমুনা গোরক্ষপুরে গেছে। কোনও খবর নেওয়া হয়নি। গীতারা মেয়েটাকে কীভাবে গ্রহণ করল, কিছুই জানা যাচ্ছে না। যদিও মৃগাঙ্ক বড়শালির ওপর ভরসা করেন খুব। শালিপতি তপন মানুষ খারাপ নয়। আশা করা যায় যমুনা, মেয়েটা ওখানে যত্নেই আছে। মৃগাঙ্ক ঠিক করেন, পারলে কালই একবার যাবেন গোরক্ষপুরে। রাস্তার ধার ধরে পাশাপাশি হাঁটতে থাকা বলাইদার মুখের দিকে তাকান

মৃগাঙ্ক, বেচারা সত্যিই খুব ভেঙে পড়েছে। মেয়ের আসল ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেল না।

চলতে চলতে বলাইদা হঠাৎ বলতে শুরু করে, জানিস মৃগাঙ্ক, ১৪ আগস্ট পাকিস্তান যেদিন স্বাধীন হয়, আমাদের স্কুলে মানে কুমিল্লার হাইস্কুল মাঠে ফ্ল্যাগ তোলা হবে। সকাল সকাল সবাই চলে গেছি মাঠে। খুব হইচই উত্তেজনা। হঠাৎ খেয়াল হল যিনি পতাকা উত্তোলন করবেন, আমাদের হেডমাস্টারমশাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ এসে পৌঁছননি। খোঁজ খোঁজ। ওঁর বাড়িতে, স্কুলে কোথাও পাওয়া গেল না। কোনও খবর দিতে' পারছে না কেউ। বিষ্ণুবাবুর বাড়ির লোকেরাও না। কোথায় চলে গেল মানুষটা। কী আর করা যায়, সবাই ধরল অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার আনিসুর মল্লিককে, স্যার, আপনিই ফ্ল্যাগ তুলে দিন। হেডস্যারকে পরে ঠিক খুঁজে বার করা যাবে। —আসলে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল ছাত্ররা। আশপাশের পাড়া, ক্লাব থেকে ফ্ল্যাগ উঠে যাওয়ার হর্ষধ্বনি, বাজি, পটকার আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমরা মনে করছিলাম, শুধুমাত্র আমাদের স্কুলের স্বাধীনতা বুঝি পিছিয়ে যাচ্ছে।

বলাইদার কথা কেটে মৃগাঙ্ক বলেন, পতাকা তোলার সময় তোমরা কী বলে জয়ধ্বনি দিতে?

—নারা-এ তকদীর-আল্লাহ-আকবর। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কায়দ-এ আজম জিন্দাবাদ। মুহুর্মুহু রব উঠছিল চারপাশে। আনিসুর স্যার গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন চেয়ারে। কোনও তাপউত্তাপ নেই। পতাকা তিনি কিছুতেই তুলবেন না। এতটাই শ্রদ্ধা ছিল হেডস্যারের ওপর। বাকি শিক্ষকরা বুঝিয়ে ক্লান্ত, এমন সময় দপ্তরি হাসানদা ভয়ে ভয়ে এসে খবর দিল, সকাল থেইকা হেডস্যার আমার ঘরে শুইয়া আছেন। কাউরে কইতে মানা করছিলেন। অহন যা পরিস্থিতি বুঝছি...

হাসানদার কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, সবাই ছুটল হেডস্যারকে নিয়ে আসতে। আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে। স্কুলবাড়ি লাগোয়া ছোট্ট ঘরে থাকত হাসানদা। গিয়ে দেখি হেডস্যার সত্যিই শুয়ে আছেন হাসানদার চিলতে খাটে। কনুই ভাঁজ করে কপালের ওপর ফেলা, চোখ চেয়ে আছেন। অদ্ভুত শূন্য চাউনি। আমাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুচরণ ঘোষকে চেনাই যাচ্ছিল না।

ছাত্রদের অনুনয়-বিনয়ে অবশেষে উঠে এলেন। থমথমে নির্লিপ্ত ভঙ্গি। ফ্ল্যাগ তোলা হল। আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল সবাই। আমরা চার বন্ধু, যার মধ্যে দুজন ছিল মুসলমান। হেডস্যারকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছিলাম। শহিদুল ছিল আমাদের মধ্যে সাহসী, গলাটলা ঝেড়ে হেডস্যারকে জিজ্ঞেস করেই বসল, স্যার আপনের কী হইছে, ক্যান আইতাছিলেন না ফ্ল্যাগ উঠাবার লগে?

হেরে যাওয়া মানুষের মতো হেঁটে যাচ্ছিলেন বিষ্ণুচরণ ঘোষ। শহিদুলের কথা শুনে, ওর কাঁধে হাত রাখলেন, ঘৃণাভরা কণ্ঠে বললেন, কাটা পড়া দ্যাশের মাইনষের এত স্ফুর্তি কীসের বুঝি না। বড় ভয়ানক স্বাধীনতা পাইলাম আমরা। অরা শুধু দ্যাশ কাটে নাই, ধর্ম ঐক্য কাটছে, কাটা পড়ল মাইনষের শিক্ষিত মন। বড় হও বুঝবা।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে শুনছেন বলাইদার কথা। মানুষটার মনে কত স্পষ্ট হয়ে আছে পূর্ব পাকিস্তানের স্মৃতি। এর পরে ভারত পাকিস্তান-যুদ্ধ, তখন সমস্তিপুরের আকাশেও উড়ে আসত বিমান। বড় বড় দেশের চোখরাঙানি তোয়াক্কা না করে ইন্দিরা গাঁধীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য, মুজিবর রহমান, তারপর স্বাধীন বাংলাদেশ।কিছুই যেন খেয়াল নেই বলাইদার। মৃগাঙ্ক একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন না, কোন প্রসঙ্গে এত কথা বলছে বলাইদা? মৃগাঙ্কর এসব শুনে কী লাভ! বলাইদা ফের বলতে শুরু করে, বুঝলি মৃগাঙ্ক, এখন সত্যিই বুঝতে পারছি, আমাদের হেডস্যার বিষ্ণুবাবুর আশঙ্কা, অনুমান কতটা সঠিক ছিল। কর্তন আজও চলছে। ধর্ম নিয়ে কাটাকাটি। আজও শরণার্থী হয়ে চলেছে দুদেশের মানুষ। আসলে কী জানিস মৃগাঙ্ক...

বলাইদার কথা চাপা পড়ে যায় জিপগাড়ির আওয়াজে। পরপর চারটে জিপ সামনে থেকে এসে ক্রস করে গেল। প্রচুর ধুলো উড়ছে। হাত নেড়ে ধুলো সরিয়ে মৃগাঙ্ক বলেন, পুলিশের

জিপ।

বলাই সেনগুপ্ত পিছন ঘুরে তাকিয়ে থাকেন জিপগুলোর দিকে। মৃগাঙ্কর উদ্দেশে বলেন, পুলিশ বোধহয় না, মিলিটারি মনে হচ্ছে। যা দৌড়চ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে!

কেন মিলিটারি আসতে যাবে হঠাৎ? জানতে চান মৃগাঙ্ক।

ঠোঁট উলটে বলাই বলেন, সেটাই তো ভাবছি! গাড়িগুলো ঠিকমতো ঠাহর করা হল না। হয়তো পুলিশই আজকাল মিলিটারির মতো হয়ে গেছে।

॥ পাঁচ ॥

হাওড়া স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টারের লাইন বড় শম্বুকগতিতে এগোচ্ছে। অবিনাশ এসে দাঁড়িয়েছিলেন নজনের পেছনে, গত আধ ঘণ্টায় কমেছে মাত্র তিনজন। ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে অবিনাশের। বগলে অফিসের ফোলিও ব্যাগ ছাড়াও, দু কাঁধে দুটো ঝোলা, একটা প্যাকিং বাক্স। বাক্সে আছে বড়দার জন্য হোমিওপ্যাথি ওষুধ। ঝোলা দুটোয় সমস্তিপুরের বাড়ি, অন্যান্য পরিজনের জন্য টুকটাক জিনিস। মূলত মুদিখানার মাল। মটর ডাল, তেজপাতা, রাঁধুনি, গুড়ের বাতাসা, মুড়কি। শীতকাল হলে কিনতেন পাটালি গুড়। এসব ওখানে ভাল পাওয়া যায় না। কাপড়-জামা, আলতা-সিঁদুর কিনে রাখবে ইলা। আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কেনাকাটা করেছেন, এখন দেখা যাক কোনদিনের রিজার্ভেশন পাওয়া যায়। তারপর ছুটির অ্যাপলিকেশন করবেন। ছুটি জমা হয়েছে অনেক। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে বলে রেখেছেন ছুটির কথা। অফিসে অবিনাশ কাজের মানুষ। হুটহাট ডুব দেন না। ছুটি চাইলে পাওয়া যায়। সমস্তিপুরে যাওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি মোটামুটি নেওয়া হয়ে গেছে। একলাই যাবেন। ওখানকার কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে খুব। দাদা প্রতিবার লিস্ট পাঠানোর পর ওষুধ নিয়ে যান অথবা পাঠিয়ে দেন অবিনাশ। এবার পুরনো লিস্ট ধরেই ওষুধ কিনেছেন। আজ না হয় কাল তো লাগবেই।

সব কাজ গুছিয়ে, সময়মতো করার পরও কেন যে রিজার্ভেশন লাইনে দাঁড়িয়ে এত বিরক্ত লাগছে বুঝতে পারছেন না। লাইন এমন কিছু লম্বা নয়, এগোচ্ছে বড্ড স্লো। এরকমই অবশ্য হওয়ার কথা, অনেক লেখাজোখার ব্যাপার থাকে। লাইনে দু-চারজন দেহাতি মানুষ, তারা বেচারা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। অবিনাশের মনে পড়ছে কী অনায়াসে সমস্তিপুরে টিকিট রিজার্ভ করতেন। নারায়ণ ঝা ছিলেন বুকিং ক্লার্ক, বাবার সঙ্গে খুব ভাল আলাপ ছিল, শ্রদ্ধা করতেন বাবাকে। সেই সুত্রে উকিলবাবুর ছেলেদের স্নেহ করতেন, রিজার্ভেশন কাউন্টারে হয়তো লম্বা লাইন, অবিনাশ অফিসঘরের পেছন দিয়ে ঢুকে ঝা-জির কাছে পৌঁছে যেতেন, চাচা, হামারা জারা চারঠো হাওড়া রিজার্ভ করা দিজিয়ে না।

ঝা-জি তক্ষুনি রাজি, ঠিক হ্যায়, তুম রখ যাও স্লিপ, হো যায়গা। .... তারপরই হয়তো বললেন, ভাইয়া সাম কো চেম্বার মে রহে গা তো? হাম যায়েঙ্গে। তুম জারা বোল কে রাখনা। টিকট ওহি দে দুঙ্গা।

অর্থাৎ দাদার কাছে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করাবেন। এই করেই অবশ্য দাদার পসারটা বাড়ল না। এত চেনাজানা সমস্তিপুরে। ... লাইন আর একটু কমেছে। ওষুধের পেটিটা নিজের পাশে মেঝেতে রাখা ছিল। তুলে নিয়ে এগোন, আবার পাশে রাখেন।

এত কটা ব্যাগ-ঝোলা নিয়ে বেশ নাজেহাল হতে হচ্ছে। এই জন্যেই কি আসছে বিরক্তি? তা কিন্তু হওয়ার নয়। বছরে এক-দুবার সপরিবারে সমস্তিপুর, দেওঘর, অথবা ভাগলপুর যান তিনি। ইলা প্রচুর লাগেজ করে। অনায়াসে সেসব সামলান অবিনাশ। দুরে দেশের বাড়ি হলে মানুষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট পটু হয়। ভাবনা হোঁচট খেল। পাঁচছজন লোক এসে লাইনে দাঁড়ানো লোকেদের কী একটা কুপন কিনতে অনুরোধ করছে। অবিনাশের কাছে এল বলে। কুপন ছাড়াও লোকগুলোর হাতে সাদা কাগজ সাঁটা কৌটো। কৌটোর মাথায় ফুটো, পয়সা ফেলার। বোঝা যাচ্ছে কোনও সেবাসংস্থার লোক এরা। কুপনগুলো নির্দিষ্ট টাকার ছাপ মারা। তার থেকেও যারা কম দান করতে চায়, তাদের জন্য কৌটো। পশ্চিমবঙ্গে কৌটো নাড়ানোর চল বহুল। এই নিয়ে অফিসে হাসিঠাট্টা হয়। পাঁচ-ছজন কলিগ পাঁড় সিপিএম, ওরাই ঠাট্টার লক্ষ্যবস্তু। তবে এরা যারা কৌটো ঝাঁকাচ্ছে, সম্ভবত কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠান। এদের লিডার একজন সন্ন্যাসী, একটু দূরে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ চেহারায় বেশ সম্ভ্রান্ত ভাব আছে। গেরুয়া পরেননি। সাদা ফতুয়া। ধুতি লুঙ্গির মতো পরা। পায়ে হাওয়াই চটি। আর একটা ব্যাপার বিশেষ করে দেখার, লম্বা সাদা চুল-দাড়ি পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মোটামুটি ফরসা

মানুষটার মুখে প্রশান্তির সঙ্গে মিশে আছে জ্ঞানের প্রলেপ। খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। খুব সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবেন। অন্য দিন হলে অবিনাশও হয়তো আবিষ্ট হতেন। আজ হলেন না। তাঁর কেন জানি মনে হল, লোকটা নিজের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো মেজেঘষে, কিছু শিষ্য জোগাড় করে, প্রতিষ্ঠানের নামে নিজের সেবা করে চলেছেন। কৌটোর মধ্যে পয়সা ঝাঁকানোর আওয়াজে সংবিৎ ফেরে, অবিনাশ দেখেন, তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক সেবক। মধ্যবয়স্ক, সংসারে জড়িয়ে থাকা চোখমুখ। দৃষ্টিতে শ্লাঘা সেবা করছেন এই বোধে। ভদ্রলোক বললেন, দাদা, কাইন্ডলি যদি কিছু হেল্প করেন। আমরা একটা চোখের হাসপাতাল খুলেছি...। আপনি কুপনও কাটতে পারেন। এক থেকে পাঁচ টাকা অবধি আছে। কৌটোতে দিতে পারেন দান।

কৌটোটা ভাল করে দেখেন অবিনাশ। সাদার ওপর নীল রঙের ছাপা পোস্টারে মোড়া। বেশ কিছু অক্ষর চাপা পড়ে গেছে, জেগে আছে একটা বাচ্চার মুখ। চোখ খোলা, মণি নেই। কী মর্মান্তিক ছবি! মানুষের দুর্বল অনুভূতিতে আঘাত করে এরা চাঁদা চাইছে। এটা কি এক ধরনের নিষ্ঠুরতা নয়! অবিনাশ লোকটির চোখে চোখ রেখে বলেন, সরি, আমি দিতে পারছি না।

মানুষটা একটু যেন অবাক হন। এতক্ষণ দেহাতিরাও তাঁদের দান করেছে, সভ্য, শিক্ষিত চেহারার লোকটা এক কথায় 'না করে দিল! সেবক আরও কী যেন অবিনাশকে বোঝাতে যাচ্ছিলেন। অবিনাশ ফের বলেন, আমাকে মাফ করবেন।

সেবক পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে অনুরোধ করে। অবিনাশ ‘না’ করাতে পেছনের লোকটি অনুপ্রাণিত হয়েছে। সেও 'সরি' বলে। অবিনাশ প্রমাদ গোনেন, তা হলে কি এরপর থেকে সবাই 'না' করে দেবে? আড়চোখে পেছনের দিকে তাকান অবিনাশ, লাইন দীর্ঘ হয়েছে।

আপসোস হয়। কী এমন ক্ষতি হত দু-চার টাকা দিলে। মনটা কেন এমন সব কিছুতেই নেগেটিভ হয়ে আছে কে জানে! একা একা দেশের বাড়ি যাবেন বলে? প্রতিবারই ইলা, দুই ছেলের টিকিট রিজার্ভ করেন। কিন্তু একা যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর নিজেরই। মনটা বড় টানছিল। ইলার ততটা নয়। সেটাই স্বাভাবিক। ও তো সমস্তিপুরে বড় হয়নি। —চকিতে অবিনাশের খেয়াল পড়ে মেজাজ বিগড়ানোর আসল কারণ। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অফিস থেকে বেরনোর সময়। ম্যানেজারের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরনোর পারমিশন নিয়ে বাইরে এসেছেন অবিনাশ, সরকারদা হাঁক দেয়, এই চ্যাটার্জি, একবার এসো না, কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

সরকারদা এই রিকোয়েস্টটা প্রায়ই করে, লম্বা যোগ দেখলেই নার্ভাস হয়ে যায়। অবিনাশ বহুবার সরকারদার লেজার এন্ট্রি করে দিয়েছেন। লম্বা যোগের ব্যাপারে ব্রাঞ্চএ তাঁর সুনাম আছে। আজ হাতে সময় ছিল না। অবিনাশ বলেছিলেন, আমি একটু বেরোচ্ছি সরকারদা, জরুরি কাজ আছে।

কী কাজ বাবা, দশ-পনেরো মিনিট থেকে গেলে হত না? সরকারদার টেবিলের কাছে গিয়ে অবিনাশ বলেন, সমস্তিপুর যাব। টিকিট রিজার্ভ করতে হবে। এ ছাড়াও কিছু কেনাকাটা আছে।

চাপা বিরক্তি নিয়ে সরকারদা বলে, কী যে খালি দেশের বাড়ি দেশের বাড়ি করো। তা হলে বদলি নিয়ে এলে কেন এখানে!

কথাটা বলে লেজারে মুখ গুঁজেছিল সরকারদা। মন্তব্যটা পিন হয়ে ফুটে রইল অবিনাশের গায়ে। ডালহৌসিতে নিজের ব্রাঞ্চ থেকে বেরিয়ে উনি প্রথমে যান শিয়ালদায় হ্যানিমান-এর দোকানে। দাদার জন্য ওষুধ কেনেন। বাসে চেপে মহাত্মা গাঁধী রোড ধরে বড়বাজার। মাথায় ঘুরতে থাকে সরকারদার কমেন্টটা, কেন এলে বদলি নিয়ে? যেন বলতে চাইল, কেন ভিড় বাড়ালে পশ্চিমবঙ্গে?

সরকারদা জানে না, এই কলকাতার বুকে অবিনাশের বড় ঠাকুর্দার নামে রাস্তা আছে।

রাস্তা বললে বাড়াবাড়ি হবে, গলি বলাই ভাল। বউবাজারের কাছে পি বি সরণি। পুলিনবিহারি সরণি। তবু তো আছে। একথা তিনি আগ বাড়িয়ে কাউকে বলতে যান না। শালীনতা নষ্ট হয়।

সরকারদার মতো ঘটিরা বাঙালদের, বিহারিদের উদ্দেশে একই কথা বলে, বহিরাগত ভাবে। এখানকার পুরনো বাসিন্দারা অবিনাশ সম্বন্ধেও একই ধারণা পোষণ করে?

মন জুড়ে একটা তেতো ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। বাজার করতে করতে কখন যেন বিস্মৃত হন সরকারদার কথা। মনটা বিগড়েই থাকে।

লাইনে একজন কমল। এগোলেন অবিনাশ। ভাবনার মাঝে এই নিয়ে তিনবার। প্রতিবারই ওষুধের পেটিটা তুলে পাশে রাখছেন। এলোমেলো হয়ে পড়ছে হাতের ব্যাগ, কাঁধ-ঝোলা। হঠাৎ কানের পাশে স্নেহময় কণ্ঠ, বাবা, মালপত্তরগুলো তুমি আমার কাছে রাখতে পারো। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।

সন্ন্যাসীপ্রতিম মানুষটি অবিনাশের কাছে এসে বললেন কথাটা। অবিনাশ অপ্রস্তুত হন। বলেন, না না, ঠিক আছে। অসুবিধে হচ্ছে না।

বেশ অসুবিধে হচ্ছে। আমি সেই থেকে লক্ষ করছি তোমাকে। বলে, একটু থামলেন মানুষটি। ফের বললেন, তুমি একটা ভুল করেছ, লাইনে দাড়ানোর আগে যদি জিনিসগুলো কাউন্টারের নীচে রাখতে, নজরে থাকত। নিজের চোখকে ব্যবহার করতে পারোনি। ঝামেলা বয়ে নিয়ে চলেছ।

অবিনাশ থতমত খেয়ে গেছেন, সন্ন্যাসী টাইপের লোকটি ঠিক কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছেন না। ভদ্রলোক আবার বলেন, স্পর্শ দিয়ে তোমার জিনিসের অধিকার বোধ করছ। চোখের ওপর ভরসা রাখতে পারছ না। ইন্দ্রিয়র সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না এখানে। তাতে আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি পড়ে। ইন্দ্রিয়গুলির মর্যাদা দেওয়া হয় না।

অবিনাশ রীতিমতো নাজেহাল অবস্থায়। ভদ্রলোক অদৃশ্য এলোপাথাড়ি চড়চাপড় চালাচ্ছেন। কেন তাঁর এই আক্রোশ! কারণ খুঁজতে যাওয়ার আগেই ভদ্রলোক ফের শুরু করলেন, তুমি এখনও পার জিনিসগুলো কাউন্টারের নীচে রেখে আসতে, আমার কাছেও রাখতে পার, যদি বিশ্বাস হয়। আমি এখন পালাচ্ছি না, আমার শিষ্যরা চাঁদা সংগ্রহ করছে।

এবার যেন অবিনাশ আন্দাজ করতে পারছেন, সন্ন্যাসীর কেন এত রাগ, অবিনাশ চাঁদা দেননি, দেখাদেখি অনেকেই দেয়নি।

সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে 'বুঝতে পেরেছি' টাইপের হাসি হাসেন অবিনাশ। সন্ন্যাসীর মুখে কিন্তু আক্রোশের ছায়া মাত্র নেই। মৃদু হাসছেন। খ্যাপাটে হাসি। কাছে এসেছেন বলে বোঝা যাচ্ছে, যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সত্তরের ওপর। এই প্রৌঢ়কে কী বলবেন অবিনাশ। ওঁর কথার একমাত্র উত্তর যেটা হয় সেটাই করলেন অবিনাশ, ব্যাগপত্তর, ওষুধের পেটি ওঁকে দিতে দিতে বললেন, ঠিক আছে, আপনার কাছে রাখুন, আমি টিকিট কেটে ফেরত নিচ্ছি।

দীর্ঘদেহী মানুষটা ঝুঁকে ওষুধের পেটিটা তুললেন, অবিনাশের থেকে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে ঝোলালেন কাঁধে। তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন আগের জায়গায়। অবিনাশ ঠিক করে নিলেন, টিকিট না কাটা পর্যন্ত সন্ন্যাসীর দিকে তাকাবেন না।

লাইনে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর কথাগুলো উলটে পালটে ভাবছিলেন অবিনাশ। সিচুয়েশন থেকে আলাদা করে এনে কথাগুলো নিরপেক্ষভাবে ভাবলে, গভীর দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অথচ কথাগুলো মোটেই 'বাণী' টাইপের শোনাচ্ছিল না। মানুষটার প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হচ্ছে অবিনাশের মনে।

মিথিলা এক্সপ্রেসে পরশুর রিজার্ভেশন পেলেন অবিনাশ। কাউন্টারের সামনে থেকে সরে এসে দেখলেন, সন্ন্যাসী একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন সে খেয়াল যেন চোখেমুখে নেই। অবিনাশ সামনে যান।

এই তো বাবা, এসে পড়েছ। পেয়েছ টিকিট? নিকটাত্মীয়র মতো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চান প্রৌঢ়। কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে ঘাড় হেলান অবিনাশ। মালপত্তর সন্ন্যাসীর থেকে ফেরত নিয়ে বলেন, আপনাদের একটা কুপন কাটব আমি।

ও, তুমি বুঝি কাটোনি। দাঁড়াও, আমার কাছে আছে। বলে, সন্ন্যাসী কাপড়ের কাঁধব্যাগ থেকে বেশ কটা কুপনের বান্ডিল বার করলেন। জানতে চাইলেন, কত টাকার দেব?

পাঁচ টাকার দিন, একটা। বলেন অবিনাশ। কুপন ছিঁড়তে ছিঁড়তে সন্ন্যাসী আন্তরিক গলায় জানতে চান, দেশের বাড়ি যাবে বুঝি? ডাক্তারি কে করেন, বাবা? হোমিওপ্যাথি ওষুধের পেটি দেখছি।

না, দাদা। টাকা দিয়ে কুপনটা নেন অবিনাশ। কুপনে একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে রাখেন। সন্ন্যাসী বলেন, আমার আশ্রম বাঁকুড়ার সোনামুখীতে। আশ্রম লাগোয়া সামান্য ব্যবস্থার চোখের হাসপাতাল। একটু বড় করে করার চেষ্টা করছি। গ্রামের মানুষের চিকিৎসা হবে প্রায় বিনা পয়সায়।

কথার মাঝে অবিনাশ বলেন, ভাল চোখের হাসপাতাল মানে তো বিশাল টাকার ব্যাপার। এভাবে চাঁদা তুলে কি পারবেন আধুনিক করতে!

প্রথমে ছোট করেই শুরু করব। এই ধর, ভাল মতো অপারেশন থিয়েটার। বিনা পয়সায় চশমা দেওয়া। তারপর তোমাদের শুশ্রূষা পেলে গাছ একদিন নিশ্চয়ই বড় হবে। আমার কাজ শুধু গাছটা রোপণ করা। একটু থামলেন সন্ন্যাসী। তারপব বললেন, কুপনে ঠিকানা দেওয়া আছে। যদি কখনও ওদিকে যাও, একবার এসো না আশ্রমে। এই যে তুমি টাকাটা দিলে, তুমিও হয়ে গেলে হাসপাতালের ভাল-মন্দের অংশীদার।

সম্মোহন করার স্বাভাবিক একটা ক্ষমতা যে সন্ন্যাসীর আছে, টের পাচ্ছেন অবিনাশ। এঁর কাছে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। সম্মোহিত হওয়া তো এক ধরনের অক্ষমতা। ঘোর কাটিয়ে অবিনাশ অনুমতি চান, আমি তাহলে আসি?

হ্যাঁ, বাবা এসো। তুমি এদিকে থাকো কোথায়?

এই তো তিনটে স্টেশন পর দেবপাড়া।

দেশের বাড়ি?

সমস্তিপুর।

ভাল, ভাল। সাবধানে যেয়ো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সন্ন্যাসীর থেকে বিদায় নিয়ে লোকাল ট্রেন ধরতে এগিয়ে যান অবিনাশ। কানে লেগে থাকে সুললিত আশীর্বাদী কণ্ঠ।

ট্রেনে বসেও সন্ন্যাসীর ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছিলেন না অবিনাশ। মানুষটা বেশ অদ্ভুত ধরনের। প্রথমে ভর্ৎসনা করলেন। কারণ হিসেবে অবিনাশ ধরে নেন, চাঁদা না দেওয়াটা উনি লক্ষ করেছেন। পরে কুপন চাইতে জানা গেল, আগের ঘটনাটা তিনি খেয়ালই করেননি। যদি না অবশ্য অভিনয় হয়ে থাকে। পরে যে ব্যবহারটা উনি করলেন, পিতৃস্নেহ মেশানো ছিল। বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অবিনাশের। যদিও বাবা কখনওই এত স্নেহ মাখিয়ে কথা বলতেন না। সব সময় কর্তৃত্ব করার ভূমিকায় থাকতেন। এটা একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বাবার অন্তরে সন্তানবৎসল এক পিতা যে ছিল, অবিনাশরা পাঁচ ভাইবোন বহুবারই সেটা টের পেয়েছেন। তিন বছর হল গত হয়েছেন বাবা। ইদানীং সমস্তিপুরে গেলে বাবার অনুপস্থিতিটা বড় বেশি টের পান অবিনাশ। মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল বাবার। কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর কিন্তু পালটায়নি। সমস্তিপুরের গোটা বাড়িটায় সেই সুরের এখন বড় অভাব।

লিলুয়ায় থেমে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। ভিড় বেড়েছে কামরায়। ট্রেনের বাইরে সন্ধে নামছে। এই ভিড়, প্রাত্যহিকতায় সন্ন্যাসীর ভর্ৎসনা হয়তো ভুলেই যাবেন অবিনাশ। সেই আশঙ্কায় কথাগুলো ফের একবার মনে করার চেষ্টা করেন, উনি বলেছিলেন ইন্দ্রিয়গুলোর সঠিক প্রয়োগ করছেন না অবিনাশ। মর্যাদা দিচ্ছেন না ইন্দ্রিয়সমূহকে। তাতেই আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি।

পরোক্ষে সন্ন্যাসী কি অবিনাশকে পঙ্গু প্রতিপন্ন করলেন?

ভাবনাটা মনকে খানিক অস্থির করে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায় মৃগাঙ্কর কথা। খোঁড়া

ছেলেটা তো কম সাহসের কাজ করেনি, রাস্তায় পড়ে থাকা শিশু কুড়িয়ে নিয়েছে। মানুষ করবে। মৃগাঙ্ককে কি আর পঙ্গু বলা যায়? কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ এই প্রথম লক্ষ করলেন, মৃগাঙ্কর জন্য তাঁর যে অনুশোচনা বা বলা ভাল অপরাধবোধ এতদিন বুকে চেপে বসেছিল, সেটা সরে গিয়ে ধীরে ধীরে ঈর্ষা জন্ম নিচ্ছে। আরও দুটো স্টেশন পার হয়ে গেল। সজাগ হন অবিনাশ। এরপর ছোট্ট ব্রিজ। গঙ্গার খালের ওপর। ঝমঝম আওয়াজ হলেই দেবপাড়ার ঢুলে পড়া প্যাসেঞ্জার জেগে ওঠে, চেতনার গভীরে টের পায় 'বাড়ি এসে গেছে।' অবিনাশ ভুলেও ঘুমকে প্রশ্রয় দেন না, এখনও দেবপাড়া তাঁর নিজের হয়নি।

ট্রেন থামল স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মের গাছে পাখিদের হাট। মালপত্তর নিয়ে বেসামাল অবিনাশ তাড়াহুড়ো করে নেমে এলেন। এখানকার লোকাল ট্রেনের আধ মিনিটের স্টপেজ আজও ঠিক অভ্যেস হল না। বিহারে গাড়ি ছাড়ার আগে আড়মোড়া ভাঙে, দু-তিনবার হুইসল দেয়। মনে হয় সত্যিই কোথাও যাচ্ছি। এখানে মন পড়ে থাকে, দেহ নিয়ে চলে যায় ট্রেন। ইলেকট্রিক ট্রেনের যান্ত্রিকতা মানুষের আচরণেও প্রভাব ফেলে। অভিব্যক্তিহীন, কলের পুতুলের মতো মানুষের সংখ্যা চারপাশে বেশি। তবে দেবপাড়ার ভূগোলটা বেশ পছন্দ হয় অবিনাশের। প্ল্যাটফর্মের একপাশে গ্রাম, অন্যদিকে শহর। খুব একটা বিস্তৃতি নেই শহরের। হুগলি নদী সীমানা টেনে দিয়েছে।

শহর জুড়ে নদীর হাওয়া বয়। সন্ধেবেলা মানুষের ভিড় হয় ঘাটে। তেমন বড়সড় কারখানা নেই। আর পাঁচটা মফস্বলের তুলনায় শান্ত, বাসযোগ্য এলাকা।

অথচ মাত্র দুশো বছর আগেও এ-অঞ্চলে কোনও বসতি ছিল না। বালি মেশানো মাটি, চাষের অনুপযুক্ত। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি করতেন চন্দননগরের ফিরিঙ্গিদের খাজাঞ্চিখানায়। মনে বাসনা ছিল জমিদার হওয়ার। সামান্য সঞ্চয় দিয়ে কিনে নিলেন এই শুখা, হাজা মহাল। তারপরই প্রকাশ হল তাঁর চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য, দূর দূর গ্রাম থেকে ভূমিহীন কৃষক এনে বাস্তু ও চাষের জমি দিলেন বিনা পয়সায়। বিদেশ থেকে কৃষি সংক্রান্ত বই আনিয়ে পড়াশোনা করলেন। ক্রমশ সবুজ হতে থাকল দেবপাড়া।

বেশ কটা বড় বড় বাড়ি করলেন, কোনওটা হাসপাতাল, লাইব্রেরি, সরাইখানা। ভাল লেখাপড়া জানার সুবাদে কলকাতার জ্ঞানী-গুণিজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হল। কে না এসেছেন এই দেবপাড়ায়, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ আরও অনেকে। বিদ্বজ্জনের সঙ্গে মেলামেশার কারণে ইংরেজ সরকারের প্রতি তৈরি হল অনীহা। একবার ইংরেজ সৈন্যরা তাদের চলাচলের পথে অনেক জমিদার বাড়ির মতো রামজীবনের সরাইখানায় যাত্রাবিরতি করেছিল। সৈন্যরা নিজেদের রসদ জোগাড় করত জমিদারদের ঘাড় ভেঙে নানান উচ্ছৃঙ্খল আচরণও করত। এ ব্যাপারে রামজীবন প্রথম প্রতিবাদ করেন। কয়েকজন জমিদারকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজ সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেন। কাজও হয়।

রামজীবনের কিছু বিশ্বাস খুব আকর্ষণীয় লাগে অবিনাশের। ভদ্রলোক শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কখনওই চোখ ঢাকতে কালো চশমা ব্যবহার করতেন না। এর পেছনে ওঁর যুক্তি ছিল, অন্ধ মানুষের চশমা পরা, অপব্যয়।

ব্যক্তিবিশেষে দান করতেন না। বলতেন, দান করা মানে ভিক্ষার সামিল। সক্ষমকে অক্ষম করে তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত পরগাছায় পরিণত হয় ব্যক্তিটি।

দেবপাড়ার বেশ কয়েকটা জায়গায় রামজীবনের মর্মরমূর্তি আছে, অন্ধ, চশমা ছাড়া। মূর্তির সামনে গেছেন অবিনাশ। এক ধরনের রোমাঞ্চ হয়, ভদ্রলোক জানলেন না ওঁর রচিত ভবিষ্যতে অবিনাশও সামিল হয়েছেন।

কাকাবাবু, আমাকে একটা-দুটো জিনিস দিন না, আপনার অসুবিধে হচ্ছে।

অচেনা কণ্ঠে সংবিৎ ফেরে অবিনাশের। কখন যেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে রেললাইন ডিঙিয়ে চলে এসেছেন রাস্তায়। পাশে বিনয়ী যুবকটির মুখ চেনা চেনা লাগে। বলেন, না না, ঠিক আছে। আমার কোনও ....

ছেলেটি প্রায় জোর করেই ওষুধের পেটিটা নিয়ে নেয়। মলিন হেসে বলে, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারেননি।

অবিনাশ চুপ করে থাকেন। ছেলেটি বলে, আমিই ফ্রেন্ডলি ম্যাচটাতে আপনাকে ফাউল করেছিলাম।

অবিনাশ এবার স্পষ্ট করে দেখেন যুবকটিকে। ক্লান্ত, অবসন্ন চেহারা। বিশ্বাসই হয় না এই ছেলেটাই ওরকম মারাত্মকভাবে পা চালিয়েছিল।

ঘটনাটা মন থেকে প্রায় মুছেই গেছে। এই মুহূর্তে ছেলেটাকে দেখে রাগও হচ্ছে না। পাশে হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি বলে, আমি আপনার পাশের পাড়ায় থাকি। আপনি নতুন এসেছেন তাই চেনেন না। আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা সব এখানেই।

বছর ছয়-সাত হল অবিনাশ দেবপাড়ায় এসেছেন, লোকে এখনও তাঁকে নতুন ভাবে। আপন হতে হতে বুড়ো হয়ে যাবেন অবিনাশ।

ছেলেটা বলতে থাকে, আপনাকে মারার পর সেদিন আমার খুব খারাপ লাগছিল। 'ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল তখনই। সামনে যেতে বাধো বাধো ঠেকছিল। পরের দিন আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম, গেটের কাছে দাড়িয়ে ছিলেন কাকিমা, যা গম্ভীর, আপনাকে ডেকে দিতে বলতে সাহসই হল না। তারপর থেকে আপনাকে রাস্তায় একা পেতে চাইছি। দেখাই হচ্ছে না। আজ ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল। আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

কৌতুকবোধ করেন অবিনাশ। বলেন, হঠাৎ মারতে গেলে কেন? ওটা তো প্রদর্শনী খেলা ছিল। তা ছাড়া তোমরা তো জিততেই।

ছেলেটা কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে, আমিও বুঝতে পারছি না জানেন, কেন সেদিন আপনাকে মেরে বসলাম। সবাইকে কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রাগ হয়ে গেল।

অবিনাশ মিটিমিটি হেসে বলেন। বড়দের কাছে হেরে যাওয়ার রাগ?

না, ঠিক তা নয়, ইদানীং কেন জানি মাঝেমধ্যেই টেম্পার লুজ করে ফেলছি আমি। প্রসঙ্গ ঘোরাতে অবিনাশ বলেন, তোমার নাম কী? কী কর?

তাপস। এখন কাঠ বেকার।

পড়াশোনা কতদূর করেছ?

হায়ার সেকেন্ডারির পর রামজীবন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। নকশালদের ঝামেলায় কলেজ প্রায়ই বন্ধ থাকে। নকশাল পার্টি করি সন্দেহে পুলিশ দুবার থানায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ধুত্তোর বলে ছেড়ে দিলাম লেখাপড়া। এখন মনে হচ্ছে ভুলই করেছি। দাদার একার টাকায় সংসার চলে। আমি হাল না ধরলে মুশকিল হয়ে যাবে।

সতর্ক হন অবিনাশ, তাপস এর পরই চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে বলবে। তা না বলে, কাছাকাছি একটা কথা বলল, বিহার, ওড়িশা, আসাম যেখানে হোক একটা চাকরি পেলে চলে যাব। আমার আর এখানে ভাল লাগছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের কিছু হওয়ার নয়।

অবিনাশ অবাক হন, তিনি কত আগ্রহ নিয়ে এখানে থাকতে এসেছেন, ভূমিপুত্র তাপস বলছে, পালাবে। ব্যক্তিবিশেষে জায়গা ভাল-খারাপ হয়।

তাপসকে এড়াতে চাইছেন অবিনাশ। এর সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে দেবপাড়াটা তাঁর কাছেও খারাপ হয়ে যাবে।

বাজার রাস্তায় এসে পড়েছেন দুজনে। একটা রিকশা দেখে দাঁড় করান অবিনাশ। তাপসকে বলেন, চলি ভাই। একদিন এসো না বাড়িতে।

তাপসের থেকে ওষুধের পেটিটা নেন অবিনাশ। তাপস বলে, সে না হয় যাব। আপনিও মাঠে আসুন। এখনও যা খেলেন, ইজিলি আমাদের এগারোয় ঢুকে যাবেন। আত্মতৃপ্তির নয়, হাসতে হয় তাই হাসেন অবিনাশ। তিনি বোঝেন, তাপস তাঁকে কৃপা করার সুযোগ নিতে চাইছে। যা কখনওই দেবেন না অবিনাশ। তাপস সেদিন ফাউল করে তাঁকে গর্বিত করেছে। এই গর্বটুকু মাঝবয়সি অবিনাশের সম্বল। নয়তো সন্ন্যাসীর ভর্ৎসনা মেনে নিতে হয়।

বিকেল উতরে গেলে দীপালি আসে পড়াতে। রবিবার ছাড়া রোজ। অংশু, বরুণকে

পড়ায়। বরুণের আর কী পড়া, ক্লাস থ্রিতে উঠেছে সবে। বেশিক্ষণ পড়তে চায় না, বই খাতা নিয়ে পালিয়ে আসে রান্নাঘরে। ইলা এই সময়টা কর্তার জন্য চপ বা পকোড়া ভাজেন। অফিস থেকে ফিরে অবিনাশ ওইসবই পছন্দ করেন খেতে। কখনও সখনও অন্য পদও হয়। ইলার নাকি রান্নার হাত ভাল। নিজে খেয়ে বোঝেন না ইলা, যে খায় তার মুখ দেখে টের পান। মুখটা খানিকের জন্য বদলে যায় মানুষটার। একমাত্র ব্যতিক্রম দীপালি। প্রথম ভাজা চপগুলো ছেলেদের এবং দীপালিকে দেন মুড়ি দিয়ে। এটা একটা বিশেষ ইঙ্গিত। তারপর নিজের এবং দীপালির চা নিয়ে আসেন ঘরে। ছেলেদের বলেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। এক্ষুনি বাবা এসে যাবে।

কথার ভেতরের অর্থ, অফিসফেরত অভুক্ত মানুষের সামনে খাওয়া ঠিক নয়। দ্বিতীয় কারণ, দুটি মাত্র ঘর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকলে মানুষটা বিশ্রাম নেবে কোথায়। সাংসারিক নিজস্বতা ব্যাহত হবে। অর্থাৎ চা, মুড়ি খাওয়ার পর আপাতত ছুটি। দীপালি চলে গেলে, বিশ্রাম নিয়ে অবিনাশ ছেলেদের পড়াশোনা দেখবেন।

দীপালিকে এভাবে ঠেলে তাড়ানোর কারণ, দীপালি নিজে। মেয়েটার বয়স হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে হয়নি। মোটামুটি সুন্দরী। এইসব মেয়েদের খুব ভয় পান ইলা। যদিও স্বামীর ওপর তাঁর ভরসা যথেষ্ট। অবিনাশ খেলো টাইপের মানুষ নন। তবে গল্প আড্ডা পেলে সহজে উঠতে চান না। আর দীপালি ওঁর অপেক্ষাতেই গড়িমসি করে। উনি ফিরলেই মেয়েটার ন্যাকামি শুরু হয়ে যায়, অবিনাশদা, অবিনাশদা, জানেন তো ...। উনি ফিরলে মেয়েটার হাসির বহরও যায় বেড়ে।

কড়ায় ছ্যাক শব্দে সংবিৎ ফেরে ইলার। কম তেলে আলুর চপ ভাজছেন। খুব হিসেব করে সংসার চালাতে হয় তাঁকে। দু-কাঠা ছ-ছটাকের ওপর একতলা বাড়ি। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বাথরুম-পায়খানার মাথায় টিনের চাল। কবে সিমেন্টের হবে কে জানে! এতটুকু করতেই অফিসে অনেক লোন হয়ে গেছে অবিনাশের। কেটেকুটে খুব কমই পান মাইনে। তা দিয়েই মুখ হাসি হাসি রেখে সংসার চালাতে হয় ইলাকে। কারণ, ইলার জোরাজুরিতে এই জমি-বাড়ি করেছেন অবিনাশ। ইলা আশ্বাস দিয়েছেন, আমি ঠিক পারব চালিয়ে নিতে। চলছে না যে তা নয়, তবে সমস্তিপুরের বাড়ির মতো নয় কখনওই। সে-বাড়িতে বিশাল বিশাল ঘর। আধ বিঘে মতো বাগান। সারা বছরের সবজি, আলু, ওই বাগান থেকেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া ফল, ফুল তো আছেই। ওখানকার দুধ, ঘি, মাছ শস্তা। আর একটা মস্ত সুবিধে, বাড়িতেই ডাক্তার। ইলার ভাশুর।

এখানে এসে অভাবেই পড়ে গেছেন ইলা। ও-বাড়ির লোকরা ভাবে সুখের জন্যেই পালিয়ে এসেছেন। তা কিন্তু নয়, ইলা টের পেতেন বাংলায় আসার জন্য অবিনাশের মনে সবসময় একটা হতাশ আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। 'হতাশ' এই কারণে যে, ও-বাড়ির তিনিই ছিলেন মধ্যমনি। তারপর দুই বোনের বিয়ে দিয়ে আর্থিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ইলার বলিষ্ঠ আশ্বাস ছাড়া কখনওই এখানে আসা সম্ভব ছিল না। ইলারও যথেষ্ট ইচ্ছে ছিল বাংলায় থাকার। এক নম্বর কারণ, ইলার বাপের বাড়ি এখন এ-বাংলায়, মছলন্দপুরে। আগে ছিল ওপার বাংলায়। এ ছাড়া সব মেয়েই হয়তো চায় নিজের পছন্দমতো একটা সংসার গড়তে। সে হবে কর্ত্রী। পুতুল খেলার বয়স থেকেই অভিলাষ জাগে মনে। সেই আশা মোটামুটি পূর্ণ হয়েছে। ইলা কিছুতেই চান না, তাঁর এই নিরাপদ নিবিড় আশ্রয়, কোনও টিউশানি পড়াতে আসা মেয়ে, হেসে গড়িয়ে ফাটল ধরাক।

বাইরের গেটের আওয়াজ হল কি? ধাতব শব্দটা তাঁর সমস্ত স্নায়ুতে কম্পন তোলে। এতই চিন্তায় ডুবে আছেন ইলা, মনে হচ্ছে বিভ্রম। এত তাড়াতাড়ি তো উনি ফেরেন না। নিঃসন্দেহ হতে উনুন থেকে কড়া নামিয়ে ইলা গেলেন প্যাসেজের দরজায়।

হ্যাঁ, একগাদা মালপত্তর হাতে উনি ফিরছেন। ওঁর মাথার ওপর আকাশের ঢালুতে চোখ গেল, এখনও লালচে ছিটে। ইলার মনে পড়ে, বলেছিলেন বটে আজ সমস্তিপুরের টিকিট কাটবেন। আসলে অবিনাশ একা দেশের বাড়ি যাবেন, একথাটা যেন মনে থাকতে চাইছে না

ইলার।

অবিনাশ দোরগোড়ায় আসতে জিনিসপত্তর হাত থেকে নিলেন ইলা। বললেন, পেয়েছ টিকিট?

চেপে রাখা শ্বাস ছেড়ে 'হ্যাঁ' বলেন অবিনাশ। জুতো ছেড়ে এগিয়ে যান বাথরুমের দিকে। ইলার মুখ বিষণ্ণ হয়। অবিনাশ দিব্যি তাঁকে ছেড়ে ও-বাড়ি যাচ্ছেন, কী জবাব দেবেন, যখন ও-বাড়ির সবাই জিজ্ঞেস করবে, ইলা বা বউদি কেন এল না?

ব্যাগ, পেটি সব ঘরে রাখেন ইলা। অংশু বই থেকে মুখ তুলে জানতে চায়, এসব কী মা? বাবা কী এনেছে?

জানি না। ঝাঁঝিয়ে উঠে রান্নাঘরে চলে যান ইলা। হেঁশেলে বসে চপ ভাজতে ভাজতে ইলা শুনতে পান, অবিনাশ ঘরে ফিরে দীপালির সঙ্গে কথা বলছেন। সামনে উনুন অথচ অনেক বাষ্প জমা হয় ইলার বুকে। বড় একা, নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে।

রাত বাড়তে পরিস্থিতি পালটায়। অবিনাশ আজ খুব গল্প করছেন ইলার সঙ্গে। ছেলে দুটোকেও আদর করছেন বেশি। কোনও এক স্বামীজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। তিনি নাকি দারুণ দারুণ সব কথা বলেছেন। কী কথা, সেটা কিন্তু বলছেন না অবিনাশ। পাঞ্জাবির পকেট থেকে বার করলেন, স্বামীজির থেকে কাটা কুপন। স্বামীজির নাম অখিলানন্দ সরস্বতী, চিদানন্দ আশ্রম, সোনামুখী। ... কর্তার মনে ভক্তি ভাব দেখে প্রমাদ গুনলেন ইলা। শ্বশুরমশাইয়ের পুজোপাঠের ঠেলায় ওষ্ঠাগত হত প্রাণ। ইনিও কি সেই রাস্তা ধরবেন? দেখা গেল, -না। রাত্তিরে শোওয়ার বন্দোবস্তে ঈশান কোণে মেঘের আভাস পেলেন ইলা। বরুণকে শুতে পাঠানো হল পাশের ঘরে দাদার সঙ্গে। ঝড় আসবে। এই ঝড়ে নারীরা কখনওই আশঙ্কিত হয় না। স্নায়ু টানটান হয়ে অপেক্ষা করে তাণ্ডবের। নিরাবরণ সমর্পণেই তৃপ্তি।

ঝড় সত্যিই এল। মিলনোন্মুখ ইলার হঠাৎ মনে পড়ে যায় অবিনাশের শেখানো সন্তান ধারণের প্রকৃষ্ট দিনক্ষণ। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া নেই। এই সময় সন্তান এলে সংসারে টানাটানি পড়ে যাবে। অস্ফুটে সতর্ক করেন স্বামীকে। উনি গ্রাহ্য করেন না। আজ যেন বড় বেশি অশান্ত, অপ্রতিরোধ্য।

সন্ধেবেলা জমা বাষ্প বৃষ্টি হয়ে ঝরে ইলার বুকে। সঙ্গমকালীন বিড়বিড় করে অবিনাশ কী যেন বলছেন। অনেক কষ্টে ‘পঙ্গু’ শব্দটা দুবার উদ্ধার করতে পারেন ইলা।

॥ ছয় ॥

অনেকক্ষণ ধরে একটা পুরনো স্বপ্ন দেখছেন মৃগাঙ্ক। প্রায়ই দেখেন। খোঁড়া হওয়ার পর থেকে স্বপ্নটা ভেসে ওঠে রাতের প্রশান্ত ঘুমে। ইদানীং স্বপ্নটা দেখতে চান না। একই দৃশ্য বারবার। ঠেলেঠুলে ঘুম থেকে উঠে পড়েন। আজ কিন্তু দেখতে আগ্রহ হচ্ছে, শেষটা কী হয় দেখা যাক। স্বপ্নটা হচ্ছে এইরকম, সমস্তিপুরের আলোকোজ্জ্বল কোনও বড় রাস্তা, আলোটা সূর্যের না কি অন্য কোনও উৎস টের পাওয়া যাচ্ছে না। অত আলো সত্ত্বেও কোনও তাপ নেই। একটা স্বাস্থ্যবান ধবধবে ঘোড়া রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত উদ্দাম ছোটাছুটি করছে। ঘোড়াটার কোনও লাগাম নেই।

জনহীন রাস্তা, ধুলো ওড়ে আর ঘোড়ার পায়ের খপাখপ খপাখপ শব্দ। ব্যাস এই দৃশ্যটাই দেখে যান মৃগাঙ্ক। দৃশ্যটা দেখে কোনওভাবেই উত্তেজিত হন না। বিশেষ কিছু অনুভূত হয় না। ঘুমের মধ্যে শরীরও থাকে নিঃসাড়। ঘোড়াটা দূরে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ফিরে আসে। ফের যায়। চলমান অথচ লক্ষ্যহীন এই দৌড়ের ওপর একসময় বিতৃষ্ণা জাগে। উঠে পড়েন মৃগাঙ্ক। আজ ঠিক করেছেন, উঠবেন না। স্বপ্নের চোখ রাখা যায় না বন্ধ। অসহায়ভাবে স্বপ্নের শেষের জন্য অপেক্ষা করছেন মৃগাঙ্ক। এই স্বপ্নের আর একটা মুশকিল হচ্ছে, মৃগাঙ্ক নিজে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন ঠাহর করতে পারেন না।

স্বপ্নটা দেখতে দেখতে নিজেকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করেন মৃগাঙ্ক। ঘুম প্রায় ভেঙেই এসেছে। চোখ বন্ধ। হঠাৎ মনে হয় ঘোড়ার পায়ের আওয়াজটা ঘরের বাইরে এসে থামল। খপাখপ খপাখপ। মৃগাঙ্ক মটকা মেরে শুয়ে থাকেন। খুরের শব্দ অস্থির হয়। মৃগাঙ্ক মনে মনে খুশিই হন। স্বপ্নটা খানিক এগিয়ে এসেছে। ঘোড়াটা এতই চঞ্চল, দুপা তুলে দিয়েছে দরজার ওপর, খপখপ শব্দটা ক্রমশ পালটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কে যেন ধাক্কাচ্ছে দরজা। আরও একটু সবুর করে, বিছানা থেকে উঠলেন মৃগাঙ্ক। কে এল? এখন হয়তো আলোই ফোটেনি বাইরে।

দরজা খুলতে মৃগাঙ্ক দেখলেন, হাট্টাগোট্টা চার অথবা পাঁচজন লোক। একজনের পরনে পুলিশি পোশাক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাচ্চা কাঁহা হ্যায়? জলদি লে আও। মেরা বিবি কে পাস শোয়ি হ্যায় স্যার। আভি লাতা হুঁ। অত্যন্ত অনুগত এবং বিনয়ের সঙ্গে কথাটি বলে মৃগাঙ্ক ঘরের ভেতরে গেলেন। তারপর আরও ভেতরে। বাথরুমের পাশে টিনের দরজা সরিয়ে একদম বাড়ির বাইরে।

বাড়ির পেছনে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে মৃগাঙ্ক সাধ্যমতো দৌড়োচ্ছেন। খালি পা। চটি পরার সুযোগ হয়নি। মনের ভাব লুকিয়ে এরকম চুপচাপ সরে পড়া মৃগাঙ্ক কিশোরবেলা থেকে রপ্ত করেছেন। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে প্রকাশ ত্রিবেদীর কোঁচা খুলে দিয়ে এমন নিরীহ মুখ করে হেঁটেছেন, ত্রিবেদীজি সন্দেহ করতে পারেননি। হাজি সাহেবের সামনে দিয়ে ওঁরই বাগানের আম ঝোলায় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। হাজি সাহেব জানতে চাইলেন, ঝোলা মে ক্যায়া হই রে বউয়া?

কইলা হ্যায় চাচা। চাচি কে পাস উধার লিয়া দো সের।

আচ্ছা হ্যায়। যাও।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাজি সাহেবের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেন মৃগাঙ্ক। নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করত অবিনাশদা। এ সমস্ত অপকর্মের প্রত্যক্ষ মদত ছিল তার। কিন্তু আজকের ঘটনাটা অত হালকা নয়। যথেষ্ট গুরুতর। অল্পবয়সের দুষ্টুমিগুলো মনে করে স্বাভাবিক থাকতে চাইছেন মৃগাঙ্ক। তাঁর গন্তব্য এখন বলাইদার বাড়ি। ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটছে। গলিঘুঁজি ধরে বলাইদার কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মৃগাঙ্ক। বলাইদাই বলতে পারবে, লোকগুলো কারা? কী করে জানতে পারল বাচ্চাটা মৃগাঙ্কর হেপাজতে আছে!

বলাইদার খিড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়ান মৃগাঙ্ক। চাপা গলায় বেশ কয়েকবার বলাইদা!

বলাইদা! বলে ডাকেন। ডাক যায় না ভেতরে। যাবে কী করে, আশপাশের গাছপালায় পাখিদের ঘুম ভেঙেছে। কী বিষম হইচই।

মৃগাঙ্ক আলতো টোকা মারেন দরজায়। ফের ডাকেন, বলাইদা! বলাইদা। ... একটু পরে দরজা খুলে যায়। বউদি। শরীর জুড়ে রাত জাগার ছাপ আর ভয়। বউদি বলে, তোমাকে এখনও ধরেনি?

কে?

পুলিশ। মাঝরাতে তোমার দাদাকে তুলে নিয়ে গেল থানায়। তখনই তোমার দাদা আলগোছে আমাকে বলেছিল, মৃগাঙ্ককে পালাতে বলতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু অত রাতে কে তোমাকে সাবধান করতে যাবে বল। আমার দুটো ছেলেই তো ছোট ছোট।

বউদির আক্ষেপে কান দিলেন না মৃগাঙ্ক। বললেন, কেন ধরেছে কিছু বলছিল?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তোমার দাদার সঙ্গেই যা কথা হল। তবে পুলিশরা ওঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কিছু করেনি, ভদ্রভাবেই জিপে করে নিয়ে গেছে থানায়। এক অফিসার তো আমাকে বলল, আপ চিন্তা না করে মাইজি, বাবু সুবহি লওট আয়েঙ্গে।

তাহলে আমি এখন কী করব? প্রায় স্বগতোক্তির ঢঙে বলেন মৃগাঙ্ক। বউদি বলে, আমার মনে হয় এখনও যখন তোমার হদিশ পায়নি ওরা আপাতত গা-ঢাকা দেওয়াই উচিত।

মৃগাঙ্ক কালক্ষেপ করেন না। সরে আসেন খিড়কি দরজা থেকে। গোটা ব্যাপারটা ভীষণ ধোঁয়াশা ঠেকছে। পুলিশ কেন প্রথমে বলাইদার কাছে এল, তারপর মৃগাঙ্কর বাড়িতে! তবে পুলিশ কী খুঁজছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। কেন না দরজা খুলতেই ওরা জানতে চেয়েছিল বাচ্চাটার কথা।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেঁটে যাচ্ছেন মৃগাঙ্ক। পুলিশরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘর তছনছ করেছে। বোকা বনে গিয়ে ওরা আরও খেপে গেছে নিশ্চয়ই। ভীষণভাবে খুঁজছে মৃগাঙ্ককে। তাতে অবশ্য ভয় পান না তিনি। এইসব পুলিশের অনেক আগে থেকে সমস্তিপুরে আছেন। দু-তিনদিন এই শহরে আত্মগোপন করে থাকা তাঁর কাছে কোনও ব্যাপারই না। শুধু একটা কথা ভেবেই খারাপ লাগছে, নিজের শহরেই ফেরারি হয়ে গেলেন! স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও এমনটা হয়নি।

সমস্তিপুরের মানচিত্রে গোপন কিছু পথ আছে যার হদিশ জানে এখানকার পুরনো বাসিন্দারা। সেই পথ ধরে মৃগাঙ্ক পৌঁছে গেলেন সাহেবদের কবরস্থানে। অবিনাশদা-মৃগাঙ্কর অতি প্রিয় আত্মগোপন করার জায়গা। এখন প্রায় ভগ্নদশা। বহুদিন হয়ে গেল এখানে আসেননি মৃগাঙ্ক। বয়স হয়ে গেছে কবরস্থানের।

স্নান-খাওয়াদাওয়া হল না। একটি সমাধিপ্রস্তর বেছে নিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক। মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যুর কোলে শুয়ে রয়েছেন। এই বোধটা এর আগেও এখানে এসে হয়েছে। পরম শান্তির বোধ। এখানে মৃত্যুর কোনও ভয়াবহতা নেই। জাগতিক কোনও আকর্ষণ থাকে না। অবিনাশদার বাবা ব্রজজ্যেঠু মহাভারতের একটা গল্প প্রায়ই বলতেন, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালীন বকরূপী ধর্ম একবার যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষের চরিত্রে সব থেকে বিচিত্র জিনিস কী?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, মানুষ জানে একদিন সে মরবেই। তবু বাঁচার জন্য কী আকুল চেষ্টা চালিয়ে যায়।

কেন চেষ্টা চালায় মানুষ? মহাভারতের এই গল্প কত পুরনো! বহু মানুষ গল্পটা জানে, জানত। বেঁচে থাকার আগ্রহ মানুষের কমেনি। কোন উদ্দেশ্যে, কীসের টানে মানুষ এতটা বিস্মৃত হয়ে থাকে? আমিই বা বেঁচে আছি কেন? –ভাবনাটা মাথায় আসতেই ধড়মড় করে সমাধিবেদিতে উঠে বসেন মৃগাঙ্ক। রোদ অনেক আগেই নিস্তেজ হয়েছে। নিভে আসছে বিকেলের রং। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ট্রেন পাস করে গেছে মজফফরপুর লাইন দিয়ে। চারপাশ থেকে উঠে আসছে লতাপাতার বুনো গন্ধ, এর সঙ্গে মিশে আছে পুরনো বেশ কিছু মৃতের স্মৃতি। নির্জনতা আরও গাঢ় করবে বলে, পোকারা ডাকতে শুরু করেছে। মৃগাঙ্কর মাথায়

আবার প্রশ্নটা ঘুরেফিরে আসে, আমার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা কী? যদি সেদিন টমিদের গুলিটা পায়ে না লেগে বুকে লাগত! লাগতেই পারত। চোখের সামনে একটা গরু মরে পড়ে গেল। আমি যে এতদিন বেঁচে আছি নিশ্চয়ই এর পেছনে অজ্ঞাত কোনও কারণ আছে। কী সেই কারণ?

মাথাটা ফের গুলিয়ে যাচ্ছে। মৃগাঙ্কর এই হয় মুশকিল, বুদ্ধির তুলনায় কঠিন কঠিন ভাবনা এসে পড়ে মাথায়। এবার বিবেচনাটা করবেন কী দিয়ে? অবিনাশদা যতদিন পাশে ছিল অসুবিধে হয়নি। এখন তলহারা লাগে বড়। তবে কারণ একটা আছে বটেই। আচমকা মৃগাঙ্কর মনে পড়ে মেয়েটার কথা। হয়তো এই মেয়েটার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেঁচে আছেন তিনি। এমনটাই পূর্বনির্দিষ্ট।

বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পেয়ে ঝরঝরে হয়েছেন মৃগাঙ্ক। সন্ধেটা আর একটু ঘনাক, রেললাইন ধরে সোজা চলে যাবেন প্ল্যাটফরমে। সন্ধের দিকে গোরক্ষপুরের একটা প্যাসেঞ্জার আছে।

প্ল্যাটফরমের দক্ষিণ প্রান্তে অফিস ঘরের পাশে একটা বগেনভেলিয়ার ঝাড় আছে। তার আড়ালে ঘন অন্ধকার। ঘাপটি মেরে বসে আছেন মৃগাঙ্ক। সামনে গোরক্ষপুর প্যাসেঞ্জারের ইঞ্জিন ফুঁসছে। এখনও সিগন্যাল পায়নি। মাঝেমধ্যেই চারপাশে চোখ বোলাচ্ছেন মৃগাঙ্ক, পুলিশ কি খুঁজছে? এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু দেখা যায়নি। ট্রেনের চাকা গড়ালেই, দৌড়ে গিয়ে উঠবেন মৃগাঙ্ক। স্নায়ু একদম টানটান। এমন সময় মাথার ওপর ঝুপ। ভীষণ চমকে ওঠেন মৃগাঙ্ক, মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারেন কে যেন চাদর ফেলল গায়ে। পেছন ফিরতে চোখে পড়ে, বলাইদা!

দিদি মেয়েটাকে কোলছাড়া করছে না। দিদির সংসারের সব ভার গিয়ে পড়েছে যমুনার ওপর। বাচ্চাটাকে নাওয়ানো খাওয়ানো, ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আসা, জামা, কাঁথা কেনা সব করছে দিদি। বাবুইটাও বোন পেয়ে পড়াশোনা শিকেয় তুলেছে। দিদির এই বুক আগলে আহ্লাদ নতুন কিছু নয়, ছোটবেলায় যমুনা, ছোটবোন রেখার যদি কোনও খেলনা, বা চুড়ি, টিপ পুতুল হঠাৎ প্রাপ্তি হত, বেমালুম ছিনিয়ে নিয়ে সেটাতে মগ্ন হত দিদি। দুই বোন বোকার মতো তাকিয়ে থাকত দিদির দিকে। বাবা-মাকে নালিশ করলে ওঁরা বলতেন, দিদি তোমাদের বড়, ওর কথা মেনে চলবে। —সেসব না হয় ছোটবেলার কথা, এখন ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে যমুনার। দিদিকে কিছু বলাও যাচ্ছে না। যদি অভিমান করে। অসুবিধে বা আশঙ্কার কারণ, মেয়েটা অর্ধচেতনে চিনছে দিদিকে, দিদির স্নেহ আদরে অভ্যস্ত হচ্ছে। এরপর যদি যমুনার কোলে উঠে কান্নাকাটি করে!

ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়াতে চেষ্টা করেন যমুনা। তিনি এখন রান্নাঘরে। জামাইবাবুর জন্য চা করছেন। মেয়ে বাবুইকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে গেছে দিদি। কিছুক্ষণ হল অফিস থেকে ফিরেছেন তপনদা। বাথরুম ঘুরে চলে গেছেন পড়ার ঘরে। নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেডিয়োতে কলকাতা ধরেছেন। ভেসে আসছে রবীন্দ্রনাথের গান। একটু চাপা স্বরে, দূর থেকে, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' মহিলা কণ্ঠ। কলকাতার গান অন্যরকম। অনেক বেশি দরদ, প্রাণ ঢেলে গান ওঁরা, কলকাতার আর্টিস্টদের দেখতে ইচ্ছে হয়। নিশ্চয়ই আশ্চর্য সুন্দর নরমসরম দেখতে ওঁদের। আজ পর্যন্ত একজনকেও দেখা হয়নি। কলকাতার সঙ্গে যোগ বলতে বাংলা সিনেমা। নুন শোয় সমস্তিপুরের ভোলা টকিজ বা কৃষ্ণা টকিজে আসে। এ অঞ্চলের বাঙালিদের মনে কলকাতা এক স্বর্গরাজ্য। অনেকেই ঘুরে এসেছে। তাদের কেউ না কেউ থাকে ওখানে। যমুনার শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি কোনও পক্ষেরই ঘনিষ্ঠ কেউ থাকে না। চিন্তাটা হোঁচট খেল, একজন থাকেন। যমুনার স্বামীর রক্তের সম্পর্কের থেকেও ঘনিষ্ঠ এক দাদা। অবিনাশদা। উনি কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও মৃগাঙ্কর কলকাতায় যাওয়ার আগ্রহ হয় না।

মুখে বলেন অবশ্য, একবার নিয়ে যাব তোমাকে। ব্যস, কথা ওখানেই শেষ। যমুনার

ভারী আশ্চর্য লাগে, যে লোক অবিনাশদা বলতে পাগল, মনে মনে যাকে গুরু বলে মানে, কেন দেখা করতে যায় না তাঁর সঙ্গে। ...চায়ের জল ফুটে গেছে। চা পাতা দিয়ে সসপ্যান ঢাকা দেন। নামিয়ে রাখেন স্টোভ থেকে। দুধের ডেকচিটা স্টোভে তোলেন।.... অবিনাশদার কথা মনে পড়তে ভেসে ওঠে চেহারাটা। দেখা হয়েছে অনেকবার, চোখাচোখি হয়েছে কম। সম্ভবত মেয়েদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেন না অবিনাশদা। যমুনার বেলায় তো নয়ই। এত আড়ষ্ট থাকেন যে, যমুনারই বেশিক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হয়। এর কারণ সম্ভবত মৃগাঙ্ককে স্নেহ করেন নিজের ভাইয়ের থেকেও বেশি। তাই এই সতর্ক সহবত।

বিয়ের সময় অবিনাশদাকে দেখে মনে হয়েছিল বুঝি বাইরে থেকে এসেছেন, মানে বড় কোনও শহর, দিল্লি, বম্বে, কলকাতা — অদ্ভুত একটা আভা বের হয় ওঁর শরীর ঘিরে। অথচ কী নম্র, লাজুক তাঁর উপস্থিতি, কণ্ঠটিও বড় সুন্দর, আন্তরিক। দাদা বা গুরু গুরু ভাব নেই। লম্বায় এমন কিছু নয়, খুব যে ফরসা তাও নয়, তবু কী যেন একটা আছে ওঁর মধ্যে। ওঁর পরিবারের আর কারও মধ্যে নেই। কথায়বার্তায় খুব সম্মোহিত করে রাখেন, সেরকমটি বলা যায় না। ওঁর যাওয়াআসা অনেকটা মলয় বাতাসের মতো। চলে গেলেও মনটা বেশ খানিকক্ষণ ভাল থাকে। যমুনার বিয়ের দু-আড়াই বছরের মধ্যেই অবিনাশদা চলে গেলেন কলকাতায়। মৃগাঙ্ক একা হয়ে গেলেন। আরও বেশি করে আশ্রয় নিলেন নেশার। তাল কেটে গেল স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে। আত্মীয়রা আড়ালে, কখনওবা সামনে দোষারোপ করে যমুনাকে, কেন স্বামীকে সামলে রাখতে পারল না। বাঁজা বলেও গঞ্জনা দেয় কেউ কেউ। তারা জানে না মৃগাঙ্কর নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য অর্ধেকটা অবিনাশদা দায়ী। দুধ উথলে যাচ্ছিল। আগুন থেকে ডেকচি নামিয়ে, স্টোভ নেভালেন যমুনা। চা বানাচ্ছেন তিনজনের দিদি, জামাইবাবু, নিজের। দিদিরটা ঢাকা দেওয়া থাকবে। গরম করে দিতে হবে ফিরলে। এখনও যে কেন ফিরছে না।

নিজের আর জামাইবাবুর চা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোলেন যমুনা। মেয়েটা আসার পর থেকে তপনদা সামনের ঘরে শুচ্ছেন। বাকিরা সবাই শোওয়ার ঘরে। এটা খুবই খারাপ ব্যাপার। যমুনার জন্য তপনদা কেন স্ত্রীর কাছ ছাড়া শোবেন। দু-একদিনের জন্য বেড়াতে এলে তবু মানা যায়। যমুনাকে কতদিন এখানে থাকতে হবে কে জানে। বেশ কয়েকবার দিদি-জামাইবাবুকে বলেছেন যমুনা, আমি মেয়েটাকে নিয়ে সামনের ঘরে শুই। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। কথা কানে নেয়নি ওরা। এমনও হতে পারে আশঙ্কা করছে, শোওয়ার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত হলে, যমুনা এখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য থেকে যাবে। দিদি না হলেও কথাটা ভাবতে পারেন তপনদা। কেননা অন্যান্যবার যত সহজ থাকেন, কত ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন বেশ। এবার কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে থাকছেন।

তপনদার ঘরে এসেছেন যমুনা। রেডিয়োতে এখন খবর বলছে, বিছানাতে উপুড় হয়ে কী একটা বাংলা বই পড়ছেন তপনদা। গলা ঝাঁকি দেন যমুনা। বলেন, তপনদা, আপনার চা যমুনার মুখের দিকে না তাকিয়ে চায়ের কাপ ডিশটা ধরেন তপনদা, বিছানায় নামিয়ে রেখে, ফের বইতে মন দেন।

নিজের কাপ হাতে বিছানা থেকে একটু দূরে চেয়ারে বসেন যমুনা। চায়ে চুমুক মারছেন তপনদা, যমুনার উপস্থিতি গ্রাহ্য করছেন না। তার মানে যমুনার আন্দাজই ঠিক, আকারে ইঙ্গিতে তপনদা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, অনেকদিন তো হল।

দোষ দেওয়া যায় না তপনদার, মাঝারি আয়ের সংসার। শালি-বাচ্চা সমেত ঘাড়ে বসে আছে, চিন্তা হবে বইকি।

এখানে আসার আগে হাতখরচা বাবদ তেমন কিছু টাকা নিতে পারেননি। নেবেনই বা কী করে, ক টাকা পড়েছিল ভাঁড়ারে? যা হুড়োতাড়া করে বেরোনো হল, টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থাই করা গেল না। দুদিন হল যমুনার হাতে এক নয়া নেই। বাবুইকে ছোটখাটো কিছু খেলনা, জামা কিছুই কিনে দেওয়া গেল না। মেয়েটার ডাক্তার-বদ্যি, দুধ ওষুধ সব দিদিই করছে। এদিকে বাচ্চার বাবার কোনও খবর নেই। মেয়েটাকে কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত

হয়ে গেছে। দেখো গিয়ে হয়তো মদ গিলে পড়ে আছে রাস্তায়।

চায়ে চুমুক মারতে মারতে মৃগাঙ্কর উদ্দেশে যমুনা মনে মনে বলেন, তোমার মতো লোকের বাবা হতে চাওয়ার শখ মানায় না। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই! নাকি নিজের রক্তের সম্পর্কের নয় বলে মেয়ের প্রতি উদাসীন। বাচ্চা ভোলানোর মতো যমুনার হাতে একটা রক্তমাংসের পুতুল তুলে দিয়েছেন।

বিরক্তিতে জানলার দিকে মুখ ফেরালেন যমুনা। জানলার বাইরে অন্ধকার নেমে গেছে। মশা ঢুকে আসছে একটা-দুটো করে। কাদের বাড়িতে জানি শাঁখ বেজে উঠল। পর পর তিনবার। কপালে হাত ঠেকালেন যমুনা। এ-বাড়িতেও সন্ধে দিতে হবে। তপনদাকে কথা বলানোর জন্য যমুনা বলেন, জানলাগুলো বন্ধ করে দিই তপনদা? মশা ঢুকছে।

দাও। দায়সারা অনুমতি দেন তপনদা।

টেবিলে শূন্য কাপ রেখে যমুনা উঠে যান জানলা বন্ধ করতে। রেডিয়োতে এখন আবহাওয়ার খবর বলছে। কলকাতার দিকে নাকি ভারী বর্ষা, বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখানকার বাতাসে তার সামান্য আভাস পর্যন্ত নেই। কলকাতা এতটাই দুর!

জানলা বন্ধ করে চেয়ারে ফিরে এসেছেন যমুনা। তপনদাকে বলেন, মেয়ের একটা নাম দিন না, দিদি তো নানান নামে ডাকছে, ঠিক করে একটা নাম দিতে হবে তো। বই মুড়ে যমুনার দিকে তাকান তপনদা। বলেন, দিতেই হবে নাম?

বাঃ, হবে না! কী বলে ডাকব?

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবেন তপনদা। উপুড় অবস্থা থেকে উঠে বসেন। যমুনা বলেন, আপনি কত বই পড়েন, কবিতা, নভেল .. ওর থেকেই কোনও একটা দিয়ে দিন।

রেডিয়ো বন্ধ করে তপনদা যমুনার মুখের দিকে তাকান। শান্ত গলায় বলেন, নাম মানে পরিচয়। নামের পেছনে তোমাদের পদবিটাও থাকবে। এই পরিচয়টা বড় হয়ে মেয়েটা মেনে নেবে তো?

ভ্রূ কুঁচকে তপনদার দিকে তাকিয়ে থাকেন যমুনা, কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারছেন না। যমুনার অবুঝ মুখের দিকে তাকিয়ে তপন বলে যান, যতই গোপন করার চেষ্টা কর, মেয়েটা বড় হয়ে জানবেই তোমরা তার আসল পিতামাতা নও। স্নেহ ভালবাসা, অর্থ দিয়ে যে মেয়েকে তিল তিল করে বড় করবে, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছু নস্যাৎ করে মেয়ে জানতে চাইবে তার আসল পরিচয়। তখন তোমরা সত্যিটা বললেও—মানে, কীভাবে ওকে পেয়েছ—বিশ্বাস করাতে পারবে না। মেয়েটা ভাববে, এর পেছনে অন্য কোনও সত্য লুকিয়ে আছে। মেয়েটার সমস্ত মন্দর জন্য দায়ী করবে তোমাদের। ভালর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবে ভাগ্যকে।

যমুনার বুকে দামামা বাজে। ভয় ভয় লাগে। এভাবে তিনি ভেবে দেখেননি। এতদিন একটাই প্রশ্ন ছিল, মেয়েটা কোন জাতের। এখন তো দেখা যাচ্ছে মেয়েটারও অনেক প্রশ্ন থাকবে। যমুনার মুখে বিষাদ ঘনায়। ভরসা জাগানো গলায় তপন বলেন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ভাল করে ভেবে দেখো কথাটা। মৃগাঙ্ককে খবর পাঠাচ্ছি। তার সঙ্গে বসে আলোচনা করো। এর মাঝে আমি আর একটা খোঁজ নিয়েছি, আলিনগরে এক অনাথ আশ্রম আছে। সেখানে মেয়েটাকে দেওয়া যায়। ব্যবস্থা করে দেওয়ার লোক আছে। কিছু টাকা খরচা হবে। সে নয় আমি খানিকটা জোগাড় করে দেব।

প্রস্তাবটা যেন ধাক্কা মেরে যমুনাকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দেয়। মনে মনে বলেন, মেয়েটার জন্য যা হোক একটা নাম চেয়েছিলাম তপনদা, আপনি ওর ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে দিলেন!

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন যমুনা। রাস্তায় আবছা অন্ধকার। গলার কাছে কষ্ট পাকিয়ে আছে। ঢোঁক গিলে কষ্টটাকে সরাতে চাইছেন, পারছেন না। রাগ হচ্ছে মৃগাঙ্কর ওপর, ওঁর জন্যই এমন ব্যবস্থার কথা ভাবছে তপনদা ৷ নেশাখোর মানুষটার বাবা হওয়ার যোগ্যতা নেই। যোগ্যতা না থাকুক আকাঙ্ক্ষা তো আছে। কীভাবে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন মেয়েটাকে। তপনদা যদি দেখতেন ...

এক ফোঁটা দু ফোঁটা করে চোখের কোল বেয়ে জল নামতে থাকে। একটু আগে যমুনা আপসোস করছিলেন, রেডিয়োতে বলছে কলকাতায় ভারী বর্ষা, এখানে তার ছিটেফোঁটা নেই। কলকাতা অনেক দূর। খুব দূর নয়, মনটা এদিক ওদিক হতেই বৃষ্টি নামল চোখে।

ঝাপসা দৃষ্টিপথে যমুনা দেখেন দিদিরা ভেসে উঠল অন্ধকার থেকে। বারান্দায় উঠে আসে দিদি, বাবুই, কোলের মেয়েটা। দিদি বলে, কী দুষ্টু যে হয়েছে না, কোনও কোল বিচার নেই, সবার কাছে যাচ্ছে আর চুল টানছে, হাসছে ঠানদির মতো ....

দিদির কোল থেকে মেয়েকে নেন যমুনা। দিদি বলে, হ্যাঁরে, সন্ধে দিয়েছিস?।

এই যাঃ, একদম ভুলে গেছি! বলেন যমুনা

তুই তো এরকম ভুলোমন ছিলি না। কী ভাবছিস সারাক্ষণ? কথাটা বলে যমুনার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকান গীতা। আবছা অন্ধকারেও বোনের মুখে পূর্ণিমার ছোঁয়া দেখেন গীতা।

যমুনা বলেন, জানিস দিদি, মেয়েটার আজ একটা নাম ঠিক হল। কী?

বৃষ্টি।

সঙ্গে সঙ্গে নামটা লুফে নিল বাবুই, মা-মাসিকে ঘিরে নাচতে লাগল, আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দেব মেপে, আয় বৃষ্টি...

গোরক্ষপুর স্টেশন থেকে হেঁটেই শালির বাড়ি যাচ্ছেন মৃগাঙ্ক। যতই খুড়িয়ে হাঁটুন রিকশা তাঁর খুব একটা পোষায় না। বলাইদার দেওয়া চাদরটায় এখনও গা-মাথা মোড়া। ভেতরে ঘাম হচ্ছে। মাথা থেকে চাদরটা নামান মৃগাঙ্ক। আশা করা যায় কেউ ফলো করে আসেনি। যদি আসত ট্রেনে বসেই টের পেতেন।

গোরক্ষপুরে ট্রেন এসে পৌঁছেছিল বিকেল বিকেল। প্ল্যাটফরমে বসে আলো নিভতে দিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক। সন্ধে নেমে গেলে স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথমে একটা শস্তার চটি কেনেন। টাকা দিয়েছিল বলাইদা।

সমস্তিপুর স্টেশনে লুকিয়ে থাকার সময় বলাইদা গায়ে চাদরটা ফেলতেই ভীষণ চমকে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক। নির্বাক থেকে চোখ দিয়ে এক লহমায় অনেক কিছু বলেছিল বলাইদা। তারপর সরে যায়।

ট্রেন হুইশেল দিয়ে চলতে শুরু করলেই, দৌড়ে কামরায় উঠেছিলেন চাদর মোড়া মৃগাঙ্ক। ট্রেন দুটো লেভেল ক্রসিং পার করে স্পিড নেয়। একটু পরেই ডানদিকে কবরস্থান, বাঁদিকে অবিনাশদা, মৃগাঙ্কদের পাশাপাশি দুটো বাড়ি। জানালায় ঝুঁকে বাড়ির কোনও একজনকে দেখার চেষ্টা করছিলেন মৃগাঙ্ক, ছোট ভাই শশাঙ্কর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই।

হঠাৎ কাঁধ ধরে কে যেন সিটে বসিয়ে দিল। মুখ ফেরাতে দেখেন আবার বলাইদা। ভীষণ অবাক হন মৃগাঙ্ক। পাশে বসিয়ে বলাইদা বলে, আমি পিতৌজিয়া নেমে যাব। তোকে কয়েকটা দরকারি কথা বলতে ট্রেনে উঠলাম। —খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সম্ভবত কথা গুছিয়ে নিচ্ছিল বলাইদা। দুপাশে অন্ধকার গ্রাম ফেলে রেখে ট্রেন তখন সজোরে ছুটছে। বলাইদা উদ্বেগ-চাপা গলায় বলে ওঠে, ওরা তোকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

কারা?

পুলিশ।

কেন?

ঠিক তোকে নয়, খুঁজছে বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটা ওদের পক্ষে বড় বিপদের কারণ হতে পারে।

তুমি যে কী বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অসহায় কণ্ঠে বলেন মৃগাঙ্ক বলাইদা বলে, আমিও কি ছাই বুঝতে পারছি। থানায় গিয়ে যতটুকু যা বুঝলাম পুলিশ, নিত্যানন্দ আর ওর সেই তেঢ্যাঙা ভাই, ভাই-বউকে অ্যারেস্ট করেছে।

ওই লোকটা তার মানে বউ নিয়ে এসেছে? তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে।

হ্যাঁ, আর একটা আন্দাজ মিলে গেছে, নিতুর ওই ভাই-ভাইবউ সদ্য বর্ডার পেরিয়েছে।

প্রথমে ঢুকেছিল কলকাতায়, তারপর এখানে। এখন কথা হচ্ছে, অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করতেই পারে, আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিতুও না হয় গ্রেপ্তার হল। কিন্তু ওরা বাচ্চাটাকে খুঁজছে কেন? বাচ্চাটা যে ওই বউটার, এটা একেবারে নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়।

তুমি বউটাকে দেখেছ? বলাইদার কথার মাঝে বলে উঠেছিলেন মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ, দেখেছি।

দেখে কি খুব শয়তানি, নিষ্ঠুর মনে হল? বাচ্চাটাকে ওভাবে ফেলে দিয়েছে কেন? ম্লান হেসে বলাইদা বলে, মেয়েদের শরীর এমন নরমভাবে তৈরি করেছেন ভগবান, সমস্ত নিষ্ঠুরতা চাপা পড়ে যায়। বউটা কতটা নির্দয় জানি না। বাসা থেকে পড়ে যাওয়া পাখির মতো থানার মেঝেতে বসেছিল। মাথায় ঘোমটা দেওয়া, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ভীষণ ভয় পাওয়া চাউনি।

তা, পুলিশ তোমায় ধরল কেন? বিভ্রান্ত হয়ে জানতে চান মৃগাঙ্ক। বলাইদা বলে, সেটাই তো হচ্ছে আসল ব্যাপার। আমি যতটুকু বুঝেছি, বাংলাদেশ থেকে আসা ওই ফ্যামিলিকে ধরতে পুলিশ নিতুর বাড়িতে হানা দিয়েছিল। কোনওভাবে খবর পেয়েছিল পুলিশ। স্বামী-স্ত্রীকে ধরেও কাজ মেটেনি পুলিশের। কেননা ওরা খুঁজছে বাচ্চাটাকে। নিতুর ওপর টর্চার করতে, ও বলে দেয় আমাদের কথা। আমরা যে সেদিন নিতুর বাড়ি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম, কারণটা নিতু আন্দাজ করেছিল। ও বুঝতে পেরেছিল বাচ্চাটার হদিশ আমরাই জানি, উৎসটা খুঁজছি। একটু দম নেয় বলাইদা। আবার বলতে শুরু করে, নিতু সন্দেহটা করেছিল আমাকেই বেশি। তাই আমার বাড়ির ঠিকানা দেয়। পুলিশ যখন বাড়ি সার্চ করে বাচ্চাটাকে পেল না, তোর বাড়িটা কোথায় জানতে চাইল। বললাম। কিন্তু বাচ্চাটা কোথায় কিছুই বলিনি। আমি থানায় বসে আছি, পুলিশ তোকে না পেয়ে ফিরে এল। আমাকে দু-চার ঘা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে পারিস? আমি বিভিন্ন জায়গার নাম করলাম। আমি কিন্তু জানতাম তুই সন্ধের গোরক্ষপুর প্যাসেঞ্জারটাই ধরবি। আমি থানায় বসে এসডিও সাহেবকে একটা ফোন করতে চাইলাম, ওরা আমায় ছেড়ে দিল।

চুপ করে ছিল বলাইদা, ট্রেনের দুলুনিতে দুলছে। মৃগাঙ্ক অপরাধী কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার জন্য তোমায় মার খেতে হল!

সে এমন কিছু না। বলে, পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে কনুই দেখিয়ে ছিল বলাইদা, কামরার ঝিমনো হলুদ আলোতে দগদগ করছিল সদ্য পড়া কালশিটে।

মৃগাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বলাইদার কাছে গোটা বৃত্তান্ত শোনার পরও পরিষ্কার হচ্ছে না পুলিশরা কেন বাচ্চাটাকে খুঁজছে। পিতৌজিয়া ঢুকছিল ট্রেন। বলাইদা উঠে দাঁড়ায়। হাতে বেশ কয়েকটা নোট দিয়ে বলে, এটা রাখ সঙ্গে। কিছুদিনের জন্য সমস্তিপুরের বাইরেই থাক। এদিককার পরিস্থিতি নর্মাল হলে, পুলিশের গতিবিধি দেখে আমিই গোরক্ষপুরে খবর দেব। তারপর আসবি।

টাকাটা দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিল বলাইদা। মৃগাঙ্কর মাথা তখন ভোঁ ভোঁ করছে। কিছুই ঠিকঠাক ভেবে উঠতে পারছেন না। এমন সময় প্রচণ্ড খিদে পেল। সারাদিন পেটে দানা পড়েনি।

জানলার পাশ দিয়ে ছাতুওলা যাচ্ছিল ট্রলি ঠেলে। ডেকে দাঁড় করালেন। ছাতুমাখা আর দু লোটা জল খেলেন। তারপর সেই যে সিটে বসে ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘুম ভাঙল রাত পার করে বেশ বেলায়। জানলার বাইরে গমের খেতে, পুকুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। ট্রেন ততক্ষণে দুঘণ্টা লেট। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও কী করে যে এত গাঢ় ঘুম দিলেন, কে জানে! একটাও স্বপ্ন দেখেননি।

এখন শালির বাড়ির দিকে যেতে যেতে নানান দুশ্চিন্তা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আঁকড়ে ধরছে। একই সঙ্গে অদ্ভুত একটা তেষ্টা তৈরি হয়েছে মনে, কখন গিয়ে মেয়েটার মুখ দেখব। গোলঘর পেরিয়ে এসেছেন অনেকক্ষণ। ওই তো দূরে ডাক্তার নন্দীর চেম্বার দেখা যাচ্ছে। ওই বাড়ির পাশের গলিটা দিয়ে গেলেই যমুনার দিদির বাড়ি।

আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার একটা ভাল দিকও আছে। যমুনার দিদির বাড়িতে পা রাখার খানিকক্ষণের মধ্যেই টানটান উদ্বেগটা একটু শিথিল হল। অবশ্য এখনও মেয়েটার বিপদ নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি মৃগাঙ্ক। মুড়ি, চা খেয়েছেন, এটা সেটা গল্প হচ্ছে। ইতিমধ্যে মেয়েটাকেও একবার চোখ ভরে দেখেছেন, কোলে নেননি। এই কদিনে কি একটু বড় হয়েছে মেয়েটা? কে জানে। ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। তবে চেহারায় আদর যত্নের ছাপ স্পষ্ট।

নানান হালকা কথাবার্তার মাঝে মৃগাঙ্ক সুযোগ খুঁজছেন, কখন মেয়েটার বিষয়ে আলোচনা করা যায়। দু-এক সপ্তাহ এরকম পালিয়ে থাকা সম্ভব, চিরদিন তো নয়। ইতিমধ্যে মেয়েটার একটা নাম দিয়েছে যমুনা, বৃষ্টি। ক্রমশ মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে, বিচ্ছেদে কষ্ট পাবে খুব। কষ্ট ছাড়া যমুনাকে আমি কীইবা দিতে পেরেছি... কথাটা বোধহয় উচ্চারণ করে ফেলেছেন মৃগাঙ্ক, বিছানায় মুড়ির বাটি কোলে বসে থাকা তপন বলে ওঠে, কিছু বললে?

মাথা নাড়েন মৃগাঙ্ক। দম ছেড়ে বলেন, কিছু না।

মৃগাঙ্ক, তপন প্রায় একই বয়সি। দুজনের মধ্যে তুমির সম্পর্ক। শরীরে অত্যাচার করার দরুন মৃগাঙ্ককে একটু বয়স্ক দেখায়। তপন তুলনায় অনেক যুবক চেহারার, একই সঙ্গে বেশ বিচক্ষণ। তাই তো এখন হঠাৎ বলে উঠল, তুমি কিন্তু এসে থেকে কী একটা ভেবে যাচ্ছ মৃগাঙ্ক। আমাদের বলছ না। সমস্তিপুরে কি কিছু হয়েছে?

আত্মসমর্পণের দৃষ্টি নিয়ে তপনের দিকে তাকান মৃগাঙ্ক। সামনের ঘরে এখন শুধু ওঁরা দুজন। মৃগাঙ্ক বলেন, মেয়েটাকে নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়ে গেছি ভাই।

কীরকম?

বলছি, দিদি, যমুনাকেও ডাকো। সবারই শোনা উচিত। তারপর ঠিক করা যাবে মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায়।

তপন গলা তুলে দিদি আর যমুনাকে ডাকেন।

আলোচনা খুব গুরুত্ব দিয়ে, গুরুগম্ভীরভাবে হল। পাশের ঘরে বাবুই জোরে জোরে পড়ছে। এ-ঘরে বিছানায় গীতা, মেয়ে কোলে যমুনা। মেয়েটা এখন ঘুমোচ্ছে। দুটো চেয়ারে মৃগাঙ্ক আর তপন। মেয়েটাকে কুড়িয়ে পাওয়া থেকে শুরু করে এখন অবধি যা যা ঘটেছে সবটাই বললেন মৃগাঙ্ক। এই মুহূর্তে সবাই চুপ। তপন ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছেন। চিন্তার থই হারিয়ে গীতার চোখে হতাশ চাউনি। পাথরের মতো অভিমান জমা হচ্ছে যমুনার মুখে, শরীরে। তুলনায় মৃগাঙ্ক সব কিছু বলে হালকা বোধ করছেন। মনটা বার বার পালিয়ে যাচ্ছে খাজাঞ্জি মার্কেটের পেছনে। ওখানে দেশি মদের ঠেকা আছে। আগে যখন গোরক্ষপুরে এসেছেন, চেখে দেখেছেন ওখানকার মাল। যথেষ্ট ভাল। তপন বাবাজি ও রস থেকে একদমই বঞ্চিত। হয়তো ঘৃণাই করে তাদের, যারা ওসব খায়। তাই গোরক্ষপুরে এসে চাখতেই হয়েছে, বেহেড হতে পারেননি মৃগাঙ্ক। এই যে তপন, কখন থেকে চোখ কুঁচকে ভেবে যাচ্ছে, এক পাত্তর মারলেই মাথা তরোয়ালের মতো কাজ করত।

সব থেকে সেফ হয়, আমরা যদি মেয়েটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিই।

তপনের কথায় যমুনাকে সন্ত্রস্ত হতে দেখে থমকান মৃগাঙ্ক। অন্যমনস্ক ছিলেন বলে পরামর্শের মর্মে পৌঁছতে পারেননি। কথাটা আর একবার মনে মনে শুনে নেন। তারপর বলেন, পুলিশগুলো যে কায়দায় মেয়েটাকে খুঁজছে, মনে তো হয় না বাঁচিয়ে রাখবে।

একটু ভেবে নিয়ে, মাথা চুলকে তপন বলেন, তা অবিশ্যি ঠিক। মেয়েটা নির্ঘাত কোনও একজনের অথবা দলের বিপদের কারণ। পুলিশ দিয়ে ব্যাপারটাকে সাফ করার চেষ্টা হচ্ছে। বিষয়টার মধ্যে পুলিশও সরাসরি জড়িত থাকতে পারে।

ফের তিনজনে চুপচাপ। যমুনার কোলে মেয়েটা একবার চমকে উঠল। মেয়েটার বুকে আলতো করে দুবার টোকা মারলেন যমুনা। বাবুইয়ের পড়ার আওয়াজ ছাড়াও, সেলাই মেশিনের ঘরঘর ভেসে আসছে। হয়তো পাশের বাড়ির কেউ চালাচ্ছে মেশিন। মৌন অবস্থা ভাঙলেন তপন। বললেন, আর একটা কাজও করা যায়। কথাটা সন্ধেবেলা বলছিলাম

যমুনাকে।

কী কাজ? এটা জানতে চান গীতা, খুবই উৎসুক ভঙ্গিতে। তপন বলেন, এখানকার এক অনাথ আশ্রমে আমার চেনা-জানা আছে। মেয়েটাকে ওখানে দিয়ে দেওয়া যায়। পয়সা খাইয়ে দিলে ওরা জানতেও চাইবে না বাচ্চাটাকে কীভাবে পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের মানতে হবে। কোনও মতেই আর বাচ্চাটাকে দেখতে যাওয়া যাবে না। ওকে ভুলে যেতে হবে।

মৃগাঙ্কর মুখে বুঝি নিশ্চিন্ততার আলো জ্বলে ওঠে, যাক, মোটামুটি সুষ্ঠু একটা সমাধান পাওয়া গেল। ঘরের বাকি তিনজনকে চমকে হঠাৎ হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করলেন গীতা। যমুনার কোনও বিকার নেই। খুঁটিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে, চোখে তাঁর এক ধরনের অবহেলার দৃষ্টি। ওই দৃষ্টিতেই দেখলেন দিদিকে। তারপর দুই পুরুষের ওপর চোখ বোলালেন। স্ত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে মৃগাঙ্ক একটু তাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে তপনকে বলেন, প্ল্যানটা ভাল। তুমি আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

কথা শেষ হতেই মেয়ে কোলে উঠে পড়েন যমুনা। ধীর পায়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর মৃগাঙ্ক এখন গীতাদের বারান্দায়। ইজিচেয়ারে বসে বিড়ি খাচ্ছেন। আজকের সন্ধেটা নির্জলা গেল। রাতে ঘুম এলে হয়। তবে তপন বুদ্ধিটা ভালই দিয়েছে, মনটা আপাতত শান্ত। মেয়েটাকে আশ্রমে দিয়ে সমস্তিপুর ফিরে গেলে, পুলিশ হয়তো আবার আসবে। একটু জেরাটেরা, সামান্য অত্যাচার করবে ধরেই নেওয়া যায়। কোনও কিছু স্বীকার না করে, মুখ বুজে থাকলেই আবার সব আগেকার মতো।

পায়ের কাছে দুটো মশা উড়ছে, মাঝে মাঝে হুল ফোটাচ্ছে, পা ঝাড়া দিয়ে উঠছেন মৃগাঙ্ক। বড় বিরক্ত করছে তো এরা। আবছা অন্ধকারে ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না মশা দুটোকে। ও দুটোর একটা যেন বিবেক, অন্যটা অপরাধবোধ, এমনই মানে করছেন মৃগাঙ্ক। বিবেক বলছে, মেয়েটাকে যত্ন করে তুলে নিয়েও কেন তিনি অনাথ করে দিচ্ছেন? অপরাধটা হচ্ছে, যমুনার কোল ভরাট করেও খালি করে দেওয়া।

মৃগাঙ্ক নিরুপায়। মেয়েটার জন্য তাঁদের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। মশা দুটো কামড়াচ্ছে, কামড়াক। মৃগাঙ্ক সহ্য করেন।

অল্প অল্প হাওয়া বইছে বারান্দায়। বাতাসের গভীরে হেমন্তের গন্ধ। খুব ধীরে ঋতু বদলের পালা শুরু হয়েছে। দুর্গাপুজো অবশ্য এখনও পার হয়নি। চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে ঋতু। একই রকম থেকে যাবেন মৃগাঙ্ক, এবং তাঁর জীবন। একটা বৃত্তের মধ্যে। যেখানে কোনও ওঠাপড়া নেই। হঠাৎ কোনও সুসংবাদে উদ্বেল হবে না প্রাণ। হওয়ার নয়। যতবারই তিনি নিজের বৃত্তের বাইরে গিয়ে কিছু করতে গেছেন, আঘাত এসেছে ঠিক। খোঁড়া পা-টা বেড়া ডিঙোনোর ফল। রেল অবরোধ সরাতে মার্কিন সৈন্যরা যখন গুলি চালাতে শুরু করল, প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক, অবিনাশদা। দৌড়ে গিয়ে গাছের আড়াল নিয়েছিলেন। অবরোধ ছত্রাখান। প্রায় শুনশানই বলা যায়। টমিদের ট্রেন টানা কু-উ-উ হুইসল দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। হুইশেলের আওয়াজটা তখন দুয়ো দেয়া মনে হচ্ছিল। অবিনাশদা বলল, শালারা, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে আমাদের ঘাবড়ে দিল।

মৃগাঙ্ক বলেছিলেন, তাই যদি হয় খামোকা পালিয়ে এলাম কেন?

অবিনাশদা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মৃগাঙ্ক ফের বলেছিলেন, সবাইকে বলি, ওরা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করছে, ডরো মত। চলো ট্রেন আটকাই, ইট, পাথর ছুড়ি। সেটাই বোধহয় ভাল হবে রে, এখনও সময় আছে।

অবিনাশদার মুখ থেকে কথা খসেছে কী খসেনি। মৃগাঙ্ক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় ছোটাছুটি করতে করতে চেঁচাতে লাগলেন, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার, ডরো মত, নিকাল আও...

রাস্তার সমান্তরাল রেললাইন। সৈন্য ভর্তি ট্রেন থেকে ছুটে এল গুলি, লক্ষ্য শূন্য নয়, নির্দিষ্ট। প্রথমটায় মনে হয়েছিল অমিত শক্তির কেউ ধাক্কা মারল আচমকা। এখন বুঝতে

পারেন সে ছিল নিয়তি।

তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। নিজের ঘেরাটোপের বাইরে যাননি মৃগাঙ্ক। কিন্তু বাচ্চাটাকে না তুলে উপায় ছিল না। আস্ত রাখত না কুকুরগুলো। ফের এল আঘাত।

পা জ্বালা জ্বালা করছে। মশা আর উড়ছে না। রক্ত খেয়ে এলিয়ে পড়েছে। ঘাড়ের পেছনে কে যেন এসে দাঁড়াল। আন্দাজ করা যায় যমুনা। হ্যাঁ তাই। অভিমান-কঠিন গলায় যমুনা বলছেন, কোনওদিন তো ভাল করে ডাক্তার-বদ্যি দেখানো হল না দুজনের। যাও বা একটা কুড়িয়ে নিয়ে এলে, ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।

অন্ধকার মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকেন মৃগাঙ্ক। কোনও উত্তর দেন না।

কী হল, চুপ করে আছ যে বড়। বলে, যমুনা মৃগাঙ্কর সামনে এসে দাঁড়ান। চোখ তোলেন মৃগাঙ্ক। মেয়েকে কোলে নিয়েই বাইরে এসেছেন যমুনা। মেয়েটার কোনও সাড়া নেই। এখনও ঘুমোচ্ছে। এত ঘুমোয় কেন মেয়েটা! যমুনা ফের বলেন, আমি মেয়েকে দিচ্ছি না। তোমাকে সাফ বলে দিলাম।

অবুঝের মতো কথা বোলো না যমুনা। অন্য কোনও বাচ্চা হলে আমি তো না করতাম না। এর পেছনে পুলিশ পড়ে গেছে। নির্ঘাৎ বড়সড় ঝামেলা আছে বাচ্চাটাকে নিয়ে। আর তা ছাড়া আমি তো ওকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসছি না। আশ্রমে রাখছি। ঠিক বড় হয়ে যাবে।

এরপরে যমুনা যা করে, তা একদম অপ্রত্যাশিত। বাচ্চাটাকে উদোম মেঝেতে শুইয়ে দেয়। বলে, এখনই দিয়ে এসো তাহলে। মায়া বাড়িয়ে কী লাভ।

বারান্দা ছেড়ে ভেতর ঘরে চলে গেছে যমুনা। হঠাৎ ঠান্ডা মেঝের স্পর্শ পেয়ে মেয়েটা কেঁদে উঠেছে। মৃগাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। দুপা এগিয়ে নিচু হয়ে মেয়েটাকে তুলতে যাবেন, খামোকা একটা অতীত দৃশ্য চলকে উঠল মনে, ষোলোই আগস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ, সন্ধেবেলা। নিজেদের বাড়ির ছাদে পায়চারি করছে অবিনাশদা। পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মৃগাঙ্ক। অবিনাশদা ভীষণ অস্থির। কার থেকে কী শুনেছে, এবং বুঝতে পেরেছে, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়। পায়চারি করতে করতে কী সব বলে উঠছিল অবিনাশদা। কথাগুলো জোড়া দিতে পারছিলেন না মৃগাঙ্ক একটা সময় অবিনাশদার কী হল, মই লাগানো চিলেছাদে উঠে স্বাধীন ভারতের পতাকা লাঠি সুদ্ধু তুলে, ছুড়ে ফেলে দিল ছাদে।

তখন সব বাড়ির মাথায় উড়ত ফ্ল্যাগ। মৃগাঙ্ক বিষম বিস্ময়ে, পরম যত্নে ঝেড়ে পুঁছে তুলেছিলেন পতাকা। এখন যেভাবে তুলে নিলেন মেয়েটাকে।

॥ সাত ॥

মৃগাঙ্কর বলাইদা মানে বলাই সেনগুপ্ত গল্প করেছিলেন, তাঁর কুমিল্লা হাইস্কুলের হেডস্যার বিষ্ণুচরণ ঘোষ পাকিস্তানের স্বাধীনতার দিন লুকিয়ে ছিলেন, পাছে পতাকা উত্তোলন করতে হয়। আসলে এই স্বাধীনতা তাঁর মনঃপুত হয়নি। ব্রিটিশরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চাদপসরণ করলেও, নিজেদের স্বার্থ ভোলেনি। তাই তো দেশভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ঠুঁটো স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছিল দেশের মানুষকে।

ওপারের বিষ্ণুচরণ যখন স্বাধীনতা বিষয়ে এরকম মনোভাব পোষণ করছেন, একই সময় হাজার মাইল দূরে সমস্তিপুরের মাধব বসাক পনেরোই আগস্টের কিছুদিন আগে থেকে ভীষণ উদাসীন। মাধববাবু ছিলেন সুভাষ বসুর অনুরাগী। থাকতেন বাঙালিটোলায়। কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের উন্নতি-অবনতি যখন যেমন ঘটত, সমস্তিপুরের কংগ্রেসিদের সঙ্গে মাধব বসাকের সম্পর্কের হেরফের হত। সুভাষচন্দ্র দেশ ছাড়ার পর মাধব বসাক একটু নির্লিপ্ত, একা হয়ে যান। অবিনাশ ওঁকে মাধবকাকা বলে ডাকতেন।

মাধবকাকা হয়তো খাঁটি কংগ্রেসি ছিলেন না, সত্যিকারের দেশদরদি ছিলেন। তার প্রমাণ বহুবার পেয়েছেন অবিনাশ। সে যাই হোক, দেশ স্বাধীন হচ্ছে। সবার মধ্যে এক দারুণ উদ্দীপনা। বিশিষ্ট বাড়ির বৈঠকখানায়, রাস্তার 'চক'-এ জটলা হয়ে আলোচনা করছে সকলে। কোথাও কিন্তু মাধবকাকাকে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটায় খটকা লেগেছিল অবিনাশের।

পনেরোই আগস্ট এল। অবিনাশের স্কুলে, কোর্টে, ক্লাবে নানান সরকারি অফিসে ফ্ল্যাগ উঠল। সারাদিন জুড়ে চলল উৎসব। মাধবকাকা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, বড়দের মুখে তাঁর নাম একবারের জন্যও উচ্চারিত হচ্ছে না। অথচ মাধবকাকার কীর্তিকলাপ কিছুদিন আগেও লোকের মুখে মুখে ঘুরত। প্রকাশ্যে গাঁধীজির অহিংসা নীতির সমালোচনা করতেন। ব্রিটিশ-সমর্থক সমস্তিপুরবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন ত্রাস। কংগ্রেসের যে-কোনও আন্দোলনের সামনের দিকে থাকতেন তিনি। মাধবকাকাকে সামলানোর জন্য আর একজনকে রাখা হত, পাছে হাতাহাতি না করে ফেলেন। টমিদের ট্রেনে প্রথম ইট ছুড়েছিলেন ওই মাধবকাকা।

বিলাতি বর্জনের আবেদন নিয়ে যখন লোকের বাড়ি বাড়ি ঘোরা হত, মাধবকাকা থাকতেন সামনে। যেসব মেয়ে-বউরা সযত্নে লুকিয়ে রাখত বিদেশি শৌখিন জিনিস, সুড়সুড় করে এসে দিয়ে যেত ঝোলায়। এর অনেকটাই অবশ্য লোকমুখে, কিছুটা বাবার কাছে শুনেছেন অবিনাশ। কেননা তখন তিনি অনেক ছোট। তবে ট্রেনে পাথর মারাটা চোখের সামনে দেখেছেন। কী অসীম সাহস থাকলে, ট্রেন ভর্তি বন্দুক উঁচিয়ে থাকা সৈন্যদের পাথর ছোড়া যায়। ভাগ্যিস বৈদ্যনাথ জেঠু পাশেই ছিলেন, মাধবকাকার হাত টেনে শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে। একজন অহিংস, অন্যজন সহিংস। দুজন পাশাপাশি মাটিতে। ওপরে গুলি চালাচ্ছে সোলজার।

বৈদ্যনাথ জেঠুর সঙ্গে কোনওদিনই পটত না মাধবকাকার। জেঠু পাক্কা গাঁধীবাদী, মাধবকাকা ছিলেন সূর্যনারায়ণ সিংহের চেলা। সূর্যনারায়ণ সিংহের উদ্যোগে নেতাজি একবার ভাষণ দিতে এসেছিলেন সমস্তিপুরে। সে সময় একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে। সেইসব মতবিরোধ, অপ্রীতিকর ঘটনা ভুলে সবাই যখন স্বাধীনতার আনন্দ-উৎসবে মেতেছে, মাধবকাকা কেন নেই জানতে ইচ্ছে হয়েছিল অবিনাশের। পরের দিন অর্থাৎ ষোলোই আগস্ট দুপুরে গিয়েছিলেন বাঙালিটোলায় মাধবকাকার বাড়ি।

দরজা খুললেন কাকিমা। মাধবকাকার কথা জিজ্ঞেস করতে, হাত তুলে ভেতরবাড়ির দালান দেখালেন। সেখানে রোদসীমানার পাশে খালি গা, ধুতি পরে বসে আছেন মাধবকাকা। কোলের ওপর কাঁসার থালা। এক মনে কী যেন বাছছেন।

কাকিমা বললেন, দুদিন হল কোনও কথা বলছে না। দেখো যদি তোমার সঙ্গে বলে।

অবিনাশ কাছে গিয়ে দেখেন, থালায় অড়হর ডাল। আঙুল চেলে কাঁকর খুঁজছেন মাধবকাকা, পাচ্ছেন না।

মাধবকাকা! ডেকেছিলেন অবিনাশ।

চোখ তুলে তাকান মাধবকাকা। অবিনাশ ঝুঁকে পড়ে মাধবকাকার পা দুটো খোঁজেন। বলেন, আসুন, প্রণাম করি। আপনাদের জন্যই দেশ স্বাধীন হল আমাদের।

কাঁসার থালা পাশে রেখে অবিনাশকে জড়িয়ে ধরেছিলেন মাধবকাকা। হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলেছিলেন, এই দেশ আমাদের নয়। আমরা চাইনি এই দেশ। টেবিলে বসে আপসরফা করে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। এ এক ধরনের নির্মম পরাজয়। দেশ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রণক্লান্তির অজুহাতে মেনে নিলেন নেতারা। হীন চক্রান্তের স্বীকার হল দেশের মানুষ। আমাদের সমস্ত আন্দোলনকে নিয়ে মশকরা করল ব্রিটেন। আর কিছুদিন পর দেখবে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবে। আগুন জ্বলবে চারদিকে।....

হয়েওছিল তাই। সেদিন চক্রান্তের অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছিলেন মাধবকাকা। আর বারবার হা-হুতাশ করছিলেন নেতাজির জন্য। কেন ফিরে আসছেন না তিনি? তা হলে কি ফরমোজা থেকে যে বিমান উড়েছিল, সত্যিই তাতে সুভাষচন্দ্র ছিলেন!

মাধবকাকার সঙ্গে কথা বলে স্বাধীনতাটাকে ঠকে যাওয়া অচল পয়সা মনে হয়েছিল অবিনাশের। সেই কারণেই সন্ধেবেলা ছাদে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ উঠে যান মই বেয়ে। চিলেকোঠার মাথায় টাঙানো পতাকাটা ছুড়ে ফেলে দেন।

তারপর কত জল বয়ে গেছে বুড়িগন্ডকে। এখন দেশ বলতে ঠিক কী, বোঝেন, নিজেও জানেন না অবিনাশ। এই যে মধ্যরাত্রি ভেদ করে মিথিলা এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে সমস্তিপুরের দিকে, এখনও তাঁর ঘুম আসেনি, শুধুমাত্র দেশে ফেরার উত্তেজনায়। খালি মনে পড়ে যাচ্ছে পুরনো সব কথা। চোখে ভাসছে পৈতৃক বাড়ি। বাড়ির সবাই এখন অঘোর ঘুমে। তারা জানেই না অবিনাশ পৌঁছচ্ছেন কাল ভোরে। অবাক হয়ে যাবে সকলে। কোনও খবর না দিয়েই এবার অবিনাশ যাচ্ছেন। এতই যখন টান, তা হলে কেন চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে। ভাষার টানে? ভাষার মধ্যেই কি লুকিয়ে থাকে দেশ? দেশ মানে একটা স্পেস। ভাষার মধ্যে ওই অদৃশ্য স্পেসটাকে এখনও খুঁজে পাননি অবিনাশ। তিনি কি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন? তাই এত টানছে আপন পরিজন। বিশেষ করে মনে পড়ছে দাদার কথা। ডিসপেনসারির থামে বিশাল করে টিনের সাইনবোর্ড। হিন্দিতে লেখা ডাক্তার শুকদেব চ্যাটার্জি, বি. এম. বি. এস. ক্যালকাটা। চাকরি পেয়ে বোর্ডটা করিয়ে দিয়েছিলেন অবিনাশ। তার আগে ছোট কাঠের বোর্ড ছিল। সেই বোর্ডটা চলে গেছে চেম্বারের দরজায়, নামের তলায় ইন-আউট লেখা। কাঠের ছোট্ট শাটারে প্রয়োজন অনুযায়ী চাপা দেওয়া যায়। এটা এদিক-ওদিক করে রজতের মেয়েগুলো এখন খেলে। ডিসপেনসারির ঘর-দালান এখনও খাপড়ার চালের। সিমেন্টের করে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি। সংকুলান হয়নি টাকাপয়সার। ওয়েস্ট বেঙ্গল যাওয়ার আগে খেয়ালই হল না, একটা কাজ বাকি রয়ে গেল। এর পিছনে বড় কারণ হচ্ছে বাবা। উনি প্রায়ই বলতেন, দাদার জন্য অত কোরো না। প্রথম সন্তান হওয়ার সুবাদে আদর, আয়েসে মানুষ হয়েছে। তোমার মতো ভাইয়ের প্রশ্রয়ে অকর্মণ্য হয়ে যাবে।

একটা সময় দাদার পশার হু হু করে বাড়ছিল। নাম এমন ছড়িয়ে পড়ে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ করে দেয়। মারওয়াড়ি বাজারে সরকারি ডিসপেনসারিতে রেগুলার বসত দাদা। কত দূর দূর থেকে কল আসত। রিকশায় বা টাঙায় চেপে যেত দাদা। একজন ডাক্তার হয়তো আজীবন অপেক্ষা করে তার কাছে এমন দু-একটা জবাব দেওয়া কেস আসুক, সেটার আরোগ্য হলেই 'মিথ' তৈরি হয়ে যাবে। সেরকম বেশ কটা পেশেন্ট পেয়েছিল দাদা, তাদের মধ্যে যেমন গরিব দেহাতি মানুষও ছিল, শহুরে উচ্চবিত্তও ছিল। তারাই কিছুটা গল্প-কাহিনী মিশিয়ে ডাক্তার শুকদেব চ্যাটার্জির নামের সঙ্গে ধন্বন্তরি আখ্যা জুড়ে দেয়।

বিয়ের পর দাদা দ্বারভাঙা লাইনে কিষণপুরে ডিসপেনসারি খোলে। সপ্তাহে তিনদিন

বসত। রোগীর ভিড় হত ভালই। এলাকার মানুষ দাদাকে যে কী হারে সম্মান করত, যে না দেখেছে, বলে বোঝানো যাবে না।

অবিনাশ বেশ কয়েকবার দাদার সঙ্গে টাঙা বা রিকশায় চেপে ডিসপেনসারিতে গেছেন। দেখেছেন, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর কেউ-না-কেউ দাদাকে হাত তুলে সালাম বা নমস্কার জানাচ্ছে। প্রত্যুত্তর দিয়ে যাচ্ছে দাদা। অবিনাশ মজা করে দাদাকে বলতেন, তুমি হাতটা মাথায় ঠেকিয়েই রাখ। এত নমস্তের জবাব দিতে হচ্ছে।

মোটাসোটা চেহারার দাদা মিটিমিটি হাসত। বলত, আসলে ওরা তো আমাকে নমস্কার করে না। করে পরিত্রাতাকে। মানুষের মধ্যেই খোঁজে তাঁকে। না পেলে মূর্তি অথবা নিরাকারের উপাসনায় যায়।

ঈশ্বরবিশ্বাস নড়বড়ে ছিল দাদার। বাইরে ঠান্ডা প্রকৃতির দেখতে হলেও, ভেতরটা ছিল ভীষণ চঞ্চল। কোনও ব্যাপারেই থিতু হতে পারত না। অজস্র অদ্ভুত প্রশ্ন জেগে উঠত মনে। বাবাকে জিজ্ঞেস করত। যত দূর সম্ভব উত্তর দিতেন বাবা। না পারলেই দাদার মুখ হয়ে যেত ভার। কপাল কুঁচকে সর্বদা ভেবে যেত মনে উদ্ভূত সেইসব প্রশ্ন। দাদার আড়ালে বাবা বলতেন, আমার বড়ছেলে হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যার হাতে জ্বলন্ত আলো কিন্তু চোখ রেখেছে বন্ধ। তাই সমস্তটাই অন্ধকার দেখে। হাতে আলোর উত্তাপ অসহ্য ঠেকলেই ছটফট করে ওঠে ওর মন। চোখ খোলে না।

বাবার বিবেচনার মধ্যে চমক ছিল, হেঁয়ালি ছিল, যুক্তি বড় কম। অল্প বয়সে এতটা বুঝতেন না অবিনাশ। তখন বাবার কথাই বেদবাক্য মনে হত। এখন বুঝতে পারেন তুলনায় দাদার প্রশ্নগুলোই ছিল অনেক লজিকাল। আজও দাদার একটা প্রশ্ন বেশ মনে আছে অবিনাশের। বাবা খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। দাদা জিজ্ঞেস করেছিল, আত্মার কি চেতনা থাকে বাবা?

নিশ্চয়ই থাকে।

কী করে থাকবে! মেনে নিলাম আত্মা অবিনশ্বর। আগুনে পোড়ে না। কিন্তু চেতনা বা অনুভূতি লোপ পায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। চৈতন্যহীন আত্মার অর্থ কী? কেন তাকে আমরা এত গুরুত্ব দেব।

বাবার বেসামাল অবস্থা। এর উত্তর ভাবা নেই। এড়িয়ে গিয়ে বলেন, তোমার সব জিজ্ঞাসার উত্তর তোমাতেই নিহিত আছে। ঈশ্বরে অনুগত হও। ধ্যান করো। পারলে কোনও গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে বীজমন্ত্র জপ করো। দেখবে সব উত্তর পেয়ে যাবে।

দাদা আজও কোনও গুরুর আশ্রয় নেয়নি। তবে আগের মতো প্রশ্নও আর করে না। কবে থেকে যেন দাদার সমস্ত জিজ্ঞাসা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নিস্তরঙ্গ উদ্দীপনাহীন জীবন কাটাতে লাগল দাদা। কথা বলত খুবই কম। বিষয়টা বাবার চোখে প্রথমে পড়ে। খুব নিকটজনকে বলতেন, শুকদেবের বিষাদযোগ শুরু হয়েছে। একটু চোখে চোখে রাখতে হবে। এই অবস্থাটা কেটে গেলেই ও পেয়ে যাবে অপার আনন্দের পথ। যে পথে পড়ে আছে ঈশ্বরের অশেষ করুণা। দাদা সে পথ পায়নি। এখনও বিষাদ ছেড়ে যায়নি তাকে। ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে। তবে অনেকদিন বাদে যখনই দেখা হয় ছোট ভাই অবিনাশের সঙ্গে, মুখে ফুটে ওঠে জন্মান্তরের হাসি। কী আশ্চর্য, রহস্যময় সেই আত্মীয়তাবোধ।

আপ্লুত হন অবিনাশ। বড়দা হয়ে কোনওদিনই তেমন কিছু সাহায্য করতে পারেনি ভাইকে। নিয়েই গেছে সবসময়। ওই হাসিটুকু দিয়ে সব শোধবোধ করে দেয়।

এখনও একটা ছোট্ট আপসোস থেকে গেছে অবিনাশের মনে, দাদার বিয়েটা প্রায় তাড়াহুড়ো করেই দিয়েছিলেন অবিনাশ। নিজের স্বার্থে। বিয়ের প্রস্তাবে দাদা অবশ্য না করেনি। পাত্রীকে সে নিজে দেখে পছন্দ করেছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রি পার করে, ভোরবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদাসভাবে সিগারেট খাচ্ছিল দাদা।

দৃশ্যটার মধ্যে গভীর এক হতাশার গন্ধ পেয়েছিলেন অবিনাশ। দাদার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আড়চোখে ভাইকে দেখে নিয়ে দাদা বলে, ঠকে গেলাম রে, তোর বউদি কোনওদিন

সন্তান ধারণ করতে পারবে না।

অবিনাশের সামনে যেন বজ্রপাত হল। শুধু ঝলকানি দেখলেন, শব্দ হল না। এতটাই নির্লিপ্ত ছিল দাদার গলা। অবিনাশ বলে উঠেছিলেন, তুমি কী করে বুঝলে? আমি ডাক্তার, এটুকু বুঝব না। তা ছাড়া তোর বউদি সব কিছু স্বীকার করেছে।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল দাদা। তাজপুর রোডে ভোর জাগছে। দুরের কোনও বাড়ি থেকে মুরগি ডেকে উঠল। ফাঁকা টাঙা চলে গেল স্টেশনের উদ্দেশে। সকালের ট্রেনের প্যাসেঞ্জার ধরবে। দাদা বলে, যাক, এদিক থেকে ভালই হয়েছে। আমার ছেলেপুলে হলে বংশের ভার তো তাদের বইতেই হত। কষ্ট হত আমার। সে ব্যাপারটা থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

'ভার' শব্দটা বলে, এক কথায় অনেক কিছু বলল দাদা। সেই মুহূর্তে ওকে একটু স্বার্থপরও মনে হচ্ছিল। আবার অবিনাশ এটাও বুঝতে পারছিলেন, দাদার এই মনোভাব আসলে প্রচণ্ড হতাশার বহিঃপ্রকাশ। সিগারেট ফেলে দিয়ে দাদা চলে গিয়েছিল বাড়ির ভেতরে। অবিনাশের শরীরে লেগে থাকা ইলার সৌরভ ততক্ষণে উধাও। সারারাত ধরে নিশিগন্ধার মতো ফুটে উঠেছিল ইলা। শিক্ষক-ছাত্রীর বেড়া ভেঙে চুরমার তখন। হাতির মতো প্রমত্ততায় অবিনাশ ঢুকে গিয়েছিলেন রজনীগন্ধার ক্ষেতে। সেই হাতি এখন আক্ষেপে ন্যুব্জ, নিঃসঙ্গ, একা। রাগ গিয়ে পড়েছিল বউদির ওপর। ওদের বাড়ির সবার ওপর ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। কেন সব কিছু চেপে গিয়ে ওরা মেয়েকে গছিয়ে দিল। হয়তো এমনও হতে পারে, বউদি, বউদির মা সব কিছু জানত। তারাদা কিছুই জানত না। মজফফরপুরের মেসের ম্যানেজার তারাদা। অবিনাশ যখন দাদার জন্য হন্যে হয়ে পাত্রী খুঁজছে, তখন তারাদা একদিন কুণ্ঠাভরে বলে, আমার বড় বোনটাকে একটু দেখবি। দেখ না যদি তোদের বাড়িতে একটু স্থান পায়। জানি তোরা খুব উঁচু বংশ। তবু দেখতে ক্ষতি কী!

কালক্ষেপ করেননি অবিনাশ। প্রথমে নিজে গিয়ে দেখেছেন। একটু শ্যামলা, মুখটা ভারী মিষ্টি। নিজের পছন্দ হতেই বাবা-দাদাকে ডেকে পাঠান। অবিনাশের তখন ভীষণ তাড়া। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে আছে, পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না।

তারিখ কেন হঠাৎ নির্দিষ্ট হয়ে গেল? এর পিছনে আছেন অবিনাশ স্বয়ং। ইলার ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরোনোর পর অবিনাশ পড়াতে গেছেন। ইলার দাদা শেখর বলল, বোনকে আর পড়িয়ে কী হবে রে। আগস্টে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কলকাতায় মাসির বাড়িতে। মা-বাবারা আর কিছুদিনের মধ্যে চলে আসছে ইন্ডিয়ায়। গোবরডাঙা বা মছলন্দপুরে জমি কিনবে বাবা। ইলা তারপর থেকে ওখানেই থাকবে।

শেখরের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল অবিনাশের। একই ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন দুজনে। খুবই বন্ধুত্ব ছিল তাদের। ইলাকে পড়ানোর প্রস্তাবটা শেখরই একদিন দিয়েছিল। কদিন খুব উশকোখুশকো চেহারায় অফিস আসছিল শেখর। অবিনাশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্যাপার রে, তোকে যেন কদিন কেমন লাগছে।

আর বলিস না। বাবা পাকিস্তান থেকে দু বোনকে নিয়ে এসে আমার কাছে রেখে গেছে। আমিই আছি মামার আশ্রয়ে। তারপর আবার দু বোন।

মজফফরপুরে শেখরের মামার বেশ নামডাক। পেট্রোল পাম্পের মালিক। কোনও সন্তান নেই। একটি ছেলে ছিল, অল্প বয়সে মারা যায়। শেখর মোটেই আশ্রয়প্রার্থীর মতো ছিল না। যথেষ্ট তোয়াজে ছিল। সুপুরুষ শেখর খুবই শৌখিন ধাতের ছেলে। দুই বোনের আগমনে ভয় পাচ্ছে, যদি শৌখিনতায় ঘাটতি পড়ে। —শেখরের সামনে দাঁড়িয়ে তখন এমনটাই মনে হচ্ছিল অবিনাশের। দীর্ঘশ্বাস সমেত শেখরের পরের কথায় ভুল ভেঙে ছিল। শেখর আপসোসের ভঙ্গিতে বলে ওঠে, খারাপ কী লাগছে জানিস, বড় বোনটা মানে ইলার পড়াশোনার মাথা খুব ভাল। খানসামা স্কুলে ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল। মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে স্কুল ছাড়িয়ে দিল বাবা। অথচ আমাদের খানসামা গ্রামে কোনও হিন্দু মেয়ের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেনি। অন্য গ্রামের তিল থেকে তাল হওয়ার খবরে বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। দু বছর হল স্কুল ছাড়িয়েছেন, এখন পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে। এক সঙ্গে

দুজনকে। ইলা-শীলা এক বছরের ছোট বড়। এই দুটোকে নিয়ে আমি যে এখন কী করি কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। বাবা চিঠিতে আগেই লিখে দিয়েছিলেন, পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পুত্রের। দেশভাগ, দাঙ্গার কারণে আমাদের পরিবার বিপর্যস্ত। তোমার দুই বোনকে নিয়ে যাচ্ছি। বেশিদিন মামার আশ্রয়ে থেকো না। এতে আমার সম্মান কমে বই বাড়ে না। আলাদা বাসা ভাড়া করে বোনেদের নিয়ে থেকো। ওদেরকে মানুষ কোরো। ...

কথা অসমাপ্ত রেখে ফের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল শেখর। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে অবিনাশ বলেছিলেন, অত ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সামনের একদিন যাব তোর মামার বাড়ি। দেখব তোর বোনেরা লেখাপড়ায় কেমন।

যাবি। চোখে আশার আলো জ্বলে উঠেছিল শেখরের। তারপর বলে, আজকেই চল। তোর গাইডেন্সে থাকলে বোন দুটো মানুষ হবে। এখানকার সমাজে বার করা যাবে ওদের। জানিসই তো মামার কত বড় বড় লোকের সঙ্গে ওঠাবসা। এসে থেকে মামারবাড়িতে কুঁকড়ে আছে বোন দুটো।

অবিনাশ আসতে চাওয়ায় শেখরের আনন্দিত এবং উৎসাহিত হওয়ার কারণ গৃহশিক্ষক হিসেবে অবিনাশের তখন খুব নাম। চাকরির জন্য সমস্তিপুর ছেড়ে মজফফরপুরে থাকে। সকাল বিকেল টিউশন পড়ায়। অফিসে সক্রিয় ইউনিয়ন করে। যা রোজগার করে বেশির ভাগটাই পাঠিয়ে দেয় সমস্তিপুরের বাড়িতে। সৎ, পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা যুবক বলতে যেমনটি বোঝায়। আর একটা ছোট্ট হিসেব সম্ভবত করেছিল শেখর। যদি অবিনাশ বোনেদের পড়ানোর ভার নেয়, টাকাপয়সা কিছুতেই নেবে না।

এদিকে অবিনাশের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে ওই দুটি মেয়েকে দেখার জন্য। কোন সুদূর পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম থেকে এসেছে দুই মেয়ে। তাদের কেমন দেখতে, হাবভাব কী রকম!

একদিন বাদ দিয়ে অফিসের পর শেখরের সঙ্গে গেলেন ওর মামার বাড়ি। আগেও এসেছেন। বাংলা সিনেমার বড়লোকের বাড়ির মতন। একতলাটা পুরোটাই বসার জায়গা। কারুকাজ করা গদি আঁটা সোফাসেট দিয়ে অঞ্চল ভাগ করা। ছোট-বড়রা আলাদাভাবে আড্ডা মারতে পারে। দক্ষিণ প্রান্তে একটা বিলিয়ার্ড বোর্ড আছে। ঘরের মধ্যে থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ওপরটাই বাড়ির অন্দরমহল।

শাড়ি পরা দুই বোন বই-খাতা হাতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল। একজন ভীষণ ফরসা, অন্যজন সামান্য কম। দুজনেরই পুতুল পুতুল গড়ন। দৃষ্টি নীচের দিকে। অতি ফরসা মেয়েটি যে বড় বুঝতে অসুবিধে হয় না। তার মুখে সহজাত গাম্ভীর্য। তবে সেই গাম্ভীর্যে ছিটেফোঁটা কাঠিন্য নেই, খুবই কমনীয়।

দু বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে শেখর কেটে গেল। অবিনাশ উলটে পালটে দেখতে লাগলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা দুই বোনের বই-খাতা। ইলার বইখাতায় যত্নের ছাপ স্পষ্ট। শীলার মোটেই তা নয়।

ওদের কোর্স কী ধরনের ছিল, কত দূর পর্যন্ত পড়েছে, বই দেখতে দেখতে জানছিলেন অবিনাশ। মাঝে মাঝেই চোখ থেমে যাচ্ছিল ইলার চোখে। দুই বোনই বেশ শীর্ণ, নতুন পরিবেশের জন্য সংকুচিত। মনে হচ্ছিল মাটি আঁকড়ে ধরা বাড়ন্ত ফুলগাছ তুলে নতুন মাটিতে লাগানো হয়েছে। গাছের ঝিমুনি ভাবটা এখনও কাটেনি। কিন্তু ইলার চোখ ছিল আশ্চর্য সজীব। অনাবিষ্কৃত ভাষায় কথা বলছিল অবিনাশের চোখের সঙ্গে। চোখ নামিয়ে নিতে হচ্ছিল অবিনাশকে। ইলার চোখ দুটো যেন গ্রামবাংলার যমজ পুকুর। যে-বাংলায় বারবার যেতে চেয়েছেন অবিনাশ, কখনও হয়ে ওঠেনি।

শীলা উঠে গিয়েছিল অবিনাশের খাবার আনতে। চোখ যাই বলুক ইলার, মুখ ছিল সিরিয়াস। খুব কম কথায় ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিচ্ছিল তার স্কুল বিদ্যার অবস্থান। এত ইনোসেন্ট ছিল ওর উপস্থিতি, অবিনাশের কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল, ইলা হয়তো জানে না

দৃষ্টি ওর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে অন্য ভাষায় কথা বলছে।

শীলা খাবার নিয়ে এল। অবিনাশ দু বোনের পড়া বুঝে নিয়ে বলেছিলেন, শীলাকে একটু খাটতে হবে। আর ইলা তুমি যদি বছর দেড়েক খেটে পড়াশোনা কর, অনায়াসে এখানকার ম্যাট্রিক দিতে পারবে।

ইলার মুখে দেখা দিয়েছিল আশার উদ্ভাস। যেন রোদ এসে পড়ল ঝিমোনো গাছটায়। দিদির খুশিতে শীলাও উৎফুল্ল। বলে ওঠে, জানেন অবিনাশদা, খানসামা স্কুলে দিদি থার্ড-সেকেন্ড হইত। আমি প্রতিবারই টাইনা-টুইনা পাস।

পরের দিন থেকেই অবিনাশ উঠে-পড়ে লাগলেন দুই বোনকে পড়াতে। নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের কোনও ঠিক ছিল না। যখনই সুযোগ পেতেন চলে যেতেন ও-বাড়িতে।

শেখরের মামা, মামিমা খুবই মুক্তমনের মানুষ। অবিনাশের যখন তখন আসা যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করতেন না। তা ছাড়া অবিনাশের ব্যক্তিত্ব সব সময়ই বয়সের নিরিখে ভারী দেখায়। ইলার আচরণ ছিল অত্যন্ত সংযত, জলের গ্লাস এগিয়ে দিতে গিয়ে অতি সতর্ক থাকত, অবিনাশের হাতে হাত না ঠেকে যায়। ওই অতি সতর্কতার মধ্যে লুকিয়ে থাকত প্রেম।

শীলা ছিল চোরা ফাজিল এবং ফাঁকিবাজ। কিছুদিনের মধ্যেই সে চলে গেল কলকাতায় মাসির বাড়ি। হয়তো অবিনাশের কঠোর শিক্ষকতার গুঁতোয়। এমনও হতে পারে শীলা তার দিদিকে একলা ছেড়ে দিয়ে গেল অবিনাশদার কাছে। হবেও বা। এ প্রসঙ্গ আর ওঠেনি ইলার সামনে। পরে শীলা যা করল, পুরোপুরি ব্রাত্য হল সমস্ত পরিজন থেকে। কেন যে অমন করল শীলা। অবিনাশের স্থির বিশ্বাস শীলা যদি আর কিছুদিন অবিনাশের গাইডেন্সে থাকত, এমন খারাপ ঘটনা ঘটাতে পারত না।

এখন এসব ভেবে আর লাভ নেই। নিজের কৃতকর্মের জন্য শীলার কোনও অনুশোচনা নেই। সে ভুলেও যোগাযোগ করে না পরিবার-পরিজনের সঙ্গে।

সে যাই হোক, ইলা নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় সহযোগে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করল সেকেন্ড ডিভিশানে। শেখর তো কৃতজ্ঞতায় গদগদ। সবে যখন অবিনাশ ভাবছেন ইলাকে এবার প্রাইভেটে আই-এ দেওয়াবেন, সেই সময় শেখর একদিন অফিসে বলল, ভাবছি, ইলাকে মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দিই। বাবার সেরকমটাই ইচ্ছে। কলকাতায় থাকলে দু বোনের পাত্র পেতে সুবিধে হবে।

অবিনাশ রীতিমতো হতচকিত। এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কল্পনাতেও ছিল না। খুবই অস্থির, অসহ্য লাগছিল তাঁর। শেখরের অনুভূতি তেমন সূক্ষ্ম নয়, লক্ষ করেনি অবিনাশের ভাবান্তর। বলে ওঠে, তুই কী বলিস, সেটাই ভাল হবে না? অবিনাশ বলেন, তোর বোন। তুই যেমন ভাল বুঝবি।

মুখে একথা বললেও মন এমন বিক্ষিপ্ত হল যে, দুটো রাত অনিদ্রায় কাটল। মজফফরপুরের রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়ালেন অবিনাশ। একদিন অফিস গেলেন না। মাথায় তখন একটাই কথা ঘুরছে, ইলা কেন রাজি হচ্ছে যেতে? অনেক না বলা কথার মধ্যে দিয়েও তো বহু কিছু বলা হয়েছে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন দুজনে। সেসবের সাক্ষী আছে, হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া। জানলা বন্ধ করতে উঠে গেল ইলা। বৃষ্টির ছাঁট আসতে পারে অবিনাশের গায়ে। হয়তো তেমন ঠান্ডা পড়েনি, রাতে পড়িয়ে মেসে ফিরবেন অবিনাশ, ইলা জোর করে মাফলার গছিয়ে দিল। সেই মাফলার হয়ে গেল সাক্ষী। একদিন যেমন বিকেল ফুরোতেই অবিনাশ পৌঁছে গেছেন পড়াতে। ইলা বাড়ির সবার জন্য চা করছিল। ওর চায়ের হাত ভাল। অবিনাশ এসে গেছেন বলেই তাড়াহুড়োতে চায়ে চিনি দিতে ভুলে যায়। অবিনাশ কিছু বুঝতে না দিয়ে সেই চা-টা গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু মামিমা চেঁচামেচি শুরু করেছেন, এ কী চা হয়েছে ইলু! চিনি দিসনি যে। মন কোথায় থাকে! একথা শুনে যে-কেউ জিভ কাটত, ছুটত চিনি আনতে। বদলে ইলা ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে শুরু করল। ওকে সামলাতে গেলে, বলল, কেন আপনি কিছু না বলে পুরো চাটা খেয়ে নিলেন?

সেই কয়েক ফোঁটা অভিমানী জল হয়ে গেল সাক্ষী। আর একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে,

রবিবারের সকালে খুব মন দিয়ে ছাত্রীকে পড়াচ্ছেন। ইলাও নিবিষ্ট। এমন সময় জানলার সোজাসুজি পাশের বাড়ির কার্নিশে বসে একটা কোকিল বেদম ডাকাডাকি শুরু করল। চিড় খেয়ে গেল দুজনের একাগ্রতায়। হেসে ফেললেন দুজনে। হাসি প্রলম্বিত হল। হেসে কুটিপাটি। পাখিটা গেল ঘাবড়ে। ডাক থামিয়ে দিল। রয়ে গেল সাক্ষী।

ইলাকে কিছুতেই যেতে দেওয়া যাবে না কলকাতায়। দুদিন ডুব মারার পর তৃতীয় দিন অবিনাশ গেলেন ওদের বাড়ি। যখন শেখর থাকে না। ইলাকে সরাসরি বললেন, এ কী শুনছি, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

কার ইচ্ছেয়। তোমার কি এতে মত আছে?

গুরুজনদের ইচ্ছেয়।

কিন্তু এরকম কথা তো ছিল না। আমি তোমাকে ম্যাট্রিক পাস করালাম, ইচ্ছে ছিল আই. এ-টাও করার। হঠাৎ এরকম একটা সিদ্ধান্তের কারণ?

আমারও ইচ্ছে ছিল এখানে থেকে পরের পরীক্ষাটা দেওয়ার। কিন্তু কী করব, বড়দের কথা শুনতেই হবে।

আমি কি তোমার গুরুজন নই? কোনও দাম নেই আমার মতামতের!

আছে। তাহলে কিন্তু দাদাকে কথা দিতে হবে, আমার আজীবনের ভার নিচ্ছেন।

কথার ইঙ্গিতটা ধরতে কয়েক পল লেগেছিল অবিনাশের। তারপর বোকা বনে যাওয়ার হাসি হেসে ফেলেন। জীবনে এত খুশি আর কখনওই হননি। ইলা লাজুক হেসে পালিয়েছিল।

দেরি করেননি অবিনাশ। পরের দিনই অফিস ফেরত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন শেখরকে। শেখরের তো চোখ কপালে উঠে গেছে। বলেছিল, কী বলছিস তুই! তোদের এত বড় বনেদি বংশ, মেনে নেবে আমাদের মতো তাড়াখাওয়া বাঙালদের মেয়েকে! তোরা যে গোঁড়া ঘটি। তোর বাবার সঙ্গে কথা বলেছিস?

বলব। বলে রাজি করাব ঠিক। তোদের কোনও অমত নেই তো?

প্রশ্নই ওঠে না। না চাইতেই তো আমরা হাতে চাঁদ পেলাম। তুই আগে তোর বাবাকে রাজি করা।—একটু থেমে শেখর বলেছিল, হ্যাঁ রে, তোদের মধ্যে কখন এসব হল, আমি তো টেরই পেলাম না। ইলার মতো শুষ্কং কাষ্ঠং মেয়ের মনে এমন বদল, আমি ভাবতেই পারছি না!

অবিনাশ মনে মনে বলেছিলেন, তুই শালা বগলে পাউডার মাখা ভেতো বাঙাল। তোর কি এসব বোঝার বোধ আছে। মুখে বলেছিলেন, আমি কালই সমস্তিপুর যাচ্ছি। বাবাকে সব ব্যাপারটা জানাতে।

সমস্তিপুরে এসে বাবার সামনে কিন্তু মিইয়ে গেলেন অবিনাশ। ওই পাঁচ ফুট দুই-তিন ইঞ্চি মানুষটার এমন প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল, রাস্তায় ঘোরা পাড়ার পাগলও সমীহ করত। সন্ধেবেলা বাবার ঘরে ঢুকেছেন অবিনাশ। বাবা বললেন, কী ব্যাপার, তুমি সপ্তাহের মাঝে হঠাৎ চলে এলে?

গোড়াতেই মোক্ষম প্রশ্ন। আমতা আমতা করে অবিনাশ বলেছিলেন, কদিন ধরে বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছিল। ছুটি তো জমে আছে অনেক....

ভাল। বলে, চোখ বন্ধ করলেন বাবা। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। অবিনাশ কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। বয়সে বা সম্পর্কে কনিষ্ঠ কারও সঙ্গে কথা বলার সময় চোখ বুজে থাকতেন বাবা। অনেক বিরতি নিয়ে কথা চালাতেন।

অবিনাশ সেদিন এটা-সেটা নানান কথা বলতে শুরু করে দেন, যদি প্রসঙ্গক্রমে নিজের বিবাহের কথাটা বলতে পারেন। আসছিলই না সেরকম কোনও সুযোগ। এমনকী নিজের দুই অনূঢ়া কন্যার বিষয়ে এতটুকু উদ্বিগ্ন নন বাবা। ওদের বিয়ের কথা উঠলে তবু বিবাহ প্রসঙ্গটা আসে। বাবা থেমে থেমে বলে যাচ্ছিলেন, আধ্যাত্মিক সব কথা। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, মানুষের জীবন আসলে প্রারব্ধ যাপন। এই জীবনকে যতটা নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করা যায়,

ততই ঈশ্বরের সান্নিধ্য মেলে। —আর একটা কথা প্রায়ই বলতেন বাবা, কথায় কথায় সেদিনও এল, কেউ যায় পালকিতে চেপে, কেউ নিয়ে যায় পালকি বয়ে। দুজনেই যাচ্ছে ঈশ্বরে লীন হতে। এখন তুমি বেছে নাও কোন পথটা নেবে? ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে তুমি যাবে পালকি চেপে। —কথাটি হয়তো কোনও মহাপুরুষের, বাবা তাঁর নামটা উল্লেখ করতেন না। আবার হতে পারে এটা বাবারই কথা। সত্যি বলতে কি, বাবার মধ্যে এমন সব পরস্পরবিরোধী ভাবনা এবং আচরণ ছিল। চট করে বড় মাপের পুরুষ হিসেবে স্থান দিতে মন চাইত না, সংসার সম্বন্ধে চিরকালই ছিলেন উদাসীন, তার পিছনে একটা দার্শনিক যুক্তি খাড়া করা ছিল। — ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছেড়ে বাবা সেদিন চলে গেলেন নিজের বংশগৌরবের বর্ণনায়। সেসব অধ্যায় বহুবার শুনেছেন অবিনাশ, ফের শুনতে হচ্ছিল ধৈর্য সহকারে। বাবা বলে যাচ্ছিলেন, ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন বিপ্লবী টাইপের মানুষ। সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত। হালিশহরে টোল ছিল তাঁর। জমিদারের সঙ্গে খটামটি লেগেই থাকত ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের। ফলস্বরূপ তাঁর খুন হওয়া দেহ পাওয়া গিয়েছিল ধান ভরা ক্ষেতের পাশে। ঠাকুর্দার মা সন্তানাদি সমেত চলে আসেন ভাগলপুরে। যেখানে তাঁর বাপের বাড়ি। ভাগলপুর থেকেই শুরু হয় অবিনাশদের বংশের বিস্তার। ঠাকুর্দার বড় ভাই পুলিনবিহারী মস্ত মানুষ, ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বেশিদিন ইংরেজদের গোলামি করেননি। চাকরি ছেড়ে যোগ দেন কংগ্রেসে। পার্টির বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি। তবে বোমাটোমা কখনও ছোড়েননি, কোনও সাহেবকে চমকপ্রদভাবে পর্যুদস্ত করতে শোনা যায় না। বাবার কাছে তাঁর গুরুত্ব ততটা ছিল না, যতটা ছিল ঠাকুর্দার সম্পর্কে, ঠাকুর্দা ঊষানাথ ছিলেন বিষম সাহসী। শিকারের শখ ছিল তাঁর। একবার হাতির পিঠে চেপে ঠিকাদারের তৈরি রাস্তা পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছেন, জেলা বোর্ডের পরিদর্শক ছিলেন উনি। সন্ধে হয় হয়, এমন সময় রাস্তার ঢালুতে ডোরাকাটা বিশাল কী একটা যেন... ঠাকুর্দার বীরত্বের কারণে কোথাও কোনও রাস্তার নামকরণ হয়নি, হয়েছে পুলিনবিহারীর নামে। বড়ঠাকুর্দার কোনও সন্তানাদি হয়নি। বিয়ের কিছু বছরের মধ্যে বিপত্নীক হন। বউবাজারের একটা বাড়িতে শেষ বয়সটা কাটিয়েছেন পুলিনবিহারী। তাঁর নামে বাড়ির সামনের রাস্তাটার নাম হয়েছে। শোভাবাজারে থাকাকালীন অবিনাশ রাস্তাটা দেখেও এসেছেন। ওঁর বাসস্থানের খোঁজ কেউ দিতে পারেনি। ইচ্ছে আছে আর একদিন গিয়ে খুঁজে বার করবেন। ... সেদিন বাবার সামনে থেকে উঠতে পারছিলেন না অবিনাশ। বিরক্ত হয়ে বাবার কথায় হ্যাঁ, হুঁ দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। উঠে গেছে ছেলে, এই সন্দেহে চোখ খোলেন বাবা। বলেন, তুমি বোধহয় আমাকে কিছু বলতে এসেছিলে।

না মানে। সংকোচ বোধ করছিলেন অবিনাশ।

বাবা বলেন, বলে ফেল। তুমি তো এতক্ষণ বাবার সামনে বসে থাকার ছেলে নও। খুবই ভয়ে ভয়ে অবিনাশ বলেন, আসলে কী হয়েছে বাবা, আমার কলিগ শেখর চক্রবর্তী। ওদের বাড়ি পূর্ব পাকিস্তানে। ও অনেকদিন চলে এসেছে এখানে। মজফফরপুরে মামাবাড়িতে থাকে। ওপারে তো গণ্ডগোল লেগেই থাকে। শেখরের বাবা দু মেয়েকে রেখে গেছেন মজফফরপুরে। বড় বোনটাকে বিয়ে করার জন্য শেখর আমায় খুব ধরেছে। আমি বলেছি, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করি।

মেয়েটিকে নিশ্চয়ই তুমি দেখেছ?

আচমকা প্রশ্নে অবিনাশ 'হ্যাঁ বলে ফেলেন। বাবা বলেন, পাত্রীটিকে তোমার পছন্দও হয়েছে। বাবাকে শুধু জানাতে এসেছ। তার মানে পণটন তৈমন কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনে রেখো তোমার দুটি বোন আছে, তাদের বিবাহ দিতে হবে।

ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমরা তিন ভাই আছি তো।

অন্য দুই ছেলের ওপর আমি নির্ভর করি না। তুমি ভাল করেই জান আমার যত বলভরসা তোমাকে নিয়ে। তা মেয়েটির স্বভাবগুণ কেমন, বাড়ির সবাইকে নিয়ে থাকতে পারবে তো?

মনে হয় তো পারবে। তবে আপনি দেখতে গিয়ে যতটা বুঝতে পারবেন, আমি কি পারব?

একটা বড় শ্বাস টেনে নিয়ে বাবা ধীরে ধীরে বলেন, আমার দেখতে যাওয়া মানে তো লোকদেখানো। যদি সত্যিই চাও আমি দেখি, তা হলে তোমার দাদার জন্য পাত্রী দেখ। এটাই রীতি। বড় ভাইয়ের আগে বিয়ে হওয়া উচিত। তোমরা না হয় একই সঙ্গে করবে। অবিনাশের খেয়াল হয়, তাই তো তাড়াহুড়োতে এদিকটা ভাৰাই হয়নি। দাদা যদি এখন বিয়েতে রাজি না হয়!

বাবা ফের চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন। বলে যাচ্ছেন, শুকদেবের বিবাহ অত্যন্ত জরুরি। নারীসাহচর্যেই ওর বিষাদযোগ কাটবে। নয়তো ওর মধ্যে সন্ন্যাসভাব আসতে পারে। তুমি আগে বিয়ে করে নিলে, ওর রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। শুকদেব বুঝবে ওর বিবাহের প্রতীক্ষায় আমরা বসে নেই।

সামনে প্রবল সমস্যা জেনেও অবিনাশ পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আমার ওপর সব ছেড়ে দিন।

অবিনাশ বাবার সামনে থেকে উঠেছেন, দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, পিছু ডাকেন বাবা, শোনো।

দাঁড়িয়ে পড়ে বাবার দিকে ফেরেন অবিনাশ। বাবা বলেন, কন্যাটির নাম কী? চোখ নামিয়ে অবিনাশ বলেন, ইলা। বাবার নাম প্রসন্ন চক্রবর্তী।

দেখতে কেমন তাকে? বেশ পবিত্র ভাব আছে তো? অবতারকে গর্ভে ধারণ করতে পারবে মনে হয়?

শরীর জুড়ে বিদ্যুৎ খেলে যায় অবিনাশের। কী অসম্ভব প্রত্যাশায় আজও বসে আছেন বাবা। আকাঙ্ক্ষাটা এখন প্রায় বাতিকের পর্যায়ে চলে গেছে। বাবার সামনে আর দাঁড়াননি অবিনাশ। চলে গিয়েছিলেন দাদার ডিসপেনসারিতে।

সব শুনে দাদা বলে, আমার কোনও আপত্তি নেই। পাত্রী দেখ। দিন স্থির কর। তোমার কি কাউকে দেখা আছে দাদা। মানে পছন্দ হয়! আমরা যোগাযোগ করে নেব। কাজ সংক্ষিপ্ত করতে জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ।

দাদা খানিকক্ষণ চোখ তুলে ভাবে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, নাঃ, তেমন কারও মুখ মনে পড়ছে না। পেট, হাত, জিভ, চোখ এসব ভাসছে মনে। ডাক্তারদের এই এক মুশকিল। বলে, এক চোট হেসেছিল দাদা। তারপর বলে, তুইই দেখ না একটা পাত্রী। তোর পছন্দই আমার পছন্দ।

প্রবাসে পাত্রী পাওয়া অত সহজ নয়। বাঙালির সংখ্যা হাতে গোনা। এদিকে বেশি দেরি করা যাবে না। শেখর তাড়া দিচ্ছে। মন বেজার করে একদিন মেসে বসে আছেন অবিনাশ, ম্যানেজার তারাদা বলল, কী হয়েছে রে তোর? কদিন ধরেই দেখছি মেজাজ খারাপ।

তারাদাকে সমস্যার কথা বলেন অবিনাশ। তখনই তারাদা নিজের বোনের কথা . বলে। সেদিনই তারাদার বাড়ি গিয়ে পাত্রী দেখেছিলেন অবিনাশ। রংটা চাপা হলেও মুখচোখে একটা বেশ শ্রী আছে। ওপর থেকে এর বেশি আর কী বোঝা যায়। সন্তান হল না, বলে দাদাও কোনওদিন দায়ী করেনি অবিনাশকে। তবু কোথায় যেন খোঁচা লেগে থাকে মনে।

আবার এটাও ঠিক, বউদির মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হলে দাদা ভেসে যেত। কী অসীম কৃচ্ছ্রতায় দাদাকে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছে বউদি। তেমনই স্নেহ করে দেওর, ননদদের। বাবার ভাষায় 'বিষাদযোগ' বিয়ের পরও দাদার ঘাড়ে চাপত। কল এলে যেতে চাইত না, ডিসপেনসারির রোগী দেখতেও প্রচণ্ড অনীহা। রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। এর মধ্যেও বউদি কীভাবে সংসার চালিয়েছে কে জানে! ছোট ভাই রজত তখন বউ নিয়ে পূর্ণিয়ায়। রেলের চাকরি রজতের। দশ বছর পূর্ণিয়ায় কাটিয়ে ফিরে এসেছে সমস্তিপুরে। এখন তাই দাদাকে নিয়ে চিন্তা কম হয় অবিনাশের। যৌথ সংসারে দাদার কন্ট্রিবিউশন কম হলেও রজত পুষিয়ে দেয়। কিন্তু খাওয়ার খরচ তো সব নয়, মানুষের ব্যক্তিগত নিত্য ব্যবহার্য কিছু খরচ থাকেই। এ ছাড়া দেওয়া খোওয়া। দাদার সেসবের

কোনও হুঁশ নেই, বউদি কারও কাছে হাত পেতে চাইবে না। অবিনাশ আন্দাজ মতো টাকা পাঠান বউদির নামে। অন্য কেউ সেটা জানে না।

বউদির পরিবার বা বউদি যদি খুঁত লুকিয়ে ঠকিয়েও থাকে দাদাকে, এখন আর সে নিয়ে কোনও ক্ষোভ নেই অবিনাশের। মনে হয় এই মহিলাই দাদার জীবনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এবং অবশ্যই অবিনাশদের বউদি হওয়ার যোগ্য সে। বাবাও নিশ্চয়ই মৃত্যুর আগে অবচেতন থেকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন বউদিকে। মৃত্যুর আগের তিন মাস বিছানায় কাটিয়েছেন বাবা। মাথা কাজ করত না ঠিকমতো। বউদি প্রাণ ঢেলে সেবা করে গেছে।

সন্তান না হওয়ার ফাঁকটা এমন নিপুণভাবে ভরাট করেছে বউদি, দাদার পাত্রী পছন্দ করার ব্যাপারে নিজেকে স্বার্থপর বা দায়ী মনে হয় না অবিনাশের। রজতের দুই মেয়ে ভীষণ বউদি নেওটা। বউদিকে ওরা বড়মা বলে ডাকে। রজত, রজতের বউ মালবিকা, দুই মেয়েকে বউদির কাছে রেখে দিব্যি দশ-পনেরো দিন বাইরে কাটিয়ে আসে। মেয়ে দুটোর সে নিয়ে কোনও তাপউত্তাপ নেই। তারা বড়মা আর আসল মায়ে তফাত করতে পারে না।

মেয়ে দুটোর নাম রুনু আর ঝুনু। রুনুর বয়স তিন, ঝুনুর বয়স দুই। ভারী মিষ্টি দেখতে। মেয়ে দুটোর কথা মনে পড়তেই অদ্ভুত একটা ভাবনা মাথায় এসে পড়ে অবিনাশের। তাঁর দুই সন্তান ছেলে। দাদা নিঃসন্তান। রজতের দুটো মেয়ে। তাহলে কি বংশের ভার অবিনাশের দুই পুত্রকেই নিতে হবে।

ঘুম তো একটুও আসছে না। শরীর জুড়ে কেমন যেন অস্বস্তি শুরু হয়। ট্রেন খুব জোরে দৌড়োচ্ছে। লোয়ার বার্থে পাশ ফিরে শোন অবিনাশ। ফুলশয্যার পরের দিন ভোরে দাদা যে বংশের 'ভার-এর কথা বলেছিল, তার মর্মার্থ জানেন অবিনাশ। একটা হচ্ছে পুত্র সন্তানের মধ্যে অবতারকে খোঁজা। দ্বিতীয়টা আরও সাংঘাতিক, দাদার ধারণা বংশের প্রত্যেক প্রজন্মে অবতার না পাওয়া গেলেও, একজন করে পাগল পাওয়া যাচ্ছে। শেষ পাগল ছিলেন অবিনাশের পিতা। শেষ দিকে নাকি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। শেষের এক বছর দাদা-বউদি বাবাকে দেখেছে। দাদার অ্যাসেসমেন্টে বউদি সম্মতি জানায়। দাদার কাছে বিগত চার পুরুষের রেকর্ড আছে, যে যে পুরুষের মধ্যে পাগলামি দেখা গিয়েছিল, তাঁদের নামের মাথায় লাল টিক মারা। দাদা নিজের নামের মাথায় একই রকম টিক মেরে রেখেছে।

আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। বেখেয়ালে উঠতে যান অবিনাশ। মিডল বার্থে ঠোকা লাগে। জানলার বাইরে আবছা আলো ফুটেছে। দুরন্ত বাতাসে ভোরের গন্ধ। অংশু আর বরুণের মুখটা মনে পড়ে, কী সরল, নিষ্পাপ। কোন অপরাধে ওরা বহন করবে বংশের ভার?

শ্বাসের পক্ষে বাতাস বড় কম লাগে। ঘাড় নিচু করে জানলার কাছে যান অবিনাশ। একটা আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ে, জানলা বরাবর একটা পাখি উড়ে চলেছে ট্রেনের সঙ্গে। কোথায় কত দূর যাবে পাখিটা?

॥ আট ॥

‘ডাগডর সাহাব, ডাগডর বাবু’ কে যেন ডাকছে। বেশ মোসাহেবি ডাক। এখনও বোধহয় আলো ফোটেনি বাইরে। পেশেন্ট চলে এল! নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু নয়, সে রকম কিছু হলে এত মধু মাখিয়ে ডাকত না। —বিছানায় শুয়ে কান খাড়া করে রাখেন শুকদেব। চেনার চেষ্টা করেন গলাটা। দীন-দরিদ্র কেউ, নাকি কিছু পয়সা আসবে হাতে?

আরও দুবার বোধহয় ডাকল লোকটা। শুকদেব যে ঘরে শোন, তারপর আরও দুটো ঘর, সদরের গলি পেরিয়ে বাড়ির অপর প্রান্তে ডিসপেনসারি। রুগির বাড়ির লোক ডিসপেনসারির বারান্দায় এসে ডাকাডাকি করে। এ-বাড়ির কাঠা ছয়েকের বাগানটা শুকদেবের ঘর লাগোয়া। ভোরবেলা মেলা পাখ-পাখালি ডাকে। এখনও ডাকছে। তাই চেনা যাচ্ছে না লোকটার গলা।

উঠবেন কিনা ভাবছেন শুকদেব। টাকাপয়সার খুবই দরকার। কালই সুধা বলছিল, হাত একদম ফাঁকা। রুগি ছেড়ো না। বিনে মাগনায় ওষুধও দিয়ো না কাউকে

অবস্থা খুব খারাপ না হলে সুধা এধরনের কথা বলে না। অথচ লোকটা সেই কখন ধরে ডাকছে, সুধার ঘুম ভাঙছে না কেন। চোখ খোলেন শুকদেব। ভোর হয়ে গেছে। মাথার দিকের খোলা জানলা দিয়ে আসছে আলো, মশারি চুঁইয়ে সেই আলো এখন পাশে শুয়ে থাকা সুধার মুখে। স্ত্রীর মুখটা ভাল করে দেখেন শুকদেব। ঘুমিয়ে থাকলে সুধাকে একদম বাচ্চা মেয়ের মতো লাগে। বন্ধ চোখের পাতার নীচে সুধার মণি এখন চঞ্চল। তার মানে স্বপ্ন দেখছে। ভোরের স্বপ্ন।

এখনও কীসের স্বপ্ন দেখে সুধা? একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে।

ডাগডর সাহেব, ডাগডর সাহেব, জারা মেহেরবানি... না, উঠতেই হবে। লোকটা যে ডেকেই যাচ্ছে। গলাটাও চেনা চেনা লাগছে এতক্ষণে। মশারি তুলে বিছানা থেকে নেমে আসেন শুকদেব। মেঝেতে পা দিতেই লোকটার নাম আর চেহারা দুটো এক সঙ্গে মনে পড়ে, রামসাগর সাউ। ভেতর ভেতর বেশ খুশি হন শুকদেব। দিনের শুরুটা তার মানে ভালই হচ্ছে। রামসাগর শাঁসালো পার্টি, বহু দিনের পুরনো পেশেন্ট। প্রথম যে-রোগটা নিয়ে এসেছিল, উপসর্গ কুষ্ঠ বলেই ধরে নিয়েছিল রামসাগর। দু-এক জন ডাক্তারও ওকে তাই বলেছিল। কার মুখ থেকে বাঙালি ডাগড়র বাবুর নাম শুনেছিল কে জানে! একদিন সন্ধেবেলা ডিসপেনসারির বারান্দায় থামের পাশে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল। তখন আবার গরমকাল।

শুকদেব রুগি দেখছিলেন। ঠাকুরঘরে সন্ধে দিয়ে ধোঁয়া ওঠা পিতলের ধুনুচি হাতে সুধা এসেছিল ডিসপেনসারিতে। ওর চোখেই প্রথম পড়ে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা লোকটা। বারান্দায় কম পাওয়ারের হলদেটে আলো। ও মাঃ, কে ওখানে। বলে, চেঁচিয়ে উঠেছিল সুধা। অন্যান্য রুগি, শুকদেব সচকিত হন। দরজা ছেড়ে সুধা সরে যেতে শুকদেব বারান্দায় যান। লোকটাকে বলেন, ইঁহা কিউ বৈঠে হো! অন্দর চলো।

নেহি বাবু, হাম ভিতর না যাবউ।

কাহে? ক্যায়া হুয়া হ্যায় তুমহারা?

বহুত খারাপ বিমারি। বড়া বড়া ডাগডর ফেল মার গিয়া। এক আদমিকে পাস আপকা নাম শুনা। বহুত উমিদ লে কর আ রাহা হুঁ।

ঠিক হ্যায়। রোগ তো বাতাও।

বাদ মে বাতায়ঙ্গে। পহলে দুসরা মরিজ কো দেখ লিজিয়ে। মুঝে কই জলদি নেহি হ্যায়।

লোকটা সত্যিই পাক্কা দু ঘণ্টা একভাবে বসেছিল। ইতিমধ্যে রুগিরা এসেছে, গেছে। একটা সময় ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন শুকদেব। চেম্বার ফাঁকা হতে দেখেন, বারান্দায় বসে বিড়ালের মতো জুল জুল করে তাকিয়ে আছে সে।

শুকদেব ইশারায় ডাকেন। লোকটা মাথা নাড়ে। অর্থাৎ ভেতরে আসবে না। অগত্যা পর্বতকেই যেতে হয় মহম্মদের কাছে। লোকটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন শুকদেব। তারপর মাথায় হাত রেখে বলেন, ইতনা ঘবড়া গয়া কিউ? কোন সা মরণ রোগ হুয়া হ্যায় তুমহারা!

লোকটা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে। তারপর চাদর সরিয়ে পুরনো ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হাত-পা দেখায়। বলে, তার কুষ্ঠ হয়েছে।

চমকে ওঠার মতোই ঘা বটে, হলুদ আলোয় আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। লোকটাকে ধমকে-ধামকে ডিসপেনসারি ঘরে নিয়ে আসেন শুকদেব। জোরালো আলোয় ভাল করে পরীক্ষা করেন। ওটা কুষ্ঠ নয়, বুঝেছিলেন আগেই। তবে চর্মরোগটা বেশ জটিল ধরনের। রোগটা কোন গোত্রের, রামসাগরকে বললেন না। বলে কোনও লাভ হত না। বুঝত না কিছুই। তার স্থির বিশ্বাস, জীবনে যে খারাপ ঘৃণ্য কাজ সে করেছে, তারই শাস্তি দিচ্ছে ভগবান। সেসব কাজের দু-একটা নমুনা পরের দিকে শুনিয়েছিল রামসাগর। শিউরে উঠেছিলেন শুকদেব।

সেদিনকার মতো ওষুধ দিয়ে বিদায় করলেন তাকে। না চাইতেই লোকটা বিশ টাকা ফিজ দিয়েছিল। তখনকার সময়ে সেটা অনেক। ক্রমশ ভাল হতে থাকল রামসাগর। প্রতিবারই আসে, বিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ পর্যন্ত দেয়। শুকদেব বলেন, কাহে ইতনা দে রহে হো। তুমাহারা পইসা সস্তা হো গল্লা ক্যায়া।

লিজিয়ে না ডাগডরবাবু, মেরা পইসা কই ছুঁবে নেহী করতা। ঘরকা আদমি মুঝসে দূর রহতা হ্যায়। আপ হামকো ইতনা সাফসুতবা কর দিয়ে, ফির ভি উন লোগো কা মন সে ডর নেহি গয়া।

আসলে হয়তো রামসাগরের পাপকেই ভয় পেত ওর বাড়ির লোক। সেই পাপের টাকা হাত পেতে নিতেন শুকদেব। তিনি রোগটা সারাতে পেরেছিলেন, পাপের বোঝা হালকা করতে পারেননি। ধরমপুরে বিশাল জমি-জিরেত ছিল রামসাগরের। অতি সম্পন্ন নিরক্ষর মানুষ। সাহেবদের ব্যবহৃত, মৃত গাঁয়ের মেয়েদের পোঁতা শরীর থেকেই উর্বর হত ওর জমি।

ডিসপেনসারি পৌঁছতে গেলে অনেক কটা দরজা খুলতে হয়। দালান পেরোতে হয় ভেতর বাড়ির, লোকটা না চলে যায়। সংসারে ভীষণ টানাটানি। চেম্বারের পিছন-দরজা খুলে তাড়াতাড়িই সামনের দরজায় যান শুকদেব। হাঁটুতে চেয়ারের ধাক্কাও খান সামান্য। খিল নামিয়ে দরজা খুলে দেখেন। রোয়াক ফাঁকা। চলে গেল। পরক্ষণেই শরীরটা একটু টাল খায়। কী যেন বেরিয়ে যায় মাথা থেকে! ঘোর? খেয়াল হয় তাই তো, এ কী ভুল হল আমার! গত দুবছর হল রামসাগর মারা গেছে। শেষ চিকিৎসা শুকদেবই করেছিলেন। কেন এই বিভ্রম? স্পষ্ট শুনলেন ওর গলা। একেই কি বলে লোভ!

কী হল, ভোর ভোর চেম্বারে উঠে এলে?

সুধার গলা। পিছন ফেরেন শুকদেব। আপ্রাণ চেষ্টা করেন নিজেকে ধাতস্থ করার। সুধা আবার বলে, কী! উত্তর দিচ্ছ না যে।

না, ভাবলাম আজ একটু সকাল সকাল বসি। বলছ, টাকা ফুরিয়েছে। বলে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেন শুকদেব।

সুধা খানিকক্ষণ সংশয়ের দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখেন। তারপর বলেন, তা বলে রাত না পোহাতেই চেম্বারে বসতে হবে! এখন তোমার কোন রুগি আসবে শুনি!

শুকদেব উত্তর দেন না। টেবিলের ডানদিকে মোটা ওষুধের বাক্সটা টেনে নেন। খোলেন। শূন্য গোল গর্ত অনেক বেড়ে গেছে।

বাসি কাপড়-জামায় ওষুধপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না। ওঠো, বাথরুম, পায়খানা সেরে এসে বোসো। তা ছাড়া ধুপ-জলও তো দেওয়া হয়নি। দুম করে বসে পড়লেই হল!

সুধার কথা শেষ হলে, চোখ তোলেন শুকদেব। কেমন যেন অসহায় চাউনি। হতাশ গলায় বলেন, ওষুধ বেশির ভাগ ফুরিয়ে এল। অবিনাশকে লিস্ট পাঠানো হয়নি।

লিস্টটা আজ করে রাখলেই হয়। বলে সুধা হন হন করে বেরিয়ে গেল।

শুকদেব স্ত্রীর চলে যাওয়া দেখে নিয়ে ফের রাস্তার দিকে তাকান, দু-চারটে করে লোক পথ চলতে শুরু করেছে। কারওই চেম্বারে ঢোকার সম্ভাবনা নেই। কেন যে ইদানীং আসে না আর! আগে তো রাতবিরেতে ডেকে নিয়ে যেত। সমস্তিপুরের সব লোক কি সুস্থ হয়ে গেল! নাকি নতুন কোনও পরিত্রাতা পেয়েছে শহরের লোকেরা তাকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে নানান সব আশ্চর্য সাফল্যের কাহিনী।

এলাকার নতুন হোমিওপ্যাথদের খবর রাখেন না শুকদেব। বিন্দুমাত্র আগ্রহ হয় না। যে-সে বসে যাচ্ছে চেম্বার খুলে। অনেক বেনোজল ঢুকে গেছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়। লোকে ইদানীং অ্যালোপাথিতে ঝুঁকেছে। চটজলদি উপশম হয় ঠিকই, নিরাময় কতটা হয় কে জানে! তার ওপর আছে হাজারটা সাইড এফেক্ট। তাঁকেও খেতে হচ্ছে আজকাল। ঘুমের জন্য। বায়োকেমিক ওষুধটায় কাজ হচ্ছে না। ঘুমের ট্যাবলেটটা দিয়েছেন ডাক্তার সরকার। তারই সাইড এফেক্টে কি আজ এত বড় একটা ভুল হল, রামসাগরের গলা শুনতে পেলেন!

নাঃ, ওষুধটা ছাড়তেই হবে। নিজের চিকিৎসায় ফিরতে হবে আবার। কেন পারবেন না। সামান্য অনিদ্রার কারণে নিজে অ্যালোপ্যাথি খেয়ে, অন্যের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা তো এক ধরনের প্রবঞ্চনা। অথচ এককালে রুগি-বাড়ির লোক তাঁকে ভগবান মানত।

রুগির মুখচোখ দেখে বুঝতে পারতেন রোগ কত পার্সেন্ট, রোগের ভয় কতটা? যাদের ভয়টাই একশো ভাগ থাকত, ওষুধ বিনা গ্লোবিউলসই পুরিয়া করে দিয়েছেন। দুদিন যেতে লোকটা হাসি মুখে আরোগ্যসংবাদ দিয়ে গেছে। সেই শুকদেব এখন নিজের চিকিৎসায় পরের মুখাপেক্ষী। এই মুহূর্তে এর একটা কারণ মাথায় আসে, তিনি তো আসলে নিজের মুখটা দেখতে পান না। পড়তে পারেন না অভিব্যক্তি। সে ক্ষেত্রে আয়নার কথা উঠবে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ালে প্রত্যেক মানুষের অভিব্যক্তি লুকিয়ে পড়ে। ভাবান্তরহীন সোজাসাপটা সরল মুখটাকেই নিজের বলে ভুল করে মানুষ।

গোয়ালা যোগেন দুধের বালতি হাতে তড়িঘড়ি উঠে আসছিল বারান্দায়, তারপর চলে যাবে ডানদিকে, সদর। চেম্বার খোলা দেখে থমকে দাঁড়ায়। চোখে ধান্দাবাজির আলো ফোটে। দুধের বালতিসুদ্ধু জোড় হাতের ভঙ্গি করে বলে, পরনাম ডাগডর সাহাব, দাবাখানা ইতনা জলদি খুল গয়া আজ!

কোনও উত্তর দেন না শুকদেব, যোগেনের পরের আর্জিটা উনি আন্দাজ করতে পারেন। যোগেন গোয়ালা সেটাই বলে, আচ্ছাই হুয়া কুছ দিন সে তবিয়ত আচ্ছা নেহি যা রাহা হ্যায় মেরা। সোচ রাহা থা আপ কো দিখাউ।

বালতিটা দোরগোড়ায় রেখে চেম্বারে ঢুকে আসে যোগেন। শুকদেবের চেয়ারের আড়াআড়ি বেঞ্চটায় বসে একটা হাত উলটে তুলে দেয় টেবিলে। জানে নাড়ি দেখবেন ডাক্তার সাহেব।

মরা আরশোলা সরানোর মতো যোগেনের হাতটা টেবিল থেকে নামিয়ে দেন শুকদেব। বলেন, পহেলে পাঁচ গো রুপিয়া রাখ, উসকে বাদ ইলাজ।

ডাক্তারবাবুর অপ্রত্যাশিত আচরণে রীতিমতো ঘাবড়ে যায় যোগেন। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফতুয়ার পকেট, কোঁচড় হাঁটকাতে থাকে। যদিও এটা অভিনয়। ডাক্তারবাবু রুগি দুজনেই সেটা জানে।

যোগেন বলে, সুবহ সুবহ নিকল আয়া হুঁ, পাস মে পইসা নেহি হ্যায়। বাদ মে আ কে দে যাউঙ্গা।

হঠাৎই স্বর চড়ে যায় শুকদেবের। চোখ গোল গোল করে বলেন, নেহি, বাদ মে নেহি। আভি দেনা পড়ে গা। বহুতবার ইলাজ করবায়া, পইসা নেহি দিয়া। উপর সে দুধ মে পানি ডালতা হ্যায়। ইতনা...

গালাগালিটা দিয়েই ফেলছিলেন সুধা এসে পড়ল, কী হচ্ছে কী, এত চেঁচামেচি কীসের!

নালিশের সুর মিশিয়ে যোগেন বলে, হামকো মাফ কিজিয়ে গা মাইজি। মেরা তবিয়ত

থোড়া ঠিক নেহি যা রাহা হ্যায়, বড়াবাবু কো দিখানে আয়া। গুসসা করনে লাগা। ম্যায়নে বোলা পইসা হাম দে দেবউ ফির ভি ডাগডরবাবু নেহি মানই ছেতিন।

ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। তুম দুধ দে কর আভি যাও, বাদ মে আনা। বলেন সুধা। দুধের বালতি তুলে সদরের দিকে হাঁটা দেয় যোগেন।

গুম মেরে বসে আছেন শুকদেব। চোরা ভর্ৎসনা মিশিয়ে সুধা বলেন, ওরকম চেঁচামেচি করছিলে কেন? নিজের মানের দিকটা খেয়ালই থাকছে না!

অনুযোগের সুরে শুকদেব বলেন, আমাকে দেখেই ওর রোগের কথা মনে পড়ে গেল। খালি মাগনায় ওষুধ খাবার ধান্দা।

না হয় খেলই। যোগেন তো বাড়ির রোজকার লোক। আর কত পেশেন্ট যে মিথ্যে বলে তোমার কাছে ওষুধ নিয়ে যায়।

শুকদেব অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকান, কখন কী বলে কোনও ঠিক নেই। এই বলছে রুগি ছেড়ো না, সবার কাছে পয়সা নিয়ো। পরক্ষণেই ভিন্ন মত। তাহলে করণীয়টা কী?

দুপা এগিয়ে এসে সুধা বলেন, যোগেন পাঁচবাড়ি ঘোরে, এক্ষুনি রটে যাবে তোমার মেজাজের খবর। আরও কমে যাবে রুগি আসা।

পশার কমে যাওয়ার কথা বলছে সুধা, তার মানে যোগেনও বেশ ক্ষমতাবান মানুষ। কার আস্তিনে যে কতটা ক্ষমতা লুকানো আছে, আজকাল ঠিক ঠাহর করা যায় না। ক্ষমতা শব্দটা ক্রমশই তার মর্যাদা হারাচ্ছে।

এখনও তো লিস্ট করা শুরু হল না। যাও বাথরুমটা না হয় সেরেই এস। বলে, চলে যায় সুধা।

ফর্দের লম্বা কাগজ বার করেন শুকদেব। ইদানীং এই কাগজ কাটা কাজটায় হেল্প করছে রুনু। ওকে ছুরি, কাঁচি ধরতে দেন না। কাগজগুলো শুধু ভাঁজ করে। গ্লোবিউলস পুরিয়া মুড়ে রাখা শুরু করেছে রুনু। ওতে ওষুধের ফোঁটা ফেলে রুগিকে দেন শুকদেব। এখন যা রুগির সংখ্যা, পুরিয়া রেডি করে রাখার দরকার পড়ে না। তবু মেয়েটার খেলায় বাধা দেন না শুকদেব। দুই বোনের অনেকটা সময় এই ডিসপেনসারি ঘরটাতেই কেটে যায়। ওদের মা-জেঠিমা নিশ্চিন্তে থাকে। ঘরটা এখন 'খেলাঘর' হয়ে গেছে। তাই বোধহয় রোগ, রুগি দুটোই ঘেঁষতে ভয় পায়। বেশ ভালই লাগে শুকদেবের। — ভাবতে ভাবতেই চার-পাঁচটা লাইন লিখে ফেলেছেন শুকদেব, কেমন একটা খটকা লাগে, কী লিখলেন এতক্ষণ! ওষুধের ফর্দ করা এত সহজ কাজ নয়। বাক্স খুলে দেখতে হয় কী কী ওষুধ ফুরিয়েছে। একটা সময় সুধারও সাহায্য লাগে।

সরু কাগজটায় চোখ বোলান শুকদেব, এ কী তিনি তো চিঠি লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। খেয়ালই নেই। তার মানে চেতন-অবচেতন সমানভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে। আর চেতন তো কখনওই গ্রাহ্য করে না অবচেতনকে। এর ফাঁকে লিখে ফেলেছেন, স্নেহের অবিনাশ, আশা করি কুশলে আছিস। ইলা, অংশু, বরুণও নিশ্চয়ই ভাল আছে। বরুণ তো তার এই অলস জেঠুকে চিনলই না। না চিনুক, শৈশব থেকে শ্বাস নিচ্ছে বাংলায়। এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। হ্যাঁ, যে কথা লিখছিলাম, ওষুধ ফুরিয়েছে। লিস্ট পাঠাচ্ছি। যেমনটা লিখছি, তাই আনিস। বেশি আনার দরকার নেই। আজকাল রুগি ...

বড়দা, বড়দা!

কে যেন ঘাড়ের কাছে এসে ডাকছে। গলাটা চেনা চেনা লাগে। আবার কোনও ভুল নয়তো? ডাকটা আর একবার শুনে নিয়ে মুখ তোলেন শুকদেব, সামনে দাঁড়িয়ে মৃগাঙ্কর ভাই শশাঙ্ক। মুখটা কাঁচুমাচু।

কী হয়েছে রে, বাড়ির কারও ...

কথা শেষ করতে দেয় না শশাঙ্ক। বলে না, কারও শরীর খারাপ নয়। আমি একটা অন্য ঝামেলায় পড়ে এসেছি।

শুকদেব বেশ অবাক হন, শশাঙ্কর মতো ধড়িবাজ ছেলে কী এমন সমস্যায় পড়ল। তাঁর

মতো মানুষের কাছে আসতে হয়েছে!

উলটোদিকের চেয়ারে বসেছে শশাঙ্ক। মুখে উদ্বেগের সঙ্গে বিমর্ষতাও মিশে আছে। পাশের বাড়ি থাকে, বছরে দু-চারবারের বেশি আসে কিনা সন্দেহ। অ্যালোপ্যাথি দেখায়। শশাঙ্ক চুপ করে আছে দেখে, শুকদেব বলেন, কী সমস্যায় পড়েছিস বল?

কাল বাড়িতে পুলিশ এসেছিল।

পুলিশ! কেন?

দাদাকে খুঁজতে।

কেন, মৃগাঙ্ক আবার কী করল? তা ছাড়া সে তো এখানে থাকে না। পৃথক করে দিয়েছিস অনেকদিন।

শেষের কথাটা ঠেস মেরেই বললেন শুকদেব। শশাঙ্ক গা করল না। বলল, কেন খুঁজছে জানি না। এ-বাড়িতে না পেয়ে ভীষণ ক্ষেপে গেল। আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করল, আর কোথায় যেতে পারে। ওকে নাকি কোয়ার্টারেও পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের জেরার চোটে আমি শুধু ওর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বলে দিয়েছি। জানি অন্যায় হল। কিন্তু কী করব বল।

তারপর? জানতে চান শুকদেব। ঠিক কী জানতে চাইছেন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন শশাঙ্ক। শুকদেব বলেন, তারপর কী করলি? দাদার কোয়ার্টারে গিয়েছিলি?

হ্যাঁ, দেখলাম ঘর খোলা। জিনিসপত্তর লণ্ডভণ্ড। বউদিও নেই।

আশপাশের লোক, ওর সাহেব কিছু বলতে পারল?

না। জানে পুলিশ এসেছিল। কেন এসেছিল কিছু বলতে পারল না।

দুপক্ষই খানিক নীরব। শুকদেব জানেন, যে সমস্যা নিয়ে এসেছে শশাঙ্ক, কোনও সুরাহাই করতে পারবেন না। সম্ভবত সে বিষয়ে শশাঙ্কও অবগত। আসার একমাত্র কারণ, ওদের কোনও নিকট-আত্মীয় সমস্তিপুরে থাকে না। ছোটবেলায় এ-বাড়িতে খেলাধুলা করেছে। অনেকদিন পর্যন্ত শুকদেবরা জানতেন শশাঙ্কর বাবা মিহিরকাকা বুঝি বাবার সামান্য দূর সম্পর্কের ভাই। ওরা দুই ভাই সেটাই জানত। তাই তো শুকদেবকে বড়দা বলে ডাকে ওরা। নামেই বড়দা। ওরা দুই ভাই, এমনকী মিহিরকাকা দরকার মতো পরামর্শ নিতে আসত অবিনাশের কাছে। একটুও ক্ষোভ বা হিংসে হত না শুকদেবের। বরং গর্ব হত। কিন্তু অবিনাশ যে এখন নেই।

কী ঘটিয়েছে, কোথায় যেতে পারে বল তো? নীরবতা ভাঙে শশাঙ্ক।

শুকদেব বলেন, সেটাই তো ভাবছি।

আসলে কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না। আচমকাই মনে একটা সম্ভাবনার কথা উকি মারে, কী ঘটিয়েছে মৃগাঙ্ক, সেটা ঠাহর করতে না পারলেও, কোথায় পালাতে পারে, যেন টের পাচ্ছেন। সেটা কিন্তু শশাঙ্ককে বলা যাবে না। ছেলেটা এতই দুর্বল প্রকৃতির, পুলিশের জেরায় ইতিমধ্যেই মৃগাঙ্কর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বলে দিয়েছে। হেনস্তার একশেষ হবে ও-বাড়ির লোক।

কনুই টেবিলে রেখে, চুল খামচে মাথা নিচু করে আছে শশাঙ্ক। ভেবেছিল দাদাকে তাড়িয়ে দিয়ে একদমই ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে, এত সহজে কি রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তা ঝেড়ে ফেলা যায়! রাষ্ট্র চেপে ধরবে না। তাই তো পুলিশ পাঠিয়েছে। চিন্তা ভুল খাতে বয়ে যাচ্ছিল। দুই দস্যি এসে পড়াতে সামলে যান শুকদেব। রুনু ঝুনু। রুনু বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল হয়ে সোজা বুকে। ঝুনুটা একটা পা তুলে চেষ্টা করছে বেঞ্চে ওঠার। শুকদেব হাত বাড়িয়ে তুলে নেন। রুনু জেঠুর থলথলে গাল দুটো টিপে নিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকায়। মাথা নিচু করে আছে বলে চিনতে পারে না। রুনু জিজ্ঞেস করে, তোমার পেশেন্টের কী হয়েছে জেঠু?

কিছু না মা, ও তোমাদের শশাঙ্ককাকা।

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়, চলি বড়দা।

হ্যাঁ, আয়। আমি দেখছি, কিছু বুদ্ধি বেরোয় কিনা। দরকার মনে পড়লে রজতের সঙ্গে

একবার কথা বল।

দেখি, সন্ধের দিকে একবার আসতে পারি।

শশাঙ্ক চলে যায়। ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গোনেন শুকদেব, ভুল হয়ে গেল রজতের সঙ্গে কথা বলতে বলে। শুকদেব যখন এত সহজেই আন্দাজ করতে পারছেন, মৃগাঙ্ক কোথায় পালাতে পারে, রজত আরও তাড়াতাড়ি পারবে।

রুনু ইতিমধ্যেই স্টেথো বার করে জেঠুর ধুকপুকি শুনছে। শুকদেব জানতে চান, তোর বাবা কোথায় রে?

ঘুমুচ্ছে।

মিথ্যে বলছে রুনু। ভেতর বাড়ির পেছনের বড় ঘরটা রজতের। রবীন্দ্রনাথের গান ভেসে আসছে। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে রজত ঘরের সমস্ত জানলা খুলে গান গাইতে বসে। খারাপ গায় না। বেশ একটা পবিত্র ভাব ভাসে বাতাসে।

মেয়েটাকে আজ নতুন জামা পরানো হয়েছে। হলুদ রঙের। মৃগাঙ্কও দাড়ি কেটে, তপনের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ধোপদুরস্ত। আলিনগর অনাথ আশ্রমে যোগাযোগ করেছে তপন। ভেতরে লোক লাগিয়ে একটা ব্যবস্থা করা গেছে মেয়েটার। হাজার চারেক টাকা মতো লাগছে। বিনিময়ে আশ্রম কমিটি গোপন করে যাবে সত্যিকারের যে কুড়িয়ে পেয়েছে তার নাম। অন্য একজনের নাম-ঠিকানা থাকবে। সেই অন্য একজন কিন্তু কোনও কল্পিত নাম নয়, সে আছে। ঘুষের অনেকটা অংশ পাবে নাম-ঠিকানা ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য। আশ্রমের গেটে লোকটা দাঁড়িয়ে থাকবে মৃগাঙ্কদের অপেক্ষায়। সত্যি কী বিচিত্র রোজগারের পন্থা! লোকটা নাকি এরকমই বেশ কটা কেস আশ্রমকে দিয়েছে। সব কিছু খবরাখবর নিয়ে এসে তপন যখন লোকটার কথা বলল, পছন্দ হয়নি মৃগাঙ্কর। তার প্রথম কারণ আর একজন সাক্ষী বেড়ে গেল। তপনকে বলেছিলেন, যা হোক একটা নাম-ঠিকানা বসিয়ে দেওয়া যায় না?

মাথা নেড়ে তপন বলে, আমি তেমনটাই ভেবেছিলাম। খবর নিয়ে শুনি ব্যাপারটা বেশ জটিল। আশ্রমে যে কজন বাচ্চা আছে তাদের সমস্ত রেকর্ড পুলিশের কাছে জমা রাখতে হয়। হঠাৎ কোনও দরকার পড়লে, পুলিশ রেকর্ড ধরে খোঁজতল্লাশ করে। সে ক্ষেত্রে একজন কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চারও ঠিকানা লাগে। কখন কোথায় কী অবস্থায় মেয়েটাকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে, কে কুড়িয়েছে, সাক্ষী আছে কিনা সব। মৃগাঙ্কর মনে খটকা লাগে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি যে বলছ লোকটা এরকম বেশ কটা কেস দিয়েছে আশ্রমকে, তার মানে রেকর্ডে অনেক বাচ্চার মাথায় এর নাম লেখা আছে, পুলিশের সন্দেহ হবে না?

হবে। যখন টাকা ভাগ হয় আশ্রমের খারাপ কিছু লোকের সঙ্গে, তখন পুলিশকেও দিতে হবে। বেড়ে যাবে ঘুষের পরিমাণ। এভাবেই তো কোরাপশান ছড়ায়।

তপনের কথার রেশ রয়ে গিয়েছিল খানিকক্ষণ। মৃগাঙ্ক ভাবেন, কোরাপশান ছড়িয়ে যাচ্ছে বটে, উৎসমুখ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে নষ্ট হয়ে যাওয়াটা রোখা যাবে কী করে? মেয়েটার জন্মবৃত্তান্তে গভীর কোনও গূঢ় রহস্য থেকে গেল। আশ্রমে দিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ে যাবে সব। এখনও পর্যন্ত যত দূর জানতে পেরেছে বলাইদা, মেয়েটার মা ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে এসেছে। সঙ্গের পুরুষটি তার কে হয় জানা যাচ্ছে না। এটাও বোঝা যাচ্ছে না পুলিশ কেন মেয়েটাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। খুব সামান্য কিছু তথ্য উদঘাটিত হয়েছে, এতে কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। তবু ব্যাপারটা এখানেই শেষ করতে হবে। নয়তো অনেক অনিষ্ট হতে পারে। এত কঠিন বিষয় ট্যাকল করার মতো ক্ষমতা ঈশ্বর দেননি মৃগাঙ্ককে। অথচ মেয়েটাকে মৃগাঙ্কর আসা-যাওয়ার পথে ফেলে রাখলেন! কোনও মানে হয় এর!

যাই হোক, মোটামুটি একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা তো করা গেছে মেয়েটার জন্য। অনেক কষ্টে রাজি করানো গেছে যমুনাকে। এখন ভালয় ভালয় সব কিছু মিটে গেলে হয়। ব্যবস্থাপনার

মধ্যে ছোট্ট একটা খোঁচা রয়ে গেল, যমুনা মেয়েকে কোল ছাড়া করেনি। বলেছে, আশ্রম অবধি যাবে।

সদরের বাইরে রিকশার প্যাঁ-পোঁ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে তপন। রিকশা ডেকে আনতে গিয়েছিল। মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে বলে, সব রেডি তো?

আমি রেডি। যমুনা ভেতরে কী করছে কে জানে! একটু আগে এখানে বসে মেয়েকে দুধ খাওয়াচ্ছিল।

মৃগাঙ্কর কথা শেষ হতেই ঘরে ঢোকে যমুনা। অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় তপনের উদ্দেশে বলে, চলুন।

যমুনার এই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বিস্মিত হন মৃগাঙ্ক। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান, কোনও মেঘ জমে নেই তো?

আপাতত কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ভেতর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে গীতা। মুখে আঁচল। কাঁদছে। বাবুই তার মাসিকে বারবার জিজ্ঞেস করছে, বোনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ গো?

ডাক্তারখানায়। আমরা এক্ষুনি ঘুরে আসছি। এটা বলে তপন। তারপর যমুনাকে বলে, চল, দেরি করে আর লাভ নেই।

বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছে দুটো রিকশা। একটাতে উঠে বসে তপন, অন্যটাতে মেয়ে কোলে যমুনা আর মৃগাঙ্ক। রিকশা দুটো গড়াতে শুরু করেছে। যমুনা এবং মৃগাঙ্ক জানেন গীতা আর ৰাব্রুই এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়, ঘুরে দেখতে সাহস হয় না। তপনই শুধু ওদের হাত তুলে ভরসা বা প্রবোধ দেয়।

গোরক্ষপুরের রাস্তা বেশ চওড়া, সমস্তিপুরের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। হু হু করে ছুটছে রিকশা। রোদ উঠেছে, তাপ নেই তেমন। রিকশার ছাউনি তোলা, তবু রোদ এসে পড়ছে বাচ্চাটার মুখে। আঁচল চাপা দেয় যমুনা। তারপর উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে সামনে। যমুনার জন্য কষ্ট হয় মৃগাঙ্কর, মেয়েটার জন্য মায়া। এই যে কটা দিন মেয়েটা ছিল, একটুও জ্বালায়নি। কোনও ঝামেলাই নেই মেয়েটার, তবু দিয়ে আসতে হচ্ছে আশ্রমে।

এর নামটার কী হবে? স্বগতোক্তির ঢঙে প্রশ্নটা হঠাৎ করে বসে যমুনা। শুনতে অনেকটা ধাঁধার মতো লাগলেও মুহূর্তে কথাটার মর্মে পৌঁছে যান মৃগাঙ্ক। ঢোক গিলে বলেন, কী আর হবে, স্মৃতি হয়ে থাকবে আমাদের কাছে।

নামটাসুদ্ধু ওকে আশ্রমে রাখা যায় না? ওঁদের বলব, এই নামেই ডাকতে একটু চিন্তা করে নিয়ে মৃগাঙ্ক বলেন, সেই আবদার করা বোধহয় ঠিক হবে না। নাম নিয়ে কেউ অনাথ আশ্রমে ঢোকে না।

চুপ করে রইলেন যমুনা। এখানকার রিকশায় থাকে অনেক ঝালর-ঝোলর, কারুকাজ। রিনঠিন শব্দ করে বাজে ঘণ্টি। এই শব্দটা মাথায় বসে যাচ্ছে মৃগাঙ্কর। এরপর যখনই মেয়েটার কথা মনে পড়বে, শব্দটা বাজবে মাথায়। অনেকটা যেন তোড়া বা নূপুরের আওয়াজ। মেয়েটাকে সেসব কিছু কিনে দেওয়া হল না।

তপনের রিকশা অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। রাস্তার এপাশ-ওপাশ দেখেন মৃগাঙ্ক, কত দূর এলেন বোঝার চেষ্টা করেন। দোকান পশরা খোলা শুরু হয়েছে। হঠাৎ একটা ফটো স্টুডিয়ো চোখে পড়ে। স্টুডিয়ো গোরক্ষনাথ। একটা লোক শো-কেসের কাচ মুছছে। মৃগাঙ্কর মাথায় আসে, মেয়েটাকে নিয়ে তাঁর আর যমুনার একটা ছবি তুলিয়ে রাখলে কেমন হয়। ভাবনাটা পরক্ষণেই মাথা থেকে তাড়ান। সর্বনাশ হবে। যদিবা মেয়েটাকে ভুলে যেত যমুনা, ছবি থাকলে ভুলতেই পারবে না কোনওদিন। একই সঙ্গে আর একটা দুশ্চিন্তা চলে আসে মাথায়, তিনিও কি পারবেন পুলিশের অত্যাচারের সামনে টানা মিথ্যে কথা বলে যেতে 'না আমি কোনও বাচ্চা কুড়িয়ে পাইনি। এমনিই বেড়াতে গিয়েছিলাম শালির বাড়ি। পুলিশ কি এত সহজে এসব কথা মানবে? মৃগাঙ্ককে পিটিয়ে বার করে নেবে মেয়েটার ঠিকানা। তার থেকে সেই ভাল ছিল নাকি, মেয়েটাকে আশ্রমে দিয়ে, নিজের আসল নাম বলে একটা রসিদ

মতো নিয়ে নেওয়া? সমস্তিপুর ফেরার পর যদি পুলিশ আসে, রসিদটা ধরিয়ে দেবেন। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে পুলিশ যা করার করুক। ভাবনাটা নিষ্ঠুর হলেও, এমনটা হলেই বোধহয় ভাল হত। এখন আর সে সুযোগ নেই। যমুনা সঙ্গে আছে। ও কিছুতেই সেটা হতে দেবে না।

রিকশা ব্রেক মারছে। তাহলে কি এসে গেল? হ্যাঁ, ওই তো নতুন রং করা আকাশি বাড়ির সামনে দাঁড়াল তপনের রিকশা। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। গেটের মাথায় বোর্ড, 'ভৈরবনাথ অবোধ আশ্রম' লেখা। ঝাঁকড়া একটা টগরগাছ পাঁচিল ডিঙিয়ে উঁকি মারছে।

রিকশা থেমেছে। মৃগাঙ্ক, যমুনা নেমে এলেন। আশ্রমের গেটের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল একটা রোগাভোগা লোক হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। রিকশা থেকে মৃগাঙ্ক দেখেছেন, একটু আগে লোকটা গেটের পাশে বেদিটায় বসেছিল। তপন মৃগাঙ্কর পাশে এসে ফিসফিস করে বলল, এই সেই দালাল।

লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের হাসিটা এমন আন্তরিক যেন কত দিনের চেনা। তপন মৃগাঙ্কর সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে, সরাসরি যমুনাকে বলে, না বউদি, আপনার ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না। আশ্রমের লোক ছুতো পেয়ে যাবে। বলবে, এই তো দিব্যি 'মা' পেয়ে গেছে। কেন আবার দিতে এসেছে এখানে। তা ছাড়া বিশ্বাস করানো কঠিন হবে, মেয়েটা কুড়িয়ে পাওয়া। ভাববে, না-জায়েজ আওলাদ অথবা মানুষ করার পয়সা নেই, তাই এখানে নিয়ে এসেছে।

অনেকদিন পর একটা আদ্যোপান্ত খারাপ বাঙালি দেখলেন মৃগাঙ্ক। লোকটা তুখোড় ধান্দাবাজ। আন্দাজ করছে, যমুনা ভেতরে গেলে মেয়েটাকে নাও ছাড়তে পারে।

লোকটা আবার বলে, দিন বউদি, বাচ্চাটাকে দাদার কোলে দিন।

মৃগাঙ্ক, তপনকে অবাক করে যমুনা মেয়েটাকে মৃগাঙ্কর কোলে তুলে দেন। মেয়েটা, যার নাম দেওয়া হয়েছিল বৃষ্টি, চোখ পিটপিট করে মেঘহীন আকাশ দেখে। গেটের পাশে বেদিটা দেখিয়ে যমুনা বলে, আমি এখানে আছি। তোমরা ঘুরে এসো।

আশ্রমের অফিসঘরে বেশিক্ষণ বসতে হল না। কাজ একেবারে পাকা করাই ছিল। দালাল লোকটা কী সব সই-সাবুদ করল কাগজে। শ্যামলা মতো অভিব্যক্তিহীন এক মহিলা এসে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। তপন আড়ালে গিয়ে কর্তাব্যক্তি মতো একজনের হাতে টাকা দিল।

কাজ শেষ। অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মৃগাঙ্ক, তপন। আশ্রম ঘিরে অনেক গাছপালা। কিন্তু কোনও বাচ্চার কল-কাকলি নেই। কেমন যেন কবরখানার নিস্তব্ধতা। দালাল ফিরে এসেছে পাশে। ভাগের টাকা নিয়ে এল সম্ভবত। সান্ত্বনা মাখানো সুরে মৃগাঙ্ককে বলে, এরা মোটামুটি যত্নেই রাখে বাচ্চাদের।

চড়াং করে রাগ উঠে যায় মৃগাঙ্কর মাথায়। ইচ্ছে হয় ঠাস করে একটা চড় কষান দালালের গালে, বলেন, যত্নে রাখে না ঘেঁচু। কোনও বাচ্চার গলা পাচ্ছি না কেন? ওরা নির্ঘাত সব বাচ্চাকে পুঁতে ফেলে।

মনে মনে যখন এমন ফুঁসছেন মৃগাঙ্ক, ওঁকে আশ্বস্ত করে হঠাৎ এক শিশুর কান্না ভেসে আসে। অনাথ কান্না। মৃগাঙ্কর মুখের পেশি নরম হয়। ভাবেন, আমিও তো প্রকৃত অর্থে অনাথ। মা-বাবা নেই, ভাই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এমনকী প্রাণাধিক প্রিয় অবিনাশদাও ধরাছোঁয়ার বাইরে। একমাত্র আছে যমুনা। সেও কি এই ঘটনার পর নিজের থাকবে। সারা জীবন খোঁটা দেবে মৃগাঙ্ককে। আসলে মানুষ যত বড় হয়, অনাথ হয়ে পড়ে। এখানকার বাচ্চারা না হয় অনাথ হয়েই জীবন শুরু করল, পরে ঠিকানা খুঁজে নেবে। সেটা অনেক আনন্দের। —ইতিবাচক দার্শনিক ভাবনাটা ভাবতে পেরে মন বেশ প্রফুল্ল হয় মৃগাঙ্কর। আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে গেটের বাইরে আসেন।

হাঁটুতে থুতনি রেখে বেদিতে বসে আছে যমুনা। মাটিতে পড়ে থাকা অজস্র টগরফুলের মধ্যে থেকে একটা ফুল তুলে কী যেন দেখছে। টগরগাছটা যমুনার ঠিক মাথার ওপর। মৃগাঙ্করা যখন ঢুকেছিলেন আশ্রমে, এত ফুল ছিল না মাটিতে।

রংহীন সাদা ফুলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এত কী দেখছে যমুনা! মৃগাঙ্কদের পায়ের শব্দে মুখ তোলে। ভাবলেশহীন মুখ, টগরের মতোই স্নিগ্ধ এবং সাদা।

কোনও কথা না বলে যমুনা এগিয়ে যাচ্ছে রিকশার দিকে। রিকশা দুটো ছাড়া হয়নি। যমুনার হাঁটার ভঙ্গিতে ভারহীন, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ভাব।

রিকশা চলল প্রায় কুড়ি মিনিট। একটাও কথা বলেনি যমুনা। জানতে চায়নি, আশ্রমের ভেতরটা কেমন। মৃগাঙ্কও কোনও কথা তোলেননি। এসব বিষয়ে যত কথা না হয় ততই ভাল। রিকশার রিনঠিন আওয়াজটা হয়েই চলেছে। তোড়ার শব্দ। দেখতে দেখতে এসে পড়ল খাজাঞ্চী মার্কেট। মনটা উশখুশ করতে শুরু করে। একটা সময় রিকশাওলাকে বলেই ফেলেন, থোড়া রুখনা ভাইয়া।

রিকশা থামে। নেমে আসেন মৃগাঙ্ক। যমুনাকে বলেন, তুমি এগোও, আমি একটু ঘুরে যাচ্ছি।

উত্তরে যমুনা ঠান্ডা গলায় বলে ওঠেন, তুমি না হয় ওসব খেয়ে নিজেকে সামলাবে। ভুলে থাকবে মেয়েটাকে। আমি কী করব?

সচকিত হয়ে যমুনার মুখের দিকে একবার তাকান মৃগাঙ্ক। মনের কথা পড়ে নিয়েছে। উত্তরে কিছু বলতে ইচ্ছে হয়, বলেন না। মাথা নামিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকেন গোরক্ষপুরের আলোকোজ্জ্বল রাস্তায়। যমুনাকে না বলা কথাটা মনে মনে আওড়ান, শুনেছি মেয়েদের চোখের জল অঢেল। ওই দিয়েই নিজেকে সামলাও।

প্রায় আড়াই দিন মদ না খাওয়া মৃগাঙ্কর হঠাৎ গালিবের একটা শের মনে পড়ে,

জাঁ ফেজাঁ হ্যায় জিসকে হাথ মে জাম আ গয়া

সব লাকিরে হাথ কী গোয়া রগে জাঁ হো গয়ী।

প্রাণ চলে আসে কারও হাতে মদের পাত্র এলে। তাকে স্বাগত জানাতে হাতের রেখাগুলো যেন নাড়ি হয়ে ওঠে।

॥ নয় ॥

পাখিটা ট্রেনের জানলার পাশে পাশে বেশি দূরে গেল না। মোকামা ব্রিজ আসার আগে উড়ে গেল নদীর দিকে। পাড়ে বসে দেখবে দিনের শুরু।

কালচে নীল আকাশ। এখনও দু-একটা তারা ডাক হরকরার লণ্ঠনের মতো টিমটিম করছে। শুকনো, বিক্ষিপ্ত নদীর জলে লেগেছে আলতো লালচে ছোঁয়া।

মিডল বার্থটা খাটানো থাকার দরুন এই অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য ঠিকমতো উপভোগ করা যাচ্ছে না। উলটে শোন অবিনাশ। মুখ থাকে জানলার দিকে।

ব্রিজে উঠে ট্রেন চলছে খুব ধীরে। বোধহয় ব্রিজের অবস্থা ভাল নয়। এর মধ্যেই বুড়িয়ে গেল! অথচ মনে হচ্ছে এই তো সেদিন বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে ফিরছেন, দাদা তখন কলকাতার মেসে থেকে ডাক্তারি পড়ে। দেখা করতে গিয়েছিলেন বাবা। সেবার সঙ্গে অবিনাশকে নেন। ফেরার সময় বাড়ির সবার জন্য কিনেছিলেন কিছু-না কিছু। লাগেজ হয়েছিল অনেক। ভোররাত্তিরে ট্রেন পৌঁছল মোকামা ঘাট স্টেশনে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কুলিদের মধ্যে। মাল নিয়ে নদীর ঘাট অবধি যাবে, তুলে দেবে স্টিমারে।

সেইবারে যেহেতু অবিনাশের প্রথম কলকাতার লাইনে যাওয়া-ফেরা, তাই সমস্ত অভিজ্ঞতাই নতুন। যাওয়ার সময় মাল কম ছিল। সিমারিয়া ঘাট স্টেশনে নেমে বাবাছেলে কাঁধে ব্যাগ তুলে স্টিমারে এসেছিলেন। ফেরার সময় কুলি নিতেই হল। বাবা অনেক বেছে বুঝে একটা বেশ বিশ্বাসী মুখ দেখে কুলি নিলেন। তাকে সব মালপত্তর তুলে দিলেও, ছাতাটা রাখলেন হাতে। কুলি বলল, দিজিয়ে না বাবু। এ ভি লেঁ লেতে হ্যায়।

নেহি, তুম আগে বড়ো। বলে বাবা যেটা করলেন, অবিনাশ রীতিমতো অবাক। ভীষণ অস্বস্তিও হচ্ছিল। ছাতার হাতলটা কুলির জামার কলারে আটকে হাঁটতে লাগলেন। অবিনাশ বলেছিলেন, এ কী করছেন বাবা!

তুমি জানো না এই লাইনের কুলিরা বেশির ভাগ চোর। একটু অন্যমনস্ক হলে পালাবে।

বাবার কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হননি অবিনাশ। মানুষের প্রতি এই অবমাননা তাঁর সহ্য হয়নি। কিন্তু কিছু করার নেই, বাবার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো সাহস তখনও তাঁর হয়নি। কুলিটারও ভারী অসুবিধে হচ্ছিল। বারবার বলছিল, ছোড়িয়ে না বাবু। হাম আপ কো সাথ সাথ হ্যায়। ভাগে গা নেহি।

বাবা কোনও কথাই কানে তুলছিলেন না। স্টিমারে উঠে কুলিকে রেহাই দিয়েছিলেন বাবা। সেইদিনও পুব দিক রাঙা করে সূর্য উঠছিল। স্টিমারে দাঁড়িয়ে বাবা সূর্যপ্রণাম মন্ত্র জোরে জোরে পাঠ করছিলেন, ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম। / ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম ॥/ ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেচক্ষুসে, জগৎ প্রসুতি-স্থিতি নাশ হেতবে।...

ব্রিজ প্রায় পার করে এনেছে ট্রেন। আজও সূর্য উঠছে। লাল আলো, নদীর স্নিগ্ধ বাতাস ঢুকে আসছে কামরায়। জানলায় থুতনি রেখে আপনাআপনি সূর্যবন্দনা শুরু করেন অবিনাশ, ওঁ জবাকুসুম ...

উচ্চারণটা বোধহয় একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। মাঝের বার্থ থেকে নেমে আসেন ভদ্রলোক। বন্দনা শেষ হতেই সসংকোচে বলে ওঠেন, এ হেঃ বলবেন তো আপনি উঠে পড়েছেন। বার্থটা নামিয়ে দিতাম। কত কষ্ট হল আপনার।

ভদ্রলোকের উচ্চারণ পাক্কা কলকাত্তাইয়া। পরনে স্লিপিং স্যুট। অবিনাশ বলেন, না না, কষ্টের কী আছে। আমি বরং একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি।

যথেষ্ট হয়েছে। আর বিনয় করতে হবে না। মালগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসুন তো, বার্থটা নামিয়ে দিই।

ভদ্রলোকের ব্যবহার বেশ আন্তরিক। চেহারায় কলকাতার বনেদিবাড়ির ছাপ। নিজের

বার্থ থেকে নেমে নিজের লাগেজ বার করে আনতে আনতে অবিনাশের মনে একটা প্রশ্ন আসে, কাল রাতে ট্রেনে ওঠার পর ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। দুবার চা-ওলা ডেকেছেন হিন্দিতে। তাহলে ভদ্রলোক কীভাবে আন্দাজ করলেন অবিনাশ বাঙালি? প্রশ্নটা করেই ফেললেন ভদ্রলোককে।

উত্তরে মানুষটা বললেন, আপনার চেহারা দেখেই তো ধরা যাচ্ছে আপনি বাঙালি। এ আর বোঝার কী আছে!

কথাটা শুনে খুবই প্রীত হন অবিনাশ। বার্থ নামানো হয়ে গেছে। দুজনে পাশাপাশি বসেন।

অবিনাশের সব সময় একটা সংশয় থাকে মনে, তাঁকে বোধহয় এখনও পুরোপুরি বাঙালি মনে হয় না। প্রথম প্রথম অফিস কলিগরা তাঁর ধুতি পরা, হাঁটাচলা নিয়ে কটাক্ষ করত। বলত, খোট্টা চ্যাটার্জি। নামটা অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। দ্রুত নিজের পোশাকআশাক, আচরণ পশ্চিমবঙ্গীয়দের মতো করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও অবিনাশের ব্যক্তিত্বে গাম্ভীর্যের সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের উদাসীনতা মিশে থাকে। সহজে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না। হাওড়ার ব্রাঞ্চে এসে প্রথম দু বছর অফিসের নাটকে দুর্দান্ত অভিনয় করেন। ব্যস তারপর থেকে আর কেউ খোট্টা বলে উপহাস করে না। এখন তো অফিসের নাটকের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর।

মহাশয়ের নামটা জানতে পারি? জিজ্ঞেস করলেন পাশের ভদ্রলোকটি।

অবিনাশ নাম বলেন। তারপর জানতে চান, আপনি?

আমি প্রবাল সামন্ত। সরকারি কর্মচারী। বদলি হয়েছি সমস্তিপুরে। জায়গাটা কেমন? অবিনাশ টের পান, ভদ্রলোক সাধারণ মানুষ নন, প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। কীভাবে যেন নিশ্চিত হয়েছেন অবিনাশ এদিককার পুরনো বাসিন্দা, আবার বাঙালিও বটে।

তারিফ করাতে আর গেলেন না অবিনাশ। কিছু মানুষ প্রশংসা শুনতে বড্ড ভালবাসে। ইনিও বাসেন মনে হচ্ছে। একটু চমকে দেওয়ার ঝোঁক আছে। অবিনাশ বলেন, জায়গা তো খুবই ভাল। মানে ক্লাইমেট বলুন, খাওয়াদাওয়া, টাটকা শাকসবজি, দুধ, সবই পাওয়া যাবে। মানুষজন যথেষ্ট সহজ সরল।

ক্রাইম? চোখ কুঁচকে জানতে চান প্রবাল সামন্ত।

আছে। সে রকম জটিল কিছু নয়। রাগ হল, কাউকে মেরে দিল। সেই মারামারিতে

একজন খুন হয়ে গেল। এইরকম আর কী!

নেপাল বর্ডার দিয়ে চোরাচালান নাকি বাড়ছে?

অবিনাশের এবার সন্দেহ হয়। জিজ্ঞেস করে, আপনি কি পুলিশে আছেন?

আরে না না, এমনি সরকারি চাকুরে। মাঝবয়সে বদলি করে দিল এখানে। কত বছর থাকতে হবে জানি না। তাই একটু বুঝে নিচ্ছি এখানকার পরিস্থিতি।

এমনিতে ভালই। গোড়ার দিকে একটু অসুবিধে হবে মানিয়ে নিতে। এখানকার আবহাওয়া চড়া ধাঁচের। গ্রীষ্মে খুব গরম, শীতে প্রচণ্ড ঠান্ডা। এলাকার মানুষের চরিত্রের ধরনটাও সেইরকম। কিছুদিন যাওয়ার পর আলাপ হবে এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে, দেখবেন সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা একটুও পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গের থেকে।

ট্রেন আবার বেশ স্পিড নিয়েছে। ধাতব শব্দ, তার সঙ্গে দুলুনি। প্রবাল বলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের আর কালচার বলে কিছু আছে! যা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল নকশালরা। কবে সব রিপেয়ার হবে কে জানে!

প্রবাল অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। সামনের বার্থের যাত্রীদের একে একে ঘুম ভাঙছে। জানলার বাইরে এখন পরিপূর্ণ সকাল। খেত, মাঠ, ফসল, নদী পিছিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালই লাগছে অবিনাশের। জিজ্ঞেস করেন, কলকাতায় কোথায় থাকেন?

পৈতৃক নিবাস যাদবপুর। আমি কখন কোথায় থাকি কোনও ঠিক নেই। বদলির চাকরি।

পরিবারে কে কে আছেন?

স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বাবা, মা সব একজন করে। সবাই যাদবপুরেই থাকে। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকেন প্রবাল। তারপর জানতে চান, আপনার পরিবার কি এখানেই?

না, আমারও বদলির চাকরি। ফ্যামিলি নিয়ে চলে গেছি দেবপাড়া। আমার স্ত্রী একটিই, পুত্রসন্তান দুটি।

রসিকতার জবাব রসিকতায় পেয়ে হো হো করে হেসে ওঠেন প্রবাল। আক্ষেপের ভঙ্গিতে বলেন, নাঃ। ব্যাডলাক। আপনি যদি সমস্তিপুরে থাকতেন, আপনার সঙ্গে জমত ভালই।

কৌতূহল মেটানোর প্রকৃষ্ট সময় এখন। অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, আমার যে সমস্তিপুরে আদি নিবাস কী করে টের পেলেন?

উত্তরে প্রবাল বলেন, ঠিক সমস্তিপুরেই কিনা শিওর ছিলাম না। তবে আশপাশে তো বটেই। আর আপনার মালপত্তরের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে, বাড়ির লোকের মান ভাঙাতে চলেছেন। সঙ্গে স্ত্রী নেই দেখে অনুমানটা আরও দৃঢ় হয়েছিল। কেননা স্ত্রী-মান তো পাহাড়প্রমাণ জিনিস দিয়েও ভাঙানো যায় না, তবু আমরা চেষ্টা করি।

তাহলে বলছেন, আপনার একটা আন্দাজ মেলেনি? বলেন অবিনাশ।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। একই সঙ্গে এটাও বুঝেছি, বাড়ির অন্য সবার প্রতি আপনার যথেষ্ট টান। তা মশাই, বদলিটা আটকাতে পারলেন না, এসব স্বাস্থ্যকর জায়গা ছেড়ে কেউ যায় পচা পশ্চিমবঙ্গে! নকশালদের জ্বালায় লোকে পালিয়ে যাচ্ছে ওয়েস্টবেঙ্গল ছেড়ে।

একথার কোনও উত্তর দেন না অবিনাশ। নকশালদের জ্বালা তিনি সেভাবে উপলব্ধি করেননি। শোভাবাজারের ভাড়াবাড়িতে থাকতে যা একটু আঁচ পেয়েছিলেন, তুলনায় দেবপাড়া অনেক শান্ত। তিনি যখন বাংলায় যান, নকশাল নিয়ে সেরকম কোনও আতঙ্ক ছিল না। থাকলে হয়তো হত না যাওয়া। সেটাই কি ভাল হত?

মাঝে একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমে ফের চলতে শুরু করেছে। চা-ওলা উঠেছে কামরায়। প্রবালবাবু চা—ওলাকে ডেকে দু ভাঁড় চা দিতে বলেন। পয়সা দিতে যাচ্ছিলেন অবিনাশ। হাতের ইশারায় মানা করে প্রবাল বলেন, পরেরবার আপনি খাওয়াবেন।

বেশ মেজাজ করে চায়ে চুমুক দিলেন প্রবাল। তৃপ্তিসূচক আওয়াজ করে বললেন, খাসা চা। মোষের দুধের নাকি বলুন তো!

জবাবটা ছোট্ট হাসি দিয়ে সারেন অবিনাশ। উত্তর হ্যাঁ বা না দুটোই হতে পারে।

প্রবাল মন দিয়ে চায়ের ভাঁড়টা লক্ষ করছেন, বলেন, ভাঁড়টা কত বড় দেখেছেন! পশ্চিমবঙ্গে চার আনায় এতটা চা দেবে আপনাকে? ভাঁড় দেখেই বোঝা যায় এখানকার মানুষের মনের প্রসার।

মুখটা হাসিহাসি করেই রাখেন অবিনাশ। এত সহজ সিদ্ধান্তে মন ওঠে না তাঁর। প্রবালবাবুর মতো বিচক্ষণ লোকেরও এভাবে দুয়ে দুয়ে চার করা উচিত হচ্ছে না। হয়তো বাধ্য হয়েই করছেন, পরিবার থেকে দূরে থাকার কষ্ট ভুলতে প্রবাসের ছোটখাটো জিনিসকে প্রশংসা করছেন।

চা শেষ করে ভাঁড়টা জানলা দিয়ে গলিয়ে দিলেন প্রবাল। উঠে দাঁড়িয়ে স্লিপিং স্যুটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। দামি ব্র্যান্ড। একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে খানিকটা বার করে অফার করলেন অবিনাশকে। নেব কি নেব না করে, নিয়েই নিলেন অবিনাশ। সিগারেটের নেশা তাঁর নেই। কখনও ইচ্ছে হলে খান।

প্রবালবাবুর লাইটারটাও বেশ শৌখিন। অবিনাশের সিগারেট ধরিয়ে নিজেরটা ধরালেন। তারপর বললেন, আমি একটু টয়লেট থেকে আসছি। যদি কেউ আমার নাম করে এসে খোঁজ করে, বলবেন জানেন না।

কথা শেষ করেই প্রবালবাবু হাঁটা দিলেন টয়লেটের দিকে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন অবিনাশ, এ আবার কী ধরনের রহস্য রেখে গেলেন ভদ্রলোক! যতই খোলামেলা গল্প করুন প্রবাল, রহস্যের একটা মোড়ক যে তাঁকে ঘিরে রয়েছে, সেটা

অনেকক্ষণ ধরেই টের পাচ্ছেন অবিনাশ। ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে এতক্ষণ যা যা বলেছেন, তা কতটা ঠিক কে জানে। 'প্রবাল সামন্ত' নামটা মনে মনে একবার উচ্চারণ করেন অবিনাশ। নামটাও কি সঠিক? এর একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যাবে রিজার্ভেশন লিস্টে। কামরার দরজার পাশে লটকানো লিস্টটা এতক্ষণে ফর্দাফাঁই। অবিনাশ মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাঁর নামের আশেপাশে পি সামন্ত বলে কেউ ছিল কি না? মনে পড়ে না। ভাবা ছেড়ে দেন। রহস্যের পিছনে দৌড়নো তাঁর ধাতে নেই। মনটা বড় একমুখী, আবদ্ধ হয়ে যায়। তার থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে যতটুকু আলাপ হয়েছে, সেটুকুই মনে রাখা ভাল। ভোররাতের মানসিক ভার অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন প্রবাল সামন্ত।

সিগারেট পুড়ে ফিল্টার ছুই ছুই, বাইরে ফেলে জানলা ঘেঁষে বসেন অবিনাশ। বাতাসের ঝাপটে মাথার চুল ছটফট করছে, বাইরের অনাবিল নিসর্গে চোখ রাখেন। বাংলার তুলনায় বিহারের প্রকৃতি অনেক রুক্ষ। তবু রূপ তো কোনও অংশে কম নয়। বিহারে থাকাকালীন অফিস ইউনিয়নের সেন্ট্রাল মিটিঙে যোগ দিতে অবিনাশকে বহুবার বম্বে যেতে হয়েছে। অনেকটা পথ। চোখ ভরে দেখেছেন নানান ধরনের প্রাকৃতিক শোভা। কখনও সজল রুক্ষ পাহাড়, নদী, ঝরনা, সমুদ্র, খাঁড়ি... সর্বদাই প্রকৃতির মধ্যে নারীকে উপলব্ধি করেছেন অবিনাশ। এটা কি কোনও সংস্কার? অলক্ষ্যে ছোট বয়স থেকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মাথায়! প্রকৃতি যেমন থিতু হয়ে থাকে, ট্রেন ছুটে চলে বিপুল গতিতে। মনে হয় বুঝি প্রকৃতিও সচল। আসলে তা তো নয়। এই ট্রেন অথবা ধাবমান কোনও যান, পুরুষের মনের গতি। বারবার পেরোতে চায় সীমানা, নিসর্গ ফুরোয় না। নারী আগলে রাখে আজীবন।

'নারী' শব্দটা মাথায় আসতেই অনিবার্যভাবে মনে আসে ইলার কথা। জীবনে ওই একজনকেই অপার ভালবেসেছেন অবিনাশ। ভালবাসাটা লুকিয়ে রাখতে পারেন না। বাইরের লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই যেমন বরুণের অন্নপ্রাশনে অফিসের সবাই নেমন্তন্ন খেতে এল, সেদিনই অফিস কলিগদের সঙ্গে আলাপ হল ইলার। অবিনাশ সম্ভবত একটু গদগদ ছিলেন। খাওয়াদাওয়া সেরে ফেরার সময় রায়দা অবিনাশকে আলাদা ডেকে বললেন, বউ নিয়ে তো খুব আহ্লাদ দেখছি তোমার। অন্য মেয়ে চেখেটেখে দেখেছ জীবনে? নাকি একটা জায়গায় নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে আছ। বাইরের মেয়ে যদি টেস্ট না করলে, বুঝবে কী করে তোমার বউটা অতি উৎকৃষ্ট মানের।

খুবই অশ্লীল ইঙ্গিত। রায়দা মানুষটা এমনই। ভীষণ ঠোঁটকাটা। এ ছাড়াও মাসে এক-দুবার সোনাগাছি যাওয়ার অভ্যেস আছে। রায়দার কথার পর সন্তর্পণে প্রসঙ্গ ঘুরিয়েছিলেন অবিনাশ। ইলার আগে নারীশরীরের স্বাদ তিনি পেয়েছেন, সে অভিজ্ঞতা এত কুৎসিত, হঠাৎ মনে পড়ে গেলে মনে হয় আজও কাদা লেগে আছে গায়ে। এক এক সময় একথাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় অবিনাশের, ওই অধঃপতনের কারণেই তাঁর আধার নষ্ট হয়ে গেছে। যে অবতার পুরুষের আসার কথা ছিল বংশের সিঁড়ি বেয়ে, তিনি থেমে আছেন অবিনাশ অবধি এসে। আজ পর্যন্ত কোনও লোকাতীত ঘটনা ঘটাতে পারেননি অবিনাশ। তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাননি অবতার পুরুষ।

বংশের এই 'মিথ'কে অবিনাশ যে সত্যি বলে ধরে বসে আছেন তা নয়, আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারলেন না। নিজের বাবার কিছু অসম্ভব কর্মকাণ্ডে, মাঝে মাঝে দাদার আশ্চর্য চিকিৎসা সফলতা দেখে মনে হয়েছে, ওই তো তিনি আসছেন। এমনকী ছোট ভাই রজত বেশ কটি অপ্রচলিত শিল্পগুণের অধিকারী, ওর কিছু কিছু কাজ দেখে মনে হয়, হয়তো ওর মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছেন তিনি। রজতের একটা বিশেষ ক্ষমতা কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে একটা গোটা গ্রাম তৈরি করে ফেলা। পাখি, গাছ, বাড়ি... কাটা কাগজটা আলোর বিপরীতে ধরে দেওয়ালে ছায়া ফেললে আরও বেশি জীয়ন্ত হয়ে ওঠে গ্রামটা। ওই ছায়া দেখতে দেখতে একদিন স্পষ্ট ওই গ্রামের পাখির ডাক শুনতে পেয়েছিলেন অবিনাশ। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, তিনি প্রকাশিত হলেন!

এখন অবতার পুরুষের অপেক্ষাটা কেমন যেন গোলমাল পাকিয়ে গেছে, মনে হয়

অপেক্ষা আসলে ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছা। সেই দেখাটা নিজের মধ্যে হলে ভাল হত। কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্ত দোষ, ঘাট, লিপ্সা সরিয়ে তাঁকে খুঁজে পাওয়া এখন ভার হয়ে উঠেছে। অবিনাশ অতি সাধারণ একজন মানুষ। তবু প্রতীক্ষা থেকে যায়। এই তো কদিন আগে বরুণের মধ্যে তাঁর ঝলক খানিক দেখতে পেয়েছিলেন, মাত্র ন বছরের ছেলে কী অসম্ভব অনুভূতিপ্রবণ। ফুটবল খেলতে গিয়ে বাবার পায়ে লেগেছে, কষ্ট পাচ্ছে বাবা। সেই যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে বরুণ দেওয়ালে লাথি মারছে! এ তো সাধারণ মানুষের লক্ষণ নয়। বরুণের মধ্যে ঈশ্বরের দূতকে খুঁজছেন অবিনাশ। নানা আবর্জনা ঘেঁটে বরুণ যখন বড় হবে, সেও আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাবে না সেই পরম পুরুষকে। ওর পুত্রসন্তানের দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকবে। এই অন্বেষণ এবার বন্ধ হওয়া উচিত। ... ভাবনার এই জায়গায় এসে বুকটা খানিক শূন্য হয়ে যায় হঠাৎ করে, সমস্তিপুরের টিকিট কাটার রাত্তিরে অবিনাশ ইলাতে গমন করেছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। ঋতুর হিসেব অনুযায়ী ইলা ওই কটা দিন অত্যন্ত উর্বর থাকে। শুধু বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। জন্মনিয়ন্ত্রণের বাহ্যিক প্রস্তুতি ছিল না সে রাতে। কার যেন অসম্ভব প্ররোচনায় উপগত হয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে ইলা দিনক্ষণ খেয়াল করিয়ে দিলেও, আকণ্ঠ পিপাসায় উন্মুখ হয়েছিল। সুতীব্র আকর্ষণে গ্রহণ করেছিল অবিনাশের শরীর। রোপণের সময় মাটি যেমনটা অধীর হয়ে ওঠে।

আবার সন্তান সম্ভাবনার সৃষ্টি হল। এর জন্য অবশ্যই খানিকটা দায়ী সেই সন্ন্যাসী। যিনি হাওড়ার টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অবিনাশকে পঙ্গু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষটি কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখাননি, বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কিছু পরিচয় দিয়েছিলেন। ওঁর একটা আন্দাজ মেলেনি, ওষুধের পেটি দেখে বলেছিলেন, বাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন অবিনাশ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন বাবা। ভুল শুধরে দেওয়ার পর এতটুকু অপ্রস্তুত হননি। তবু সেই সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন কিছু ছিল, বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন অবিনাশ। বিধাতা কি সন্ন্যাসীর মধ্যে দিয়ে অবিনাশকে আবার পিতা হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন? —অবাস্তর জিজ্ঞাসাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন অবিনাশ। 'অবান্তর' এই কারণে যে, প্রশ্নটা স্বআরোপিত। অবিনাশ লক্ষ করছেন, তাঁর সমস্ত দার্শনিক ভাবনা ঈশ্বরকেন্দ্রিক হয়ে যায়। অথচ ঈশ্বরবিশ্বাস ততটা সুদৃঢ় নয়। হয়তো পিতার প্রভাবে ভাবনার প্রক্রিয়া এমন হয়েছে। নাস্তিক অথবা ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের থেকেও বেশি অশান্তি ঈশ্বরের প্রতি অর্ধবিশ্বাসীদের। কষ্টটা সহ্য করতেই হয় অবিনাশকে। ক্লান্তি আসে। বিশ্রাম চায় মন।

ট্রেনের জানলার বাইরে উদার, নির্লিপ্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছেন অবিনাশ। কী অদ্ভুত প্রশান্তি ছেয়ে আছে চারদিকে। হাওয়ায় ধুলোমাটি, জল, ফসলের গন্ধ। অবিনাশ প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করেন, এবার যেন তাঁর একটি কন্যাসন্তান হয়।

ঘুমের চটকা লেগেছিল। কে যেন ঠেলা দিয়ে ডাকে। চোখ খুলেই চমকে যান অবিনাশ, চারটে লোক। কালো পোশাকে আবৃত। মুখ কালো রুমালে বাঁধা। রুমালের ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, এখানে প্রবাল সামন্তের রিজার্ভেশন তো? কোথায় লোকটা?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়েন অবিনাশ। বলেন, আমি জানি না। এমনটাই বলতে বলেছিলেন প্রবালবাবু।

কালোদের একজন ঝাঁঝিয়ে ওঠে, জানি না বললেই হল! আমরা শিওর হয়েই এই কমপার্টমেন্টে উঠেছি। বলুন, কোথায় গেলেন সামন্ত?

উলটোদিকের সিটে দেহাতি যাত্রীরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। ওদের মধ্যে দুজন মহিলা, একটি শিশু। অবিনাশ বলেন, সত্যিই আমি জানি না। এমন কোনও লোকের সঙ্গে আলাপ হয়নি আমার।

লোকগুলো আর কথা খরচ করল না। একজন বলল, দাঁড়া দেখি, ওপরের বার্থে কে যেন শুয়ে আছে।

অবিনাশ নিশ্চিন্ত হন। প্রবাল সামন্ত বার্থে নেই, বাথরুমে গেছেন। আশঙ্কা হচ্ছে হঠাৎ

যদি এসে পড়েন! না আসার চান্সই বেশি। অবিনাশ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন প্রবাল সামন্ত যে-সে লোক নন। সাংঘাতিক কেউ। না হলে যমদুতের মতো চারটে লোক তাকে খুঁজতে আসে! এরকম যে ঘটতে পারে আন্দাজ করেছিলেন প্রবালবাবু, তাই তো টয়লেটে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, যদি কেউ খোঁজ করে আমার, বলবেন জানেন না।

নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দম চেপে বসে আছেন অবিনাশ। ওপরের বার্থে ঝুঁকে পড়া চারজন চাপা উল্লাসে বলে ওঠে, এই তো পেয়েছি।

ভীষণ অবাক হন অবিনাশ। এতটাই যে সিট ছেড়ে উঠে পড়েন। কাকে পেয়েছে ওরা? যার খোঁজ করছিল তার তো ওপরে থাকার কথা নয়। — ভাবতে ভাবতেই ওরা চারজন ওপরে শুয়ে থাকা মানুষটাকে চিৎ অবস্থায় নামিয়ে আনে। মানুষটির মুখ দেখে চমকে ওঠেন অবিনাশ, প্রবাল সামন্ত। চোখ বুজে এমন নিঃসাড়ে পড়ে আছেন, মনে হবে যেন মরেই গেছেন। নাকি সত্যি তিনি মৃত?

মাথা কাজ করছে না অবিনাশের। শ্বাস নিতে ভুলে গেছেন। কালো পোশাকের চারজন সৈনিক-তৎপরতায় প্রবাল সামন্তর বডি চাদর চাপা দিয়ে শোয়া অবস্থাতেই কুপ থেকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ কোনও প্রতিবাদ করছে না। হঠাৎই অবিনাশের চোখে পড়ে ওই চারজনের একজন একটু খুড়িয়ে হাঁটছে। হাঁটাটা খুব চেনা অবিনাশের। কে ওই লোকটা? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই, খোঁড়া লোকটা উত্তর দেয়। অবিনাশের দিকে ফিরে, মুখের রুমাল নামিয়ে মৃগাঙ্ক বলে, তুমি বাড়ি যাও। আমি কাজ সেরে আসছি।

এরকম একটা গর্হিত কাজ করতে করতে মৃগাঙ্কর এই স্বাভাবিক কথনভঙ্গিতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগে। অবিনাশ বুঝতে পারে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মৃগাঙ্ক। কিছু একটা বলতে যাবেন অবিনাশ, ঘুম ভেঙে যায়। —বিচ্ছিরি স্বপ্ন ট্রেনের জানলার বাইরে এখন আধা শহর। কোথায় এল কে জানে! কামরার ভেতরে চোখ বোলান, পাশেই বসে আছেন প্রবাল সামন্ত। ইংরেজি নিউজ ম্যাগাজিন পড়ছেন। অবিনাশের ঘুম ভেঙেছে টের পেয়ে বললেন, এসে গেল তো আপনার সমস্তিপুর। দারুণ ঘুম দিলেন একটা।

সলজ্জ হেসে আবার জানলার বাইরেটা দেখেন, হ্যাঁ, উজিয়ারপুর ঢুকছে ট্রেন। এবার গোছগাছ করে নিতে হয়। এর পরেই সমস্তিপুর।

স্বপ্নটা বেশ অন্য রকম। প্রবাল সামন্তকে বলতে পারলে ভাল লাগত। বলা যাবে না। স্বপ্নে প্রবালবাবুকে মৃত দেখেছেন অবিনাশ।

প্রবালবাবুর লাগেজ খুব সামান্য। খুব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলেন। অবিনাশের সময় লাগছিল। অন্য প্যাসেঞ্জাররা অনেক আগেই বেঁধেছেদে রেডি। ওদের মধ্যে বেশ কিছু গ্রামঘেঁষা মানুষ আছে, যারা এখনও পর্যন্ত নিজের রিজার্ভ বার্থটা পুরোপুরি নিজের মনে করতে পারে না। রাতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে। মাঝপথের কোনও স্টেশন থেকে ওঠা প্যাসেঞ্জারকে জায়গা ছেড়ে দিতে পারলে যেন বেঁচে যায়। আসলে রিজার্ভেশন ব্যাপারটাই তো চালু হল কদিন। তার আগে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে সিট দখল করতে হত। সত্যি, কী কষ্টটাই গেছে সে সময়!

জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফের সিটে বসলেন অবিনাশ। একবার মনে হল বাথরুম ঘুরে আসবেন কি? না থাক, বাড়ি গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন। বাড়ির কথা মনে পড়তেই ইঁদারার জলের ঠান্ডা পর্যন্ত অনুভব করলেন অবিনাশ। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আপন আবাস। ভেতর ভেতর কেমন যেন একটা উত্তেজনা হচ্ছে। ইলা, বাচ্চারা থাকলে হত না। ওদের দিকে নজর রাখতে গিয়ে অন্যমনস্ক থাকতেন।

মনের অস্থির ভাবটা কাটাতে প্রবাল সামন্তর সঙ্গে কথা চালাতে শুরু করেন অবিনাশ, আপনার ঠিকানাটা তো নেওয়া হল না। কোথায় থাকবেন সমস্তিপুরে?

আপাতত সরকারি কোয়ার্টারে। বলেন সামন্ত।

অবিনাশের খেয়াল হয় ভদ্রলোক সরকারের কোন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন এখন অবধি জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করেন, সরকারি কোন কোয়ার্টার?

সরি, এই বিষয়টা আপাতত গোপন থাক। আপনি বরং আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন। একদিন দেখা করে আসব। কিছুদিন আছেন তো এখানে?

একটু অপমানিত লাগলেও তেমন গুরুত্ব দিলেন না অবিনাশ। গোপনীয়তা তো সরকারের, প্রবালবাবুর নয়। অবিনাশ বলেন, আছি হপ্তাখানেক। যদি একদিন আসেন তো খুব ভাল হয়। সেকেন্ড লেভেল ক্রশিংয়ের কাছে গিয়ে যে-কাউকে বলবেন, ডাক্তার চ্যাটার্জির ডিসপেনসারিটা কোথায়? দেখিয়ে দেবে। ওটাই আমাদের বাড়ি। আমার দাদা ডাক্তার।

থ্যাঙ্কয়ু। বলে, উঠে দাঁড়ালেন প্রবালবাবু।

ট্রেন স্টেশন ইয়ার্ডে ঢুকছে। প্রবাল সামন্তর দু হাতে দুটি মাত্র লাগেজ, ছোট্ট বেডিং আর দামি স্যুটকেস। বলেছেন বদলি হয়ে এলেন। বাকি মাল কোথায়? কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করেন অবিনাশ, এখানে কিন্তু মারাত্মক ঠান্ডা পড়ে। মাস দুয়েক পরেই শীত। অনেক কিছু কিনতে হবে আপনাকে।

উত্তরে মৃদু এবং রহস্যময় হাসি হাসেন প্রবাল সামন্ত। লোকটাকে এখন পর্যন্ত ঠিক ঠাহর করা গেল না।

ট্রেন থেমেছে। যাত্রীদের মধ্যে হুড়োতাড়া পড়ে গেছে নামার। এটাই লাস্ট স্টপ। তবু যে কেন এত অধৈর্য! হয়তো এরা অনেকেই বাড়ি ফিরছে।

প্ল্যাটফর্মে নেমেই একদম বদলে গেলেন সামন্ত। দু হাতে লাগেজ ঝুলিয়ে ঋজু, সটান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বিদায়সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে হোঁচট খেলেন অবিনাশ। সামন্ত তাঁকে চিনতেই চাইছেন না। গিরগিটির ভঙ্গিতে ঘাড় এদিক-ওদিক করে কাকে যেন খুঁজছেন। কারও রিসিভ করার কথা আছে হয়তো। প্রবাল সামন্তর থেকে মন সরিয়ে নিলেন অবিনাশ। সঙ্গে অনেক মাল আছে দেখে তিন-চারটে কুলি এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের চেহারায় চোখ বুলিয়ে একজন মাঝবয়সিকে বেছে নেন অবিনাশ। কারণ, বেশি বয়সির মাথায় বোঝা চাপাতে অস্বস্তি হয়। আর জোয়ানরা তো ঠিক রোজগার করে নেবেই।

পছন্দ করা কুলিটা মাল ওঠাতে লাগল। অন্য দুজন মোটেই হতাশ হয়নি। তারা সাহায্য করছে মাঝবয়সির কাঁধে, মাথায় মাল তুলে দিতে। নিজের শ্রেণির প্রতি এই আন্তরিকতা বিহারে খুব দেখা যায়। ব্যাপারটা ভীষণ ভাল লাগে অবিনাশের। সে জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে সবসময় একটা অন্তর্লীন প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

কুলি এগিয়ে যাচ্ছে। অবিনাশ আড়চোখে একবার প্রবাল সামন্তকে দেখে নিতে গিয়ে থমকে যান, একদল পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে সামন্তর সামনে এগিয়ে আসছে। ওই দলটার মধ্যে সাদা পোশাকের পুলিশও আছে দু-তিনজন। ওরা যে সামন্তকে ধরতে আসছে না, প্রবাল সামন্তর সটান দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। তবে ওঁর মুখে গভীর উৎকণ্ঠা।

অবিনাশ এগিয়ে গিয়ে কুলির কাঁধে টোকা মেরে বলেন, থোড়া ঠহর যাও। হাম আভি আয়া।

বাবা কুলির কলারে ছাতার হাতল দিয়ে আটকে রাখতেন, অবিনাশ শোধ দেওয়ার জন্যই অতিরিক্ত বিশ্বাস করেন এদেরকে। এও তো এক ধরনের পিতৃঋণ।

সামন্তর আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন অবিনাশ। পুলিশদের মুখে সদ্য সফলতার আলো। সাদা পোশাকের একজন বলে, আপনার কথাই ঠিক হল স্যার। রাত্তিরেই ছেলেটাকে ধরলাম। তবে মনে হচ্ছে সঙ্গে আরও দু-একজন ছিল। একা এত বড় একটা অপারেশনের সাহস কেউ করবে না। বাকিদের ধরা গেল না।

ব্যাড লাক। চলো দেখি ছেলেটাকে। কোথায় রেখেছ? বলে, দৃঢ় পদক্ষেপ এগিয়ে যাচ্ছেন সামন্ত।

সাদা পোশাক ওঁর হাতের লাগেজ দুটো নিতে নিতে বলে, ওয়েটিং রুমে আছে।

অবিনাশ অজান্তেই দলটাকে অনুসরণ করছেন। এখন আর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না প্রবাল সামন্ত পুলিশের একজন বড়কর্তা। পাশে হেঁটে যাচ্ছে অধস্তনরা। বড় সাহেবকে তেল

মারার ভঙ্গিতে অন্য একজন সাদা পোশাক বলছে, হাওড়ায় গাড়ি ছাড়ার লাস্ট মোমেন্টে আপনি যে ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে থ্রি-টায়ারে গিয়ে শোবেন আমরা কেউ আন্দাজ করতে পারিনি। আপনি শিওর ছিলেন, আপনাকে মার্ডার করার চেষ্টা হতে পারে?

শিওর ছিলাম না। তবে চান্স তো একটা ছিলই। এই কবছরে এত আনকভারড সিচুয়েশনে ওরা তো আমাকে পায়নি।

বড়কর্তার কথায় সাদা পোশাক সন্তুষ্ট নয়। বিনয়ে আর একটু গুড় মিশিয়ে বলে, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে স্যার, আপনার কাছে সামান্য হলেও ইনফর্মেশন ছিল। না হলে আপনি আগে থেকেই কী হিসেবে সমস্তিপুর ফোর্সকে রেডি থাকতে বলেন। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই সমস্তিপুরের পুলিশ ঘিরে ফেলল ফার্স্ট ক্লাস।

জুনিয়র অফিসারের দিকে তাকিয়ে মৃদু, রহস্যময় হাসিটা হাসেন সামন্ত। অবিনাশের প্রশ্নের জবাবে এই হাসিটা আজ সকালেই একবার হেসেছেন। এ এক ধরনের অভিজাত উপেক্ষা। জুনিয়ারের জিজ্ঞাসা এড়িয়ে গিয়ে সামন্ত জানতে চান, রক্ষিত কেমন আছে? উনডেড হয়নি তো?

না স্যার, আপনি ভাল লোককেই আপনার বার্থে শুতে বলেছিলেন। ওর তো রাতে ঘুম হয় না। দিনে ঘুমোয়। তার ওপর আপনার স্লিপিং স্যুট পরে শুয়েছিল, টেনশানে চোখের পাতা এক করতে পারেনি....

আরও কী সব বলে যাচ্ছে ইয়াং অফিসার, সব কথা ভালভাবে শুনতে পাচ্ছেন না অবিনাশ। আপাতত তাঁর কাছে বিষয়টা মোটামুটি পরিষ্কার। পুলিশের পাতা ফাঁদে কেউ একজন ধরা পড়েছে। যার উদ্দেশ্য ছিল প্রবাল সামন্তকে খুন করা। কেন সামন্তকে খুন করতে চাইছে? ছেলেটিকে একবার দেখার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে অবিনাশের।

পুলিশের দলটা ওয়েটিং রুমে ঢোকে। পিছন পিছন অবিনাশ। বিশাল ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চে বসে আছে সেই ছেলে। এক হাতে হ্যান্ডকাফ, দুপাশে পুলিশ।

ছেলেটার বয়স বড় জোর বাইশ-চব্বিশ। চেহারায় ভদ্রঘরের ছাপ। চোখ-মুখে ভয়, অনুতাপ, অনুশোচনা কিচ্ছু নেই। বরং সামন্তকে দেখে দৃষ্টি দপ করে উঠল। ছেলেটা কি নকশাল? কেন এমনটা ভাবছেন অবিনাশ! যে-কোনও সহিংস বিপ্লবে তাঁর কি পরোক্ষ সমর্থন আছে? যার ভিত প্রস্তুত হয়েছিল সেই কিশোর বয়সে? নকশাল আন্দোলন নিয়ে অবিনাশের মনে এখনও অনেক ধোঁয়াশা। বড় কোনও নেতার সঙ্গে আলাপ হয়নি বলে তত্ত্বটা তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। তবু সদ্য ধরা পড়া ছেলেটার পক্ষ নিয়ে ফেলছেন।

সামন্ত বেঞ্চের কাছে পৌঁছতেই ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটাকে এবার খুব কাছ থেকে দেখছেন অবিনাশ। কী নিষ্পাপ, সরল মুখ। ভাবাই যায় না কাউকে খুন করতে গিয়েছিল। শুধু চোখ দুটোই যেন অন্য কারও, ধিকি ধিকি জ্বলছে।

সামন্ত অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটাকে দেখলেন। অবিনাশ পিছনে থাকার দরুন সামন্তর চাউনিটা দেখতে পাচ্ছেন না। ওয়েটিং রুমে গুন গুন, ফিস ফিস। হুইশেল বাজিয়ে কোনও প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে। আওয়াজটা শেষ হতেই, বিনা ভূমিকায় সামন্ত সপাটে চড় কষান ছেলেটার গালে।

মেঝেতে ছিটকে পড়েছে ছেলে। ওর এক হাতের হ্যান্ডকাফটা যে-পুলিশ ধরেছিল, সময়মতো ছেড়ে দিয়েছে। মার খাওয়া ছেলেটাকে ভাল করে লক্ষ করেন অবিনাশ। শৃঙ্খলহীন অপর হাত নিজের আঘাত লাগা গালে বোলাচ্ছে ছেলেটা। ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে আঘাত যতটা না শরীরে লেগেছে, তার থেকেও বেশি লেগেছে আত্মসম্মানে।

অবিনাশের খারাপ লাগে। শাস্তি যা পাওয়ার ছেলেটা তো পাবেই। তবু কেন এত জোরে মারলেন সামন্ত। অপমানটা কি ছেলেটার ঠাকুর্দার গাল অবধি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন!

যুবকটি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। কেউ সাহায্য করছে না। করার কথাও না। প্রবল আক্রোশে সামন্তই এগিয়ে যান, নিমেষে বুটসুদ্ধু লাথি মারেন ছেলেটার পেটে। এ দৃশ্য সহ্য হয় না অবিনাশের। মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে থাকেন। বুকের মধ্যে কেমন একটা প্যালপিটিশন

শুরু হয়েছে। ভীষণ ভয়। সামন্ত কি সত্যিই এখানে বদলি হয়ে এসেছেন? তা হলে তো সমস্তিপুরের পক্ষে এটা ভীষণ খারাপ খবর।

ভোরের আচ্ছন্নতা, ভ্রম, ভাবাবেগ কাটিয়ে শুকদেব এখন বেশ ঝরঝরে। বাথরুম সেরে, জলখাবার খেয়ে ফিরে এসেছেন ডিসপেনসারিতে। ফুরিয়ে যাওয়া ওষুধগুলোর লিস্ট করে ফেলতে হবে। সমস্ত স্টক নামানো হয়েছে টেবিলে। রুনুঝুনুকে ভেতর-বাড়িতে দিয়ে এসেছেন। ভাইবউ মালবিকাকে বলেছেন, ঘণ্টাখানেক আটকে রেখো। আমি ওষুধের ফর্দ করছি, এসে ডিসটার্ব না করে।

রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বসে অফিসের ভাত খাচ্ছিল রজত। শুকদেবের সিরিয়াসনেস দেখে টেরা চোখে একবার তাকাল। খেতে বসে কথা বলে না রজত।

পৈতে হওয়ার পর থেকেই এটা মেনে আসছে। কথা না বললেও ওর দৃষ্টির ভাষা পড়তে পারেন শুকদেব। রজত তখন চোখ দিয়ে বলেছিল, রুগিই হয় না চেম্বারে, ওষুধ ফুরোল কী করে!

চোখ দিয়েই উত্তর দিয়েছিলেন শুকদেব, ফর্দ তো তোমার হাতে ঝোলাচ্ছি না। তোমার অত চিন্তা কীসের?

লিস্ট বানানো চাড্ডিখানি কথা নয়। এ এক হুলুস্থুল ব্যাপার। প্রতিবারই সাহায্য করে সুধা। এখনও আসছে না কেন! ছত্রাখান ওষুধের শিশি, ধুলোয় ভোম হয়ে বসে আছেন শুকদেব। এমন সময় ক্রিড়িং ক্রিড়িং... রজত সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছে অফিসে। ডিসপেনসারির দরজার সামনে দিয়ে রাস্তায় নামতে হয়। অফিস যাওয়ার সময় রজত রোজ একবার বলবেই, দাদা, আসছি।

আজও বলল। অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ' দেন শুকদেব। কী যেন একটা মনে পড়তে চাইছে। কোনও একটা দরকারি কথা বলার ছিল রজতকে। যদি চলে যায়, তাই বলে উঠলেন, শোন। কথা আছে।

বাড়ির সামনে চওড়া নর্দমা। তার ওপর সিমেন্টের ব্রিজ পেরিয়ে রজত রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিল। উঠতে যাচ্ছিল সাইকেলে। দাদার ডাকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখে বিরক্তি। শুকদেব ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে ছোট ভাইয়ের দিকে এগিয়ে যান।

সামনে যেতে রজত বলে, কী হল আবার!

এই সময়টুকু পেয়ে লাভ হয়েছে শুকদেবের, মনে পড়ে গেছে কথাটা। বলেন, মৃগাঙ্ক ফেরার। পুলিশ খুঁজছে।

জানি তো।

জানিস তো বলিসনি কেন আমাকে?

শুনে কী করতে?

মোক্ষম প্রশ্ন করেছে রজত। সত্যিই তো জেনে কী করতে পেরেছেন শুকদেব! কী করার আছে তাঁর! রজতের প্রশ্নের চোটে ভুলেই গেলেন কী বলতে এসেছিলেন। দাদার অপ্রস্তুত ভাব কাটাতে রজত বলে, তুমি কার কাছে শুনলে!

শশাঙ্ক এসেছিল সকালবেলা। বলল এই অবস্থা। মৃগাঙ্কর ঘর নাকি লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ। শশাঙ্ককেও এসেছিল জেরা করতে।... বলতে বলতেই শুকদেবের মনে পড়ে যায় আসলে কী জন্য রজতকে ডেকেছেন। একটু থেমে বলে ওঠেন, ও হ্যাঁ, ভাল কথা। তোকে যেটা বলছিলাম, শশাঙ্ক তোর কাছেও আসবে সন্ধেবেলা।

তো? রজতের কপালে ভাঁজ পড়ে।

আলোচনা করবে। দাদা কোথায় কোথায় যেতে পারে।

এতে অসুবিধে কী! আসতেই পারে।

অসুবিধে আছে। আমি যেমন একটু ভেবেই বার করে ফেলেছি মৃগাঙ্ক কোথায় যেতে পারে। তুইও পারবি। খবরদার সেই জায়গার নাম করবি না। শশাঙ্কটা এমন শয়তান,

অলরেডি মৃগাঙ্কর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা পুলিশকে দিয়ে দিয়েছে।

সাইকেল স্ট্যান্ড করে রজত দাদাকে বলে, তুমি যে কী বলছ, কেন বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। চল চেম্বারে বসে গুছিয়ে বল সব কথা।

দু পা এগিয়ে যাওয়া ভাইয়ের কনুই ধরে নেন শুকদেব। বলেন, তোর অফিসে দেরি হয়ে যাবে। ছোট্ট কথা। এখানে দাঁড়িয়ে শুনে নে। রজত দাড়ায়। ভঙ্গিতে অসহিষ্ণুতা। শুকদেব বলেন, মৃগাঙ্ক পালিয়েছে অবিনাশের কাছে। একটু মাথা খাটালে তুইও সেটা বুঝতে পারবি। আমার কথা হচ্ছে, তুই সেটা বলে দিস না শশাঙ্ককে। তাহলে অবিনাশের ঠিকানাটাও পুলিশকে দিয়ে দেবে ছেলেটা।

দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে রজত বলে, আমার মাথা তো ফাঁকা বসে থাকে না, অবাস্তব কল্পনার করার সময় আমার নেই। তুমি চেম্বারে বসে যে কাজটা করছিলে, সেটাই মন দিয়ে করো।

মরিয়া কণ্ঠে শুকদেব বলেন, অবাস্তব নয় রে রজত। শশাঙ্কর মতো ছেলেরা সব পারে।

একটু ধমকের সুরে রজত বলে, তুমি ভেতরে যাবে, নাকি বউদিকে...

রজতের থেমে যাওয়া দেখে শুকদেব টের পান ডিসপেনসারির দরজায় সুধা এসে দাঁড়িয়েছে। মাথা নামিয়ে ফিরতে থাকেন।

চেম্বারে ঢুকতে গেলে সুধা সরে দাঁড়ায়। নিজের চেয়ারের দিকে যেতে যেতে শুকদেব অনুযোগের সুর মিশিয়ে বলেন, ছোটর সবসময় হামবড়াই ভাব। ভাল কথা বলতে গেলাম...

কে বলেছে তোমাকে মৃগাঙ্ক ঠাকুরপো মেজ ঠাকুরপোর কাছে যেতে পারে? সুধার গলাটা আপাতকঠিন শোনালেও, ভেতরে গভীর অভিমান।

চেয়ারে বসে শুকদেব বলেন, আমি নিশ্চিত মৃগাঙ্ক পালালে অবিনাশের কাছেই যাবে। ওরা যে কী রকম হরিহর আত্মা ছিল তুমি দেখনি।

দেখিনি। তবে শুনেছি। বলে, উলটোদিকের চেয়ারে বসে সুধা। অর্থাৎ লিস্ট করায় হেল্প করবে। মনটা একটু শান্ত হয় শুকদেবের। যাক, ঝামেলার কাজটা সহজ হয়ে যাবে অনেক।

সুধার দিকে একটা চওড়া ওষুধের বাক্স এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা নিয়ে বসেন। সুধা সর্টিং জানে। একদম ফাঁকা শিশিগুলো এক জায়গায়, প্রায় ফাঁকা আর ইমপর্টেন্ট আধ ফাঁকা ওষুধগুলো আলাদা আলাদা জায়গায়। তারপর ওষুধের নামগুলো বলবে সুধা, লিখে নেবেন শুকদেব। গুরুত্বপূর্ণ ওষুধগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে সুধার। ও এখন প্রায় হাফ ডাক্তার।

প্রাথমিক কাজটা করতে করতে শুকদেব গল্পের ছলে শুরু করেন, মৃগাঙ্ক অবিনাশকে আমরা গৌরনিতাই বলে খেপাতাম। ও দুটো একবার কী করেছিল জান! বাছাইয়ে ব্যস্ত সুধা মুখ না তুলে বলেন, কী?

অর্থাৎ গল্প শোনার মন হয়েছে। বেশ উৎসাহের সুরে শুকদেব বলেন, হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে দুজনেই ফিরছে না। সন্ধে হয়ে গেছে। দুবাড়িতেই খোঁজাখুঁজি শুরু হল। স্কুল তো অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে। গেলাম বাংলা-পণ্ডিতের বাড়িতে। রজনীবাবু বললেন, ওদের দুজনকেই স্কুলে দেখা যায়নি। কী করি, ছুটলাম অবিনাশের ক্লাসমেট রাজেশ্বরের বাড়িতে। ওই খবরটা দিল, ওই দুটোতে নাকি প্ল্যান করেছে সেদিন স্কুলে না গিয়ে মজফফরপুর যাবে ট্রেনে করে। মজফফরপুর স্টেশন থেকে চব্বিশ মাইল দূরে একটা বাজারে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছিলেন। জায়গাটার সঠিক হদিশ কেউ ওদের দিতে পারছে না। কেউ বলেছে, ওয়াইলি স্টেশন। কেউ বলছে ওয়ানি গ্রাম। ওরা আবিষ্কার করতে গেছে জায়গাটা। পরে নাকি আরও প্ল্যান আছে, ওখানে ক্ষুদিরামের স্মৃতিস্তম্ভ করবে। —ক্ষুদিরাম কীভাবে ধরা পড়েছিলেন সেই ঘটনা জান তো? কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন শুকদেব।

মাথা নাড়েন সুধা। শুকদেব বলেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল বোমা ছুড়ে দুজন দুদিকে পালিয়ে যান। খালি পায়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ক্ষুদিরাম যখন মজফফরপুর থেকে বহু দূরের একটা বাজারে দাঁড়িয়ে চিঁড়ে-জল খাচ্ছিলেন, তখনই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রফুল্ল ধরা পড়েন মোকামা ঘাটে। অবশ্য ধরা তাঁকে যায়নি, তার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন। সেসব কাহিনী

তুমি জান। তো যা বলছিলাম, আমাদের দুই কাপ্তান বাড়ি ফিরলেন অনেক রাত করে। দুই বাবা বেত নিয়ে রেডি ছিলেন। পরিত্রাহি চিৎকার করছে দুজনে। বাবাকে আটকাতে গেলাম আমি, ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ওই মার দেখে মাথা ঘুরে গেল আমার। পড়ে গেলাম মাটিতে। তারপর আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল সবাই। আচ্ছন্ন অবস্থায় শুনি, অবিনাশের গলা, ও দাদা, ওঠো না। বাবা মোটেই জোরে মারেননি। আরও মার খাওয়ার ভয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছিলাম। থেমে গেলেন শুকদেব। একটু পরে বললেন, বদমাইশির জন্য আরও বেশ কয়েকবার বাবার মার খেয়েছে অবিনাশ। ভুলেও চেঁচাত না।

ডিসপেনসারি ঘরে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা নেমে এল। পরিবেশের ভারী ভাবটা কাটাতেই বুঝি সুধা বলে ওঠেন, একটু চা খাবে তো? আমারও ইচ্ছে করছে খেতে। দেখি উনুনে আঁচ আছে কি না।

সুধা উঠে যান। কাজ গুলিয়ে যাচ্ছে শুকদেবের। বারবার চোখের সামনে উঠে আসছে কিশোরবেলা। কী অদ্ভুত দিন ছিল তখন। বাগানভরে রক্তগাঁদা ফুটত। ইঁদারার পাশের জমিতে সবজি চাষ দিত রামলগন। বাড়ির খাস চাকর আবার মা-মরা ভাইবোনের অভিভাবকও বটে। সবজিখেতের মটরশুঁটি কী মিষ্টি... ধীরে ধীরে নিজের কিশোরবেলায় তলিয়ে গেলেন শুকদেব। সময়ের খেয়াল নেই। হঠাৎ সুধার গলা, ওমা, এ কী!

বেশ জোরেই চেঁচিয়েছে সুধা। চমকে উঠে সুধার দিকে তাকান শুকদেব, আশঙ্কা হয় কিছু গণ্ডগোল করে ফেলেছেন বুঝি।

হাতে কাপ-ডিশ নিয়ে সুধা কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে নেই। চেয়ে আছে দরজার বাইরে। সুধার দৃষ্টি অনুসরণ করে শুকদেব রাস্তার দিকে তাকান। এবং প্রচণ্ড বিস্মিত হন। তাঁর বিশ্বাসই হয় না। একগাল হাসি নিয়ে রিকশা থেকে নামছেন অবিনাশ। বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠলেও, সামলে নেন নিজেকে। মুখ ঘুরিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন।

টেবিলে দায়সারাভাবে চায়ের কাপ নামিয়ে সুধা বলেন, কী হল, বসে রইলে কেন। দেখ কে এসেছে। কিছুক্ষণ আগেই মেজ ঠাকুরপোর কথা হচ্ছিল না। অনেক দিন বাঁচবে।

শুকদেবের প্রতিক্রিয়া গ্রাহ্য না করে সুধা এগিয়ে যান। ভোররাতের অভিজ্ঞতা ফিকে হয়নি শুকদেবের, স্পষ্ট শুনেছিলেন রামসাগরের গলা। অবিনাশের হঠাৎ আসাটা সেরকমই কোনও বিভ্রম হয়তো। চুপ করে ঘোর ভাঙার অপেক্ষায় আছেন শুকদেব। সুধা হয়তো আসেইনি ঘরে। সবটাই মনের ভুল। কিন্তু চায়ের কাপ-ডিশটা টেবিলে স্পষ্ট। ছুঁয়ে দেখতে যাবেন, এমন সময় 'দাদা' বলে সেই কবেকার ডাক দেয় অবিনাশ। শব্দটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বুকে আছড়ে পড়ে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন শুকদেব। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান।

রিকশাওলা জিনিসপত্তর নামাচ্ছে। অবিনাশ এগিয়ে এসে দাদাকে প্রণাম করেন। শুকদেব ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রথম যে কথাটা বলেন, অবিনাশ খানিক হকচকিয়ে যান। শুকদেব বললেন, প্ল্যানটা ভালই করেছিস। পুলিশ ধন্দে পড়ে যাবে।

॥ দশ ॥

আলসিয়া রে আলসিয়া/ তোর খলই যায় ভাসিয়া... লাইন দুটো সকাল থেকেই মাথায় ঘুরছে ইলার। পড়াশোনায় অন্যমনস্ক হলেই মা ছড়াটা বলত। অনেকদিন পর্যন্ত ভাইবোনেরা জানত ছড়াটার দুটো লাইনই সম্বল। একদিন বড়দা বাকি দুটো লাইন কোথা থেকে যেন জোগাড় করে আনল। পড়তে বসে ভাইবোনেরা গল্প করছে, মা ব্যস্ত পায়ে হেঁশেলের দিকে যেতে যেতে ফুটকুনিটা দিল। মা' খুব নরম মনের মানুষ, এর বেশি শাসন করতে জানত না। সেদিন যখন ছড়াটা বলেছে মা, উত্তরে দাদা বলে উঠেছিল, যাক খলই ভাসিয়া / কালকে বানাইস বসিয়া।

মা ধরা পড়ে যাওয়ার হাসি হেসে ফেলেছিল। আসলে বাকি দুটো লাইন জানলেও মা বলত না। মায়ের সেই হাসিটা আজও মনে পড়ে, ছোট্টখাট্টো চেহারার মা ঘর আলো করে হেসেছিল। ঘরের ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা ভরাট হয়ে গিয়েছিল তক্ষুনি।

কেন সকাল থেকে লাইন দুটো ভ্রমরের মতো মাথায় ঘুরছে, কে জানে! কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না। এখন বিকেল। দিবানিদ্রার চটকা এইমাত্র ভেঙেছে ইলার। ইদানীং সংসারের কাজ কম। দিন পাঁচেক হল অবিনাশ দেশের বাড়ি গেছেন। উনি না থাকলে কাজ অর্ধেক হয়ে যায়। অংশু এখন স্কুলে। বরুণ বাড়িতেই। ওর প্রাইমারি সেকশান। মর্নিং স্কুল।

বরুণ দুপুরে পাশেই শুয়েছিল। এখন নেই। কোথায় গেল, সে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলে। নিরাপদ রেখার মধ্যেই থাকে ছেলেটা। ডাক দিলে এক্ষুনি সাড়া দেবে।

বিছানা থেকে উঠতে প্রবল আলিস্যি লাগছে ইলার। উনি সমস্তিপুর যাওয়ার পর থেকেই এমনটা হয়েছে। যাওয়ার দুদিন আগে রাতেরবেলায় এমন কাণ্ডটা করলেন, কিছু বেঁধে যায়নি তো? সে রাতে যেন ওঁকে ভূতে পেয়েছিল। কোনও কথাই শুনতে চাইছিলেন না। খুব ভুল সময়ে ওসব করে ফেললেন। মেঘে মেঘে ভারী হয়ে আসা আকাশ ঘন কালো হয়ে আক্রোশে ফুঁসছিল। বজ্রবিদ্যুৎ বৃষ্টি হয়ে তা যখন নামছিল ইলার শরীরে, অসহ্য ভাল লাগছিল। ইলা টের পাচ্ছিলেন কোথাও কোনওভাবে অসম্মানিত অথবা পরাজিত হয়েছেন অবিনাশ। ফের জেগে ওঠার জন্য এই মিলন। ব্যাপারটা একদিক থেকে ভালও লাগে, আবার খারাপও। কেন কোথাও আঘাত পেলে মনে পড়ে স্ত্রীর শরীরের কথা। অন্য সময় তো মাস পেরিয়ে যায়, কিছু হয় না। তখন তো আড্ডা, গল্প, অফিসের কাজ। বাইরের জগৎ নিয়েই মশগুল। ভাল লাগে এই ভেবে যে, ফিরে তো আসতেই হয় আমার কাছে। ইলা হয়তো মনের অতল থেকে চান অবিনাশ মাঝেমাঝেই অসম্মানিত, পরাজিত হন। এই চাওয়াটা কি প্রেম? প্রেম তা হলে এতটাই নির্লজ্জ। কে জানে বাবা!

বিছানা থেকে উঠে আসেন ইলা। শুয়ে থাকলে চলবে না। একটু পরেই স্কুল থেকে ফিরবে অংশু। এসেই খেতে চাইবে। বাড়ন্ত শরীর। আটা মাখাই আছে। স্টোভ জ্বেলে ওর জন্য কটা রুটি করে দিতে হবে। স্টোভ জিনিসটা ইদানীং আর ভাল লাগছে না। একটু সম্পন্ন আত্মীয়বাড়ি গেলেই দেখা যাচ্ছে, গ্যাসের উনুন। বিশেষ করে শীলার বাড়িতে যেদিন চকচকে গ্যাস ওভেন দেখলেন, বুকের ভিতর চিড়চিড় করে উঠেছিল। হিংসে আঁচড়াচ্ছিল নখের মতন। মনে হয়েছিল এই দুনিয়ায় পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। তাই নেই ভগবানও। তা না হলে, শীলা ওরকম একটা পাপের বিয়ে করেও কী করে সুখে থাকে। শীলা যখন বড় চোখমুখ করে তার নতুন ব্যবস্থার রান্নাঘর দেখাচ্ছিল, সহজভাবে হাসতে পারছিলেন না ইলা। অথচ তিনি তো বোনকে যথেষ্টর থেকে বেশি ভালবাসেন। তাই তো কাউকে না জানিয়ে বোনের বাড়িতে যান। অন্তত একবেলার জন্য। অবিনাশ যদি জানতে পারেন, বাড়ি মাথায় তুলবেন। বাপের বাড়ির তরফ ত্যাগ করবে সম্পর্ক। একমাত্র মা জানে শীলার সঙ্গে যোগ রাখে বড় মেয়ে। খুব নিভৃতে ইলাকে পেলে ফিসফিস করে জানতে চায় শীলার খবর। এমনিতে নতুন আলাপ হওয়া মানুষকে বলে থাকে আমার এক মেয়ে, চার ছেলে। এমনটাই

নির্দেশ দেওয়া ছিল বাবার। বাবা গত হলেও মা সেই নির্দেশ মেনে চলছে।

শীলাকে নিজের শরীরের একটা অঙ্গের মতোই ভালবাসেন ইলা। তবু সেদিন গ্যাসের উনুনটা সহ্য করতে পারেননি। ওদের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে তখনই প্রতিজ্ঞা করেন, এক বছরের মধ্যে নিজের রান্নাঘরের জন্য গ্যাস ওভেন আনতেই হবে। সেই লক্ষ্যে সংসার খরচা থেকে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে জমা করতে শুরু করেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে প্রতিজ্ঞা রাখা যাবে না। গ্যাসের উনুন পেটে জ্বলছে। অবিনাশ সমস্তিপুর যাওয়ার কদিন পর দিন পেট কাঁচিয়ে বমি হল। মুখের ভেতরটা টকটক। অথচ অনিয়ম তেমন কিছু করেননি। দোকান থেকে এনে অম্বলের ওষুধ খেলেন। কিছুটা সামলাল। এখন এসেছে প্রবল আলিস্যি। লক্ষণগুলো তাঁর চেনা। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি যেন দেখা দিচ্ছে। মন থেকে চাইছেন না এখনই কেউ এসে পড়ুক। বাড়ি করার জন্য অনেক টাকা অফিস থেকে ধার করেছেন অবিনাশ। সব শোধ হতে দশ বছর লেগে যাবে।

বড় ঘর থেকে বেরিয়ে ইলা আশেপাশে তাকালেন। কোথাও বরুণকে দেখা যাচ্ছে না। বাড়ির শেষে কুয়োতলা। পাশে আমগাছ। গাছতলাটা বরুণের প্রিয় জায়গা। ওখানে এসে তাঁবু খাটায় মাঝেমধ্যে। খেলনাবাটি খেলে। ছেলে হয়েও গৃহস্থালির খেলা যে কী ভাল লাগে তার!

গাছতলায় এসেও বরুণকে পাওয়া গেল না। এবার একটু দুশ্চিন্তা শুরু হল ইলার। ডেকে উঠলেন, বরুণ! বরুণ! কোথায় গেলি?

বাড়ির পিছন থেকে এবার সামনের গেটের দিকে এগোলেন ইলা। মাঝে মাঝে বরুণের নাম ধরে ডাকছেন। ডাকটার মধ্যে ক্রমশ মিশছে অনিশ্চয়তা, সংশয়।

ছাদের পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে বরুণ মায়ের গলা পেয়েছে, সাড়া দিতে পারছে না। তার সামনে এখন এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। সে নড়ে উঠলেই দৃশ্যটা ভেঙে যাবে।

বরুণদের বাড়ির পাশে সরু ইট পাতা গলি। তারপর একটা বাড়ির ভিত হয়ে থাকা জমি। জ্ঞান হয়ে থেকে ওই ভিতটা দেখে আসছে বরুণ। ওই ইটের চৌখুপিটাকে নিয়ে বরুণের খুব অস্বস্তি। খালি মনে হয় এই বুঝি জমির মালিক এল বাড়ি তৈরি করতে। ভিত তো হয়েই আছে, হুটহাট করে হয়ে যাবে বাড়ি। তা হলে সে কী করে বাড়ির ছাদ থেকে আলোদিদার বড়ি, আচার পাহারা দেবে! আর কী করেই বা দাসবাড়ির খাঁচায় পোর টিয়েটাকে নজর করবে দুপুরবেলা। রোজ ওই সময় খাঁচার টিয়েটার সঙ্গে খেলতে আসে একটা কাঠবিড়ালি। সেই খেলার একমাত্র দর্শক বরুণ। ছাদে দাঁড়িয়ে একা একা হাসে বরুণ। তখন ভটচায বাড়ির আলোদিদা বলে, দাদুভাই, তুমি আছ তো ডায়রে, কাকপক্ষী এলে ঢেলা ছোঁড়ার ভান কোর দিকিনি। আমার বড্ড ঘুম নেগেছে, এট্টু গইরে নিই।

শুধু ভান করলে হয় না বরুণের, দু-একটা ছোট ঢেলা ছুড়তেও হয়। সেসব ঢেলা তার মজুত করা আছে। তবে কাকেরা আজকাল তাকে চিনে গেছে। সে ছাদে থাকলে, ভুলেও ভটচায বাড়ির উঠোনে নামে না। চড়াইগুলো তুলনায় বেহায়া টাইপের। ভিত হয়ে থাকা জায়গাটা যদি বাড়ি হয়ে যায় ভটচায বাড়ি, দাসবাড়ি সব আড়াল পড়ে যাবে। আড়ালে চলে যাবে নারায়ণ মাস্টারমশাইয়ের বাগান। স্কুল থেকে ফিরে মাস্টারমশাই রোজ জল দেন গাছে। কী সুন্দর বড় বড় গোলাপ। জল পেয়ে মাথা নাড়ে। বাগানের কাছে গিয়ে বরুণ দেখে এসেছে, বেশ কটা হলুদ গোলাপ হয়েছে এবার।

ছাদের দক্ষিণ দিকটা বরুণের কাছে যেন প্রজাপতির একটা ডানা। উত্তর দিকের ডানা ধূসর। মথের ডানার মতো। সেদিকে গিয়েও মাঝেসাঝে দাঁড়ায় বরুণ। খোঁড়া বুড়ির বাড়ি। পিছনে ডোবা। তারপর ঝোপঝাড়, জঙ্গল মতন। মাঝরাতে শিয়াল ডাকে।

দুপুরে মা যখন জিরোয়, রোজ ছাদের দক্ষিণ দিকে এসে দাঁড়ায় বরুণ। ওই ভিতের ভীতিটুকু ছাড়া বাকি সব ভালই লাগে। বরুণের সমবয়সি পাড়ায় বেশ কিছু বন্ধু আছে। যাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। তাদের সঙ্গে বিকেলে খেলে বরুণ। নানান খেলা। পঞ্চাশ চোর চোর, পিটু, কবাডি, রিং ছোড়া, গাদি... খেলাধুলো করার অঢেল জায়গা

তাদের। কখনও বরুণদের বাড়ির পিছনের মাঠে, ভটচায বাড়ির উঠোনে, এবং সন্ধে নামার একটু আগে বাড়ি না-হওয়া ভিতে।

ভিতের খেলাটা নিজেরাই বানিয়েছে। অন্য কোথাও খেলা হয় কি না জানে না। বরুণদের খেলাটা এরকম, চারজনকে তুলে দেওয়া হবে ওই চৌখুপিতে। তারা এমনভাবে হেঁটে যাবে, কেউ কারও মুখোমুখি ধাক্কা মারবে না। তা হলে দুজনেই আউট। মুখোমুখি হচ্ছে দেখে পিছন হাঁটাও চলবে না। এ-খেলায় শুধু সামনের দিকে হেঁটে যাওয়া।

বর্ষার সময় ভিতে শ্যাওলা জমে, খেলতে বারণ করেন বড়রা। জল পেয়ে প্রচুর আগাছা জন্মায় সেখানে। বৃষ্টির দিন চলে গেলে রুইদাস কাকা সব ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে দেয় বিনে পয়সায়। রুইদাস কাকার কুঁড়েঘর মাস্টারমশাইয়ের বাগানের পাশে। মাটি কাটা, জঙ্গল সাফ করাই তার কাজ। কোনও টাকা না নিয়ে পাড়ার বাচ্চাদের খেলার জায়গা পরিষ্কার করে দেয় বলে, বড়রা ওকে খুব ভাল মানুষ হিসেবে দেখে। কিন্তু বরুণরা জানে রুইদাস কাকা না বলতেই কেন আগাছা সাফ করে। আসলে ওই ভিতের তলায় অনেক সাপ আছে। জঙ্গল সাফ করার নাম করে সাপ ধরে রুইদাস কাকা। ওরা সাপ খায়। কাজল একদিন নিজের চোখে ওদের সাপ রান্না করতে দেখেছে। তবে ওই ভিতের বাস্তুসাপটা বাগে পেয়েও ধরেনি রুইদাস কাকা। বাস্তুসাপকে মারতে নেই।

বরুণ যখন দুপুরবেলা ছাদের এদিকটা এসে দাঁড়ায়, অনেক কিছু দেখার সঙ্গে চোখ বোলায় ভিতের ওপর। যদি হঠাৎ দেখা পাওয়া যায় বাস্তুসাপের। আজ ছাদে উঠে প্রথমেই ভিতের দিকে তাকিয়েছিল, চমকে ওঠে বুকটা। এ কী, তাদের খেলার জায়গায় অচেনা একটা মেয়ে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে। সাদা ফ্রক, লাল টুকটুকে হাওয়াই চটি, গায়ের রং কালো, বড়লোকের মেয়েদের মতো হাঁটাচলা। চুলে চাইনিজ ছাঁট। এই ছাঁটটা চেনে বরুণ, সুনীল কাকা একবার দীনু নাপিতকে দিয়ে লেখার চুলে চাইনিজ ছাঁট দিয়েছিল। লেখার বাবা পরেরদিন লেখাকে নেড়া করে দেয়।

এ-পাড়ায় চাইনিজ ছাঁট চলে না। শ্যামলা মেয়েটা বে-পাড়ার। কী সাহস, বরুণদের খেলার জায়গায় হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। কোথা থেকে এল, কার সঙ্গে? ভাবতে ভাবতেই বরুণ দেখেছিল, ভিতের পিছনে ঢালু জমি থেকে উঠে আসছে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক। পাশে রুইদাস কাকা। মেয়েটা 'বাবা, বাবা' বলে দৌড়ে গেল ওদের দিকে। ধুতিপাঞ্জাবি কাকু বললেন, তুমি একটু নিজের মতো খেলো মা। আমরা কাজগুলো সেরে নিই।

তোমাদের কী কাজ বাবা? আজ থেকেই বাড়ি তৈরি হবে আমাদের?

কথাটা ওপরে ভেসে আসতেই কান, মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল বরুণের। পায়ের কাছে জড়ো করে রাখা ঢেলা, যেগুলো দিয়ে কাক তাড়ায় সে, সবসুদ্ধু তুলে ছুড়ে মারতে ইচ্ছে করছিল ভিতের মালিকদের।

সেটা করা যাবে না। বাড়িতে বলে দিলে ভীষণ মারবে মা। কিন্তু কিছু তো একটা করতেই হয়। শ্যামলী, বুলবুলি, দীপু, বাপুন, মাতন, সপু, সিরাজুল, মনোয়ারা, লেখা .... সবাইকে এক্ষুনি খবর দেওয়া উচিত, আমাদের ভিতখেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ছাদের সিঁড়ির দিকে দৌড়তে যাবে বরুণ, শ্যামলা। মেয়েটা হঠাৎ ওপর দিকে তাকায়। সেই যে তাকিয়েছে, এখনও পর্যন্ত চোখ নামায়নি। বরুণও যে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, ভুলে গেছে।

আলোর রং পালটাচ্ছে ধীরে, নীল আকাশে সিংহের মতো মেঘটা হয়ে গেল কুঁড়েঘরের মতন। দৃষ্টিপথ কাটতে ফিঙে উড়ে গেল দুবার। পৃথিবীও অলক্ষ্যে অতি সন্তর্পণে ঘুরে যাচ্ছে। সামান্য হলেও আয়ু বাড়ছে। তবু কোন এক অমোঘ আকর্ষণে বরুণ আর কালো মেয়েটার দৃষ্টি রয়েছে লীন। যৌনচেতনার বিকাশ হয়নি দুজনেরই। শুধু আছে অশেষ মুগ্ধতাবোধ। মেয়েটি এমন কিছু দেখতে নয় যে বরুণ মুগ্ধ হয়ে পড়বে। বরং বরুণের অনেক মনোহর জিনিস আড়াল হয়ে যাবে মেয়েটির বাড়ি হলে। তবু কেন বরুণ এরকম সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে। মায়ের গলা সে অনেকক্ষণ পেয়েছে। সাড়া দেওয়ার ইচ্ছে

থাকলেও পারছে না। এই ঘোরটা কখন ভাঙবে জানে না দুজনেই। হয়তো বিধাতা দুজনকে চোখাচোখি করিয়ে লিখে নিচ্ছেন, দুই জাতকের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক। বৃদ্ধ হয়েছেন বিধাতা, তাই এত সময় লাগছে।—এসব মজার ভাবনা অবশ্য বড় হয়ে ভেবেছে বরুণ। একটু পরিণত হতেই বারবার ব্যাখ্যা করেছে, মন্দিরার সঙ্গে তার ওই সম্মোহনের। পূর্বনির্দিষ্ট বলে সত্যিই কি কিছু হয়? মাত্র নয়-দশ বছরের বরুণের চেতনায় ওরকম একটা কালো, মিষ্টি মেয়ের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হল কখন! ওই ভিতের বাস্তুসাপটার মতো বরুণের পছন্দ ছিল সুপ্ত এবং অজ্ঞাত। সেদিন যেন ইটের চৌখুপিতে দাঁড়িয়ে থাকা কালো মেয়েটার মধ্যে ওই সাপটাকেই লক্ষ করেছিল বরুণ। —এখানে জীবনানন্দ কোট করতে হয়, ...কোন যেন কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর, একদিন আমি যাব দুপহরে সেই দূরে প্রান্তের কাছে, সেখানে মানুষ কেউ যায় নাকো— দেখা যায় বাঘিনীর ডোরা বেতের বনের ফাঁকে, — জারুল গাছের তলে রৌদ্র পোহায়....'

মায়ের ডাকে ততক্ষণে হাহাকার ঢুকে গেছে। বরুণ! বরুণ! বলতে বলতে ছাদে উঠে আসে মা। একটু থামে। লক্ষ করে বরুণ কীসে এত নিবিষ্ট? পাশে দাঁড়িয়ে বলে, কী রে, সেই কখন ধরে ডাকছি, সাড়া দিচ্ছিস না যে বড়

বরুণ ভিতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওখানে এবার বাড়ি হবে মা। মন্দিরা কিন্তু চোখ সরায়নি। তাকিয়েই আছে ওপরে। যেমন সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে, তেমনই ওর মা। দেখলেই বোঝা যায়, ওদের বাড়িতে বকুনি, শাসন নেই। খালি আদর আর ভালবাসা। নিজেদের জমিটাকে খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না মন্দিরার। গলির মধ্যে ছায়া ছায়া জায়গায়। ছেলেটা আর ওর মাকে দেখে মন্দিরার মনে হচ্ছে, এখানে বাড়ি হয়ে ভালই হবে।

ছেলেটার মা এখন দেখছে মন্দিরাকে। যেন চোখ দিয়েই আদর করছে। এমন একটা কথা বলল, লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নেয় মন্দিরা। উনি বললেন, মেয়েটা খুব মিষ্টি দেখতে তো!

মেয়েটার বাবা কোথা থেকে ঘুরে এসে আবার মেয়ের পাশে দাঁড়ায়। ইলা ঘোমটা টেনে সরে আসেন। তারপর বরুণের হাত ধরে বলেন, চ, নীচে যাবি তো। এক্ষুনি স্কুল থেকে ফিরবে দাদা।

সন্ধে উতরে গেল। কদিন এই সময়টা আরও যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ইলার। অবিনাশ অফিস থেকে ফেরেন এখন। তার আগে গা ধোয়া, সামান্য প্রসাধন, ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেওয়া, শাঁখ বাজানো সব হয়ে যায়। আজ এখন অবধি কিছুই হয়নি। অংশু বরুণকে পড়াতে এসে দীপালি টুকল, কী ব্যাপার বউদি, আপনাকে কেমন যেন লাগছে। শরীর ভাল নেই না কি?

না না, সেরকম কিছু না। তোমার দাদা নেই তো, তাই সব কাজেই একটু ঢিলে পড়ে যাচ্ছে। উত্তরে দীপালি বলল, ও, তাই বলুন।

কথাটা কেমন অদ্ভুতভাবে বলল মেয়েটা, মানেটা ধরতে পারলেন না ইলা। তারপর এসে কলঘরে ঢুকেছেন। আশপাশের বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছে। চৌবাচ্চা থেকে মগে করে জল তুলেছেন, গায়ে ঢালা হয়নি। সব কিছু থেকে ইচ্ছেটা চলে গেছে।

কর্তাকে ছেড়ে এতটা একলা আগে থাকেননি কখনও। সমস্তিপুরে থাকতে উনি মাঝে মাঝে বম্বে যেতেন। অফিস ইউনিয়নের মিটিং থাকত। তখন এতটা নিঃসঙ্গ লাগত না ইলার। বাড়ি ভর্তি লোকজন, শ্বশুর, ভাশুর, দেওর, বাচ্চাগুলো, সবাই এমনভাবে মাতিয়ে রাখত, অবিনাশ যে নেই, ট্যুরে গেছেন, এক এক সময় ভুলেই যেতেন ইলা। এখানে উনি ছাড়া সব অন্ধকার। নিজেকে ভীষণ নির্বাসিত মনে হচ্ছে। অথচ ইলাও তো চেয়েছিলেন, তাঁদের একটা আলাদা বাড়ি হোক। নিজস্ব সংসার। ইচ্ছেমতো সেই সংসারকে সাজাবেন। কারও মর্জির তোয়াক্কা করতে হবে না। তা বলে কর্তা সবসময় পোষা বিড়ালের মতো বাড়িতে বসে থাকবে, এমনটা দাবি করা আদিখ্যেতা হয়ে যাবে। বরং এই ফাঁকা ভাবটা কাটাতে মাকে কিছুদিনের জন্য আনিয়ে নিলে হত। কিন্তু কে দিয়ে যাবে মাকে! মেজদার অফিস বড়বাজারে।

মছলন্দপুর থেকে বেরোয় সেই ভোরে। ফেরে রাতে। সেজভাই অপূর্ব বি এ পাস করে বসে আছে, বেকার। বাড়িতে প্রায় থাকেই না। পার্টি করে। লাল পার্টি।

এ-বাড়িতে যে কবার এসেছে, কর্তার সঙ্গে তর্ক হয়েছে খুব। আর পড়ে থাকল ছোটভাই সিধু। ভাল নাম স্বাধীন। সে তো অংশুর থেকে মাত্র দু বছরের বড়। মাকে দিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। ইলা যে নিয়ে আসবেন, সে সাহস হয় না। দেবপাড়া থেকে মছলন্দপুর তো খুব কাছে নয়। অথচ সমস্তিপুর থেকে আসার সময় মনে হয়েছিল বুঝি বাপের বাড়ির কাছে গিয়ে থাকব।

এতটা রাস্তা উজিয়ে মাকে নিয়ে আসার মতো অভ্যস্ততা ইলার হয়নি। এই দেশটা এখনও তাঁর কাছে ধোঁয়াশার মতো লাগে। কলকাতাটা কোন দিকে গুলিয়ে যায়, উত্তরে না দক্ষিণে? বেলুড় মঠ গঙ্গার এপারে না ওপারে, দোটানায় পড়ে যান। এত কিছুর মধ্যে মছলন্দপুর যে কোথায়, কোন দিকে, ঠাহর করা যায় না। তবে দক্ষিণেশ্বরটা যে পুব দিকে, তা বিলক্ষণ জানেন ইলা। দেবপাড়ার গা দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা। ওপারে ডান হাতি, কোণ বরাবর দক্ষিণেশ্বর মন্দির। গঙ্গার ওপর বিবেকানন্দ ব্রিজ।

দেবপাড়ায় আসার পর গোড়ার দিকে নিয়ম করে বিকেলবেলা যেতেন রাসতলা ঘাটে। ওপারে মায়ের মন্দির দেখে গর্বে বুক ভরে যেত। এই মন্দির নিয়ে সমস্তিপুরে কত গল্প হয়েছে! কালীঘাট মন্দির ভাল, না দক্ষিণেশ্বর? এই নিয়ে তর্ক হত।

ওখানকার বাঙালিরা দু-চারবারের বেশি ওইসব মন্দির দেখেনি। কেউ কেউ তো একবারও না।

পাকিস্তানে থাকতেও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কত কাহিনী শুনেছেন ইলা। রামকৃষ্ণ, সারদা মা, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা... মনে হত দক্ষিণেশ্বর বুঝি পুরাণের কোনও পুণ্যস্থান। সেই পীঠস্থান এখন ইলার চোখের সামনে। পশ্চিম আকাশের আলো যখন মন্দিরের গায়ে পড়ে, রাসতলার ঘাটে দাঁড়িয়ে ইলার মনে হয় অনেক দূর হেঁটে ভগবানের খুব কাছে এসে পড়েছেন। যে হাঁটা শুরু হয়েছিল আত্রাই নদীর ধারে খানসামা গ্রাম থেকে।

গায়ে আর জল ঢালা ঠিক হচ্ছে না। শীত শীত করছে। এই সময় জ্বরজ্বারি হলে কে দেখবে? সন্ধেবেলা চুল ভেজান না। হাতখোপা করে বাঁধা আছে। পরনের ভিজে শাড়ি ছেড়ে, শুকনো গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে নিজেকে বেশ পৃথুলা মনে হয়। আজ দুপুরে ঘুম থেকে উঠে বরুণকে খুঁজতে যখন ছাদে গিয়েছিলেন, মুখচোখ কি খুব ফোলা ফোলা লাগছিল? ইলা আশা করেননি বাড়ির পাশের ভিতটায় একজন সুবেশ ভদ্রলোককে দেখবেন। চোখাচোখি হয়েছিল। কী জানি কী মনে করল মানুষটা। ইলাকে কি খুব আলুথালু দেখাচ্ছিল! অসুস্থ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু দীপালি যে আজ বাড়ি ঢুকেই বলল, আপনার কি শরীর খারাপ বউদি?

নিজের রূপ নিয়ে দ্বিধা সংশয়ে পড়ে যান ইলা। ছাদে লোকটার সামনে আর একটু দাঁড়ালে হত। মানুষটার চোখে মুগ্ধতা বা উদাসীনতা ফুটে ওঠার আগেই সরে এসেছিলেন ইলা। না, নগ্ন শরীরে পরপুরুষের কথা ভাবা ঠিক হচ্ছে না। গা মোছা সাঙ্গ করে, শুকনো শাড়ি জড়িয়ে কলঘরের বাইরে এলেন ইলা।

সন্ধে দিতে দিতে একটা বুদ্ধি আসে মাথায়। দীপালিকে সঙ্গে নিয়ে মছলন্দপুর গেলে হয় না! সকালে গিয়ে বিকেলের মধ্যে মাকে নিয়ে চলে আসা যাবে। দীপালি নিশ্চয়ই অরাজি হবে না। ও তো ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে নিজের আর দীপালির জন্য চা করলেন ইলা। মাঝের ঘরে মাদুরের ওপর ছাত্র পড়ায় দীপালি। ওকে চা-বিস্কুট দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলেন ইলা। হাতে উল-কাঁটা। কর্তার জন্য সোয়েটার বুনছেন। ঘর ফেলার পর চার আঙুল মতো হয়েছে।

ইলা লক্ষ করেছেন চা-বিস্কুট' অথবা মুড়ি মাখা খুব আগ্রহভরে খায় দীপালি। এই সময়টা বোধহয় খিদে পায় ওর। আহা, অভাবি ঘরের মেয়ে। —উল বুনতে বুনতে ইলা ভাবছেন মছলন্দপুরে যাওয়ার ব্যাপারে দীপালির কাছে কথাটা কীভাবে পাড়বেন। বারবার তাকাচ্ছেন

মেঝের দিকে। দীপালি চা-বিস্কুট আর ছাত্র দুটোকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। হয়তো ছাত্রর মা বসে আছে দেখে আরও মন দিয়েছে পড়ানোয়। ইলা বলেন, দীপালি, তোমার কি সকালের দিকে রোজ পড়ানো থাকে?

অবাক হওয়া মুখ তুলে দীপালি জানতে চায়, কেন বউদি?

না এমনি। ভাবছিলাম, যদি কোনওদিন ফাঁকা থাক তোমাকে নিয়ে একবার বাপের বাড়ি যাব।

আপনার বাপের বাড়ি মানে তো বনগাঁ লাইনের মছলন্দপুর।

হ্যাঁ।

মাদুরে ঘুরে বসে দীপালি বেশ উৎসাহ নিয়ে বলে, গেলেই হয়। রাতে থাকবেন না কি?

না না, দিনের দিন ফিরে আসব।

কী একটু ভেবে নিয়ে দীপালি বলে, অবিনাশদা ছাড়া যাবেন, আপনার মা-দাদারা নিশ্চয়ই খুশি হবেন না।

এই শুরু হয়ে গেল ঠানদির মতো কথা বলা। মেয়েটার এই এক দোষ, সুযোগ পেলেই জ্ঞান দেয়।

ইলা যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, মুখ দেখে ধরতে পেরেছে দীপালি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বলে ওঠে, আমার যেতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ওঁরা তো জামাইকে পেলেই সব থেকে বেশি আনন্দ পেতেন। কবে আসবেন অবিনাশদা?

ইলা উত্তর না দিয়ে উল বুনে যান। আর একটু পরে দীপালি জিজ্ঞাসা করে, সোয়েটারটা কি অবিনাশদার জন্য বুনছেন?

নিরাসক্ত মুখে ঘাড় হেলান ইলা। এটুকু না করলে অভদ্রতা হয়ে যায়। মনে মনে ঠিক করে নেন দীপালিকে নিয়ে যাবেন না মছলন্দপুর। এ যা মেয়ে সারাটা রাস্তা অবিনাশদা অবিনাশদা করে যাবে। সেটা শুনতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না ইলার। অন্য যুবতীর মুখে কারই বা স্বামীর নাম বারংবার শুনতে ভাল লাগে?

ইলা সিদ্ধান্ত নেন একলাই যাবেন বাপের বাড়ি। শীলার বাড়ি তো একা-একাই যান। যদিও ওদের বাড়িটা কাছেই, বরানগর। রাসতলা ঘাট থেকে তিন নম্বর বাসে আধঘণ্টাটাক পথ। দোকান-বাজার করা, একলা বাসে ওঠার অভ্যেস তো ইলার আছে। মছলন্দপুর কীভাবে যেতে হয় সমস্তটাই জানেন ইলা। বালিঘাট স্টেশনে ট্রেন ধরে দমদম যাওয়া, সেখান থেকে বনগাঁ লোকাল। দেবপাড়া আসার পর বার ছয়েক দুই ছেলেকে নিয়ে অবিনাশের সঙ্গে গেছেন। ট্রেনের টাইম পর্যন্ত জানা ইলার। তা হলে ভয়টা কীসের! ভয় নয়, আসলে আড়ষ্টতা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অস্বচ্ছন্দ ভাবটা কাটিয়ে ফেলতে হবে। এখানকার মেয়ে-বউরা বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে অনেক সাবলীল। বাড়িতে কর্তা না থাকলে হুটহাট বাজার দোকান সিনেমা দিব্যি সেরে নেয়। এ-পাড়ার বউদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটাও সিনেমা দেখতে যাননি ইলা। ওরা প্রথম প্রথম ডাকত। এখন ছেড়ে দিয়েছে। অবিনাশকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিলেন ইলা, ওদের সঙ্গে সিনেমা যাব কি?

অবিনাশ বলেছিলেন, যেতেই পার।

যাওয়া হয়নি। কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। আসলে এই বাধো বাধো ভাবটা কিশোরীবেলা পেরোতে না পেরোতেই অদৃশ্য শৃঙ্খলের মতো পায়ে বসে গিয়েছিল।

তখন ইলা খানসামা গ্রামে। ওপার বাংলার দিনাজপুর। দেশভাগ হয়নি। বাড়ি থেকে স্কুল খুব দূর নয়। দেড় মাইল মাত্র। তখনকার দিনে ওই দূরত্বকে কাছেই মনে করা হত। বাবা ছিলেন ওই স্কুলের হেডপণ্ডিত। সংস্কৃত, বাংলা পড়াতেন। ভীষণ রাশভারী। পড়া না পারলে নিজের মেয়েদেরও কান ধরে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিতেন।

বাবা কোনওদিন দুই মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাননি। ওই রাস্তাটুকু পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত আজবচাচা। জমিদারের গোমস্তাগিরি ছেড়ে চলে আসার সময় বাবার সঙ্গে আজবচাচাও চলে এসেছিল। থাকত বারবাড়িতে। বাবাকে ভগবানের মতো ভক্তি করত চাচা। কিন্তু

কোথাকার কোন গণ্ডগোল শুনে বাবা আজবচাচার পাহারাদারিতে আর ভরসা করতে পারলেন না।

বর্ষার তখন প্রায় শেষ। খাল, বিল, পুকুর থেকে জঁল টেনে নিচ্ছে আত্রাই নদী। আকাশের মেঘ কিছুতেই জমাট বাঁধতে পারছে না। হামেশাই মেঘ ভেঙে ছিটকে আসছে কিশোরীবেলা পেরোনোর মতো রোদ। স্কুল ফেরত দুই বোন আজবচাচাকে বলল, চাচা তুমি এট্টু দাঁড়াও। দেইখ্যা আসি চর জাগছে কতটা।

যাও মা, যাও। আমি এই গাছতলায় জিরাইয়া লই।

দুই বোন ছুটেছিল আত্রাইয়ের চর দেখতে। ওই চর থেকেই দেখা যায় কুলবনের দ্বীপ কতটা মাথা তুলল। পুজো কেটে গেলেই দ্বীপ পুরোপুরি জেগে উঠবে। সেখানে ঘন কুলগাছের বন। শীত পড়লে দাদাদের সঙ্গে ওই জঙ্গলে যাবে ইলা, শীলা। ওখানকার কুল হয়তো তেমন ভাল নয়, কিন্তু জায়গাটা ভীষণ সুন্দর। শীত আসব আসব ভাব হলেই দ্বীপ জেগে ওঠে। অন্য সময় পাড়ে দাঁড়িয়ে দ্বীপটাকে দেখাই যায় না।

সেদিন কুলবনের আবছা মাথা দেখতে পেয়ে খুশি মনে আজবচাচার কাছে ফিরে এসেছিল দুই বোন। সহর্ষে বর্ণনা করছে নদীর জল সরে যাওয়া। চাচার মুখে আনন্দ ফুটছে না। কথা থামিয়ে ইলা শীলা লক্ষ করেছিল, কীসের একটা কষ্টে চাচার মুখ বেঁকে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে ইলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমার কী হইছে চাচা?

ততক্ষণে দু-চারটে হিক্কা তুলে কাঁদতে শুরু করেছে আজবচাচা।

কী হইছে বলবা তো! কান্দো ক্যান?

ষাট পেরিয়ে যাওয়া বিবর্ণ, রুক্ষ লোকটা কান্নার হিক্কে তুলতে তুলতে বলেছিল, তোমাগো বাবা কইছে, মাইয়া দুটারে বড়পোলার কাছে পাঠাইয়া দিব। এহানে রাখা ঠিক হইতেছে না, বাড়ন্ত বয়স...

পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছিল ইলার। শীলারও নিশ্চয়ই যাচ্ছিল। কান গরম। বড়দার কাছে মানে তো ইন্ডিয়া। সেই মজফফরপুর। কী আছে সেখানে? বড়দা তো কখনওই সেখানকার গুণকীর্তন করে না। বরং নিন্দেই করে। খাওয়াদাওয়ায় সুখ নেই। চাদ্দিকে বিহারি, লোক নেই কথা বলার। আর পাকিস্তানের লোকেদের ওরা নাকি খুব হেয় করে। বড়দা যতবারই বাড়ি আসে, মা বলে সে নাকি আরও রোগা হয়ে গেছে। যে কদিন থাকে খুব যত্নআত্তি করে মা। তা হলে ইলা শীলা কেন যাবে ওখানে। এই আত্রাই নদী, চর, খাল, বিল, মাঠ, স্কুল... আরও কত কী ছেড়ে কোন অপরাধে দু বোনকে যেতে হবে বিভুঁইয়ে? অপরাধটা জানার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন ইলা। যদিও জানতেন বাবার ইচ্ছে নিয়ে কেউ কোনওদিন প্রশ্ন করে না। আজবচাচার কাছে ইলা জানতে চেয়েছিলেন, বাবা তোমারে কিছু কইছেন। ক্যান আমাগো ইন্ডিয়ায় পাঠাইতে চান?

চোখের জল মুছতে মুছতে আজবচাচা বলে, বারেবারে জিগাই। কয় না কিছুই। একটু আগে জল সরে যাওয়া দেখে এসেছে দুই বোন। সেই জলই আবার ফিরে এসেছে আজবচাচার চোখে। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সব কিছু মিথ্যে মনে হয়েছিল ইলার। আজবচাচাকে ছেড়ে ইলা শীলা বইখাতা হাতে দৌড় লাগিয়েছিলেন বাড়ির দিকে।

তেঁতুল গাছতলায় ঝাঁট দিচ্ছিল মা। উঠোনের দড়িতে ঝুলছিল বাবার ধুতি গামছা। স্কুল থেকে ফিরে বাবা গাছতলায় বসেন। সন্ধের আগে উঠে যান ঘরে। গাছতলায় আরামকেদারা পেতে দেওয়া হয়। মা সেইসবের জোগাড় করছিল।

ইলা মায়ের পাশে গিয়ে বলেন, মা, কী শুনতাছি, বাবায় নাকি আমাগো বড়দার কাছে পাঠায় দিবে।

কোনও উত্তর দেয় না মা। ঝাঁট দিয়েই যায়। শীলা মাকে ধরে ঝাঁকায়, কী হইল। কও না বাবা কী কইছে?

উত্তর নেই। বাবার হুকুম মায়ের পছন্দ না হলে এরকম বোবা হয়ে থাকত কদিন। দু বোন যখন বুঝল সিদ্ধান্ত মোটামুটি পাকা, ইলা গেলেন দক্ষিণ দিকের ঘরে। যেখানে নিজের

বইখাতা, শাড়িজামা। ছোটবেলা থেকে জমিয়ে রাখা পুতুল, আরও সব টুকিটাকি জিনিস। কোনও বান্ধবীর দেওয়া সামান্য উপহার। ওইটুকুই তাঁর নিজস্ব জগৎ। ওখানে বসে নিভৃতে কাঁদবেন ইলা। শীলা সে-ধরনের মেয়ে নয়, মায়ের থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে, সে প্রথমেই উঠোনের দড়ি থেকে বাবার ধুতি গামছা ফেলে দিল মাটিতে। তবু মায়ের মুখে কথা ফুটল না। এবার সারা বাড়ি নাচানাচি করবে মেয়েটা। বাবার দোয়াত-কলম লুকোবে, খাতা সরিয়ে রাখবে বে-জায়গায়। একটু পরে ভয় পেয়ে আবার সব যথাস্থানে রাখবে।

বাবার জিনিসপত্তর থেকে উঠিয়ে নিয়ে রাগ ছড়িয়ে দেবে সারা বাড়ির ওপর। এই হয়তো লাউগাছে টান মেরে মাচা থেকে বেশ কিছুটা নামিয়ে দিল। খুলে দিল হাঁসের ঘর। প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে হেলেদুলে হাঁসেরা চলল পুকুরের দিকে। খানিক আগেই অনেক কষ্ট করে মা ওদের ঘরে তুলেছিল। এত অনিষ্ট দেখেও মা বোবা হয়েই থাকবে। তার মানেই মা মেয়েদের পক্ষে আছে। বোবা হয়ে থাকাটাই ছিল মায়ের কান্না। শীলার রাগ পড়তে আবার সময় লাগে না। খানিক তাড়ুমাড়ু করে ফিরে এসে বসবে দিদির কাছ ঘেঁষে। সেদিনও হয়েছিল তাই। বাবা যেই বাড়ি ফিরলেন গুটিসুটি পায়ে শীলা চলে এসেছিল ইলার কাছে। বিপন্ন ইলার মুখের দিকে চেয়ে শীলা বলেছিল, দিদি, ইন্ডিয়া খুব এট্টা খারাপ জায়গা না! দেখস না, বড়দারে কেমন চাকচিক্কা লাগে।

বোনের প্রতি স্নেহ-সান্ত্বনাবশে মৃদু হেসেছিলেন ইলা। যে হাসির মধ্যে হয়তো বিষণ্ণতা প্রকট হয়েছিল। শীলা মুখ নিচু করে নেয়।

অবশেষে মাস চারেকের মধ্যেই এক শীতের সকালে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। কুয়াশাচ্ছন্ন স্টিমারঘাট। ভোঁ দিয়ে স্টিমার ছাড়তেই ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা আজবচাচা হাত নাড়তে লাগল। কাঁদছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। আসার সময় বাড়ির লোকজন কেঁদে ভাসিয়েছে। অপূর্ব খুব ছোট। ফ্যাল ফ্যাল করে মা আর দিদিদের দিকে দেখছিল। দিদিদের দেখাদেখি সেও মাকে প্রণাম করে, কিন্তু যাওয়া হয় না বাবা দিদিদের সঙ্গে। খুব বায়না ধরেছিল। ওকে কেউ বকেনি। মা ধরে রেখেছিল আঁকড়ে। ওই বয়সে এটুকু জ্ঞান ইলা-শীলার হয়েছিল, পুত্রসন্তান বরাবরই পিতা-মাতার প্রিয় হয়। কন্যা জন্ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া শাস্তি। মেয়ে হলে তাই অনেক কিছু মেনে নিতে হয়। আগের রাতে মা অনেক করে বুঝিয়েছে, অত ঘরবাড়ি করিস ক্যান। মাইয়াগো তো শ্বশুরঘর যাইতেই হয়। তরা না হয় আগেই ঘর ছাড়লি।'

কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল। মেনেও নিয়েছিলেন দুই বোন। কিন্তু ভোরবেলা যখন মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছিলেন ইলা, কী ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল মায়ের পা। যেন রাতভর ভেজানো আতপ চাল।

মুচড়িয়ে উঠেছিল বুক। ঠাকুমার মড়া প্রণাম করার অভিজ্ঞতা ইলার আছে। মায়ের সঙ্গে আর কি দেখা হবে না?

আত্রাইয়ের জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল স্টিমার। চারপাশে ধোঁয়া-ধোঁয়া হিমেল ভাব। তার থেকেও বেশি ঠান্ডা লেগে আছে ইলার আঙুলে। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে মায়ের মুখ।

পোঁটলাপুঁটলি, তোরঙ্গ নিয়ে বসে আছে স্টিমারের অন্য যাত্রীরা। চাদর মোড়া জবুথবু। ইলারা ছাড়াও আর কয়েকজন বসার জায়গা পায়নি। এন্ডির চাদর গায়ে স্টিমারের নাক বরাবর দাঁড়িয়ে আছেন বাবা। যেন মহাভারতের জেদি কোনও সারথি।

পাশে দাঁড়িয়ে শীলা অনেকক্ষণ ধরেই উশখুশ করছিল। খুঁজছিল কিছু। হঠাৎ ইলার হাত টেনে বলে, দ্যাখ, দ্যাখ দিদি, ওই যে কুলবন! আমি ঠিক দ্যাখতাছি না?

অত কুয়াশার মধ্যে শীলা ঠিকই দেখেছিল। আবছা কালো কুলের বনটা যেন ঘোমটা দেওয়া কোনও বউ। ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। —শীলার কথা কানে গিয়েছিল বাবার। ঘাড় ফিরিয়ে কুলের বনটা দেখে সান্ত্বনার সুরে বলেছিলেন, সামনে আরও অনেক কিছু দেহনের আছে। নীলফামারি যাইয়া তগো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাইব।

সে সৌভাগ্য ইলাদের হয়নি। নদীর ওপারে আকাশের মুখ থমথমে ছিল। স্টিমার ছেড়ে

গরুরগাড়িতে উঠতে গিয়ে ইলা লক্ষ করেন, স্টিমার থেকে নামা যাত্রীদের মধ্যে ইলা-শীলার বয়সি অনেক মেয়ে আছে। ওদের মুখগুলো সেদিনের সকালটার মতোই বিষণ্ণ। ওরাও তা হলে দেশ ছেড়ে চলল!

পর পর বেশ কয়েকটা গরুরগাড়ি লাইন দিয়ে চলতে লাগল। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই পথ আর শেষ হয় না। অথচ ইলার ধারণা ছিল ইন্ডিয়া তো তাদের গ্রাম লাগোয়া দেশ। মাঝে এক রাত্রি থাকতে হল ধরমশালায়। গরুরগাড়ির ক্যারাভানের সবাই থাকল। এত সব যাত্রী কেউ কারও সঙ্গে তেমন কথা বলছে না। আগাম পথের গাড়িঘোড়ার

খবর বিনিময় হচ্ছে শুধু। তবে শীলা তো বসে থাকার মেয়ে নয়, সে ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিয়েছে, কোন পরিবার ইন্ডিয়ার কোথায় যাচ্ছে, কোন মেয়েটাকে দেখতে কেমন, সব খবর এসে দিচ্ছে দিদিকে। সে নাকি দিদির থেকে ভাল দেখতে মেয়ে খুঁজেই পাচ্ছে না। ইলা কিন্তু দেখেছিলেন। একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন তার রূপ দেখে। ধরমশালায় রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে মুখ ধুতে গিয়েছিলেন কুয়োপাড়ে, এক ঢাল চুল, নীল ডুরে শাড়ি পরা মেয়েটাকে দেখে চমকে যান। যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে কোনও পরি। দিনে কুয়াশা থাকার দরুন রাতের আকাশ ছিল পরিষ্কার। চাঁদের অকৃপণ আলোয় দেখেছিলেন মেয়েটার পানপাতার মতো মুখ, খাড়া নাক, জোড়া হাঁসুলির মতো ভ্রূ। গায়ের রঙে সোনার আভা। — মেয়েটা নির্ঘাত কোনও জমিদার বংশের মেয়ে। ইলাই এগিয়ে গিয়েছিলেন আলাপ করতে, কী নাম তোমার? কোথা থেইকা আসছ?

স্বাতী। রংপুর হইতে।

যাবা কই?

ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ।

থাহেন কে?

আর কোনও উত্তর দেয়নি মেয়ে।

শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে চলে গিয়েছিল। ওর হাঁটায় অহঙ্কার? নাকি দেশ ছেড়ে আসার অভিমান, তখনকার মতো বুঝতে পারেননি ইলা। রাতে বোনের পাশে শুয়ে স্বাতীর কথা বলেন, কাইল সকালে দেখিস কেমন পরির মতো দ্যাখতে সে মাইয়া। তোর চক্ষে কি নেবা হইছে, ওই মাইয়াডারে দ্যাখতে পাইলি না!—একই সঙ্গে ইলা আক্ষেপ করেছিলেন, আহা রে, মাইয়াডার পরিবার যদি আমাগো লগে বিহারের দিকে যাইত, ওর গুরুজনের সাথে বাবারে কথা কইতে বলতাম। যদি বড়দার সাথে মাইয়াডার বিয়া দেওন যায়। দেইখা তো মনে হয় বামুনের মাইয়া।

আসলে রূপসীকে ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না ইলার। স্বাতী এতটাই সুন্দর, ঈর্ষাকেও ম্লান করে দেয়।

যাকে নিয়ে এত কথা, সকাল হতেই শীলা ছুটেছিল তাকে দেখতে। দুঃসংবাদ নিয়ে ফেরত এল শীলা। ভোররাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না স্বাতীকে। ওর বাবা, কাকা খুব খোঁজাখুঁজি করছে। ওঁদের কাছেই জানা গেছে, রংপুর থেকে আসার পথে আরও দুবার নাকি পালানোর চেষ্টা করেছিল স্বাতী।

মেয়েটাকে পাওয়া গেল কি না জানা হল না ইলাদের। রোদ চড়তেই বেরিয়ে পড়া হল সেই গরুরগাড়ির ক্যারাভানে। ইলা এখনও বিশ্বাস করতে পছন্দ করেন, তৃতীয়বারের চেষ্টায় স্বাতী পালাতেই সমর্থ হয়েছে। পালিয়ে সে কোথায় গেল, নিজের বাড়িতেই ফিরে গেল হয়তো। ওর মা তখন মেয়েকে ভুলে নিত্যকার কাজে মন দিয়েছে, হঠাৎ উঠোনে এসে দাঁড়াল স্বাতী। মা তো অবাক। বিশ্বাসই করতে পারছে না। অথবা গা-হাত টিপে দেখছে, রক্তমাংসের কিনা! অথবা মেয়েটি চলে গেছে, তার ভালবাসার পুরুষের কাছে, দুঃখী ছেলেটা হয়তো উদাস হয়ে বসেছিল নদীর পাড়ে। পিঠে শুকনো পাতা পড়ার মতো ছোট্ট টোকা। মুখ ঘুরিয়ে ছেলেটা তো হাঁ।

স্বাতীর অন্তর্ধানের পরের পর্বটা কল্পনায় আঁকতে আঁকতে বাকি পথ পাড়ি দিয়েছিলেন

ইলা। ইতিমধ্যে গরুরগাড়ি ছেড়ে ট্রেন ধরা হয়েছে। একবার ট্রেন বদলাতে হল। বাবা বললেন পাকিস্তান এখানেই শেষ। এটা রাধিকাপুর বর্ডার। ওপারে ইন্ডিয়া।

বাবার তথ্যটা মনকে তেমনভাবে আলোড়িত করতে পারল না। এতটা পথ সময় কাটিয়ে মন তখন অনেকটাই অসাড়। পথসঙ্গীরা এক-এক করে ঝরে গেছে। ইলার ততক্ষণে মনে হতে শুরু করেছে ইন্ডিয়াটা এলে হয়।

আরও একটা রাত এবং দিন ট্রেনে কাটিয়ে কাটিহার হয়ে মজফফরপুর এলেন ইলারা। আবহাওয়ার ধরনধারণ পালটে গেছে, চারপাশে কেমন যেন শুকনো, ধুলো ওড়া ভাব। গ্রামদেশের সেই মিষ্টি মাটিভেজা গন্ধটা উধাও।

নিরাপদে দুই মেয়েকে নিয়ে মজফফরপুর স্টেশনে পৌঁছতে পেরে বাবাকে খানিকটা হালকা লাগছিল। মুখে বেশ খুশি খুশি ভাব। টাঙায় যেতে যেতে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললেন, উপদেশ দিলেন, লক্ষ্মী মেয়ের মতো থাকতে হবে মামারবাড়িতে। ওঁরা যেন কোনও নিন্দে না করেন। ওঁদের থাকা-খাওয়া অনেকটা ঘটিদের মতন, মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে সেসব। তারপর তো শেখর আলাদা বাড়ি করবেই, তখন দুই বোনকে সঙ্গে নিয়ে থাকবে।

বাবার মুখে অনেকদিন পর হাসি ফুটে উঠতে দেখেছিলেন ইলা। সার্থকতার হাসি। তবু হাসির ওপর মাছের আঁশের মতো কীসের যেন আশঙ্কাও লেগেছিল।

ছোটখাটো প্রাসাদের মতো মামারবাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে গেলেন বাবা। বাক্স-প্যাঁটরা, দুই মেয়েকে পাশে নিয়ে তোষামুদে কণ্ঠে ডাক দিলেন, সচ্চিদা! সচ্চিদা আছ নাকি হে?

বাবার গলাটা ভীষণ অচেনা লাগছিল। কেন এত কুণ্ঠা! চিঠি দিয়ে তো জানানো আছে ইলারা আসছেন। বড়দাই বা গেল কোথায়? বাবা আশা করেছিলেন তাকে স্টেশনে দেখবেন।

আরও দু-তিনবার ডাকার পর মামিমা নেমে এলেন দোতলা থেকে। কী সুন্দর নরম গিন্নিবান্নি দেখতে। ঘোমটা ভাল করে টেনে নিয়ে বললেন, এ কী জামাইবাবু, আপনারা কখন চলে এলেন! শেখর যে আপনাদের স্টেশনে আনতে গেল!

বাবা হাসছেন অকারণ হাসি। মামিমা বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ইলা শীলা করল মামিকে। বাবা বললেন, তোমার দুইটা ঝি নিয়া আসলাম। দ্যাখো কতটা কামে লাগে।

মামিমা সঙ্গে সঙ্গে দুই বোনকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, এ কী বলছেন জামাইবাবু, এরা দুটো আমার মেয়ের মতো।

বাবা তখনও হাসছিলেন। তাঁকে আর খানসামা স্কুলের হেডপণ্ডিত মনে হচ্ছিল না,

দপ্তরির মতো দেখাচ্ছিল। বাবার ওই আচরণ দেখেই দুই বোন বুঝে যান, তাঁদের আদবকায়দা এখানে কীরকম হবে।

বাবা কিন্তু অযথা কুণ্ঠায় ছিলেন। মেয়ের মতো নয়, নিজের মেয়েকে যেভাবে আদরে শাসনে রাখে মা, মামি সেভাবেই রেখেছিলেন ইলা-শীলাকে। সংসারের টুকিটাকি কাজ, রান্নার ঠাকুর চাকরদের দিকে লক্ষ রাখা। পড়াশোনার আলাদা সময়। ইলার ওপর ভার ছিল ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার। দুটি মেয়েকে পেয়ে মেজাজেই ছিলেন মামি৷ মামাও খুশি হয়েছিলেন ঘর ভরে উঠতে দেখে। ওঁদের তো টাকাপয়সার কোনও অভাব ছিল না। অভাব ছিল নিজের মানুষের। দুই বোনের উপস্থিতিতে বড়দাই বরং একটু অস্বস্তিতে থাকত।

প্রশ্রয় পেয়ে শীলার মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগল নানান দুষ্টুমি, বদমাইশি। ঠাকুর, চাকর, মালিদের নাজেহাল করে ছাড়ত শীলা। কাজে ভুল করলেই বাঙাল ভাষায় গাল পাড়ত তাদের। সে ভাষা তারা বুঝতে না পেরে বলত, ক্যায়া কহিছতিন বহনজি!

হেসে খুন হত মামি। ঠাকুর চাকররা মালকিনকে হাসতে দেখে বোকার মতো হাসত।— এইভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল গুড়গুড় করে। কখনও-সখনও মনে পড়ত স্বাতীর কথা। কেন মেয়েটা পালাল! একটু ধৈর্য ধরলে পারত। তার জন্যেও হয়তো এরকম একটা সুন্দর আশ্রয় অপেক্ষা করছিল। নাকি সে আরও কোনও সুন্দরের জন্যে ফিরে গেছে। যা সে ফেলে

এসেছিল কোনও এক নদীর পাড়ে। যেখানে স্বাতীর অপেক্ষায় সূর্য ডুবছে খুব ধীরে। জলের রং গাঢ় লাল। উদাস ছেলেটা বসে আছে গভীর বিষাদে। সূর্য ডুবে গেলেই কি সে জীবনটা শেষ করে দেবে?

এমন সময় পিঠে পাতা পড়ার মতো ছোট্ট টোকা। ... স্বাতীর মতো অত সুখী হননি ইলা। তবু মনে হয়েছিল ভালই তো আছি। কয়েক মাস যেতে যেদিন অবিনাশ এলেন বাড়িতে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মানুষটাকে দেখেই মনে হয়েছিল, এই সে। যার জন্য এতটা পথ উজিয়ে নিয়ে এসেছেন ভগবান।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল শীলাও, বলল, বড়দার বন্ধুটাকে কী সুন্দর দেখতে, না রে দিদি? ঠোঁট চাপা আত্মবিশ্বাসী হাসিটা সম্ভবত হেসেছিলেন ইলা। শীলা একটু দমে যায়। প্রিয় খেলনা, পুতুল, সাজগোজের জিনিস কেড়ে নিয়ে দিদি এমনটাই হাসে।

প্রথমদিন মানুষটার সঙ্গে কথা বলে, কণ্ঠস্বর শুনে, ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ মোহিত হয়ে যান ইলা। অবিনাশ চলে গেলে ঠাকুরঘরে যান। মামিমার গোপালকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করেন, কৃতজ্ঞতা জানান। তখন পাথরের গোপালের চোখ বড় জীবন্ত লাগছিল।

অবিনাশের কাছে বেশ কিছুদিন পড়ার পর কেমন যেন একটু সংশয় দেখা দিল। মানুষটা পড়ানোর ব্যাপারে এতটাই সিরিয়াস, ইলার ছুড়ে দেওয়া আভাস-ইঙ্গিতগুলো ধরতেই পারে না। আরও একটা মুশকিল হচ্ছে, শীলা যেহেতু পড়ায় ফাঁকি দেয়, ওর প্রতিই বেশি মনোযোগ দিচ্ছিলেন অবিনাশ। ইলার এই অসহায় অবস্থা সহজেই উপলব্ধি করল শীলা। যখনই বড়দা কথা তুলল যে, কোনও এক বোনকে কলকাতায় মাসির বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল শীলা। ইলা নিভৃতে বোনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুই যে রাজি হয়ে গেলি যেতে, পারবি আমাকে ছেড়ে থাকতে? মিকি হেসে শীলা বলেছিল, আমি কোনও রকমে চালিয়ে নেব। কিন্তু তুই তো অবিনাশদা ছাড়া বাঁচতেই পারবি না।

দুই বোনের এই গোপন আঁতাত বাড়ির লোক কেউ জানল না। আজও জানে না। কলকাতায় মাসিরবাড়িতে ওকে ভালমন্দ বোঝানোর ছিল না কেউ। কীভাবে যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল মাসতুতো দাদা বিপুলের সঙ্গে। ওরা বিয়ে করে মাসিরবাড়ি থেকেও বেরিয়ে গেল। শোক সামলাতে পারলেন না বাবা। স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। আত্মীয়স্বজন শীলাকে সম্পর্কের বাইরে ফেলে দিল।

ইলা পারলেন না। বোনের এই ভবিতব্যের মূল কারণ তো তিনি। তাই বোনের কাছে যান, যোগাযোগ রাখেন। এ বিষয়ে তাঁর সামান্য ভয়, উৎকণ্ঠা থাকলেও অপরাধবোধ নেই। তবে বিপুলদাকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। বিপুলদাও সেটা বোঝে, ইলা ওবাড়ি গেলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শীলার ছেলেটা ভারি মিষ্টি। ওরা নাম রেখেছে সায়ক। কেন যে রেখেছে ওরকম একটা নাম! সায়ক মানে তো খড়্গা, বাণ। কেমন যেন অশুভ শোনায়। নিশ্চয়ই বিপুলদাই দিয়েছে। অংশু, বরুণের মাঝামাঝি বয়স ছেলেটার। খুব মাসি মাসি করে। ও হয়তো কোনওদিন জানবেই না, এই মাসির জন্যই তার মামারবাড়ি বলে কিছু নেই।

আপনা-আপনি একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে ইলার। ভগবান তাঁর ঘর ভরে দিলেও, বঞ্চিত করেছেন শীলাদের। সুখ অত্যন্ত মাপ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ঈশ্বর। কাউকে বেশি দিতে হলে, আর একজনের কম পড়ে যায়।

বউদি, আমি তা হলে আসি।

দীপালির ডাকে সংবিৎ ফিরতে সময় লাগে। চিন্তার অতলে ডুব দিয়েছিলেন ইলা। হাতের উল-কাঁটা ইতিমধ্যে আরও ছ আঙুল বুনে ফেলেছে। একটু সময় নিয়ে ইলা বলেন, হ্যাঁ এস।

দীপালি বলে, কবে যাবেন মছলন্দপুর? সেইমতো সকালের টিউশানিগুলো... দীপালির কথা কেটে ইলা বলেন, এক্ষুনি যাচ্ছি না। গেলে তোমায় বলব।

ঘাড় হেলিয়ে দীপালি চলে যায়। বরুণ লাফিয়ে উঠে আসে বিছানায়। মায়ের কোল ঘেঁষে বসে সে এখন সোয়েটার বোনা দেখবে। অংশু বইখাতা নিয়ে চলল পাশের ঘরে। স্কুলের

হোমটাস্ক, দীপালির দিয়ে যাওয়া পড়া, সব করতে হবে এখন। লেখাপড়ার ব্যাপারে ঠেলা দিতে হয় না অংশুকে। সে যথেষ্ট সিরিয়াস।

শরীর ঘেঁষে বসা বরুণকে ইলা জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে, বাবার জন্য মন খারাপ করছে না তোর?

মাথা নেড়ে 'না' বলে বরুণ।

বিস্মিত ইলা বলেন, কেন?

তুমি তো আছ।

ছেলের নরম গলায় ‘তুমি তো আছ' কথাটা ইলার প্রত্যয় ইস্পাতকঠিন করে। সত্যি কথা বলতে কি, শ্বশুরবাড়ি, বাপেরবাড়ি দুদিকের লোকই ইলার কথার গুরুত্ব দেয় খুব। বাপেরবাড়ির বড় মেয়ে, শ্বশুরবাড়ির মেজবউ হলেও, বড়বউয়ের গুরুত্ব পায়। সবাই যেন অস্ফুটে বলে, 'তুমি তো আছ'। ইলা যদি এখন শীলাকে নিয়ে মছলন্দপুরে যায়, খুব অনাসৃষ্টি হবে কি? যাঁকে সব থেকে ভয়, বাবা, তিনি আর বেঁচে নেই। বড়দা এখনও বিহারে থাকে। মেজদা নির্বিরোধী মানুষ। সারাদিন বড়বাজারে কেটে যায়। পরে যদি জানেও শীলা এসেছিল, খুব একটা ঝামেলা করবে না। বিশেষ করে যখন শুনবে ইলা নিয়ে এসেছে। মেজবউদি শীলাকে কোনওদিন দেখেনি, ওর কৌতূহল মিটবে। ছোটভাই অপূর্ব বাড়ি থাকলে বড় ভাল হয়, ও বোধহয় ভুলেই গেছে ছোড়দিকে কেমন দেখতে।

শীলাকে দেখে মায়ের অবস্থা কী হবে ভাবতে গেলেই মনে পড়ে যাচ্ছে, খানসামা গ্রামের শেষ দিন। বোবা হয়ে মা দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। দুই মেয়ে প্রণাম করল। মায়ের পা ঠান্ডা বরফ।

এবারে দুই বোন ফিরে যাবে মায়ের কাছে। খানসামা না সই মছলন্দপুরে। মা তো আর বদলায়নি। শীলাকে আগে থাকতে শিখিয়ে রাখবেন ইলা, মাকে প্রণাম করে বলবি, সামান্য সুখ-শান্তির জন্য কত দূর পাঠিয়েছিলে, একটু-আধটু পথ ভুল তো হয়ই। পারলে ক্ষমা কোরো।

উল বুনতে বুনতে ইলার অজ্ঞাতে এক ফোঁটা টলটলে জল গাল বেয়ে নামছে। তা দেখে বরুণ বলে, বুঝেছি, তোমার মন খারাপ করছে বাবার জন্য।

॥ এগারো ॥

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সমস্তিপুর থেকে আসা প্যাসেঞ্জারটা হাওড়ায় পৌঁছাল। প্রায় চার ঘণ্টা লেট। পিলপিল করে যাত্রী নামছে ট্রেন থেকে। ভিড়ের মধ্যে মিশে অপূর্বও নেমে পড়ল। ছদিন বিহারে আত্মগোপন করে অপূর্ব ফিরল বাংলায়।

রাত যা হয়েছে এখন শিয়ালদা গিয়ে লাস্ট বনগাঁ লোকাল পাওয়া যাবে না। রাত কাটাতে হবে প্ল্যাটফর্মে অথবা দিদির বাড়ি দেবপাড়ায়। ওদিককার লোকাল এখনও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। যত দূর মনে পড়ছে, জামাইবাবু বলেছিল, হাওড়া মেন লাইনের লাস্ট ট্রেন এগারোটা পনেরোয়।

সমস্তিপুর প্যাসেঞ্জার এসেছে আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে। মেন লাইনের লোকাল ছাড়ে এক থেকে ছয়ের মধ্যে। লোকাল ধরার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে অপূর্ব। কাঁধে কাপড়ের সাইড ব্যাগ। চুল উশকোখুশকো। পরনে চোঙা প্যান্ট-শার্ট নোংরা এবং কোঁচকানো। দাড়ি কাটা হয়নি এই কদিন। পাগলদের ড্রেস। শুধু ওর প্রখর এবং সতর্ক চাউনিটা প্রমাণ করে দিচ্ছে, সে মোটেই পাগল নয়, হয়তো-বা পলাতক।

নিজেকে নিয়ে অপূর্বর আর একটা সমস্যাও আছে, তার হাইট অ্যাভারেজের থেকে বেশ বেশি। যতটা ঘন ভিড়ের মধ্যে কুঁজো হয়ে এগোচ্ছিল অপূর্ব, তা এখন অনেকটাই পাতলা। ফলে আরও সাবধান হয় সে। কেমন জানি আশঙ্কা হচ্ছে ছদিন পরও পুলিশ তার জন্য জাল পেতে রেখেছে।

ট্রেন যত দূরত্ব কমিয়েছে হাওড়ার, ভয়টা পেয়ে বসছিল অপূর্বকে। সেই মতো সে একবার বর্ধমান পরে ব্যান্ডেলে নেমে পড়তে চেয়েছিল, ঘুরপথে ফিরে যাবে বাড়ি। দুটো স্টেশনেই কামরা থেকে মুখ বাড়াতে দেখে, প্ল্যাটফর্মে টহল দিচ্ছে বেশ কিছু পুলিশ। এরা কি অন্য দিন থাকে? জানে না অপূর্ব। হয়তো এই নজরদারি তার জন্যই। দরজা থেকে পিছিয়ে এসে নিজের জায়গায় বসেছিল অপূর্ব। ব্যান্ডেল বা বর্ধমানে নামলে পুলিশ সহজেই তাকে শনাক্ত করবে, কেননা সেখানে ভিড় নেই, অর্থাৎ আড়াল নেই কোনও।

পুলিশ যে তাকে নিশ্চিতভাবে খুঁজছে, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বরং উলটোটাই আশা করা উচিত। তীর্থঙ্কর এমন একটা ছেলে, পুলিশের মার খেয়ে মরে যাওয়ার উপক্রম হলেও সঙ্গীর নাম কবুল করবে না। তাও আশঙ্কা একটা থেকেই যায়।

তীর্থঙ্করকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের এমনটা মনে হতেই পারে, আরও কেউ ছিল। তাকে না পাওয়া অবধি সমস্তিপুর থেকে ফেরা সমস্ত গাড়ির ওপর কদিন নজর রাখবে পুলিশ। সেটা কতদিন, আন্দাজ করার উপায় নেই। টাকা ফুরোতেই ফিরতে হল অপূর্বকে। সাইড ব্যাগ বুকে নিয়ে খুব ধীর পদক্ষেপে প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

ওই ব্যাগটাই ওকে চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট। এমন অনেক কিছু আছে ব্যাগে, অনায়াসে আন্দাজ করা যাবে, প্রবাল সামন্তকে খুন করতে সে-ও গিয়েছিল।... খুন শব্দটা মাথায় আসতেই বুকটা কেমন জানি ধড়াস করে উঠল। অথচ কী নির্দ্বিধায় পার্টির আদেশ মাথা পেতে নিয়েছিল অপূর্ব। না নেওয়ার কিছু নেই, প্রবাল সামন্তর মতো হারামি পুলিশ অফিসারকে খুন করতে পারার মধ্যে যে কী সুখ লুকিয়ে আছে, সংগ্রামী বন্ধু মাত্রই সেটা জানে।

'খুন' করার কথা ছিল অপূর্বর, গার্ড দেবে তীর্থঙ্কর। শেষ মুহূর্তে দায়িত্বটা তীর্থ ছিনিয়ে নেয়। সমঝদারের মতো বলে, অপূর্ব তোর থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে পার্টির। আমার তো কিছুই দেওয়ার নেই। ঝুঁকিটা আমি নিই।

অপূর্ব জানে তীর্থঙ্কর আসলে তৃপ্ত হতে চেয়েছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থর তৃপ্তি। পারেনি সে। এর জন্য অপূর্বকে পার্টির নেতৃত্বের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু খুনটা কি অপূর্বও পারত করতে? জীবনের প্রথম খুন ওরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে। চলন্ত ট্রেনে

দুজন আর্মড গার্ড নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে শুয়ে আছে অফিসার। কনস্টেবল দুজন অন্যমনস্ক হলেই, ঘুমন্ত অফিসারকে মেরে ফেলতে হবে। প্রথম চেষ্টা হবে ছুরি দিয়ে। না পারলে রিভলবার। নিজের পালাতে পারাটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মার্ডারটাই আসল।

খুন করতে যেতেই ধরা পড়ে গেল তীর্থ। দুজন সাদা পোশাকের অফিসার ছিল। যাদের উপস্থিতি আন্দাজই করতে পারেনি অপূর্বরা। আর সব থেকে বড় ঠকা ঠকে গেছে তীর্থ, শেষমেশ গুলি চালাতে গিয়ে সে দেখে, সামন্তর জায়গায় অন্য একজন উঠে বসেছে।

সাইড বার্থে শুয়ে তখন ঠকঠক করে কাঁপছে অপূর্ব। কী ভীষণ শীত। তক্ষুনি পালাতেও পারছে না। তীর্থকে ঘিরে ধরা পুলিশরা সন্দেহ করবে। সেই সময় তীর্থও পার্টির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে খুব। ভুলেও সাইড বার্থের আপারে তাকায়নি।

ঘটনা ঘিরে উৎসুক যাত্রীরা জড়ো হতে শুরু করল। জমাট বাঁধল ভিড়। উজিয়ারপুর স্টেশনে থামল গাড়ি। তখনই ট্রেন থেকে টুক করে নেমে পড়েছিল অপূর্ব। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে সে সোজা চলে যায় গ্রামের গভীরে। যাওয়ার পথে পার্টির ট্রেনিং সে কাজে লাগিয়েছে, পিচ রাস্তা ক্রস করেনি, কোনও চায়ের দোকানে বসেনি, শহরের রাস্তা এড়িয়ে গেছে। চলে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামে। ইচ্ছে করলে নর্থ বিহারের অনেক জায়গায় সে শেল্টার পেতে পারত। যেমন মজফফরপুরে বড়দার কাছে। দিদির শ্বশুরবাড়ি সমস্তিপুরে। দ্বারভাঙায় বড়বউদির বাপের বাড়িতে... কোথাও যেতে ভরসা হয়নি। বা বলা ভাল, বিশ্বাস হয়নি ওদের। নিজেদের বাঁচাতে যদি ধরিয়ে দেয় পুলিশে। পার্টি করতে গিয়ে মানুষের ওপর বিশ্বাসটা হারিয়ে যাচ্ছে। এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়। বিশেষ করে নিজের আত্মীয়স্বজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, ইদানীং বড় বেদনা দেয় অপূর্বকে।—এসব তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি। পার্টি মিটিংয়ে এ নিয়ে আলোচনা করাই যাবে না। বিপরীত যুক্তিগুলো কণ্ঠস্থ অপূর্বর। ওই যুক্তিগুলো সে নিজেই অনেক পার্টিকর্মীকে বলে উদ্বুদ্ধ করেছে, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষই তোমার স্বজন।

উজিয়ারপুর গ্রামের গভীরে গিয়ে পার্টির একটা নির্দেশ অপূর্ব মানেনি। পার্টিতে বলা হয়, দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক ছাড়া আর কারও বাড়িতে আশ্রয় নেবে না। অপূর্ব আশ্রয় নিয়েছিল এক জোতদারের কাছে। খুবই সম্পন্ন অথচ সরল গৃহকর্তা। সাংবাদিক পরিচয়ে সেখানে উঠেছিল অপূর্ব। জার্নি এবং টেনশানে ভোগা শরীরটা আরাম চাইছিল একটু। ওরা যতটা পেরেছে খাতিরযত্ন করেছে। ভরপেটে খেতে খেতে অপূর্বর বারবার মনে পড়েছে তীর্থঙ্করের কথা। সে এখন কী করছে? কলকাতায় চালান করে দিল কি?

যে গ্রামটায় থাকত অপূর্ব সেখানে খবরের কাগজ পৌঁছয় না। ফলে তীর্থঙ্করের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানা যাচ্ছিল না। জোতদারের বাড়িতে দিনেরবেলা থাকত না অপূর্ব। গ্রাম থেকে গভীর গ্রামে ঢুকে গেছে। দেখেছে কী মারাত্মক দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে মানুষ। অবর্ণনীয় তাদের কষ্ট। সেখানে কৃষিবিপ্লবের কোনও হাওয়া পৌঁছয়নি। এক এক সময় মনে হচ্ছিল এই জায়গাটা বুঝি ভারতের বাইরে। অথচ তার পার্টি বিশ্বাস করে এখনই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃষ্ট সময়। ভূমিহীন কৃষক সংগঠিত হচ্ছে, ক্ষোভ উগরে দেওয়ার জন্য ব্যগ্র তারা। কিন্তু কোথায় ক্ষোভ? যখনই কোনও কৃষককে বোঝাতে গেছে, কীভাবে শোষিত হচ্ছে সে, কৃষকটি নিজের কপাল দেখিয়েছে। বলেছে এখানে যা লেখা আছে সেটা তো মানতেই হবে।

ওই গ্রামের চাষিবাসি মানুষ অদৃশ্য ললাটলিখন পড়ে নিতে পারলেও, জমির অধিকার বুঝে উঠতে পারে না। কী গভীর অজ্ঞতা তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যেন মধ্যযুগে পড়ে আছে। এদের কাছে কোনওদিন পৌঁছনো যাবে কিনা কে জানে!

যে জোতদারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন অপূর্ব, তিনি শোষণের ব্যাপারে কম যান না। এ নিয়ে তাঁর কোনও অপরাধবোধ নেই। তাঁর যুক্তি বংশ পরম্পরায় তিনি শোষণের অধিকার পেয়ে এসেছেন। তাঁর জমি চাষ করে যারা, জোতদারকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করে।

দু-চারদিন ওই পরিবেশে থাকতে থাকতে অপূর্বর কেমন যেন কনফিউজড লাগছিল, সে যে শুনে এসেছে, দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যেই সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘৃণা সঞ্চিত রয়েছে যুগ যুগ ধরে। এই ঘৃণা সংগ্রামকে অবিচল রাখে। বিপ্লবী জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে এই ঘৃণা। কারণ, মূলত তাদের স্বার্থকেই বহন করে এই বিপ্লব।

কোথায় সেই ঘৃণা। এ ব্যাপারে দু-একজন কৃষককে মোটিভেট করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে অপূর্ব। খুব একটা যে চেষ্টা করেছে তাও নয়, মুদ্রাদোষের মতো যতটুকু করে ফেলেছে আর কী। সে তো ওখানে বেশি দিন থাকবে না, পাততাড়ি গোটাতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পরে পার্টি মিটিংয়ে আলোচনা করবে, বলবে যে গ্রামে বিপ্লবের পরিস্থিতিই তৈরি হয়নি। আর আমরা মনে করছি ভারতের নিপীড়িত মানুষ মাত্রই আমাদের আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং মনে মনে সমর্থন করে আমাদের। এ এক ধরনের আত্মপ্রসাদ। উজিয়ারপুরের মতো ভারতের অজস্র গ্রাম পড়ে আছে, যেখানে আমাদের আন্দোলনের নাম-গন্ধ পৌঁছয়নি।

উজিয়ারপুর থেকে ফেরার দিন অপূর্বর সেই ধারণা নস্যাৎ হয়ে যায়। রাত্তিরে ট্রেন। সন্ধে উতরে গেলে দেখা করতে গিয়েছিল গৃহকর্তার কাছে। তিনি তখন খাটিয়ায় শুয়ে চাকরকে দিয়ে পা টেপাচ্ছেন। দালানে জ্বলছে টিমটিমে লণ্ঠন।

অপূর্ব কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়াতে রাধেশ্যাম বলেন, রাত কা প্যাসেঞ্জার পকড়নাই আপ কে লিয়ে ঠিক রহে গা।

ভেতর ভেতর বেশ চমকে উঠেছিল অপূর্ব, কিছু কি ইঙ্গিত করলেন মানুষটা। গৃহকর্তা জানেন অপূর্ব সাংবাদিক, সেইমতো গ্রামের নানান সমস্যা নিয়ে কথাও হয়েছে মানুষটার সঙ্গে। ওইসব কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই কি অপূর্বর আসল পরিচয় আবিষ্কার করে ফেললেন?

পা টিপতে থাকা লোকটাকে সরে যেতে বলে, রাধেশ্যাম খাটিয়ায় উঠে বসলেন। তারপর সরাসরি তাকালেন অপূর্বর দিকে। দৃষ্টি নামাতে গিয়েও থমকে গেল অপূর্ব। রাধেশ্যামের চোখে 'কেমন ধরে ফেলেছি' ব্যাপারটা নেই। আছে সম্ভ্রম। হঠাৎ হাত জোড় করে সে বলতে শুরু করে, আপ পত্রকার নেহি হ্যায়, ইয়ে মেরা পহলে দিন সে মালুম থা। আপ ক্রান্তিকারী হ্যায়। জানতে হুয়ে ভি হাম আপ কে লিয়ে রহনে ঔর খানে কা ব্যবস্থা কিয়া। আপনে মেরা কিষাণ কো ললকারা, ইয়ে ভি মেরা যহন মে হ্যায়। অব বলিয়ে ম্যায় কিউ আপ কে লিয়ে ইতনা কিয়া?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অপূর্ব। রাধেশ্যাম বলতে থাকন, ইয়ে ভি মেরা পুরখোঁ কি বাত হ্যায়। পরম্পরা। মেরা বাপ-দাদা ভি আপ য্যায়সা বহুত ক্রান্তিকারীকো আশ্রয় দিয়া।

অপূর্ব তখন আর কী করে। অনেক সুকরিয়া আদা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বেরোনোর সময় রাধেশ্যাম বললেন, বিপদে পড়লেই অপূর্ব যেন সেখানে চলে যায়। তার উপস্থিতি গোপন থাকবে। ভদ্রলোক একজন চরণদার দিয়ে দেন অপূর্বর সঙ্গে। লণ্ঠন, লাঠি হাতে অপূর্বকে স্টেশনে পৌঁছে দেয় জোতদারের চাকর।

রাধেশ্যামবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে, এক আকাশ তারা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অপূর্বর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, রাধেশ্যাম কি শ্রেণিশত্রু? আর একটা বোধে উপনীত হচ্ছিল সে, বিপ্লব মানব সভ্যতার ঐতিহ্যের অঙ্গ। এর ক্ষেত্র সর্বদাই প্রস্তুত। —ভাবনাগুলো কি একটু সংশোধনবাদী ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে না? জিজ্ঞাসাটা পিছু ছাড়েনি। উজিয়ারপুর থেকে হাওড়ার আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম অবধি চলে এসেছে।

প্ল্যাটফর্মের গোড়ায় এসে দুজন পুলিশকে দেখতে পায় অপূর্ব। পুলিশ দুটোর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে না কাউকে খুঁজছে। গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। পাশ দিয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে হেঁটে যায় অপূর্ব।

তিন নম্বরে একটা লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত ওটাই মেন লাইনের লাস্ট লোকাল। পায়ে পায়ে ট্রেনটার উদ্দেশ্যে এগোতে থাকে অপূর্ব। দু-চার পা এগোতেই তার মনে হয়, কেউ যেন ফলো করছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করতে করতে এই একটা অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জন করেছে অপূর্ব, পিছন না ফিরেই আন্দাজ করতে পারে, কেউ অনুসরণ করছে।

বেশির ভাগ সময় আন্দাজটা মিলে যায়। এটা কী করে পারে নিজেই জানে না অপূর্ব, বড় আশ্চর্য লাগে তার।

অনুমানটা মিলিয়ে নিতে ট্রেনের পাশে হাঁটতে থাকা অপূর্ব হঠাৎ একটা কামরায় উঠে পড়ে। ভেতরে যায় না। গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। একটু অপেক্ষা করতেই তার আন্দাজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। আট নম্বরের মাথায় যে দুজন পুলিশকে ক্যাজুয়ালি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, তারাই উঠে এসেছে কামরায়।

ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয় অপূর্ব। পুলিশ দুটো তাকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে, ডাইরেক্ট চার্জ করছে না। অপূর্বর বেশবাসের জন্যই এই সন্দেহ। প্রবাল সামন্তর ঘটনার সঙ্গে এর বোধহয় কোনও যোগ নেই। আবার থাকতেও পারে। তীর্থঙ্করের সঙ্গীর চেহারার কোনও বর্ণনা পুলিশের কাছে নেই, ওরা নিশ্চয়ই র‍্যানডাম ধড়পাকড় করছে। আর একটু পরেই পুলিশ দুটো অপূর্বকে জেরা শুরু করবে। ব্যাগ সার্চ করলেই বেরিয়ে পড়বে রেড বুক, একটা ড্যাগার, আর রিভলবার। চাদর, লুঙ্গি, গামছার মধ্যে মোড়া আছে ওগুলো।

নার্ভাস লাগছে বেশ। বাঁ পা-টা অবশ হতে শুরু করেছে। কিছুদিন যাবৎ ভয় একটু তাড়াতাড়ি পেয়ে বসছে অপূর্বকে। এই সাহস নিয়ে কী করে সে গিয়েছিল প্রবাল সামন্তকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে! কারণ একটা আছে, কেন জানি কয়েক মাস ধরেই অপূর্বর মনে হচ্ছে তাদের আন্দোলনের আয়ু হয়তো শেষ হয়ে এসেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র পুরোপুরি কবজা করে ফেলেছে তাদের আগুন। বহু কমরেড জেলে। নানান ছুতোনাতায় অসংখ্য কমরেডকে মেরে ফেলা হয়েছে। এবং সব শেষে দলের শ্রদ্ধেয় নেতা ধরা পড়ে গেলেন জুলাই মাসে। কোর্টে তোলার আগেই তিনি মারা গেলেন পুলিশি হেফাজতে। তার আগেও আর এক তাত্ত্বিক নেতাকে পালাতে দিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ। তখনও ভরসা ছিল শ্রদ্ধেয় নেতা তো এখনও আছেন বেঁচে। আত্মগোপন করে আছেন, নতুন এবং নির্ভুল সমরকৌশল সাজাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে।

তাত্ত্বিক নেতাকে চাক্ষুষ করেনি অপূর্ব। অনেক লেখা পড়েছে। লেখাগুলো প্রথম প্রথম কঠিন ঠেকলেও, একবার বুঝে উঠতে পারলেই সামনের পথটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উনি চলে গেলেও লেখায় অমর রয়ে গেলেন। কিন্তু ওই মানুষটা, দলের প্রধান কাণ্ডারী যিনি, যার সঙ্গে একবার সাক্ষাতে একটি যুবকের সারা জীবন পালটে যেতে পারে। —অপূর্বর তেমনটাই হয়েছিল। একবার জেলা থেকে বাছাই করা যুবছাত্র কমরেডদের নিয়ে মিটিং হয়। অপূর্ব নিজের জেলার চারজনের একজন। কলকাতায় এক গোপন ডেরায় মিটিং বসে। শদুয়েক ছেলে ছিল। বিশাল হলঘর। শতরঞ্চির ওপর। কেউবা বাইরে বসে আছে। শ্রদ্ধেয় নেতা এলেন। চেহারা দেখে অপূর্ব হতবাক। শুনেছিল, উনি ছোটখাটো চেহারার রোগা মানুষ। তা বলে এত রোগা। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন। হাঁপানি নিশ্চয়ই।

টিকালো নাক প্রায় ঠোঁট ছুঁয়েছে। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। কালো ফ্রেমের চশমার ভেতরে শাণিত দৃষ্টি। নিজেকে আড়ালে রেখে সেই চোখের দিকে টানা তাকিয়ে থাকলে, বোঝা যায় ওই চোখ দুটোতে একদা স্বপ্নরা সাগ্রহে বাসা বাঁধত।

সেদিন তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল দুশোর ওপর ইয়াং কমরেড। মূল বক্তব্য এখনও বুকে গেঁথে আছে অপূর্বর। বলেছিলেন, দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই যুব-ছাত্ররা বিপ্লবী হতে পারবে। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। নিজের এলাকায়, পাড়ায়, স্কুলে, কলেজে পাঁচ-ছজনের ছোট ছোট স্কোয়াড তৈরি কর। বেরিয়ে পড় তোমাদের পাশেই অবহেলিত গ্রামের গভীরে। চার-পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে ওঁদের সঙ্গে থাক। ওঁদের জীবনযাপনের সঙ্গে মিশে যাও। মাও চিন্তাধারা তাঁদের শোনাও, সারা ভারতের বিপ্লবী কৃষক যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী তাঁদের বল। প্রথম প্রথম তোমাদের বিশেষ পাত্তা দেবেন না তাঁরা। স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা তথাকথিত শিক্ষিতদের অবিশ্বাস করেন। মনে রাখবে আগামীদিনে আজকের এই দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষকই দেশের নিয়ন্তা হবেন।... এরকম আরও অনেক কথায় আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল অপূর্ব। এসব

কথা আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে। তবু শ্রদ্ধেয় নেতা মাথার ওপর থেকে সরে যেতেই, কেমন একটা ভয়, অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরেছে তাকে। বছরখানেক হল পুলিশি তৎপরতা এবং নিজেদের ভুলত্রুটির কারণে পার্টি সংগঠনের কাঠামো এখন অনেকটাই দুর্বল। মনে হয়েছিল এটা সাময়িক। শ্রদ্ধেয় নেতা শহিদ হতেই সেই বিশ্বাসটায় ফাটল ধরেছে। এত সব হতাশার মধ্যে একটাই পজিটিভ ব্যাপার, অপুর্বদের স্কোয়াড এখনও সক্রিয়। সেটা কতদিন থাকবে বলা যায় না। নেতা বিমলদার গলায় এখনই সংশোধনবাদীর সুর। গোপন মিটিংয়ে ঠিক হল প্রবাল সামন্তকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার মস্ত সুযোগ এসেছে। বদলি হয়ে সে চলে যাচ্ছে বিহারে। খতমের তালিকায় অনেকদিন ধরে বেঁচে আছে সামন্ত।

খুন করার দায়িত্বটা যেচে নেয় অপূর্ব। নৃশংস লোকটার বেঁচে থাকার আর কোনও অধিকার নেই। প্রায় দেড়শোর মতো কমরেডকে লোকটা তিল তিল করে মেরেছে। যদি পার্টির দিন সত্যিই শেষ হয়ে যায়, তার আগেই লোকটাকে শেষ করতে হবে।

বিমলদা মিটিংয়ে নানান টালবাহানা করছিলেন, এখন কিছুদিন আমাদের চুপচাপ থাকা উচিত। বড় বড় নেতাদের ধরে পুলিশ এনথু পেয়ে গেছে। ওরা ঝিমিয়ে পড়লে আমরা ফের আক্রমণে যাব।

বক্তব্যে সায় দেয়নি অপূর্ব। বলেছিল, এই সময়ই আমাদের বেশি করে অ্যাকশানে যাওয়া দরকার। পুলিশকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে আমরা মোটেই দুর্বল হয়ে পড়িনি। তা ছাড়া প্রবাল সামন্তকে মারার এর থেকে সহজ সুযোগ আর কখনওই পাওয়া যাবে না।

অবশেষে অপূর্বর সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় সভায়। মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে বিমলদা হাত রেখেছিলেন অপূর্বর কাঁধে। প্রথমে এটা-সেটা দিয়ে কথা শুরু করে অন্যদের থেকে একটু তফাতে নিয়ে গেলেন। তারপরই বললেন আসল কথা, আমাদের পার্টি বিশ্বাসঘাতকে ভরে গেছে। তাই তো এত সহজে ধরা পড়লেন শ্রদ্ধেয় নেতা। তুই যা যা প্ল্যান আজ মিটিংয়ে ঠিক করলি একটু রদবদল করে নিবি। মিটিংয়ে আজ যারা ছিল তাদের কেউ একজন পুলিশকে খবরটা পাচার করতেই পারে।

পোড়খাওয়া, অনেক অপারেশন লিড করা বিমলদাকে সেই মুহূর্তে উড়িয়ে দিতে পারেনি অপূর্ব। বলেছিল, প্ল্যানটা তাহলে কীভাবে সাজানো যায় বলো তো?

শোন, তোরা তো ঠিক করেছিস সামন্ত সমস্তিপুর স্টেশনে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবি, সেটা অনেক হ্যাফাজার্ড হয়ে যাবে। ও যদি ইনফর্মড হয়ে যায়, ট্রেনের উলটোদিকের দরজা দিয়ে পালাবে।— একটু ভেবে নিয়ে বিমলদা বলে, তার থেকে এক কাজ কর, ওর কমপার্টমেন্টে ওর সঙ্গেই তোরা যাত্রা শুরু কর। রাত্তিরে গার্ড হালকা হবেই। তখনই কাজটা সেরে ফেল। কোনও স্টেশনে গাড়ি ঢুকছে, এমন সময়টাই বেছে নিবি। যাতে অপারেশনটা করেই পালিয়ে যেতে পারিস।

বিমলদার পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ তীর্থকে ধরল—তার থেকে বড় কথা নিজের বার্থেও যখন ছিলেন না সামন্ত, তখন নিশ্চিতভাবে অপূর্বর মনে হয়েছিল, পুলিশ ইনফর্মড।

কে ট্রেচারিটা করল? বিমলদা কি? বিশ্বাস হতে চায় না কিছুতেই। এই বিমলদাই অপূর্বকে রাজনীতির হাতেখড়ি দিয়েছিলেন। বিমলদাই নিয়ে গিয়েছিলেন যুবছাত্র কমরেডদের মিটিংয়ে। মিটিংয়ের পর বনগাঁ লোকালে বসে অপূর্ব তার মুগ্ধতার কথা শোনাচ্ছিল। শ্রদ্ধেয় নেতার বক্তৃতা, ওঁকে দেখে সে কতটা মুগ্ধ হয়েছে। ছেলেমানুষের মতো বলে যাচ্ছিল, উনি অল্প বয়সে দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন তাই না বিমলদা! চোখ দুটো কী সুন্দর, টানা টানা। আর দাঁত এখনও ঝকঝক করছে।

ম্লান হেসে বিমলদা বলেছিলেন, দূরে বসেছিলি বলে ধরতে পারিসনি, দাঁতের পাটি দুটোই নকল। বাঁধানো। জেলে যখন অনশন করতেন, পুলিশ জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করত। তখনই দাঁতকটা ভেঙে যায়।

এখন অপূর্বর মনে হচ্ছে বিমলদার মতো কমরেডরাই পার্টির দাঁত ভেঙে দিতে উঠেপড়ে

লেগেছে। অপূর্বদের পিছনে বিমলদাই লাগিয়েছে পুলিশ। বিমলদাকে সামনে পেলে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যেত। কিন্তু আর কি তার সামনে যাওয়ার কোনওদিন সুযোগ হবে?

ট্রেনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আড়চোখে পুলিশ দুটোকে দেখে অপূর্ব। একজন খইনি ডলছে, অন্যজন গল্প করে যাচ্ছে। ওরা অপূর্বকে ধরছে না কেন? নাকি খামোকাই ভয় খাচ্ছে সে। হয়তো পুলিশ দুটোর এই ট্রেনেই ডিউটি।

আর একটা কথা মাথায় আসে, পুলিশ এক্ষুনি তাকে ধরবে না। ফলো করে দেখবে কোথায় যায়।—সম্ভাবনাটা মাথাচাড়া দিতে অপূর্ব ঠিক করে পুলিশ দুটোকে একটু পরীক্ষা করা যাক।

কামরা থেকে নেমে পড়ে অপূর্ব। হেলে দুলে দুটো কামরা পরে ফের ওঠে। অপেক্ষা করে, পুলিশ দুটো কি এখানেও উঠবে?

॥ বারো ॥

পাঁচ-ছটা দিন হুশ করে বেরিয়ে গেল। সমস্তিপুরে এখনও নিজেকে একান্তে পাননি অবিনাশ। তাঁর আসার খবর পেয়ে কত লোক যে দেখা করে গেছে, নিজেও গেছেন অনেকের বাড়ি। আর নিজের বাড়ির লোক তো সর্বদাই ঘিরে আছে। কত কথা, কুশল বিনিময়, হাসি হাসি মুখ নিয়ে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। অনেক সময় চানঘরে ঢুকে পড়ে খেয়াল হয়েছে, হাসিটা লেগে আছে মুখে।

এরকমটাই হওয়ার কথা। এখানে এলে এমনভাবেই কাটে। আড্ডায় গল্পে দিনরাতের খেয়াল থাকে না। কিন্তু কেন কী জানি, এবার একটু হাঁফ ধরে যাচ্ছে। বারেবারে একলা হতে চাইছেন অবিনাশ। সমস্তিপুরে একা চলে আসার পিছনে হয়তো সেই কারণটাই কাজ করছে, নিজের মতো করে পেতে চাইছেন ফেলে যাওয়া বসত, জনপদ। কেন চাইছেন হঠাৎ? এর নির্দিষ্ট কোনও ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেননি অবিনাশ। কয়েক ঘণ্টা একলা থাকতে পারলেই হয়তো কারণটা স্পষ্ট হবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর থেকেই বাইরে বেরোনোর ফিকির খুঁজছিলেন অবিনাশ। বিশেষ কোনও জায়গায় যাওয়া নয়, এমনিই বেরিয়ে পড়া। একথা বাড়ির লোকেদের বললে, তাদের কানে আশ্চর্য ঠেকবে। তাই এই কদিনের মতো খেয়ে উঠে দাদার পাশে দিবানিদ্রা সারতে গিয়েছিলেন অবিনাশ। এবার যেন দাদা বড্ড বেশি কাছে টানছে। রাত্তিরে অবশ্য অবিনাশ একাই শুচ্ছেন। বাবার বিছানায়।

আজ দুপুরে দাদার যেই চোখ লেগেছে, নাক ডাকতে শুরু করেছে অল্প অল্প, পাশ থেকে উঠে এসেছিলেন অবিনাশ। লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে, দেখেন, খিড়কি দোর দিয়ে এক হাতে বড়সড় মান অন্য হাতে কোদাল নিয়ে বউদি ঢুকছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে অবিনাশ বলেছিলেন, বাঃ বেশ বড় সাইজ হয়েছে তো! কোথায় হয়েছিল? কাকে দিয়ে তোলালে?

দালানের দিকে আসতে আসতে বউদি বলল, নিজে তুলে আনলাম। লোক দিয়ে তোলালেই দু টাকা চেয়ে বসত। বাগানের শেষে রেললাইনের ধারে হয়েছিল গাছটা। কদিন ধরেই ভাবছি তুলব। তুমি আছ যখন ঘরের জিনিস খেয়ে যাও।

আমাকেই বলতে পারতে তুলতে। খামোকা তুমি ওই ঝোপজঙ্গলের ভেতর যেতে গেলে কেন! সাপখোপ থাকতে পারে। বলেছিলেন অবিনাশ।

বউদি বলে, এ ভিটের সাপ, পোকামাকড় আমায় চেনে, তুমিই বরং এখন অচেনা। ঠেস দেওয়া কথা। তবে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বলেনি বউদি। সুরে ঠাট্টার মিশেল ছিল। তবু কথাটা মনের অন্তঃস্থলে অচেনা তারে ঝংকার তোলে। সদরের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ান অবিনাশ।

দালানে মানটা নামিয়ে বউদি কোদাল হাতে যায় কলতলায়। কোদালের কাদা পরিষ্কার করবে।

কল টিপতে টিপতে বউদি বলে, তা ভরদুপুরে এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

যাই একটু ঘুরে আসি। আর তো দুটো দিন আছি। ঘুমিয়ে কাটালে চলবে! দায় এড়ানো উত্তর দিয়েছিলেন অবিনাশ।

সে না হয় আমি বুঝলাম। তোমার দাদা ঘুম থেকে উঠলে কী বলব? তুমি না ফেরা পর্যন্ত সে আমার মাথা খারাপ করে ছাড়বে। কোথায় গেল? কী বলে গেল...

বউদির কথায় দু-একটা সুক্ষ্ম অসন্তোষের রেখা ফুটে উঠছিল অবিনাশের কপালে। কয়লাঘরে কোদাল রেখে শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে বউদি, অবিনাশ বলেছিলেন, দাদা যেন এবার একটু বেশি বেশি আমার ওপর ডিপেন্ড করছে। ব্যাপারটা কী বল তো?

সামনে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল বউদি। ওখান থেকেই বলে, ও বরাবরই তোমায় একটু বেশি ভালবাসে। বয়স হচ্ছে বলে মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে পারছে না।

'ডিপেন্ড' কথার অর্থ বউদি যে জানে না তা নয়। নির্ভরতাকে ভালবাসার মোড়ক দিচ্ছে। ভালবাসার ভেতর নির্ভরতার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে বড্ড ওজনদার হয়ে যায়। কষ্ট হয় বইতে।

কুলোতে ডাল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বউদি। চালতে চালতে বলেছিল, এই যেমন ধর, কাল থেকে আমায় বিরক্ত করে মারছে, আলুগাছ আরও আগে লাগালে না কেন? অবিনাশ ফিরলে ওর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া যেত। ইলা বড় ভাল আলুর দম করে।

একটা হুমদো বেড়াল উঠোন পার হচ্ছিল। বেড়ালটা উঠোনের রোদের থেকে সাদা। বউদি, 'যাঃ যাঃ ভাগ' বলে, কথায় ফেরে। বলেছিল, আচ্ছা তুমি বল, বাগানের আলু পেয়ে ইলা দম করলে, ও কি গিয়ে খেয়ে আসতে পারবে? এগুলো ছেলেমানুষি বায়না নয়? তা ছাড়া আলু তার সময়-সিজিন অনুযায়ী হবে। ওর কথামতো...

কথায় বাধা দিয়ে অবিনাশ বলে উঠেছিলেন, ঠিক আছে। দাদা উঠলে যা হোক একটা কিছু বলে দিয়ো, কোথায় গেছি। আমি সন্ধের আগেই ফিরব।

বউদির সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসেছিলেন অবিনাশ, বউদি আসলে বোঝাতে চাইছিল দাদার ভালবাসার ক্ষেত্রটা কত বিশাল! নির্ভরতার ছুতো তুলে তাকে কিছুতেই খাটো করা যাবে না। দাদাকে বোধহয় ঈশ্বরজ্ঞান করে বউদি। তাই তো তার অসফল দিকগুলো ঢাকা দিতে সারা দিনমান খুটুর খুটুর কাজ করে। কমপেনসেট করে সংসারকে। একজন মাত্র মুনিষ নিয়ে কুয়োতলার পাশের জমিতে আলুচাষ দিয়েছে। এ ছাড়াও নানা সবজি লাগায় বছরভর। বাগানের সামনে ফুলের চাষ। এবার যেন বাগানটা আরও বেশি সজল লাগছে। এই কদিন এখানে থেকে অবিনাশ লক্ষ করেছেন ছোটভাই রজত, ভাইবউ মালবিকা বাগানের দিকে তেমন নজর দেয় না। দরকার মতো ফলটাফুলটা নিয়ে আসে। নিয়ে এসে অবশ্য বলে, বউদির গাছের গোলাপ, বউদির গাছের লাউ... এইভাবেই সংসার খরচের কমবেশি বরাবর হয়ে যায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা নিয়েছেন অবিনাশ। কোথায় যাবেন ঠিক নেই। রিকশাওলাকে বলেছেন, মহাদেবস্থান চল।

নির্দেশ অনুযায়ী চলেছে রিকশা। আজ সমস্তিপুরকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছেন অবিনাশ, সাত বছর আগে ফেলে যাওয়া জায়গাটা কি ক্রমশ পালটাচ্ছে? যদিও গত বছরই ঘুরে গেছেন, তখন এসব ভাবনা মাথায় চাপেনি। ইলা ছিল, দুই ছেলে ছিল, হইহই করে কেটে গেছে কদিন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সমস্তিপুর বদলালে অবিনাশের কী যায় আসে? তা ছাড়া যে কোনও জনপদ সময়ের সঙ্গে তো বদলাবেই। সেই পরিবর্তনের সাক্ষী হতে চান অবিনাশ? এটা তাঁর জন্মভূমির প্রতি টান?

না, এমন কোনও আবদার তাঁর নেই। তা ছাড়া স্বেচ্ছায় তিনি সরে গেছেন দূরে। বিষয়টা আসলে এত সোজাসাপটা নয়। এর পিছনে গোপন একটা অনুসন্ধিৎসা কাজ করছে। অবিনাশ দেশ ছাড়ার কয়েক বছর আগে লক্ষ করছিলেন, সমস্তিপুরের হিন্দিভাষীদের মধ্যে কেমন একটা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাচ্ছে। যেটাকে এখানকার বাঙালিরা বিদ্বেষ বলেই ধরে নিচ্ছিল। সে সময় অবিনাশ অনেক বাঙালিকে বুঝিয়েছেন, এই অসহিষ্ণুতা স্বাভাবিক। জনসংখ্যা বাড়ছে, কাজ নেই। জিনিসের দাম বাড়ছে হু হু করে। মানুষের মনে অসন্তোষ তো জন্মাবেই।

অবিনাশের যুক্তি মন থেকে মেনে নেয়নি এখানকার বাঙালিরা। তাদের ক্ষোভ, আজকাল বিশেষ 'বাবু-বাবু' করে না এখানকার হিন্দিভাষীরা। অথচ ওরা মারোয়াড়ি পঞ্জাবিদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।— মন্তব্যগুলো গায়ে মাখতেন না অবিনাশ। অলস লোকের অর্থহীন অভিমান এসব। কই, অবিনাশের পাড়ায়, অফিসে কোনওদিন তো কোনো ভেদাভেদ দেখেননি বাঙালি বিহারির মধ্যে। তাহলে মিছিমিছি এসব ধুয়ো তুলে লাভ কী?

বিশ্বাসটা ধাক্কা খেল ছোট্ট একটা ঘটনায়। তখন পাকাপাকিভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাব, এই ভাবনাটা মাথায় চাপেনি। চোরা একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল মাত্র। একদিন অফিস থেকে ফিরেছেন খুব টায়ার্ড হয়ে। বিয়ের পর সমস্তিপুর মজফফরপুর ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। খুব ধকল যেত। বৈদ্যনাথকাকার ছোট ছেলে চম্পক হঠাৎ উপস্থিত। মুখটা থমথমে।

তখনও অফিসের পোশাক ছাড়েননি অবিনাশ, ব্যাগটা ইলার হাতে দিয়ে দালানে চেয়ারে বসে দম নিচ্ছিলেন। মনমরা চম্পককে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী হয়েছে রে? মুখটা ওরকম কেন?

ভেঙে পড়া গলায় চম্পক বলেছিল, দোকানটা বোধহয় আর রাখতে পারব না অবিনাশদা।

কেন, কী হল হঠাৎ?

উত্তরে তক্ষুনি কিছু বলেনি চম্পক, ইলা এসে দুজনকে চা দেওয়াতে চায়ের কাপটা তুলে কী যেন ভাবছিল। ওর মুদিখানা ব্যানার্জি লেনের মুখে। গাঁধীবাদী বৈদ্যনাথ মজুমদার সমস্তিপুরের সংগ্রামী আন্দোলনের পুরোধা হলেও, নিজের কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য একটা মুদিখানা বই কিছুই করে দিতে পারেননি। তবে পনেরোই আগস্ট ফ্ল্যাগ তুলতে ওঁকে ডাকা হয়।

চায়ে চুমুক দিয়ে চম্পক বলে, দোকানঘরের মালিক আমাকে উঠিয়ে ছাড়বে ঠিক করেছে।

কারণ?

মারোয়াড়ি পার্টি পেয়েছে। দোকানঘরটার জন্য ভাল টাকা দেবে বলেছে লোকটা। মালিক এখন আমার দোকানের সামনে চার-পাঁচটা বখাটে ছেলে বসিয়ে দিয়েছে। ওদের মধ্যে মালিকেরও ছেলে আছে একটা। আমার কাস্টমারদের দিবারাত্র টোনটিটকিরি মারছে ওরা। দোকানের সামনেই ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করে দিয়েছে...

কথার মাঝে অবিনাশ বলে, এসব প্রবলেম ইচ্ছে করলে তোর বাবাই সামলে দিতে পারবে। থানায় গিয়ে দাঁড়ালেই হল, বৈদ্যনাথ মজুমদারকে পাত্তা দেবে না এমন সাহস এখনও সমস্তিপুরের পুলিশের হয়নি।

বাবা থানায় গিয়েছিল। সত্যিই পাত্তা দেয়নি ওরা। আগের ওসি বাঙালি ছিল, বাবাকে মানত খুব। এখন যে লোকটা এসেছে মহা ত্যাঁদোড়।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত লেগেছিল অবিনাশের কাছে, চেয়ারে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করেন, কাকা হায়ার অথারিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেননি?

করেছিলেন। খোদ এস-পি। তিনি বলেছেন, জামানা বদল গ্যায়া মজুমদারবাবু। থোড়া অ্যাডজাস্ট কর লিজিয়ে। ঔর ইয়ে ছোটামোটা বাত মেরা তক আনা নেহি চাহিয়ে।

বৈদ্যনাথকাকার প্রভাব তার মানে কোনও কাজই করছে না! বিস্ময় গোপন করে অবিনাশ বলেছিলেন, তা এখন কী করবি ঠিক করেছিস?

বাবা তোমার কাছে পাঠাল। বলল, তুমিই একমাত্র পার ঝামেলাটা সামলাতে।

খানিকক্ষণ থম মেরে বসেছিলেন অবিনাশ। বৈদ্যনাথকাকার প্রতি এই অবজ্ঞা তাঁকে বিদ্ধ করছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। চম্পককে বলেন, চল তো দেখি, তোর দোকানঘরের মালিক কী বলতে চাইছে। পরিষ্কারভাবে বুঝে আসি।

অফিসের ধুতি-পাঞ্জাবি বদলানো হল না, খাওয়া হল না কিছু। চম্পককে নিয়ে গেলেন মালিকের বাড়ি। ব্যানার্জি লেনের গলির মুখেই দীনেশ শর্মার দোতলা বাড়ি। একতলায় চম্পকের দোকান, ওপরতলায় শর্মাজি থাকেন। অবিনাশ শর্মাজির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন, শর্মাজির বক্তব্য চম্পক ভাড়া দেয় মাসে আশি টাকা। মারোয়াড়ি পার্টি বলেছে অ্যাডভান্স দেবে কুড়ি হাজার। ভাড়া প্রতি মাসে একশো। তাহলে কেন তিনি পুরনো ভাড়াটে রাখবেন?

সহজ বুদ্ধিতে অবিনাশ বুঝেছিলেন, কোর্টে শর্মাজির নামে কেস করলেই ব্যাপারটা ঝুলে যাবে। মারোয়াড়ি পার্টিকে বেচতে পারবে না দোকান। কিন্তু তাতে কোনও সুবিধে হবে না

চম্পকের। ওর দোকানের সামনে উচ্ছৃঙ্খলতা চলতেই থাকবে। তার থেকে ব্যাপারটা সরাসরি মিটিয়ে নেওয়া যাক। অবিনাশ প্রস্তাব দেন, ঠিক হ্যায় চম্পক বিশ হাজার এক রুপাইয়া দেগা, ঔর হর মহিনা একশো এক রুপাইয়া ভাড়া। ব্যস আভি তো আপ কা ডিমান্ড কমপ্লিট হো গ্যায়া। লে আইয়ে কাগজ-পেন, আভি লিখাপড়ি সব হো যায়ে।

চম্পক হাঁ করে তাকিয়ে ছিল অবিনাশের দিকে, কোথা থেকে জোগাড় হবে এত টাকা? আসলে অবিনাশ মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাইয়ে দেবেন চম্পককে।

এমত প্রস্তাবেও রাজি হলেন না শর্মাজি। গাঁইগুই করে যেটা বললেন, সার সংক্ষেপ হল, মারোয়াড়ি ভদ্রলোককে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া ধর্মপ্রাণ সেই মানুষটি নিরামিষাশী। তাঁদের থাকা-খাওয়ার সঙ্গে শর্মাজিদের খুব মেলে। ... আপাত যুক্তিহীন কথাগুলোর মধ্যে একটা সুর-ই বাজছিল, বাঙালি, তোমরা আমাদের নও।

শর্মাজির কথার গুঢ়ার্থকে গ্রাহ্য না করে উঠে পড়েছিলেন অবিনাশ। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, ঠিক হ্যায়, আপ আপনা কোশিশ জারি রাখিয়ে, ম্যায় মেরা কাম করুঙ্গা।

চ্যালেঞ্জে জিতেও ছিলেন অবিনাশ, সে বড় বাঁকা পথে। পুলিশ, নেতাদের কাছে গিয়ে কোনও সুবিধে করতে পারেননি। কিছু আধা-পরিচিত গুণ্ডাকে টাকা খাইয়ে মারোয়াড়ি পার্টিকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। সে আর দোকান কেনার কথা ভাবেনি। আজও সেই দোকান দিব্যি চালাচ্ছে চম্পক। কিন্তু অবিনাশের মনে কোথায় যেন প্রাদেশিকতার কাদা লেগে গেছে। নোংরাটা তিনি দেখতে পান না, অনুভব করেন।

এখন রিকশায় যেতে যেতে তিনি বাঙালি খুঁজছেন রাস্তায়। দেখছেন, তাদের হাঁটা কি আগের মতোই দৃপ্ত, সাবলীল আছে? অথবা কতটা বিশৃঙ্খল হয়েছে এখানকার হিন্দিভাষীরা।

ব্যানার্জি লেনের কাছাকাছি চলে এসেছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও বদলই চোখে পড়েনি। বরং একটু যেন ঝিমোচ্ছে সমস্তিপুরের রাস্তাঘাট। দুপুরের আলস্য। এর মধ্যে আবার খান পাঁচেক 'নমস্তে' পেয়েছেন অবিনাশ। নমস্কারগুলোর প্রাপক আসলে ডাগতরবাবু, মানে দাদা। দাদার চেহারার সঙ্গে অবিনাশের মিল আছে ঠিকই, আগেও কিছু কিছু নমস্কার পেয়েছেন, যারা করত, পরমুহূর্তে তাদের চোখে সংশয় দেখা দিত। এবার দিচ্ছে না। আগের থেকে একটু মোটা হয়েছেন অবিনাশ। অনেকটা দাদার মতো।

রিকশা পৌঁছল ব্যানার্জি লেনের মুখে। দোকান বন্ধ করছে চম্পক। চানখাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে ফের এসে খুলবে।

দোকানের দরজায় তালা মেরে ঘুরতেই চম্পকের চোখে পড়ে অবিনাশকে। অবাক হয়ে বলে, আরে অবিনাশদা, কবে এলে তুমি?

বিচক্ষণ রিকশাওলা নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে গেছে, জানে দুই বাঙালির এখন কিছু কথা হবে।

চম্পক এগিয়ে এসেছে রিকশার কাছে। হাসি মুখে অবিনাশ বলেন, একটু আগে তোর কথাই ভাবছিলাম। আছিস কেমন? কাকার শরীর?

বাবা এখন প্রায় শোয়া। কোনও রকমে বাথরুমটা যেতে পারে। তা এলে কবে? থাকছ তো কদিন?

এসেছি দিন পাঁচেক হয়ে গেল। দুদিন পরেই ফেরার টিকিট।

ভীষণ অবাক হয়ে চম্পক বলে, সে কী পাঁচদিন হল এসেছ, আমাকে কেউ কিছু বলেনি তো!

অবিনাশ মনে মনে বলেন, আমার আসা হয়তো কোনও খবরই নয় সমস্তিপুরের কাছে। —খানিক বিরতিতে নিজেকে শুধরে নেয় চম্পক। বলে, অবশ্য আমাকে কে কী বলবে, সারাদিন দোকান আগলে বসে থাকি, মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা নেই। একটু থেমে চম্পক বলে, দুদিনের মাঝে বাবাকে একসময় এসে দেখে যেয়ো, তোমার কথা মাঝেমধ্যেই বলে। -

আসব। বলে রিকশাওলার পিঠে টোকা মারেন অবিনাশ। অর্থাৎ 'চল'। রিকশা চলতে

শুরু করতেই চম্পক বলে, ও হ্যাঁ, খবরটা পেয়েছ নিশ্চয়ই। মৃগাঙ্কদাকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো বেপাত্তা। পুলিশ খুঁজছে। কেন খুঁজছে বুঝলে কিছু?

মাথা নাড়েন অবিনাশ। মুখে বলেন, আমিও তো এসে শুনলাম সব।

রিকশার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চম্পক বলে, একা হলে না হয় কথা ছিল, খামখেয়ালি লোক। কিন্তু বউদি সুদ্ধু উধাও হল কেন কে জানে!

চম্পক দাঁড়িয়ে পড়েছে, এগিয়ে যাচ্ছে রিকশা। দুজনের মাঝে ঝুলে রইল অদৃশ্য বিশাল প্রশ্নচিহ্ন। এখানে আসার দিন চিহ্নটা ছিল বেশ ছোট, বাড়িতে পা রাখতেই দাদা যে কথাটা বলেছিল, 'বুদ্ধিটা ভালই করেছিস' শুনে বিষম ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন অবিনাশ। পরে মৃগাঙ্কর ব্যাপারে সবিশেষ শোনেন দাদার কাছে। দাদাকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, মৃগাঙ্ক মোটেই দেবপাড়ায় যায়নি।

মৃগাঙ্কর মেয়ে কুড়িয়ে পাওয়াটা জানে না দাদা। অবিনাশ কিছু বলেননি। রজত, শশাঙ্কর সঙ্গে কথা হল, ওরা অনেক কিছু জানলেও মেয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে একদম অজ্ঞাত। তাহলে কি ওই মেয়ের কারণেই উধাও হয়েছে মৃগাঙ্ক, যমুনা?

কেউ না জানলেও দেবপাড়ায় বসে অবিনাশ জেনেছেন। মৃগাঙ্ক এতটাই আপন মনে করে তাঁকে। চিঠিতে মেয়েটার কথা লেখা আছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে পুলিশের কী সম্পর্ক!

এক এক সময় একটু বেখাপ্পা কার্যকারণ আসছে মাথায়, মৃগাঙ্ক কি কোথাও থেকে চুরি করেছে বাচ্চাটাকে? তাই পিছনে লেগেছে পুলিশ। চুরি করার মানসিকতা মৃগাঙ্কর নেই। জলজ্যান্ত বাচ্চা গায়েব করা তো অসম্ভব ব্যাপার। নাকি একটা শিশুসন্তানের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল মৃগাঙ্ক? যেটাকে কুড়িয়ে পাওয়া লিখেছে, সেটা হয়তো তুলে নেওয়া। হাসপাতাল অথবা অবহেলায় ফেলে রাখা বাচ্চাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে সে।

এরকম হঠকারি কাজ মৃগাঙ্ক জীবনে আগেও অনেক করেছে, তবে সেসব এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ভুল শুধরে নিতেও দেরি করত না মৃগাঙ্ক। এবারের ঘটনাতেও অবিনাশ ধরে নিয়েছিলেন, উনি থাকতে থাকতেই মৃগাঙ্ক ফিরে আসবে। আসছে না। আর মাত্র দুদিন বাদেই অবিনাশ চলে যাবেন। প্রশ্নচিহ্নটা ক্রমশ বড় হচ্ছে, কোথায় গেল মৃগাঙ্ক, কেন পালাল?

রিকশা থেমে গেছে। চোখ তুলে অবিনাশ দেখেন, মহাদেবস্থানের মন্দির এসে গেছে। পয়সা মিটিয়ে নেমে আসেন রিকশা থেকে।

দুপুর বলেই জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা। অন্য সময় ভিড়ভাট্টা লেগে থাকে। এখন কোথায় যাবেন অবিনাশ? সমস্তিপুরে তাঁর যাওয়ার জায়গার অভাব নেই। অনেক বাঙালি, বিহারি বন্ধু। বহু বন্ধুর বাড়িতেই যাওয়া হয়নি এবার। পরে যখন জানবে অবিনাশ এসে ঘুরে গেছেন, দুঃখ পাবে। রেলের অফিসেই অবিনাশের এত চেনা যে, দুপুর বিকেল ফুরিয়ে যাবে হুশ করে। কিন্তু কোনও মহলে, কারও কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না। মন এক একবার বলছে, যাই, মৃগাঙ্কর কোয়ার্টারে গিয়ে দেখি, যদি ফিরে আসে!

এখানে পৌঁছনোর পরের দিন সব জানা সত্ত্বেও মৃগাঙ্কর কোয়ার্টারে ঘুরে গেছেন অবিনাশ। তখনও মনে এরকমই একটা আশা ছিল, যদি ইতিমধ্যে ফিরে আসে!তালা দেওয়া ছিল দরজায়। ওর সাহেব, পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আউট হাউসে তালা লাগিয়েছে। ওই তালা কি আর খুলে দেবেন মৃগাঙ্কর জন্য! দয়া করে থাকতে দিয়েছিলেন ওকে।

সমস্তিপুরে এসে মনটা হালকা করতে চেয়েছিলেন অবিনাশ, মৃগাঙ্কর এধরনের অপ্রত্যাশিত নিরুদ্দেশ মনটাকে আরও ভারী করে দিয়েছে। নিজের পুরনো জায়গায় একজন ছাড়া তো সবাই আছে তবু কেন এত অসম্পূর্ণ লাগছে! কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মৃগাঙ্কর না থাকাটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, অবিনাশের বুক জুড়ে সে কতটা আছে। অথচ ছেলেটার ভেতর এমন কিছু নেই, যা থেকে অবিনাশ শিক্ষা নিতে পারেন। আকর্ষণীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নেই তার চরিত্রে। বুদ্ধি সাদামাটা। সে অবিনাশের বিশ্বস্ত অনুচর মাত্র। দেবপাড়া চলে যাওয়ার দরুন সেই অনুচরের এখন প্রয়োজন পড়ে না। তাহলে কেন তার অনুপস্থিতি মনটাকে বিমর্ষ

করে রেখেছে? — ভাবতে ভাবতে অবিনাশ কখন যেন লেভেল ক্রশিং পার হয়ে এসেছেন। এখনও ঠিক নেই কোথায় যাবেন। পা চলেছে বাজারের রাস্তা ধরে। মিনিট পনেরো হাঁটলে ওল্ড পোস্টাপিস রোড। ওখানেই মৃগাঙ্কর কোয়ার্টার। যদি আশ্চর্য কোনও সমাপতন হয়, গিয়ে দেখলেন, এইমাত্র মৃগাঙ্ক এসে পৌঁছেছে বাড়িতে! যমুনাও এসেছে, কোলে সেই বাচ্চা। অবিনাশকে দেখে মৃগাঙ্ক বলে উঠবে, এ কী, অবিনাশদা তুমি! আসবে বলে কোনও চিঠি দাওনি তো। যদি জানতাম তুমি আসছ, কে পালাত সমস্তিপুর ছেড়ে। তুমি থাকলে ঝামেলা ঠিক সামলে নেওয়া যেত।

ঠিক আছে, এখন তো এসে গেছি। বল তোর কী সমস্যা? নিজের জায়গা ছেড়ে এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?

আমিও বুঝতে পারছি না জান, কেন যে পুলিশ আমার পিছনে লেগেছে। একটা কারণ মনে হচ্ছে, এখন তো ব্রিটিশ-আমেরিকা আমাদের দেশে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়েছে, তারাই খুঁজে খুঁজে বার করছে কারা টমিদের ট্রেনে ইঁট ছুড়েছিল, কাদের মনে থেকে গেছে সন্ত্রাসবাদ। ওরা মনে হয় তোমাকেও...

কল্পিত সংলাপ। একপেশে হয়ে যাচ্ছে, এত ভারী ভারী কথা মৃগাঙ্ক বলবে না। অবিনাশ লক্ষ করেন, তিনি পোস্টাপিসের দিকে যাচ্ছেন না। বাজারের রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের গলি ধরেছেন। অবিনাশকে চমকে দিয়ে পিছনে সুগার মিলের ভোঁ বেজে ওঠে। সেকেন্ড শিফটের ভোঁ। মনে হচ্ছে যেন মৃগাঙ্ক আকুল হয়ে ডাকছে তার অবিনাশদাকে।

শহর ফুরিয়ে গেল। পাকা রাস্তাও চলে গেছে মুখ ঘুরিয়ে। অবিনাশ এখন মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। পায়ে চলা একটা পথের আভাস এখানেও আছে। অদুরে বুড়িগন্ডক। নদীটাকে দেখা না গেলেও বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা, আর জল-ছোঁয়া বাতাসের গন্ধ পেয়ে টের পাওয়া যায় নদীর অস্তিত্ব।

অবিনাশ এখন যেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, এটা আসলে একটা বাঁধ। মাঠ, বাঁধ প্রায় একাকার হয়ে গেলেও নদী অনেক ঢালুতে। ১৯৫৫-র মারাত্মক বন্যার পর '৫৭ নাগাদ বাঁধটা তৈরি হয়েছিল। ডানহাতি যে রেলব্রিজটা দেখা যাচ্ছে, বন্যায় ভেঙে তলিয়ে যায়। জলের তোড় উপড়ে দেয় রেললাইন। সমস্তিপুর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অন্য শহর থেকে। সেই সময় বাবার একটা কথা খুব মনে পড়ে। নাছোড় ঝড়বৃষ্টি দ্বিতীয় দিনেই করাল রূপ নিতে শুরু করল। বাবা কেমন যেন অস্থির। বাগান-উঠোন জলে থইথই। খবর আসছে নদীর জল বাড়ছে। বাবা অবিনাশকে ডেকে বললেন, চোখ-কান খোলা রাখ। ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসছে। প্রকৃতির সংহারক রূপ দেখলে টের পাবে মানুষের শক্তি কত তুচ্ছ। আত্মঅহঙ্কার ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে।

সেই বন্যায় সেটা ভালমতোই বুঝেছিলেন অবিনাশ। তারপরই নদীকে শৃঙ্খল পরানো হয়েছে। বাঁধের অনুগত হয়েছে নদী। আর সেরকম বন্যা হয়নি সমস্তিপুরে।

বাঁধের ঢালু বেয়ে জলের কাছে নেমে এসেছেন অবিনাশ। শীর্ণ নদী, চরা জেগে উঠেছে বুকে। দু-চারটে ডিঙি ভাসছে। মাছ ধরছে মনে হয়। এত শীর্ণ, তবু মৃদু তরঙ্গ আছে জলে।

সূর্যদেব হাঁটা দিয়েছেন পশ্চিমে। চিকচিক করছে নদীর উপরিভাগ। আকাশে অলস উড়ান দিচ্ছে চিল।

ফের সেই নির্জনতা। যেখানে নিজের সঙ্গে দেখা হয়। কোনও স্বজন-পরিজনের প্রতি টান জাগে না। মনে হয় কারও প্রতি আমার কোনও দায় নেই। প্রকৃতির, বিশেষ করে সমস্তিপুরের প্রকৃতির এই অনাবিল আলিঙ্গন আমার আশ্রয়।

খামোকা চোখ ভরে জল আসে। পায়ের দিকে তাকান অবিনাশ। ছোট ছোট ঢেউ ভাঙে তীরে। যেন অবিনাশের শৈশব অস্ফুটে কিছু বলতে চাইছে। এই সেই জল, যা কোথাও বয়ে যায়নি। অবিনাশের ছোটবেলা থেকে আটকে আছে এখানে। মাটিকে কিছু বলতে চায় সে।

অবিনাশের কথা ফোটার আগেই প্রথম মা মারা যান। জন্মদাত্রীর মুখ মনে পড়ে না। দ্বিতীয় মাও বেশিদিন বাঁচেননি। এক মায়ের মুখের ওপর আর এক মায়ের মুখ এসে যায়।

অনেকটা প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অবয়বের মতো। শুধুই স্নেহের পরশ লেগে আছে গায়ে।

নদীর পাড়ে বসে পড়েন অবিনাশ। দক্ষিণ দিক থেকে জোলো হাওয়া ভেসে আসে। রোদের তেজ কমে যায়। হয়তো কোনও মেঘখণ্ড আড়াল করেছে সূর্যকে। ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে অবসন্ন লাগে শরীর। পাড় শুকনোই আছে। শুয়ে পড়েন অবিনাশ।

বেশিক্ষণ শোয়া হয় না। আকাশ হয়েছে কালো। কখন হল! প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। 'বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে শোঁ-শোঁ করে বইছে বাতাস। নদীর জল ফুলছে। ওই তো দুটো ডিঙি পটাপট উলটে গেল। বুক সমান জলে দাঁড়িয়ে অবিনাশ দেখতে পান, বাবা সাঁতরে যাচ্ছেন কিষাণপুরার দিকে। অবিনাশ জানেন বাবার বুকে গামছার সঙ্গে বাঁধা আছে বাড়ির নারায়ণশিলা।

সকাল থেকেই বাড়িতে জল ঢুকেছে, অনেক কষ্টে একটা লরি জোগাড় করে অবিনাশ যখন জিনিসপত্তর, ভাইবোন, পিসিকে তুলেছেন, বাবা বললেন, আমি যাব না তোমাদের সঙ্গে। এ হচ্ছে মহাপ্রলয়। কিছুই থাকবে না পৃথিবীতে। শুধু জল আর জল। এই সময় আপনজনের কাছে বিদায় নেওয়া ভাল। বিচ্ছেদটা তেমন শোকাবহ হবে না।

ভীষণ অবাক এবং অপ্রস্তুত হয়ে অবিনাশ বলেছিলেন, এসব আপনি কী বলছেন বাবা!

এই অসময়ে আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, আমরাই বা আপনাকে ছাড়ব কেন? কোনও কথাই কানে নিলেন না। নারায়ণশিলা আলমারির মাথায় তোলাই ছিল। সেটা গামছায় মুড়ে বুকে বাঁধতে লাগলেন।

অবিনাশ আরও কিছু বলতে যাবেন, কনুই ধরে টানল দাদা। তারপর ইশারায় বলল, ছেড়ে দে, মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

অত সহজে বাবাকে ছাড়তে মন চায়নি অবিনাশের। বাগানের জল ভেঙে, রেললাইন ডিঙিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বাবা, অনুসরণ করছেন অবিনাশ। কোথায় যাচ্ছেন মানুষটা? নদীর ভয়াল রূপ দেখে হয়তো ফিরে আসবেন।

এলেন না। যেখান থেকে ডুবজল শুরু, সাঁতার দিতে লাগলেন। অবিনাশ হতাশ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন বাবার সাঁতারে যাওয়ার দিকে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। কালো আকাশ ফালাফালা করে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। একটি স্বার্থপর, পাষণ্ড বুকে ঈশ্বর বেঁধে, মা মরা সন্তানদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দূরে।

জল বুক অবধি ঠেলে উঠতেই ভয় পেয়ে যান অবিনাশ। বৃষ্টি ঝেপে এল আবার। জল ঠেলে বাড়ির উদ্দেশে এগোতে থাকেন। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখেন, ফেঁপে ওঠা কালো জলকে বাবার মতোই নিষ্ঠুর লাগে।

পালাতে পালাতে হাঁপিয়ে ওঠেন অবিনাশ। বড় বড় শ্বাস নিয়ে উঠে বসেন নদীর পাড়ে—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আধোঘুমে কী ভীষণ স্পষ্ট হয়ে ফিরে এল তাঁর অতীত। নদীই কী স্বপ্নটা দেখাল!

বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ান অবিনাশ। সূর্য ঢলে পড়েছে অনেকটা। নদীর জলে, নৌকার পালে অস্তরাগ। এই মনোরম পরিবেশে কেন ফিরে এল তিক্ত অতীত?

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন যেন আয়নার মতো নির্জন মনে হয় অবিনাশের। সারা শরীরে লেগে আছে ভুলে যেতে চাওয়া স্মৃতি। সূর্যের রক্তিম প্রতিফলনে সেইসব অতীত এখন জ্বলছে।

পারদ শরীর ফেলে তাড়াতাড়ি বাঁধের ওপর উঠে আসেন অবিনাশ। বেশ কিছুক্ষণ আগে তিনি নির্জনতা পেতে চাইছিলেন। এখন নির্জনতা তাঁকে পেতে চাইছে। এ এক অমোঘ আকর্ষণ। অবতার ছাড়া এই আকর্ষণকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে নেমে গেল। হেঁটেই ফিরলেন অধিনাশ। ডিসপেনসারির দালানে উঠে দেখলেন, চেম্বারে তিনজন রুগি। একজনের নাড়ি ধরে বসে আছে দাদা। —যাক, রুগি তাহলে হচ্ছে।

অবিনাশের পায়ের আওয়াজে দাদা ঘাড় ফেরায়, বলে, পেলি?

একটু থমকান অবিনাশ। কী পাওয়ার কথা বলছে দাদা? কে জানে, বউদি হয়তো কিছু বুঝিয়ে রেখেছে।

আন্দাজেই ঘাড় হেলান অবিনাশ। অর্থাৎ পেয়েছেন। 'পাননি' বললে হয়তো কথা বাড়ত।

ডিসপেনসারির সামনে থেকে সরে গিয়ে সদরের রকে ওঠেন অবিনাশ। দরজা ঠেলে প্যাসেজ পেরোতেই মালবিকা। ঘোমটা ভাল করে টেনে নিয়ে ফিকফিক করে হাসছে। হাসিটা যে অবিনাশকে লক্ষ করেই, বুঝতে অসুবিধে হয় না। অবিনাশ জানতে চান, কী হল, হাসছ যে বড়?

হাসতে হাসতেই মালবিকা বলে, কোথায় গিয়ে শুয়েছিলেন, সারা জামা-কাপড়ে কাদা। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ নিজের পোশাকে চোখ বোলান, সত্যিই পাঞ্জাবি-ধুতিতে ধুলো-কাদার দাগ। এই অবস্থাতে ভূতের মতো হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। রাস্তায় চেনা কেউ যদি দেখে থাকে কী ভাববে।

মালবিকা বলে, যান, গামছা পরে কাপড়-জামাগুলো কলতলায় খুলে রাখুন। আমি কেচে রাখব। আপনার লুঙ্গি, গেঞ্জি খাটের বাজুতে রাখা আছে।

বেশ লজ্জায় পড়ে গেছেন অবিনাশ। বউদি হলে এতটা অস্বস্তি হত না। যতই হোক মালবিকা ভাইবউ। ওর সামনে গুরুজন ভাবটা খানিক টাল খেল। একই সঙ্গে মনে পড়ে গেল দেবপাড়ার বাড়ি থেকে আসার সময় ইলার রিমাইন্ডার, দেখো, ওখানে গিয়ে বড়দি, মালবিকাকে বেশি অর্ডার কোরো না। যতটা পারবে নিজের কাজ নিজে করে নেবে। দোষ অবশ্য আমারই, হাতে হাতে জুগিয়ে আমিই তোমার অভ্যেস খারাপ করেছি।

দালানের তার থেকে গামছা নিয়ে কলতলায় যান অবিনাশ। ভেতরঘর থেকে রজতের মেয়ে দুটোর পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। পড়াচ্ছে রজত। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে পড়েছে। অবিনাশ যে কদিন আছেন, রোজই নাকি ফিরছে তাড়াতাড়ি, বউদি বলছিল। শুনে অবিনাশ জানতে চান, ওর কি আমাকে কিছু বলার আছে মনে হয়? হেজিটেট করছে!

না না, সেরকম কিছু নয়। তুমি আছ, তোমার একটু সঙ্গ পেতে চাইছে। বলেছিল বউদি।

কই, ও তো আমার সঙ্গে দরকার ছাড়া কথাই বলে না। শুধু কথা দিয়ে কি সঙ্গ হয়? তুমি যে বাড়িতে আছ, হাঁকডাক করছ এটাই হয়তো ওর শুনতে ভাল লাগে।

নিমেষে কথাটা অন্তর ছুঁয়ে গিয়েছিল। রজত তাঁর থেকে খুব ছোট না হলেও বরাবরই সমীহ করে চলে। দাদাকেও অতটা করে না। কারণ হয়তো অবিনাশের ব্যক্তিত্ব। কিশোর বয়সে অবিনাশের পিছু পিছু ঘুরত রজত। মেজদা যা করছে, চেষ্টা করত অনুকরণ করার। তারপর কবে থেকে যেন হঠাৎ দূরত্ব বেড়ে গেল। তবে মেজদার ছেড়ে দেওয়া শখ সে লালন করেছে সযত্নে। এক সময় বাঁশি শেখা শুরু করেছিলেন অবিনাশ। অনেকটাই শিখেছিলেন। গান শুনে বাঁশিতে তুলে নিতে পারতেন। বাঁশি শেখার মূল কারণ ছিল, গলায় সুর কম লাগত অবিনাশের। রজত কিন্তু যথেষ্ট সুরো। তবু মেজদার কাছে বাঁশি শিখতে শুরু করল। অবিনাশ এক সময় বাঁশি ছেড়ে দিলেন। রজত ছাড়ল না। আজও বাজায়, গানও গায় খুব সুন্দর। তারপর যেমন ফুটবল, অবিনাশের দেখাদেখি রজতও খেলত জান লড়িয়ে। তার শরীর পোক্ত নয়। প্রায়ই চোট পেত। সেই ফুটবল আজও সে ছাড়েনি। অফিস টিমে কোচিং করায়। শুধু একটা ব্যাপারে সে মেজদাকে অনুসরণ করল না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই তার। অজস্র ছোটখাটো গুণাবলী নিয়ে সমস্তিপুরে সে ভালই আছে। কাগজ কেটে পাখি, গাছপালা করতে পারে, বাঁশি বাজায়, গান গায়, ফুটবলে উৎসাহ দেয়, মোটামুটি আঁকতেও পারে, এইসব নিয়ে সে বেশ মেতে আছে। এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যমণি রজত। এমনটা অবিনাশও পারতেন। তা হলে কীসের টানে গেলেন বাংলায়। পিছন থেকে দৌড় শুরু করে রজত কি তাঁকে হারিয়ে দিল? আবার সেই রজতই তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে।

হাত-পা ধোয়া হয়ে গেছে অবিনাশের। কলতলায় ধুতি-পাঞ্জাবি রেখে গামছা পরে উঠে আসেন দালানে। মুখোমুখি হয় বউদির সঙ্গে। জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, গা ধুলে নাকি?

মাথা নাড়েন অবিনাশ। বউদি বলে, তা হলে কাপড়-জামা ছাড়লে যে বড়!
উত্তর না দিয়ে অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, কোথায় গিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে দাদাকে কী বলেছ?
চাপা হাসি নিয়ে বউদি বলে, কেন?
বাড়িতে পা রাখতেই জিজ্ঞেস করল, পেলি? কী পাওয়ার কথা বলছে বুঝতে পারলাম না। কথা না বাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বলে দিলাম।
বউদির হাসি উথলায়। অবিনাশ বলেন, কোথায় গেছি, কী বলেছ?
বলব না। খ্যাপা দাদাকে নিজেই সামলাও। বলে, রান্নাঘরের দিকে ঘুরে যায় বউদি। যেতে যেতে বলে, কাপড় পালটে এসো। তোমাদের মুড়ি দিচ্ছি।
বাবার ঘর থেকে পোশাক বদলে দ্বালানে এসে অবিনাশ দেখেন, দাদা চেয়ারে অন্যমনস্কভাবে বসে আছে। দালানে সব সময়ই তিন-চারটে চেয়ার পাতা থাকে। একটা নিচু টেবিল। এর পরই রান্নাঘর। গিন্নিরা রান্না করতে করতে কথা চালাতে পারে কত্তাদের সঙ্গে। এই দালানটাই পারিবারিক জমায়েত স্থল। চেয়ার টেবিল সরিয়ে দিনরাতের খাওয়া আসন পেতে এখানেই হয়। বাবার আমলের নিচু টেবিলটারও এখানে বিশেষ গুরুত্ব আছে। চিঠিপত্র এখানে এসেই জমা হয়, যে যারটা এসে নিয়ে যায়। সংসার খরচের হিসেব এই টেবিলে বসে লেখা হয়। কলকাতায় চলে যাবেন, ঠিক করেও কথাটা বাবাকে বলতে পারছিলেন না অবিনাশ। চিঠি লিখে এই টেবিলেই পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখেন।
টেবিলের ওপারে এখন বাবা বসে নেই, দাদা আছে। বাবার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যার আকাশপাতাল তফাত। অবিনাশ টেবিলের এপারে বসেন। দুজনের চেয়ারের পিঠ দেওয়ালে ঠেকানো। অবিনাশের আগমনে দাদা ঘুরে তাকায়। বলে, আছে কোথায়?
এর উত্তর অবিনাশের কাছে নেই। প্রশ্নটাই জানেন না। বউদি তাঁকে বলেনি। রান্নাঘর থেকে ভাজাভুজির গন্ধ ভেসে আসছে। দুই বউ সেখানেই ব্যস্ত। কথা ঘোরানোর জন্য অবিনাশ বলেন, এত তাড়াতাড়ি পেশেন্ট দেখা হয়ে গেল তোমার!
কটা আর পেশেন্ট, তিনটে তো মাত্র। রোগ তেমন সিরিয়াস কিছু না।
তবু ওই কটা পেশেন্টকে নিয়েই নাড়াঘাঁটা করতে হয়। যাতে বাইরের লোক ভাবে চ্যাটার্জি ডাক্তারের প্র্যাকটিস ভালই। চেম্বারে বসে ডাক্তারি এক প্রকার ব্যবসা, এটা ভুললে চলবে কেন!—কথাগুলো এমনভাবে বলছেন অবিনাশ, কে যে বয়সে বড় বোঝা যাচ্ছে না।
শুকদেব বলেন, ব্যবসাই তো করে এলাম। এক ব্যাটার রোগ সেরে গেছে, তবু আসে। ওর ধারণা সারেনি। দিলাম চার পুরিয়া ওষুধ ছাড়া সুগার অফ মিল্ক। দশ টাকা কড়কড়ে। আমার পাপের হিসেব লিখতে লিখতে চিত্রগুপ্তের হাতের হাড় সরে যাবে।
নিজেকে নিয়ে রসিকতা করছে দাদা, তার মধ্যেও বিষাদের ছোঁয়া লেগে আছে। তবু ভাল আগের অবান্তর প্রশ্নটা গেছে ঘুরে। দাদার অপরাধ বোধ হালকা করতে অবিনাশ বলেন, দেখ, তুমি যে ব্ল্যাঙ্ক ওষুধটা দিয়েছ, ওটা ঠকানো নয়। তুমি ওকে দিয়েছ আশ্বাস। তারই দাম মিটিয়েছে রুগি।
দাদা ম্লান হাসে। বলে, ওসব থাক। আমি যে কারণে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম, কোথায় দেখা হল মৃগাঙ্কর সঙ্গে?
শূন্য থেকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেন অবিনাশ। বউদি বানিয়ে দাদাকে বলেছে, মৃগাঙ্কর খোঁজে গেছেন অবিনাশ।
মাথা নেড়ে অবিনাশ বলেন, দেখা হল না।
সে কী, তুই যে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে বললি, পেয়েছিস।
দাদার সপ্রশ্ন, বিস্মিত চাউনি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন অবিনাশ। দেখেন, বউদি মুড়ির বাটি নিয়ে রজতের ঘরের দিকে যাচ্ছে। বউদির উদ্দেশে অবিনাশ বলেন, বাটিটা এখানে রেখে রজতকে ডেকে দাও।
কথামতো টেবিলে বাটি রেখে রজতকে ডাকতে যায় বউদি। দাদা বলে ওঠে, ওকে

আবার ডাকছিস কেন?

দাদার গলায় স্পষ্ট অসন্তোষ। অবিনাশ বলেন, কেন, ডাকলে কী হবে?

আজকাল বড্ড চোখ পাকায় আমাকে।

কেন, চোখ পাকায় কেন? অবাক হয়ে জানতে চান অবিনাশ।

আমার কথাবার্তা ওঁর ঠিক পছন্দ না। দিগ্‌গজ মানুষ তো!

মনে মনে হাসেন অবিনাশ। দাদা যা এলোপাতারি কথা বলে, যে-কেউ ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারে। অবিনাশও হয়তো ফেলতেন যদি সব সময়ের জন্য এখানে থাকতে হত।

রজত বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। একটু আড়ষ্ট ভাব। সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল। আরও দুবাটি মুড়ি দিয়ে গেল বউদি। মুড়ি, ছোট ছোট ডালবড়া, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, আদা দিয়ে মাখা। এখানকার মুড়ি দেবপাড়ার মতো ভাল না, পেঁয়াজ, লঙ্কা, আদার ঝাঁঝ দারুণ।

এক খাবলা মুড়ি মুখে দিয়ে কথা শুরু করল রজত, মেজদা, একটা খবর তোমাকে দেওয়া হয়নি। যে পুলিশ অফিসারের কথা তুমি বলেছিলে, যাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল ট্রেনে, একটা ছেলে ধরাও পড়েছে, বলে, আর এক খাবলা মুড়ি তোলে রজত। অবিনাশ অপেক্ষা করে আছেন পরের খবরের। রজত বলে, ছেলেটা মেজবউদির বাপের বাড়ির অঞ্চলের। তুমি ঠিক আন্দাজ করেছিলে ছেলেটা নকশাল।

খানিক চুপ করে থাকেন অবিনাশ। তারপর জানতে চান, ছেলেটার নাম জানতে পারলি? তীর্থঙ্কর। তীর্থঙ্কর রায়। মছলন্দপুরের একজ্যাক্ট কোথায় থাকে জানতে পারিনি।

শ্বশুরবাড়ি খুব একটা যাওয়া হয় না অবিনাশের। দক্ষিণ চাতরার টিনের চালের বাড়িটাই তৈরি হয়েছে তাঁর বিয়ের অনেক পর। চৌষট্টি সাল নাগাদ শ্বশুরমশাই ওপার বাংলার মায়া ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন মছলন্দপুরে। ওই বাড়িটাকে ঠিক শ্বশুরবাড়ি মনে হয় না। বরং মজফফরপুরে ইলার মামার বাড়িটাকেই শ্বশুরবাড়ি বলে মানতে ইচ্ছে হয়। যদিও সেখানেও হয় না যাওয়া।

তীর্থঙ্কর রায়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করেন অবিনাশ, সমস্তিপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পুলিশঘেরা অবস্থায় বসে ছিল। রোগাসোগা চেহারা, চোখমুখে কী ভয়ঙ্কর তেজ! ওই তেজের ওপর সপাটে চড় মারলেন সামন্ত, ঘৃণা ছেয়ে গেল ছেলেটার মুখে। পরিব্যাপ্ত ঘৃণা। নিজের ওপর, সামন্তর ওপর, দেশের মানুষের ওপর।

ছেলেটাকে আগে কখনও দেখেছেন মছলন্দপুরে? সম্ভাবনা কম।—ভাবনার মাঝে রজত বলে ওঠে, নকশালরা ঠিক কী চায় বল তো? বিহারে থেকে আর কলকাতার কাগজ পড়ে আমি ঠিক ধরতে পারি না।

একটু সময় নিয়ে অবিনাশ বলেন, সাত-আট বছর বাংলায় থেকে আমিও ওদের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না। নকশাল কোনও নেতা বা কর্মীর সঙ্গে আলাপ নেই আমার। পার্টিটাকে এমনভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছে, আমাদের মতো ছাপোষা মানুষরা নাগাল পায় না তাদের। খবরের কাগজগুলো ওদের হিংসার খবরই শুধু ছাপে, মতামত ছাপে না।

এই সময় একজন বুদ্ধদেব জন্মানোর খুব দরকার ছিল। কথাটা বললেন শুকদেব।

রজত সঙ্গে সঙ্গে দাদার দিকে ঘুরে তাকান, মেজদা সামনে থাকার দরুন চোখ পাকাননি। শুকদেব দৃষ্টি ঘুরিয়েছেন অবিনাশের দিকে।

উঠোনের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ বলে যান, একটা গ্যাপ। মস্ত একটা গ্যাপ পড়ে গেছে আমার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে। আমি ওখানকার রাজনীতি বুঝতে পারি না, আধুনিক সাহিত্য নাগালের বাইরে। নাটকও অনেক এগিয়ে গেছে। খেলাধুলোর মধ্যে চালাকি বেশি। খালি মনে হয় অনেক পিছিয়ে আছি।

অবিনাশের মুখে বিষণ্ণতা জাঁকিয়ে বসার আগেই শুকদেব বলে ওঠেন, ওটা মনে হওয়ার কারণ তুই ভুলতে পারছিস না সমস্তিপুরকে তাই। নয়তো বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কি দ্বারভাঙ্গায় থেকে সাহিত্য করছেন না? কোন অংশে পিছিয়ে আছেন তিনি? তারপর ধর সতীনাথ ভাদুড়ি, বিহার থেকেই লিখেছেন। আর আমাদের শরৎচন্দ্র...

আমার তো ওঁদের মতো প্রতিভা নেই। ওঁরা সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব। আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ।

আবহাওয়া ভারী হয়ে এসেছে। তিন ভাই মন দিয়েছে মুড়ির বাটিতে। সুধা চা নিয়ে আসেন। অবিনাশের শেষ কথাটা হয়তো শুনেছেন, টেবিলে চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বলেন, এই সাধারণ মানুষটার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে থাকি, কবে বাড়ি আসবে। একটা চিঠি পাঠালে দু-তিনবার করে পড়ি। সমস্তিপুরের কত লোক জিজ্ঞেস করে তোমার কথা।

ম্লান হেসে চায়ের কাপ তুলে নেন অবিনাশ। বউদি যা বলছে সব হয়তো সত্যি, কিন্তু কেমন যেন সান্ত্বনার মতো শুনতে লাগছে।

দাদা বলে ওঠে, যাই বলিস, তোর ধুতি পরার ধরন কিন্তু বদলে গেছে, লুটিয়ে ধুতি পরেও তোর হাঁটতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বাঙালির ধুতি পরার সঙ্গে তুলনা করছে দাদা। অবিনাশ বলেন, ওখানে লোকে প্রায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছেড়েই দিয়েছে। আমাদের ব্রাঞ্চে আমরা মাত্র তিনজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরি। আমার বয়সি কাউকে এই ড্রেসে কমই দেখা যায়। বরং প্রবাসী বাঙালিরাই ধুতিপাঞ্জাবি পরে বেশি।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর রজত বলে, মেজদা, তোমার চেহারায় কিন্তু এখন একটা বেশ বাঙালি বাঙালি ছাপ পড়ে গেছে। ধরাই যায় না....

কথা কেটে অবিনাশ বলেন, কোনওদিন বিহারি ছিলুম?

হেসে ফেলে রজত। ওর চেয়ারের পাশে মালবিকা এসে দাঁড়িয়েছে। লাজুক সম্ভ্রমে বলে ওঠে, আমাদের বউয়েদের কেউ কিন্তু বিহারি ভেবে ভুল করে না। একবার দেখেই বাঙালি বলে চিনতে পারে।

আলগোছে সুন্দরী ভ্রাতৃবধূটির দিকে তাকান অবিনাশ, হালকা চালে বললেও, মালবিকার কথার যথার্থতা আছে। বউদি, মালবিকার জন্ম থেকে বড় হওয়া সব বিহারে, তবু ওদের বাংলা উচ্চারণে হিন্দির মিশেল নেই। বরং হিন্দির ভেতর মিশে যায় বাংলা। ওদের শাড়ি পরা, রান্না সব বাংলার মতোই। মেয়েদের বেলায় কেন এমনটা হয়েছে। ওরা কীভাবে ধরে রাখতে পেরেছে বাঙালির ধারা?

সদরের প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে রজত হঠাৎ বলে ওঠে, কে?

বাকি সবাই সদরের রাস্তায় তাকায়। শশাঙ্ক হেঁটে আসছে। চেহারা সুবিধের নয়, খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ। দালানের মাঝে এসে দাঁড়ায় শশাঙ্ক। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বলে, বউদি এসেছে আমাদের বাড়িতে। কোলে একটা বাচ্চা। বলছে, দাদার মেয়ে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন অবিনাশ। বিষম আগ্রহে জানতে চান, আর মৃগাঙ্ক, ও কোথায়?

দাদা কোথায় বউদি জানে না। তুমি একবার আসবে অবিনাশদা?

॥ তেরো ॥

বুঝলি দিদি, মায়ের থেকেও তোর রান্নার হাত ভাল। বলল অপূর্ব। থালা চেটেপুটে সাফ করে এখন আঙুল চুষছে।

উলটোদিকে বসে ইলাও খাচ্ছিলেন। বললেন, বাজে কথা বলিস না। আমি শিখেইছি তো মায়ের কাছে।

থালার পাশে জলের গ্লাস তুলে অপূর্ব বলে, বড় হয়ে মায়ের কাছে আর কদিন ছিলি। মামিমার কাছেও অনেক কিছু শিখেছিস।

না। সে-বাড়িতে রান্নার ঠাকুর ছিল।

তা হলে ওই বামুন ঠাকুরের কাছেই শিখেছিস বলছিস।

অপূর্বর কথায় অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়েন ইলা। রান্নার প্রসঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। মানুষটা ভীষণ ভালবাসতেন বাড়ির মেজবউয়ের হাতে রান্না খেতে। কত্তা যেদিন অনেক প্রস্তুতি নিয়ে বাবাকে বলতে গেলেন, অফিস থেকে এবার তো বদলি করে দিচ্ছে কলকাতায়। কথার মাঝে শ্বশুরমশাই অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন মেজছেলের দিকে। প্রথম কথাটাই মুখ থেকে বেরিয়েছিল, তার মানে বউমাও যাচ্ছে তোমার সঙ্গে। এ-বাড়ির রান্নাবান্নার কী হবে?

বাবার সামনে থেকে ঘুরে এসে হাসতে হাসতে ইলাকে কথাগুলো বলেছিলেন অবিনাশ। ইলা হাসেননি। তাঁর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

বাটি-গ্লাস থালার ওপর নিয়ে উঠে গেল অপূর্ব। বড়দা ছাড়া ইলার আর তিন ভাই, এমনকী শেষ বয়সে নিজের বাবারও এই অভ্যেসটা হয়েছিল, নিজের এঁটো থালা নিজে তুলে কলতলায় রাখা। অপূর্ব আর এক কাঠি সরেস। থালাটা মেজেও রাখবে সে। এই সহবতের মধ্যে কোথায় যেন দেশ ছেড়ে আসার কুণ্ঠাও আছে।

শ্বশুরবাড়িতে এসব পাট নেই। পুরুষ মানুষরা খেয়েদেয়ে একটু প্রশংসা করলে বর্তে যায় বাড়ির মেয়েরা।

শ্বশুরমশাই যদিবা রান্নার ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করতেন, ছেলেরা মাথা নিচু করে খেয়ে উঠে যেত। খাওয়ার শেষে অবিনাশকে নিজের ঘরে গিয়ে ধরেছেন ইলা, মাছের কালিয়াটা কেমন হয়েছে বললে না তো!

ভাল। খুব ভাল। বাবা তো বললেন।

তখন তোমার সায় দিতে কী হয়েছিল?

অন্য দু বউয়ের খারাপ লাগত।

সংসারে শান্তি বজায়ের দিকে এতটাই লক্ষ ছিল মানুষটার। আর তিনি কি না চলে এলেন পৈতৃক ভিটে ছেড়ে।

মন রেখে কথা বলার স্বভাব শ্বশুরমশাইয়ের ছিল না। কোনও একটা পদ খেয়ে বলতেন, এটা নিশ্চয়ই ছোটবউ রেঁধেছে। একদম স্বাদ হয়নি। কী করে হবে, এসেছে আমাদের মতো ঘটিদের বাড়ি থেকে।

এই মন্তব্য নগদ কম-বেশি পাওয়ার জন্য নয়, কোনও ছেলের বিয়েতেই নগদ সংক্রান্ত কোনও দাবি ছিল না ওঁর। কে কী দিয়েছে, কখনও ঘুরেও দেখেননি তিনি। শুধু ছেলেদের শ্বশুরবাড়ির কাউকেই তিনি পছন্দ করতেন না। মেয়ে যখন এ-বাড়িতে বউ হয়ে এসেছে, স্নেহ, শাসনের অধিকার শুধু মাত্র তাঁর। ইলার বাবাকেও পাত্তা দিতেন না। একবার কি দুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তাতেই শ্বশুরমশাই একবার বাবাকে বলেন, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, আপনি কি এদেশের ভাষায় একদমই কথা বলতে পারেন না? আপনার বাঙাল ভাষা বেশিক্ষণ শুনলে কান-মাথা ভোঁ ভোঁ করে আমার।

বাবা ঘাবড়ে গিয়েছিল। পরে ইলাকে বলে, ওইরকম ঠোঁটকাটা শ্বশুর লইয়া ঘর করবি কী

কইরা!

ইলা শুধু হেসেছিলেন। কেননা বউভাতের দিন একটা বেশ মজা হয়েছিল। কত্তার এক পিসি কলকাতা থেকে বিয়েতে গিয়েছিলেন। নববধূর সামনেই শ্বশুরমশাইকে বলতে শুরু করলেন, আচ্ছা দাদা, তোমার আক্কেলটা কী বল দিকিনি! এপার বাংলায় মেয়ে কি কম পড়েছে, তুমি বাঙালবাড়ির মেয়ে নিয়ে এলে। এরা যা ঝগড়ুটে, বাড়িতে কাক-চিল বসবে না।

বধুর বেশে ইলা চমকে তাকিয়েছিলেন শ্বশুরের দিকে, কী উত্তর দেন উনি। ইলার পাশে আর এক নববধূ বসে আছে। বাড়ির বড়বউ। সে এপার বাংলার। এক সঙ্গেই বউভাত হয়েছিল দুজনের। ইলার বিয়েটা ভাব করে, আত্মীয়দের কানে তখনও পৌঁছয়নি। দূর সম্পর্কের বোনের কথায় মিটিমিটি হেসেছিলেন শ্বশুরমশাই। বললেন, কাক-চিল না আসুক, তোরা এলেই হল। বাঙালরা গর্ব করে, তাদের বাড়ির মেয়েরা নাকি খুব ভাল রাঁধে। তাই ওদের ঘর থেকে একটা মেয়ে নিয়ে এলুম। বুড়ো বয়সে যাতে একটু ভাল খেয়েদেয়ে মরতে পারি।

শ্বশুরমশাই শেষ বয়সে ইলার সেবাযত্ন পাননি। ইলারা চলে এসেছিলেন দেবপাড়ায়। যে ছোটবউকে তিনি কখনওই তেমন পছন্দ করতেন না, মালবিকাও অগ্রাহ্য করত বাবাকে, বলত, ভেবেছিলুম শাশুড়ি ছাড়া ঘর করতে এসে সুখে থাকব। ইনি তো তিন শাশুড়ির বাড়া।

শেষ বয়সে ছোটবউ-বড়বউ বাবাকে দেখল। একদম বিছানা নিয়েছিলেন তিনি। বড়বউ সন্তান ধারণ করতে পারেনি বলে, তার ওপরেও খুশি ছিলেন না বাবা। কিন্তু তাঁর সমস্ত আশীর্বাদ পেল ওই দুই বউ। প্রিয়পাত্রী হয়েও ইলা পড়ে রইলেন এখানে একা। স্বার্থপরের মতো।

পাতের শেষটুকু নাড়াঘাটা করতে করতে উঠে পড়লেন ইলা। খেতে আর ইচ্ছে করছে না। থালা নিয়ে চললেন রান্নাঘরে। এঁটোকাঁটা এখন রান্নাঘরে থাকবে। একটু পরে সন্ধ্যার মা আসবে মাজতে। বাংলায় আসার পর থেকেই সংসারে ঠিকে ঝির বন্দোবস্ত করেছেন অবিনাশ। ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা... সমস্তিপুরের সংসারে এত কিছু ভাবাই যেত না। একজন দাই ছিল, ঘরদোর মুছত শুধু।

এখানে এসে কত্তা যখন ঠিকে ঝির ব্যবস্থা করছেন, বারণ করেছিলেন ইলা। বলেছেন, কী দরকার। আমার তো অভ্যেস আছে।

উত্তরে অবিনাশ বলেছিলেন, অভ্যেস এবার ছাড়তে হবে। আমার ফুলের মতো বউটার গায়ে সংসারের ধুলোময়লা লাগতে দেব না এবার থেকে।

হুঁ, ফুলের মতো বউ না ঘেঁচু। এই তো আমাকে ছেড়ে দিব্যি একা একা নিজের বাড়ি ঘুরতে গেলে। কদিন কীভাবে কাটল আমার। যেন এক একটা বছর। —কথাগুলো মনে মনে হাজার মাইল দূরে থাকা কত্তাকে বললেন ইলা। সমস্তিপুর থেকে আজ তিনি ট্রেনে উঠবেন, ফিরবেন কাল। জমিয়ে ঝগড়া করতে হবে।

রান্নাঘরে নিজের থালাবাটি নামিয়ে রাখতে গিয়ে ইলা লক্ষ করেন, অপূর্ব ওর থালাবাটি মেজে তাকে তুলে রেখেছে।

অদ্ভুত ছেলে! আগে যখন এসেছে এরকমটাই করেছে। ইলা বলেছেন, তুই মাজছিস কেন! আমাদের তো কাজের লোক আছে।

সে তোদের কাজের লোক। আমার নয়। আমার জন্য সে মাইনে পায় না। বেগার খাটতে যাবে কেন?

এ ছেলেকে কী বোঝাবেন ইলা! কিন্তু কথা হচ্ছে, এই সুশিক্ষা সে পেল কোথায়? সন্ধ্যার মাকে তো প্রথমবার আপনি-আজ্ঞে করতে শুরু করেছিল। সন্ধ্যার মা ঘাবড়ে গিয়ে চাকরি ছেড়ে দেয় আর কী। — সেবারে অপূর্বকে অনেক বুঝিয়ে আপনি থেকে তুমিতে নামিয়েছেন ইলা। কিন্তু এখানে এলে নিজের কাজ নিজেই করে অপূর্ব। ও যে পার্টি করে, অবিনাশ বলেন, ওদের মত নাকি বিদেশ থেকে আমদানি।

বিদেশিরা তো ভাল স্বভাবই পাঠিয়েছে বলতে হবে। অপূর্ব যে-পার্টিটা করবে, এ দেশের সরকার তাদেরকে পছন্দ করে না। ওদের পার্টি থেকে একটা গ্রুপ আলাদা হয়ে গিয়ে নকশাল হয়েছে। যারা হাতে মাথা কাটে বড়লোকদের, পুলিশের। বোমাবাজি, খুন ওদের কাছে জলভাত। শোভাবাজারে ভাড়াবাড়িতে থাকার সময় তার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন ইলা। সন্ধের দিকে হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেত পাড়া। বোম পড়ত। বারুদের গন্ধের আগেই ভেসে বেড়াত খুন হয়ে যাওয়ার খবর। বুক ছমছম করত।

কোন দূর গাঁয়ের দাঙ্গার খবর শুনে বাবা এদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তখন তো জানত না দাঙ্গা, যুদ্ধ মানুষের পিছু ছাড়ে না। ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো

ইলার কেমন জানি আশঙ্কা হয় অপু এখানকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি তো? ওর সঙ্গে কথা বলার পর অবিনাশের এমনটাই মনে হয়েছিল। ইলাকে বলেছিলেন সেকথা, আমার আন্দাজ অপুর্ব এখন আর সিপিএম করে না। ওর কথার ধরন শুনে মনে হচ্ছে হয় নকশাল পার্টিতে ঢুকে গেছে, নয়তো ঢুকবে।

কথাটা শুনে বুকটা ধক করে উঠেছিল ইলার। তক্ষুনি অপুকে ধরার উপায় নেই। ফিরে গেছে মছলন্দপুর। পরেরবার যখন আসে, চেপে ধরেছিলেন ইলা, সত্যি করে বল, তুই নকশাল পার্টি করিস কি না?

হঠাৎ নকশাল পার্টি করতে যাব কেন! তুই তো জানিস দক্ষিণ চাতরায় বেশির ভাগ সিপিএম পার্টির লোক। খানসামা থেকে আসা গ্রামের জ্যাঠা-কাকা এখন এপারের লিডার। নকশাল পার্টি করছি জানলে ওঁরা আমাকে ছেড়ে দেবেন ভেবেছিস!

তবু অপুর কথা বিশ্বাস হয়নি ইলার। বলেছিলেন, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল, নকশাল করিস না।

গা ছুঁয়ে বলেছিল অপু। মাথাটা তখন শান্ত হয়। কিন্তু গত পরশু যে-চেহারা নিয়ে সকালবেলা এ-বাড়িতে পা রাখল অপু, পুরনো আশঙ্কাটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওকে দেখে ইলা বলে উঠেছিলেন, এ কী রে, কী চেহারা হয়েছে তোর।

ক্লান্তির হাসি হেসে ঘরে ঢুকেছিল অপু। ইলা পিছু ছাড়েননি, ভাইকে চা, জল দেওয়ার আগে নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন, কোথায় ছিল সে। কেন এমন ভূতের মতো চেহারা হয়েছে?

চেয়ারে গা এলিয়ে অপু বলেছিল, কিছু হয়নি বে বাবা। জল দে।

তুই কোথা থেকে এলি আগে বল?

কেন, বাড়ি থেকে।

মিথ্যে কথা বলিস না অপু। এত সকালে বনগাঁ লোকাল নেই।

ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেলে অপু। তারপর বলে, আচ্ছা বাবা, সত্যি কথা হল, পার্টির কাজে বর্ধমানের গ্রামে গিয়েছিলাম।

পার্টির কী কাজ?

তোকে অত সব বোঝানো আমার কম্ম নয়। জামাইবাবুর কাছে বুঝে নিস। অবিনাশদা জানে পার্টির কী কী কাজ থাকে।

তখনকার মতো ভাইকে রেহাই দিয়েছিলেন ইলা। চা-জলখাবার খেয়ে সেই যে ঘুমোতে গেল অপু, উঠল সন্ধেবেলা। দীপালি পড়াতে আসার পর।

ওর দাড়িওলা, উলোঝুলো চেহারা দেখে দীপালিও প্রথমটায় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। অপুকে আগে দেখেনি দীপালি। ইলা আলাপ করাতে গেলেন দুজনের। অপু একদম পাত্তা দিল না।

খানিক পর দাড়িটাড়ি কেটে এসে, অপুর অন্য আচরণ। জামাইবাবুর লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে এসে, দীপালির সঙ্গে বসে চুটিয়ে আড্ডা। নিজের ভাইটাকে ঠিক যেন বুঝতে পারেন না ইলা। সেটা আশ্চর্যের কিছু না, কদিন আর অপুকে কাছে পেয়েছেন। নিজের কিশোরীবেলা কাটতে না-কাটতে বাবা পাঠিয়ে দিল এদেশে। ছোটভাই স্বাধীন তো পুরোটাই অচেনা ইলার কাছে। ও এমন জুলজুল করে দেখে দিদিকে, যেন অন্যের দিদি।

তবে দীপালিকে এবার খুব চিনেছেন ইলা! এক নম্বরের পুরুষ ঘেঁষা। অপূর্বর সঙ্গে আলাপ হওয়ার দিনই বলে গেল, আপনার ভাইয়ের ব্যবহারটা খুব ভাল। দেখতেও আপনার মতো। এবার নিশ্চয়ই মছলন্দপুর ভাইয়ের সঙ্গে যাবেন। পরেরবার আমি আপনাকে নিয়ে যাব। ও-বাড়ির একজনের সঙ্গে তো আলাপ হয়েই গেল। 'যাচ্ছি তোমাকে নিয়ে। বয়ে গেছে আমার।' কথাটা মনে মনে আওড়েছিলেন ইলা। মুখে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই পরেরবার তোমাকে নিয়ে যাব।

দীপালি চলে যেতেই অপূর্বর কাছে গিয়েছিলেন ইলা। জানতে চান, মেয়েটাকে কেমন দেখলি?

আকাশ থেকে পড়ে অপু, কোন মেয়েটা?

ইলা একটুক্ষণ জরিপ করেন ভাইকে, না, অভিনয় করছে না। অন্য কোনও চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল হয়তো। ইলা বলেছিলেন, আরে বাবা, যে মেয়েটার সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করলি।

অন্যমনস্ক গলায় অপু বলেছিল, ও, দিদিমণি। ভাল, খুব ভাল।

ইলা আর কথা বাড়াননি। সরে এসেছিলেন অপুর সামনে থেকে। ছেলেটা এবার কেমন যেন থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণটা সুবিধের ঠেকছে না ইলার। কত্তা ফিরলেই ওকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

বড়ঘরের বিছানায় এসে শুয়েছেন ইলা। আজ তিনি একা। বরুণ শুয়েছে তার মামার সঙ্গে সামনের ঘরে। ওরা এখনও ঘুমোয়নি। গলা পাওয়া যাচ্ছে। বরুণ নিশ্চয়ই গল্প শোনার বায়না করেছে মামার কাছে। অপূর্ব পারেও বটে, কত গল্প যে ওর মাথায় আছে কে জানে। বরুণ-অংশুকে শুনিয়েই যায়। বাচ্চা দুটোকে খুব ভালবাসে অপু। ওদের সামনে চট করে অন্যমনস্ক হয় না। অথবা ওরা অন্য ভাবনা ভাবতেই দেয় না।

হঠাৎ একটা কথা মাথায় আসে ইলার, কত্তাকে এবার বলবেন, অপূর্বর জন্য ছোটখাটো একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে। ও এ-বাড়ি থেকেই চাকরি করতে যাবে। মছলন্দপুরে আর ফিরতে হবে না। এখানে অংশু বরুণকে পড়াবে। ছাড়িয়ে দেওয়া হবে দীপালিকে।

পার্টি-ফার্টি করতে গিয়ে কী চেহারা হয়েছে ছেলেটার! কেন পার্টি করে সে? যার নিজেরই ঠিকঠাক সংস্থান নেই, সে যাচ্ছে দেশের লোকের উপকার করতে!

পার্টি থেকে অনেক ভাল ভাল শিক্ষা পেয়েছে অপূর্ব। যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটু থিতু হোক। সেই কবে থেকে ইলাদের পরিবার এদেশ-ওদেশ, এগ্রাম-ওগ্রাম করে যাচ্ছে। এখনও গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হচ্ছে অপূর্বকে। একটা সাধারণ শান্তিকামী পরিবার আর কত ধকল নেবে!

পায়ের কাছে জানলাটা আধখোলা। চোখে আলো আসছে। ঘুমের ঝিমটিটা এসেও আসছে না। জানলাটা বন্ধ করে দেবেন কি না ভাবেন ইলা। ওটা খোলা আছে পিওনের জন্য। ওখান দিয়েই চিঠি গলিয়ে দেয় সে। আজ আর চিঠির অপেক্ষা করার মানে হয় না। উনি তো ফিরেই আসছেন কাল।

জানলা দিতে উঠতে গিয়েও শুয়ে রইলেন ইলা। অন্য কেউ তো পাঠাতে পারে চিঠি। অনেকদিন চিঠি দেয়নি মা। শীলাও চিঠি লেখে মাঝে মাঝে। মজফফরপুরের মামি আর চিঠি দেয় না। ভুলে গেছে হয়তো। মামিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ইলাই বা কটা চিঠি দেন। অথচ মামির কাছে তিনি নিয়েছেন প্রচুর।

মামারবাড়ি থেকেই বিয়েটা হয়েছিল। সিংহভাগ খরচ করেছিল মামি। বাকি বড়দা। খানসামা থেকে বাবা, মা, ভাইয়েরা এসেছিল বিয়েতে। শীলাও যায় কলকাতা থেকে। বাবা সঙ্গে সামান্য টাকা নিয়ে এসেছিল, মেয়ের বিয়েতে প্রয়োজন হবে। একটা টাকাও খরচ করতে দেয়নি মামি। টাকাগুলো শীলার বিয়েতে লাগবে বলে বড়দার কাছে রেখে গিয়েছিল বাবা। শীলা সে টাকা খরচ করার সুযোগ দিল না। এটা যেমন নিজেদের পরিবারের ক্ষেত্রে দুঃখের, একটু আলাদাভাবে ভাবলে, ব্যাপারটা ইলা-শীলার কাছে সুখেরও। বাবা যখন গলার কাঁটা ভেবে দুই মেয়েকে এদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তখন বাবার আর কোনও অধিকার নেই মেয়েদের বিয়েতে খরচ করার।

সেই জমা টাকায় মছলন্দপুরে জমি কেনা হয়েছিল। পরে বাবা ওপারের পাট চুকিয়ে এখানে বাড়ি করে। হিসেব মতো দু মেয়েরই ওই বাড়ির ওপর অধিকার বেশি। শীলা বেচারি একদিনও যায়নি মছলন্দপুরে।

ঘুমটা আসছে না। পাশ ফিরে শোন ইলা। কেন যে এত পুরনো কথা মনে আসছে এ কদিন! কত্তা নেই, একা হয়ে গেছেন। দূরে সরে যাওয়া আত্মীয়রা ভিড় করে আসছে মনে। মামির চেহারাটাই বারবার ভেসে উঠছে চোখে। অবিনাশের সঙ্গে যে একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে ইলার, অনেক আগেই টের পেয়েছিল মামি। কাউকে কিছু বলেনি, নীরব থেকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। অবিনাশকে খুব পছন্দ করত যে। কত রকম খাবারদাবার খাইয়েছে, জামা, সোয়েটার দিয়েছে সময় সময়। বড়দা একটু অবাক হত। তবে খুঁটিয়ে বিচার করতে বসার স্বভাব দাদার ছিল না। তা ছাড়া অবিনাশকে বড়দা অন্তর থেকে ভালবাসত। ঈর্ষা করার কোনও প্রশ্নই নেই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করার পর ইলা যখন হাওয়ায় ভাসছেন এবং মনে মনে তৈরি হচ্ছেন আই এ পরীক্ষাটা দেবেন, অবিনাশদাও পূর্ণ উদ্যমে লেগে পড়েছে আই এ-র বইপত্তর, নোটস জোগাড় করতে। তখনই বাবার চিঠিটা এল, খানসামা ছেড়ে বেশির ভাগ হিন্দু চলে আসছে ইন্ডিয়ায়। বাবাও ঠিক করেছেন চলে আসবেন। গোবরডাঙা বা মছলন্দপুরে জমি কেনা হবে। খানসামার অনেকেই এসে বাড়ি করেছে ওখানে।

ইলার ম্যাট্রিক পাসে খুবই খুশি হয়েছেন বাবা... এত দূর পর্যন্ত ঠিকই ছিল চিঠিটা। তারপরই বাবা লিখেছেন, ইলাকেও এবার কলকাতায় মাসির বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। বাংলায় থাকলে দুই মেয়ের পাত্র পেতে সুবিধে হবে। বাড়ি তো হয়ে যাচ্ছে এদিকে, কতদিন আর পড়ে থাকবে বিহারে। —আসলে শালাবাবুর অনুগ্রহ নিতে বাবার সম্মানে লাগছিল। একথাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছিলেন চিঠিতে। বড়দা গোটা চিঠিটাই ইলার হাতে তুলে দিয়েছিল। পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব দাদার ছিল না।

চিঠিটা পড়ে ইলার তো খুবই দিশেহারা অবস্থা। এই চিঠি নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন, কার কাছে? কাকে গিয়ে বলবেন, তিনি কিছুতেই মজফফরপুর ছেড়ে যাবেন না।

মামিকে চিঠি পড়ানো যাবে না, বাবা তাদের পর ভাবে জানলে দুঃখ পাবে। অবিনাশদাকে কিছু বলার কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ততদিন ভালবাসা আদান-প্রদান হয়েছে শুধু আভাস ইঙ্গিতে। ইলা তখনও পর্যন্ত আশঙ্কায় আছেন, আজও অবিনাশদা তাঁর ইঙ্গিত পুরোটা বোঝে কি না!

চিঠি ছাড়াই ইলা কেঁদে পড়েছিলেন মামির কাছে, আমি কিছুতেই তোমাদের ছেড়ে যাব না।

মামি শান্ত গলায় বলেছিল, আমি জানি তুই শুধু আমাদের জন্য কাঁদছিস না। আর যার জন্য কাঁদছিস, সে-ই ব্যবস্থা করে দেবে তোর বিহারে থাকার। যখন সে প্রস্তাবটা নিয়ে আসবে, দেরি করিস না হ্যাঁ করতে।

এই ছিল মামি। গুরুজনসুলভ দুরত্ব রেখেও হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যেত। চিন্তাভাবনাতেও ছিল অনেক এগিয়ে থাকা মহিলা। অভিজাত বলতে যা বোঝায় আর কি। তাই হয়তো মামির পছন্দ হয়নি ইলার শ্বশুরমশাইকে। বিয়ের পাকা কথা বলতে গিয়েছিল সমস্তিপুরে। ফিরে এসে বলল, ইলা, ও-বাড়িতে বিয়ে করছিস কর, যত তাড়াতাড়ি পারিস আলাদা হয়ে যাস।

কেন মামি? ভীষণ অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল ইলা।

মামি বলে, তোর শ্বশুরমশাই প্রাচীনকালে পড়ে আছেন। তুই কি জানিস, ধ্যান করতে করতে উনি দু হাত শূন্যে উঠে পড়েন। প্ল্যানচেট করে আত্মা ধরে আনেন মর্জিমতো।

ধ্যাত, এসব কে বলল তোমাকে? অবিনাশদা তো কোনওদিন এসব কথা বলেনি।

মামি ঠাট্টা করছে ভেবে কথাটা উড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন ইলা, দেখা গেল তা নয়। পরের কথা গম্ভীরভাবে শুরু করল মামি। বলল, অবিনাশদের বাড়ি ঢোকার আগে এক

আত্মীয়র বাড়ি গিয়েছিলাম আমরা। খোঁজখবর নিচ্ছিলাম তোর শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেমন, তাদের খাওয়া-দাওয়া, রীতি-রেওয়াজ... বলে, থেমেছিল মামি।

সামান্য সংশয় নিয়ে ইলা জানতে চান, কী বলল তারা?

চিন্তান্বিত মুখ আর ছোট্ট শ্বাস ফেলে মামি বলে, তারা তো ওদের বাড়ির সবার খুব প্রশংসা করল। ওখানকার বাঙালিরা বেশ মর্যাদা দেয় ওদের ফ্যামিলিকে। বিশেষ করে তোর শ্বশুরমশাইকে তো দেবতাজ্ঞানে মান্য করে। ওরকম নির্লোভ উকিল দেখা যায় না। সারাদিন অধ্যাত্মবাদ, ঠাকুরদেবতা নিয়ে আছেন। প্ল্যানচেটে বসেন প্রায়ই। ওঁদের একটা থিওসফিক্যাল ক্লাব আছে।

সেটা আবার কী? ভীষণ বিস্ময়ে জানতে চেয়েছিলেন ইলা। মামি বলেছিল, তুই সেসব বুঝবি না। সোজা কথা জেনে রাখ, ওটা হচ্ছে ভূতেদের নিয়ে আড্ডা মারার ক্লাব। কথাটা শুনে সত্যিই ভয় পেরেছিলেন ইলা। ভয়ের ছাপ মুখে এতটাই প্রকট হয়েছিল, মামি সান্ত্বনার সুরে বলে, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, ওঁরা ভাল ভাল আত্মাদের নিয়ে আসেন। যেমন, ওঁদের কারও মৃত স্ত্রী, পরলোকগত পিতা, মাতা, ঘনিষ্ঠ স্বজন-পরিজন। এমনকী বড় বড় মনীষীদের প্ল্যানচেটে নিয়ে আসা ওঁদের কাছে জলভাত। সান্ত্বনায় কোনও কাজ হল না। ইলার প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। মামি বলে, ব্যাপারটা পুরোটাই বুজরুকি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শিক্ষিত কিছু বাঙালি এই ভূতচর্চায় বিশ্বাস করে। কলকাতাতেও এরকম ক্লাব আছে।

কিন্তু মামি, আমাকে তো অবিনাশদা এসব কিছু বলেনি। বলেছিলেন ইলা। উত্তরে মামি বলেছে, হয়তো সংকোচ হয়েছে। ওকে দেখে যতটুকু বুঝেছি, নিশ্চয়ই এসবে বিশ্বাস করে না।

তা ওদের বাড়িতে গিয়ে তুমি কী বুঝলে?

বাড়িতে গিয়ে কী আর বুঝব! তোর শ্বশুরমশাই ভীষণ রাশভারী। মেয়েদের দিকে সরাসরি তাকান না। জবাব দিচ্ছিলেন কেটে কেটে। ওদের বাড়িতে মেয়েমানুষ বলতে একমাত্র অবিনাশের বিধবা পিসি। মিনমিন করে কথা বলে, বোঝা যায় ওঁর মতামত শোনাই হয় না ও-বাড়িতে। আরও দু-একজন মহিলা দেখলাম, তারা পাশের বাড়ির। অধৈর্য স্বরে ইলা জানতে চেয়েছিলেন, তুমি একবার ভূতের ক্লাবের ব্যাপারটা জানতে চাইবে তো ওঁর কাছে।

চেয়েছিলাম, অনেক ঘুরিয়ে। বলেছিলাম এখানকার বাঙালিরা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে। আপনার অনেক গুণের কথা বলছিল তারা। -শুনে তোর হবু শ্বশুর, বলল কী জানিস। 'আমি ধ্যান করতে করতে দু হাত শূন্যে উঠে যাই, সেটা বলেছে?” পুরো হাঁ হয়ে গেছি আমি। ওনার আত্মীয়রা সেটাও বলেছিল, তখন পাত্তা দিইনি। —শেষমেশ মরিয়া হয়ে তোর শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, আপনার সম্বন্ধে লোকে যা বলছে, সব কি সত্যি? উত্তরে তোর শ্বশুরমশাই সেই প্রথম আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ছেলের বিয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। ওই প্রসঙ্গটা বাদ রেখে কথা বলুন।

কথা শেষ করে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল মামি। হয়তো ইলার ভবিষ্যৎ কল্পনায় দেখার চেষ্টা করছিল। খানিক পরে বলে, মানুষটার ছোটখাটো চেহারা হলে কী হবে, প্রবল ব্যক্তিত্ব। লম্বা ঘাড় অবধি চুল, কপালে লম্বা করে লাগানো চন্দনের টিকা। ধুতিটা লুঙ্গির মতো করে পরা আর সাদা ফতুয়া। দেখলেই কেমন জানি অস্বস্তি হয়। এই ধরনের গৃহকর্তার তত্ত্বাবধানে সংসার স্বাভাবিক ছন্দের হয় না। তুই বিয়ের কিছুদিন পরই অবিনাশকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাস।

সব শুনে ইলার বুক তখন ছমছম করছে। একই সঙ্গে আফসোস হচ্ছে, শ্বশুরঘর করতে পারবেন না বলে। একে তো শাশুড়ি নেই, ভেবেছিলেন শ্বশুরকে সেবাযত্ন করে নাম কিনবেন। অনেকদিন পর ফিরে পাবেন পিতৃস্নেহ।... মন ভেঙে গিয়েছিল ইলার। বিয়ের আগে অবিনাশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যা-কিছু শুনেছেন, কতটা সত্যি?

পাত্তা দেননি অবিনাশ। বলেছেন, বাবার নিজস্ব কিছু বিশ্বাস এবং অভ্যেস আছে। উনি সেসব সংসারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না। বরং নিজেকে নিয়ে সংসার থেকে একটু দূরে

থাকেন।
সংশয় কাটছিল না ইলার। বড়দার সঙ্গে আলোচনা করেন। দাদা এমন ফাজিল, বলে কি না, তোর শ্বশুরকে বলবি প্ল্যানচেট করে দু-একটা ভূতকে যেন বাড়িতে আটকে রাখে। ভূতগুলো তোদের ফাইফরমাশ খাটবে, মাইনে দিতে হবে না।
মনশ্চক্ষে ইলা দেখেছিলেন, বধূবেশে ভূত ভরা বাড়িতে পা রাখছেন। কোনও এক পেতনি বধূ বরণ করছে, কেউ বাজাচ্ছে শাঁখ, উলু... শিউরে উঠেছিলেন ইলা।
বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম হল। বাইরে থেকে শ্বশুরমশাইকে যতই গভীর মনে হোক, খেতে বসে দুই বউমার সঙ্গে অনেক গল্প করতেন। তুলনায় ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতেন কম। সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর লক্ষ ছিল। দুই বউকে কাজ ভাগ করে দিয়েছিলেন, বড়দি ঠাকুরঘর আর বাগান, ইলার জিম্মায় অন্য সব ঘর, সংসার খরচ। রান্না দুজনেই করতেন। আর পাঁচটা স্বাভাবিক পরিবারের মতোই চলত ইলাদের সংসার। মামির কথা মেলেনি।
হ্যাঁ, সত্যিই শ্বশুরমশাইয়ের একটু বেশিই ঈশ্বরভক্তি ছিল। সে ব্যাপারে তিনি ছেলের বউদের উত্যক্ত করেননি। বরং বড়বউকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, বউমা, আমার পুতুল খেলার ফুল জোগাড় হয়েছে? অথবা আমি এখন খেলাঘরে ঢুকছি। কেউ দেখা করতে এলে ডেকো না, বসিয়ে রেখো।
শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে আসতেন সমস্তিপুরের বিশিষ্ট কিছু মানুষ। তাঁদের কেউ ডাক্তার, ব্যারিস্টার, পণ্ডিতমশাই। ওঁরা সবাই আধ্যাত্মিক ক্লাবের সদস্য। ওঁদের মধ্যে আলোচনা হত ঠান্ডা অনুত্তেজিত গলায়। তর্ক-ঝগড়া প্রায় হতই না। প্ল্যানচেটে বসতেন মাসে একবার কি দুবার। দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে যেত, ভেতরে কী হচ্ছে, ইলারা জানতেই পারতেন না। কখনও-সখনও প্ল্যানচেটের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে যেত। মিনিট পাঁচ-দশের মধ্যেই খুলে যেত দরজা। ব্যাপারটা জানার জন্য বিষম কৌতূহল হত ইলার। একদিন খেতে দিয়ে শ্বশুরমশাইকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, আজ আপনাদের প্ল্যানচেট এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কেন?
যাঁকে ডেকেছিলাম, তিনি ঢোকার বদলে অন্য একটা দুষ্ট আত্মা ঢুকে আসছিল বারবার। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। বলেই সতর্ক হয়েছিলেন শ্বশুরমশাই, বউমা, তোমাদের এসব ব্যাপারে কৌতূহল থাকা ঠিক না। সংসারধর্ম করছ, এই নিয়েই থাক। ওই সবে মন দিলে সংসারের প্রতি মমতা কমে যাবে... আরও অনেক কিছু বলেছিলেন শ্বশুরমশাই। ইলার সেদিকে মন নেই। মাথায় ঘুরছে, সেই দুষ্ট আত্মাটা নির্ঘাত অন্ধকার বাগানে আমলকি গাছের টঙে বসে পা দোলাচ্ছে। সামনের পূর্ণিমা পর্যন্ত ওই মগডালে বসে থাকবে সে। শ্বশুরমশাইরা প্ল্যানচেটে বসলেই সুড়ৎ করে ঢুকে পড়বে মিডিয়ামের ভেতর। তারপর শুরু করবে নানান ফাজলামি।
এইসব ভাবনায় ধীরে ধীরে ভূতেদের নিয়ে ভয়টা কেটে গিয়েছিল ইলার। বড়দি আর তিনি ভূতপ্রেত নিয়ে নানান গল্প ফাঁদতেন। চা করে কোনও একটা বানানো নাম ধরে ডাকত বড়দি, যা তো অমুক, তোর কত্তাবাবুকে চা-টা দিয়ে আয়। তারপর নিজেই ভূতের মতো ডিঙি মেরে চায়ের কাপ-ডিশ নিয়ে যেত শ্বশুরমশাইয়ের ঘরের দিকে। হেসে খুন হতেন ইলা। ভূত তখন তাঁদের কাছে ঠাটার বস্তু।
শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে যখন সম্পর্কটা একদম সহজ হয়ে গেছে, ইলা কথায় কথায় জানতে চেয়েছিলেন, বাবা, আপনি কি ধ্যান করতে করতে দু হাত ওপরে উঠে যান? শ্বশুরমশাই হেসে ফেলে বলেছিলেন, কে যে কথাটা রটিয়েছে কে জানে! আমি নিজে কোনওদিন কিছু বুঝিনি। ধ্যানের সময় চোখ বন্ধ থাকে তো।
পুজোর সময় তা হলে কেন আপনি দরজা-জানলা বন্ধ রাখেন? আর একটু সাহসী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইলা। উত্তরে শ্বশুরমশাই বলেন, ওতে মনঃসংযোগে সুবিধে হয়।
ঠাকুর-দেবতা নিয়ে বাড়ির মেয়েরা বেশি মাতামাতি করুক, শ্বশুরমশাই চাইতেন না।

ছেলেদেরও অধ্যাত্মবাদে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননি। ওটা ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জগৎ। শুধু একটাই অতিপ্রাকৃত কথা ইলাকে মাঝে মাঝে বলতেন, নিজেকে শুদ্ধ রাখো, শুদ্ধ থেকো। তুমিই তাঁর আধার।

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতেন না ইলা। আজও বোঝেন না। কত্তাকে জিজ্ঞেস করলে হেসে এড়িয়ে গেছেন। বলেছেন, ইচ্ছেমতো একটা মানে করে নাও, অধ্যাত্মবাদের বেশির ভাগ কথাই অস্পষ্ট।

ইলারা সমস্তিপুর ছেড়ে আসার সময় খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন বাবা। অংশু তখন ছোট। বরুণ দেড়, দু বছরের। সারাক্ষণ ছোট নাতিকে বুকে নিয়ে ঘুরতেন বাবা। বুকটা ভীষণ খালি হয়ে গিয়েছিল। তাই তো মাস ছয়েকের মধ্যেই উনি চলে এলেন দেবপাড়ায়। কিছুদিন থাকবেন মেজছেলের কাছে। ওই কিছুদিনটাকে অনির্দিষ্ট করার জন্য ইলা খুব সেবাযত্ন শুরু করলেন শ্বশুরমশাইকে। সেই সময় অবিনাশের মেজাজও বেশ খুশি খুশি থাকত। গাছতলা ছেড়ে চলে এলে কী হবে, গাছ নিজেই চলে এসেছে ছায়া দিতে।

কাকভোরে উঠে পড়তেন বাবা। প্রথমেই চলে যেতেন গঙ্গাস্নানে। সমস্তিপুরের মতন এ-বাড়িতে বাগান নেই বলে বাড়ি বাড়ি ফুল তুলতে বেরোতেন। ফুল তোলা না বলে, চুরি করা বলাই বোধহয় ভাল।

শ্বশুরমশাই থাকাকালীন এক সকালে পাড়ার নারায়ণ মাস্টারমশাই এলেন কত্তার কাছে। একটু চটে আছেন, সৌজন্য দিয়ে ঢাকা দিতে চাইছেন সেটা। বললেন, অবিনাশবাবু, আপনি তো জানেন আমার বাগান করার শখ। কিছুদিন যাবৎ ঘুম থেকে উঠে দেখছি, সব ফুল চুরি হয়ে গেছে। আজ তাই ভোর থেকে জেগে বসেছিলাম। দেখলাম, আপনার বাবা সমস্ত ফুল তুলে নিচ্ছেন। মানা করতে পারলাম না। নিষ্ঠাবান পূজারীর মতো দেখতে, বয়স্ক মানুষ, সব থেকে বড় কথা উনি আপনার বাবা। ভাবলাম, আপনাকে বলাই ভাল। দয়া করে ওঁকে বারণ করবেন ফুল তুলতে, আমি না হয় রোজ কিছু ফুল দিয়ে যাব বাড়িতে।

শ্বশুরমশাইকে বলা হল সে কথা। উনি বললেন, ওকে ফুল দিয়ে যেতে বারণ কোরো। সব ফুল দিয়ে নিজের পুজো করুক।

চেহারার কারণেই হোক বা অন্য কিছু, ভক্তিবাদের দু-চার কথা বিলিয়ে শ্বশুরমশাইয়ের কিছু অনুগামী তৈরি হয়ে গেল এই অঞ্চলে। সন্ধেবেলা রাসতলার ঘাটে বসে তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। কীর্তন হত। শ্বশুরমশাই মূল গায়ক। সমস্তিপুরের বাড়িতে কদাচিৎ গাইতেন উনি। সত্যব্রতবাবু বলে ওখানে একজন ছিলেন। খোল বাজিয়ে একাই গেয়ে মাতিয়ে দিতেন। দিব্যি দেবপাড়ায় দিন কেটে যাচ্ছিল শ্বশুরমশাইয়ের। ইলা যখন ধরেই নিয়েছেন, শ্বশুরমশাই শেষ বয়সটা থেকে যাবেন এখানে। হঠাৎ ওঁর মধ্যে অস্থিরতা শুরু হল, চলে যাব, ফিরে যাব করতে লাগলেন।

ইলা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে বাবা?

না, অসুবিধে কিছু নেই। অনেকদিন তো প্রবাসে থাকা হল। এবার বাড়ি ফেরা যাক।

এই বাড়িটাও তো আপনার। বলেছিলেন ইলা।

শ্বশুরমশাই বলেন, হ্যাঁ, বাড়িটা আমার ঠিকই। কিন্তু এখানকার গাছপালা, নদী, প্রকৃতি, মানুষ আমার মনের মতো নয়।

কেন নয়, তফাত কোথায়? জানার ইচ্ছে থাকলেও চুপ করে ছিলেন ইলা। একটু সময় নিয়ে শ্বশুরমশাই বলেন, এখানকার সব কিছুর মধ্যে কেমন যেন তাড়াহুড়ো। নদীর মধ্যেও।

নদীর মধ্যে তাড়াহুড়ো। বিস্ময়ে কথাটা রিপিট করে ফেলেছিলেন ইলা।

উনি বলেন, হ্যাঁ, সমস্তিপুরের বুড়িগণ্ডককে দেখেছ, কী বিস্তার! কত বিভঙ্গ! বিভিন্ন ঋতুতে নদীর রূপ কেমন পালটে যায়। আর তোমাদের গঙ্গা যেন বড়সড় নালা। হুড়হুড় করে বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। কাছাকাছি এসে পড়েছে অনন্ত জল। অধৈর্য হয়ে পড়েছে নদী। তার চলনের ছাপ পড়েছে মানুষের মনে, ভূপ্রকৃতিতে।

যুক্তি শুনে পুরোপুরি থ হয়ে গিয়েছিলেন ইলা। একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল,

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এই গঙ্গার ধারটাকেই পছন্দ করেছিলেন। এখানেই দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ... বলা হয়নি, যদি পালটা কোনও অদ্ভুত যুক্তি শুনতে হয়।

উনি ফিরে গেলেন। অংশু, বরুণের প্রতি মায়া, ইলার হাতের রান্না, সেবাযত্ন কিছুই ওঁকে বেঁধে রাখতে পারল না। অবিনাশ বেশ কিছুদিন মনমরা হয়ে রইলেন।

পাতলা সরের মতন ঘুমটা লেগে আছে শরীরে, তাই এত কিছু স্পষ্ট মনে করতে পারছেন ইলা। এই অবস্থায় স্মৃতি হয়ে ওঠে জাগরূক, বর্তমান আবছা। ক্রমে ঘুমের চাদরটা সরে যাচ্ছে শরীর থেকে। সামনের ঘরে কোনও শব্দ নেই। অপু, বরুণ ঘুমিয়েছে হয়তো। আবার পাশ ফিরতে যাবেন ইলা, হঠাৎ মনে হয় দুটো কালো বিড়াল পর পর জানলা গলে মেঝেতে নামল।

চমকে উঠে বসেন ইলা। ভ্রম কাটে। পিওন এসেছে।

ডাকছে, টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম।

ওই শব্দ দুটোই কালো বিড়ালের মতো আছড়ে পড়ল অবচেতনে। ভয়ে কাঁটা হয়ে ইলা পিওনকে সাড়া দিতে পারছেন না। এ-বাড়িতে সম্ভবত একবারই টেলিগ্রাম এসেছিল, শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর খবর নিয়ে। এবার কোন অশুভ সংবাদ?

পিওন আরও দুবার ‘টেলিগ্রাম' বলতেই ইলা ‘অপূর্ব' বলে চিৎকার করে ওঠেন। অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনায়।

এক ডাকেই সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে অপূর্ব। বলে, কী রে দিদি? ইলা আঙুল তুলে জানলা দেখায়। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে, সই করে টেলিগ্রাম নেয় অপূর্ব। পড়ে। শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছেন ইলা। অপূর্ব বলে, জামাইবাবুর ফিরতে আরও পাঁচদিন দেরি হবে। জরুরি কাজে আটকে গেছেন।

চেপে রাখা শ্বাসটা ফেলে ধাতস্থ হন ইলা। তারপর বলেন, জরুরি কাজটা কী? কাগজটা এগিয়ে দিয়ে অপূর্ব বলে, টেলিগ্রামে অত কিছু লেখা যায় না। দেখ, হয়তো পরশু, কি তারপরের দিন কোনও চিঠি আসবে।

টেলিগ্রামটা পড়েন ইলা, হেল্ডআপ ফর আরজেন্ট ওয়ার্ক। উইল বি লেট বাই ফাইভ ডেজ, আমি। ‘আমি' অক্ষরটাই হাজার মাইলের দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়। কাগজটা হাতে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে আসেন ইলা। অপু ফের সামনের ঘরে যাচ্ছিল, ইলা ডেকে বলেন, চা খাবি?

তুই খেলে খাব। বলে অপু।

রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ইলা আরও একবার টেলিগ্রামে চোখ বোলান। 'আমি' অক্ষরটা দেখে ফিক করে হেসে ফেলেন। মনে মনে বলেন, তোমার আর এক আমি হয়তো পেটে এসে বসে আছেন। খবরটা তো জানই না। দেবো নাকি টেলিগ্রাম করে। হুটতেপুটতে চলে আসবে।

জামাইবাবু আরও পাঁচদিন পরে আসছেন জেনে বেশ নিশ্চিন্ত হয় অপূর্ব। গা ঢাকা দেওয়ার মেয়াদ বাড়ল। তার মানে এই নয় যে, জামাইবাবু এসেই অপূর্বকে হুড়কো মারত। বরং নিজের সেজশালাটিকে বেশ স্নেহ করেন অবিনাশদা। তবু মানুষটার সামনে বেশিক্ষণ বসে থাকা একটু ঝুঁকির মনে হয়। অবিনাশদার অদ্ভুত এক ধরনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আছে। চশমার আড়ালে সেটা আরও ধারালো হয়।

মার্কসবাদে বিশ্বাস না থাকলেও সে-বিষয়ে অবিনাশদার ধারণা মোটামুটি স্বচ্ছ। অপূর্বর তাই ভয় হয়, এই বুঝি অবিনাশদা তার চরম অবস্থান ধরে ফেলবেন। যেমন একদিন কথা প্রসঙ্গে অপূর্ব বলে ফেলেছিল, রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকে যায় অবিনাশদার। বলে, তুমি ‘রথের রশি' নাটকটা পড়েছ?

মাথা নেড়েছিল অপূর্ব। অবিনাশদা বলে, কোনও মনস্বীর সম্বন্ধে কমেন্ট করার আগে, তাঁকে ভাল করে জান। নেতাদের শেখানো বুলি মুখস্থ বোলো না। বিপ্লব বলতে যদি সশস্ত্র

বিপ্লবকে ধরে নিই, তা হলেও বলব, রবীন্দ্রচিন্তায় সেই বিপ্লব সম্পর্কে দ্বন্দ্ব ছিল, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনওটাতে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। একথা তো তোমাদের কমিউনিস্ট নেতারাও আজকাল স্বীকার করছে। তুমি যেন একটু অন্য সুরে গাইছ!

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয় অপূর্ব। বলে, আমি কিন্তু 'রক্তকরবী' পড়েছি। সেখানে কি সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনকে অন্তঃসারশূন্য বলে প্রমাণিত করা হয়নি?

ওই যে বললাম দ্বিধা, সংশয়। একদিকে বিশ্ব পরিস্থিতি বলছে সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ, রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করতে পারছেন না মানবতাকে। তার মানে এই নয় যে উনি বিপ্লবকে অস্বীকার করছেন। হৃদয়বান, চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই এই সংশয়ে ভুগবে।

অপূর্বর বলতে ইচ্ছে করেছিল, তা হলে আপনি মানছেন রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন মানুষের মতন একজন। তবু তাঁকে নিয়ে এই ব্যক্তিপুজো কেন? —বলেনি অপূর্ব, পাছে ধরা পড়ে যায় সে এখন সংশোধনবাদীদের দলে নেই।

অবিনাশদা যদি বুঝতে পারে অপূর্ব নকশাল হয়ে গেছে, এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। একটা মোটামুটি নিরাপদ ডেরা নষ্ট হয়ে যাবে।

বিছানায় ফিরে এসেছে অপূর্ব। এখন আর ঘুম আসবে না। সব স্নায়ু সজাগ হয়ে গেছে। এ-বাড়ির সমস্ত শব্দের সঙ্গে পরিচিত সে। কোনও একটা আওয়াজের সূত্র ধরে ঢুকে আসতে পারে পুলিশ অথবা বিরোধী দলগুলোর কর্মী। দুই পক্ষ এক সঙ্গে ও আসতে পারে। এখন পশ্চিমবঙ্গে সবাই এক হয়ে গেছে। অপূর্বরা আলাদা। তার ওপর আবার ছত্রভঙ্গ। এই যে একটা অপারেশন করতে গিয়ে ছিটকে গেল, আবার তার স্কোয়াডের সঙ্গে কবে মিলিত হবে, নিজেও জানে না। বিমলদা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এ-ব্যাপারে এখন নিঃসন্দেহ অপূর্ব। তীর্থঙ্কর ধরা পড়ে গেল বিমলদার জন্যই। অপূর্বও পড়ত। বিমলদা ঠিক কাদের হয়ে কাজ করছে বোঝা যাচ্ছে না। সরাসরি পুলিশ, নাকি বিরোধী পার্টি ভায়া পুলিশ। অপূর্বর ধরা না পড়াটা বিমলদার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নিজেদের স্কোয়াডে ফিরে গিয়ে অপূর্ব যখন তাদের অসফলতা এবং অপারেশনে যাওয়ার আগে বিমলদার পরামর্শ বলবে সবিস্তারে, কারও বুঝতে বাকি থাকবে না, কে করেছে বিশ্বাসভঙ্গ। অর্থাৎ যা দাঁড়াল, বিমলদা চাইবেন না অপূর্ব ফিরে আসুক।

অপূর্ব এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক মানুষ। এই ভাবনাটা কদিন ধরেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সজাগ হয়ে থাকছে স্নায়ু। একমাত্র ঘুম এলেই এর থেকে নিবৃত্তি। ঘুমটাও ভাল হচ্ছে না, কেমন যেন ছেঁড়া ছেঁড়া। তার মধ্যেই অজস্র স্বপ্ন দেখছে অপূর্ব। সবই ছোটবেলার স্বপ্ন। খানসামা গ্রামটা বারবার উঠে আসছে মনে। উঁচু ভিটের ওপর তাদের ইটের দেওয়াল, টিনের চালের বাড়ি। হেঁশেলঘর আলাদা। ছিটেবেড়ার। উঠোনে বিশাল তেঁতুলগাছ। ভিটে লাগোয়া বিশাল পুকুর।

কাল্টু নামে একটা ছোট্ট কুকুর ছিল অপূর্বদের। বাড়ির আর সবাইয়ের পায়ে পায়ে ঘুরলেও, অপূর্বকে দেখলেই কাল্টু দে দৌড়। কারণ অপূর্বর প্রিয় খেলা ছিল কুকুরটাকে ধরে পুকুরে ছুড়ে দেওয়া। নাকটাকে জাগিয়ে রেখে আপ্রাণ সাঁতার কাটত কাল্টু। পাড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিত অপূর্ব। এর জন্য বাবার কাছে দু-একবার কানমলা খেয়েছে। এই দৃশ্যটাই স্বপ্নে ঘুরে যাচ্ছে। নাক উঁচু করে খানসামার পুকুরে আপ্রাণ সাঁতার কাটছে অপূর্ব, পাড়ে দাঁড়িয়ে একজন লোক হাততালি দিচ্ছে, স্বপ্নে লোকটাকে চিনতে পারছে না অপূর্ব।—এরকম নানান উলটোপালটা স্বপ্ন ঘুমকে ছিঁড়ে দিচ্ছে, অস্বস্তিতে রেখেছে সারাক্ষণ।

পাশ ফিরতে গিয়ে বরুণের গায়ে চাপ পড়ে যায়। সরে শোয় অপূর্ব। বরুণটা অকাতরে ঘুমচ্ছে। একটু আগেই জেগে ছিল। বড় বড় চোখ করে মামার কাছে শুনছিল গল্প। ভারী সুন্দর বরুণের চোখ দুটো। বন্ধ করে রাখলেও ভাল লাগে, খুলে রাখলেও। এই ছেলেটা যখন বড় হবে, মনে রাখতে পারবে তার সেজমামাকে? — কথাটা ভেবে হোঁচট খায় অপূর্ব। সে কি ভেতর থেকে টের পাচ্ছে তার আয়ু সংক্ষিপ্ত? এসব ভাববাদী চিন্তাকে সে এতদিন ঘৃণা করেছে, তা হলে কি হেরে যাচ্ছে মনে মনে? ভাবনাটাকে অন্য খাতে বয়ানোর জন্য

অপূর্ব ঠায় তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত বরুণের দিকে, ওর ভবিষ্যৎ পৃথিবী কেমন হবে কে জানে! জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে করতে একবারও কি মনে পড়বে না সেজমামার কথা! অপূর্বরা একটু অন্য রকমভাবে চেষ্টা করেছিল, তা নিশ্চয়ই জানবে। এই মুহূর্তে দুটো লাইন মনে পড়ে অপূর্বর। কে বলেছিল, এখন ঠিক খেয়াল নেই, দ্য বার্ড ইজ নট বর্ন ফর ডেথ। দ্য ভয়েস অফ দ্য বার্ড ইজ ইমমর্টাল।—এখানে পাখির সুরটাই হচ্ছে বিপ্লবের বাণী। যা অমর।

দু হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে এসেছে দিদি। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিচ্ছে। একটু পরে বলে, আবার ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

বিছানায় উঠে বসতে বসতে অপূর্ব বলে, না। দে, চা-টা দে।

ভাইয়ের হাতে কাপ দিয়ে খাটের সামনের চেয়ারে বসেন ইলা। নিজের চায়ে চুমুক মেরে বলেন, কী এমন জরুরি কাজ থাকতে পারে বল তো?

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট হাসি লিক করে যাচ্ছিল অপূর্বর, সত্যি, দিদিটা না জামাইবাবু ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে। হাসি চেপে অপূর্ব বলে, কতদিন পর নিজের বাড়ি গেছেন, কত কাজই তো থাকতে পারে।

অপূর্বর দিকে না তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় ইলা বলেন, আমার মনে হচ্ছে বড় ভাশুরের শরীরটরির খারাপ হয়েছে, ফেলে আসতে পারছে না। চিন্তা হচ্ছে শরীর কতটা খারাপ? আবার একটা টেলিগ্রাম আসবে না তো, যাতে লেখা থাকবে আরও পাঁচদিন পরে আসছি।

তুই না দিদি ভাবতে পারিস বটে! বললাম তো তখন, পরশু, তরশু একটা চিঠি আসতে পারে অবিনাশদার, তখনই জানতে পারবি আসল কারণটা। এখন মিছিমিছি চিন্তা করে লাভ আছে!

অপূর্বর কথায় কাজ হল না, ইলার মুখ আগের মতোই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিমর্ষ। দিদিকে একটু অন্যভাবে ধাক্কা দিয়ে স্টেডি করার চেষ্টা করে অপূর্ব, আচ্ছা দিদি, তুই যে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে এত ভাবিস, বাপেরবাড়ি নিয়ে চিন্তা করিস?

মিচকি হাসি ফুটে ওঠে ইলার মুখে। বলে, কেন চিন্তা করব? আমাকে তো বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য বাড়ি। চিন্তা তোদের, তোরা ও-বাড়ির ছেলে। একথাটাই শুনতে চাইছিল অপূর্ব। উত্তর তার রেডি করাই আছে। বলে, বিয়ে তোকে জোর করে দেওয়া হয়নি। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিস।

ভারী অপ্রস্তুত হন ইলা। হেসে ফেলেও কপট শাসনে বলেন, এই অপু, তুই আমার থেকে অনেক ছোট, এসব নিয়ে ইয়ার্কি মারবি না।

অপূর্ব নিশ্চিন্ত হয়, আপাতত দিদিকে ধাতস্থ করা গেছে। এক মনে চা খেয়ে যায় অপূর্ব।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেন জানি শীলার কথা মনে পড়ে, ও বেচারা ভাই-বোনের এই মিষ্টি সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যখনই গোপনে শীলার বাড়ি যান ইলা, বোনটা সবার আগে ভাই, দাদা, মায়ের খবর নেয়। ভাইয়েরা কতটা বড় হয়েছে, কে কী করে। ছোট ভাই সিধুকে তো দেখেইনি শীলা। সিধুও কি জানে তার আর একটা দিদি আছে? ইলা বলেননি, পাছে সিধু আরও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে বসে।

বরুণটা ঘুমচোখে এপাশ ওপাশ ফিরছে। ওর গায়ে ঘুমের টোকা মারতে মারতে ইলা অপূর্বকে বলেন, তুই পার্টি করিস। উদার মনের ছেলে। তুই কেন সম্পর্ক রাখিস না শীলার সঙ্গে?

চায়ে শেষ চুমুক মেরে কাপটা খাটের নীচে রাখে অপূর্ব। বলে, আমাদের পার্টির শিক্ষা অনুযায়ী রক্তের সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

আমাকে যে দিস। আমার কাছে আসিস। ডাকিস দিদি বলে।

অদ্ভুত এক ধরনের হাসি হাসে অপূর্ব। মানে বোঝা যায় না। ছোট করে বলে, পার্টিতে ঢুকেছি বড় হয়ে, ছোটবেলার ডাকটা ভুলি কী করে। —একটু থেমে বলে, ছোড়দির কথা আমারও মনে পড়ে। আমাদের ভুলে গিয়ে ভালই তো আছে। আমিও আর চাই না আত্মীয়স্বজন বাড়াতে। অনেক ছোট ছোট দুঃখ, স্বার্থ, অভিমান, মায়া আশেপাশে ঘোরে।

নিজেকে ভীষণ সংকীর্ণ মনে হয়। ছোট হয়ে যায় দুনিয়াটা।

ওরে বাবা, তুই তো দেখছি সাধুসন্তদের মতো কথা বলছিস। হঠাৎ ভেক ধরে বেরিয়ে পড়বি না তো?

কথাটা ঠাট্টার ছলে বলেছেন ইলা। অপূর্বর অভিব্যক্তিকে সেটা স্পর্শ করে না। থম মারা মুখে অপূর্ব বলে, আমাদের জীবন প্রায় সন্ন্যাসীর মতোই। এই তো এতদিন গ্রামে কাটিয়ে এখন তোর বাড়ি পড়ে আছি। মা, দাদা জানে আমার স্বভাবের কথা। তারা দুশ্চিন্তা করে না।

কথার সূত্রে একটা প্রশ্ন মাথায় আসে ইলার। সত্যি বলতে কি, প্রশ্নটা কদিন ধরেই ঘুরছে মনে। জিজ্ঞেস করার পরিস্থিতি আসেনি। ইলা বলেন, হ্যাঁ রে অপূর্ব, এবার তোকে যেন একটু অন্য রকম দেখছি। সেই যে বাড়ি এসে ঢুকেছিস, কোথাও বেরোচ্ছিস না। দোকান-বাজার করতেও যেন অনীহা। কী হয়েছে বল তো তোর? আগে এখানে এসে কত লোকের সঙ্গে দেখা করতিস। পার্টির সঙ্গে কি কোনও ঝগড়া হয়েছে?

দিদি ঠিক জায়গায় আলো ফেলেছে। এমনটাই আশঙ্কা করছিল অপূর্ব। দিদির বাড়ি আসার পর থেকে সে বেশি সময়টা কাটাচ্ছে এই ঘরে। দরজা-জানলা বন্ধ করে। জামাইবাবুর মোটা মোটা বই নিয়ে পড়ার ভান করতে হচ্ছে তাকে। তবু দিদির চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়নি। ইলার উদ্দেশে অপূর্ব বলে, ঠিক ঝগড়া নয়, পার্টির থেকে কিছুদিন অ্যালুফ থাকতে চাইছি।

কেন?

পার্টির অনেক কিছুর সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না!

ইলা রাজনীতির তেমন কিছু বোঝেন না। তাই চুপ করে থাকতে হয়। অপূর্ব খাট থেকে নেমে বন্ধ জানলার কাছে যায়। দিদিকে আশ্বস্ত করার জন্যই সম্ভবত পাল্লা খোলে। বাইরে রোদ পুড়ে বিকেল হয়েছে। দিদির বাড়ির সামনে ছোট্ট এক চিলতে বাগান, নিচু পাঁচিল, ইট পাতা রাস্তা, ওপারে অনেকটা জমি, গাছপালার মাঝখানে পোড়ো একতলা বাড়ি। তারপরই একটা হলুদ তিনতলা বাড়ির দেওয়ালে দৃষ্টিপথ আটকে যায়। শহুরে আড়াল। বছর বিশেক আগেও এই জায়গাটা নিশ্চয়ই গ্রাম ছিল, শহর থাবা বসাচ্ছে। সামনের ফাঁকাটুকু দিদিদের পক্ষে ভারী উপকারী।

গাছপালার ওপর পড়ে থাকা বিকেলের রোদ দেখতে দেখতে অপূর্বর একবার মায়ের কথা মনে পড়ে। মছলন্দপুরের বাড়িতে মা এখন কী করছে? মা কি ভাবছে তার কথা?

এবারে ঝোলা কাঁধে বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসছিল, মাকে বলেছিল, আইতাছি মা। কবে ফিরুম ঠিক নাই।

ও আবার কেমন কথা! মোটামুটি কইয়া যা কবে নাগাদ ফিরবি। নয়তো চিন্তা হয় বড়।

তোমারে তো কইছি, পার্টির কামে সময়ের কোনও ঠিক নাই। এক হপ্তাও লাগতে পারে আবার এক মাস...

ক্ষোভ দেখিয়ে মা বলেছিল, পার্টিই যখন তর সব কিছু, ওহ্যানে গিয়া থাকতে পারিস। ঘরে আসিস ক্যান?

তোমার লইগাই আসি। তুমিই ধইরা রাখছ। তুমি মরলে আর ফিরুম না।

তরে ধইরা রাখছি আমি! কথাটা বলার সময় মায়ের চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল, দৃষ্টিতে বিস্ময়ের চেয়ে গর্বই ছিল বেশি। মায়ের এত কটা ছেলেমেয়ে, সবার জন্য কত উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। জন্ম দেওয়ার পর থেকে মা সদা-সন্ত্রস্ত, কখন কোন সন্তানের বিপদ ঘনিয়ে এল। এরই ফাঁকে ভুল পথে কোনও এক সন্তানের জন্য গর্ব উকি মারে মায়ের মনের আকাশে। ভাবনা যতই ভুল হোক, মাকে বড় নির্মল লাগে। মনে হয় ওই অনাড়ম্বর স্নিগ্ধ অহঙ্কারে জন্ম আমার। জীবনের শুরু...

এই মুহূর্তে ছোটখাটো চেহারার মায়ের কাছে ফিরে যেতে মন চাইছে অপূর্বর। সেটা বাস্তবোচিত হবে না। মাকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য দিদির দিকে ফেরে অপূর্ব। ইলা অনেক আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছেন। বরুণটাও বিছানায় নেই।

খাটে ফিরে আসে অপূর্ব। শোয় না। মাথা নিচু করে বসে থাকে। মছলন্দপুরে ফিরতে তাকে হবেই। বেশিদিন দিদির বাড়িতে থাকা যাবে না। পুলিশের অত্যাচারের মুখে তীর্থ যদি অপূর্বর কথা বলে দেয়, ঠিক খুঁজে খুঁজে পুলিশ এ-বাড়িতে চলে আসবে। নিজের জন্য দিদির বাড়িটা বিপদে পড়ুক সেটা কিছুতেই হতে দিতে পারে না অপূর্ব।

এবারে হয়তো দিদির বাড়ি আসাই হত না। হাওড়া স্টেশনে সেই যে দুটো পুলিশকে সন্দেহ করে অপূর্ব শেষ লোকালের কম্পার্টমেন্ট বদলেছিল, পুলিশ দুজন ফের উঠে আসে অপূর্বর কামরায়। অপূর্ব নিশ্চিত হয় পুলিশ পিছু নিয়েছে, জানতে চাইছে কোথায় ডেরা বাঁধবে অপূর্ব।

শেষ লোকাল বেশ কটা ভোঁ বাজিয়ে ধীর গতিতে চালু হয়। গতি যথেষ্ট বাড়তেই অপূর্ব ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। আত্মগোপনে অভ্যস্ত অপূর্ব, দৌড়োদৌড়িতে না গিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দেওয়াল ঘেঁষে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে। আশেপাশে আরও দু-একজন প্ল্যাটফর্মবাসী শুয়েছিল।

চাদরের ফাঁক দিয়ে অপূর্ব লক্ষ রাখছিল, পুলিশ দুটো নামে কি না। তারা নামেনি। তা হলে কি অযথাই ভয় পাচ্ছিল সে? পরক্ষণেই মাথায় আসে, হয়তো তাই। পুলিশ ওরকম বোকার মতন সামনাসামনি শ্যাডো করে না। তা হলে কেন অপূর্ব কামরা বদলানোর পর ওরাও বদলাল?

এরকম অজস্র কেন, দ্বিধা, দুশ্চিন্তা তাড়া করে বেড়াচ্ছে অপূর্বকে। জগতের সমস্ত দড়িকেই সাপ বলে ভ্রম হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার জায়গা। জীবনটাকে সেভাবে জানাই হল না। অবদমিত হয়ে রইল প্রেম, ভালবাসা, কাম। ভেবেছিল সুদিন আসবে ঠিক। শৌখিনতাগুলো রইল তোলা।

সুদিন আনতে পারল না অপূর্বরা। শ্রদ্ধেয় নেতা ধরা পড়ে যেতেই পার্টিকর্মীদের আত্মবিশ্বাসে টান পড়েছে। শেষ দিকে সংগঠনের অবস্থা এমনিতেই ছিল ভঙ্গুর, এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

অপূর্বর মতো এরকম ছিটকে পড়া যোদ্ধাদের আমৃত্যু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে হবে। তা কি সম্ভব! ধরা অপূর্বকে পড়তেই হবে। তারপরের প্রহসন তো জানাই আছে।

মৃত্যু নিয়ে খুব একটা ভাবে না অপূর্ব। সে জানে এ-দেশের জেলে জায়গা হবে না তার। অন্ধকার মাঠে দৌড় করিয়ে বুলেট ফুঁড়ে দেবে পুলিশ। অনেক না পাওয়াকে সঙ্গী করে চিরনিদ্রায় চলে যাবে অপূর্ব। তার মৃত্যুকে শহিদ আখ্যা দেবে না কেউ। এমনকী নিজের সব থেকে কাছের জন মা, জোর গলায় বলতে পারবে না, আমার ছেলে মানুষের ভাল করতে গিয়ে মারা গেছে। সমাজব্যবস্থা মায়ের মুখ চেপে ধরবে।

এই অপমানটাই সহ্য হয় না অপূর্বর। তাই সে শেষবারের মতো শোধ নিতে গিয়েছিল। সামন্তর মতো পুলিশ অফিসারকে মারতে পারলে, তবু কিছুটা আত্মতুষ্ট হওয়া যেত। পারল না তারা। এখন পড়ে রইল লাঞ্ছনাময় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

লাঞ্ছনার ছ্যাঁকা সে হাওড়ার এক নম্বর প্ল্যাটফর্মেই পেয়েছিল সে রাতে। ট্রেন চলে যেতেই অপূর্বর আশপাশ থেকে চাদর মোড়া প্ল্যাটফর্মবাসীরা উঠে বসে, তারা সবাই অত্যন্ত দুর্বল স্বাস্থ্যের ভগ্নপ্রায় মানুষ। বুঝতে অসুবিধে হয়নি ভিক্ষেই এদের রুজি।

সেই ভিখারিরা ঘিরে ধরে অপূর্বকে, কিছুতেই শুতে দেবে না তাদের জায়গায়। তারা বুঝতে পেরেছে, অপূর্ব সাংঘাতিক ধরনের কোনও অপরাধী, অপূর্বর জন্য ওদের ডেরায় পুলিশি ঝামেলা হোক, সেটা তারা চায় না। অতএব পত্রপাঠ বিদায় হও।

অনেক বুঝিয়েও নিরস্ত করা যাচ্ছিল না। শেষমেশ বাধ্য হয়ে অপূর্বকে রিভলবার বার করতে হয়। ভয় পেয়ে যে যার নিজের জায়গায় শোয়। অপূর্ব ডুবে যায় আত্মগ্লানিতে, নিজের দেশের ভিখারিকে বন্দুক দেখাতে হল!

রিভলবারটার কথা মনে পড়তে অপূর্বর খেয়াল হয়, দিদির বাড়িতে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গামছা মোড়া রিভলবার, ভোজালি দিদির কয়লার চৌবাচ্চার পাশের খাঁজে

লুকিয়ে রেখেছিল, মাঝে আর দেখা হয়নি সেগুলো ঠিকঠাক আছে কি না।

খাট থেকে উঠে জিনিসগুলো দেখতে যায় অপূর্ব। ও দুটোই এখন তার আত্মমর্যাদা। রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দিদি বলল, দেখ তো অপু, বরুণটা কোথায় গেল।

দেখছি। বলে, এগিয়ে যায় অপূর্ব। কয়লার চৌবাচ্চা বাথরুম-পায়খানার পাশে। বেশ লম্বাচওড়া কয়লা রাখার জায়গাটা। চৌবাচ্চার পাড়ে উঠে খাঁজে হাত গলানো যাবে।

উঠে পড়ে অপূর্ব। কয়েকটা পুরনো টিনের জং ধরা কৌটো সরায়, গামছা মোড়া রিভলবার, ভোজালি খাঁজে ঢোকানোর পর কৌটোগুলো সে নিজেই রেখেছিল।

হ্যাঁ, লাল গামছাটা দেখা যাচ্ছে। ফিরে আসছে আত্মবিশ্বাস। এখন পর্যন্ত এই দুটো অস্ত্রের ব্যবহার করতে হয়নি অপূর্বকে। সঙ্গে থাকলে মনে বল আসে। অস্ত্র দুটো কিন্তু পোড় খাওয়া। অপূর্বর হাতে আসার আগে বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। স্কোয়াড থেকে যেদিন তাকে অস্ত্র দুটো দেওয়া হয়, লিডার অলকেশদা বলেছিলেন, এ দুটো কে ব্যবহার করত জানিস?

মাথা নেড়েছিল অপূর্ব। গর্বের সঙ্গে অলকেশদা বলে, কমরেড প্রদীপ সেনগুপ্ত। গায়ে কাঁটা দিয়েছিল অপূর্বর। প্রদীপদা ওদের স্কোয়াডের সব থেকে ডেয়ারিং কর্মী। অনেক কটা বডি নামিয়েছে। ধরা পড়ার দুদিনের মধ্যে পুলিশ ওঁকে রাজবাড়ির মাঠে গুলি করে মারে।

প্রদীপদার অস্ত্র কীভাবে হাত ঘুরে স্কোয়াডে এসেছে জানে না অপূর্ব। শুধু জানে এই দুটো আয়ুধ বেশ কয়েকবার গর্জে উঠেছে। এদের স্মৃতি এখনও উত্তপ্ত বারুদে, রক্তে। খুব চার্মড অবস্থায় সেদিন বাড়ি ফিরেছিল অপূর্ব। রিভলবারে চারটে গুলি, দুটো বোর ফাঁকা। গুলি দিতে পারেনি অলকেশদা। বলেছে পরে আনিয়ে দেবে। আজ পর্যন্ত জোগাড় হয়নি। খাপওলা ভোজালিটা অবশ্য ভীষণ চকচকে, দশ ইঞ্চির ফলা।

প্রদীপদার জিনিস দুটো হাতে আসার আগে অপূর্বর ছিল, ওয়ান শাটার বন্দুক আর সোজাসাপটা একটা ছ ইঞ্চির ড্যাগার। ওয়ান শাটারে শ্যুট করেছে দুবার। কোনওবারই খুন করার উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু আহত করা। ওয়ার্নিং। পুলিশের ইনফর্মার পাঁচুর বাঁ পায়ের কিছু ছালচামড়া নিয়ে গুলিটা বেরিয়ে যায়। ব্যাটা তখন নেশা করে ছিল। সেকেন্ড ইনসিডেন্ট, সিমেন্টের ডিলার মোহনজি ছিল স্কুটারের পিছনের সিটে। ওর ছেলে চালাচ্ছিল গাড়ি।

পান কিনতে দোকানে দাঁড়িয়েছিল স্কুটার। যেমন রোজ দাঁড়ায়। গলির মুখে দাঁড়িয়ে মোহনজির পায়ে লক্ষ্য স্থির করেছিল অপূর্ব। সেদিনও হাতে পেটো নিয়ে ওর পাশে ছিল তীর্থঙ্কর। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় অপূর্ব। গুলি লাগে সামনের চাকার গার্ডে। স্কুটারসুদ্ধু মোহনজি এবং তার ছেলে রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে থাকে। তীর্থ একটুও দেরি করেনি, পর পর পেটো দুটো চার্জ করে, অপূর্বর কনুই ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। তারপর গলি ধরে দুজনেই দে দৌড়।

ওই অ্যাকশানেই কাজ হয়েছিল, পরের চিঠিতেই নির্দিষ্ট স্থানে থলে করে টাকা রেখে যায় মোহনজি। টাকাটা চাঁদা হিসেবে চাওয়া হয়েছিল। আগের দুটো চিঠিকে গ্রাহ্য করেনি মোহনজি। লোকাল নেতা ও পুলিশকে ভালমতো হাত করা আছে তার। ভেবেছিল, টাকা না দিয়ে পার পেয়ে যাবে।

বিষয়টার এত সুন্দর নিষ্পত্তির পরেও মনটা খচখচ করছিল অপূর্বর। কেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সে। ওয়ান শাটারের এই এক মুশকিল, লক্ষ্যবস্তু চার-পাঁচ ফুটের মধ্যে না থাকলে মিস অনিবার্য। পাঁচুর পায়ে গুলি ছুঁয়ে যাওয়াটা আকস্মিক ঘটনা। চোলাইয়ের ঠেক থেকে উঠে টলমল পায়ে এগোচ্ছিল পাঁচু। টিপ না করেই ঘোড়া টেনে দেয় অপূর্ব। ফসকাতেই পারত গুলি। পাঁচু শালার এমনিই কপাল, খুবলে গেল পায়ের কিছুটা মাংস। সেই যে এলাকা ছেড়ে ভেগেছে পাঁচু, আর দেখা যায়নি।

নড়বড়ে অস্ত্র দিয়েই এলাকায় ত্রাস ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল অপূর্বরা। সে জায়গায় প্রদীপদার অস্ত্র তো কামানের সমান। একটা অ্যাডভান্টেজ অপূর্বর ছিল, হয়তো এখনও আছে। সুধাংশু জ্যাঠার বাড়ি অপূর্বদের বাড়ির গায়ে। সুধাংশু জ্যাঠা সি পি এমের বড় লিডার। বাবা সুধাংশু জ্যাঠার পাল্লায় পড়ে সি পি এম করত। দুটো পরিবারই খানসামা গ্রাম

থেকে আসে। এলাকার লোকেরা দুটো বাড়িকে সি পি এম সমর্থক হিসেবেই জানে। এই পরিচয়টাই ছিল অপূর্বর আড়াল। তাই কি অস্ত্র দুটো অপূর্বর হাতে তুলে দিয়েছিল অলকেশদা? অপূর্বর হেফাজতটা সব থেকে নিরাপদ মনে হয়েছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল পরের দিন। ঘটনাটাকে ঠিক কাকতালীয় বলে মানতে ইচ্ছে হয় না, আবার না মেনেও উপায় নেই। পরের দিন সকালে সুধাংশু জ্যাঠা এসে হাজির। মায়ের করে দেওয়া চা খেতে খেতে নানান কথা বলছিল মেজদার সঙ্গে। অপূর্ব ইচ্ছে করেই থাকছিল চোখের আড়ালে।

জ্যাঠা ব্যস্ত মানুষ, দরকার ছাড়া এ-বাড়িতে সময় নষ্ট করবে না। দরকারটা কী জানার জন্য অপূর্বর কান ছিল জ্যাঠাদের আলোচনায়। পাশের ঘরে বসে অপূর্ব শুনছিল সুধাংশু জ্যাঠার আক্ষেপ। এলাকার লোকেরা আর দলবদ্ধ নয়। কেউ মিশছে কংগ্রেসের সঙ্গে, ইয়াং ছেলে দু-চারটে ভিড়ে গেছে নকশাল পার্টিতে। আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা এসেছি ওপার থেকে। দলবদ্ধতাই আমাদের এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেখানে ফাটল ধরে গেলে, অস্তিত্ব বিপন্ন হবে আমাদের। — খুবই সংকীর্ণ মানের রাজনৈতিক সুড়সুড়ি দেওয়া এইসব কথা। কিছুটা বিরক্ত হয়েই পাশের ঘর থেকে কিছু বলবে বলে উঠে এসেছিল অপূর্ব। সুধাংশু জ্যাঠাই ওকে দেখে বলতে শুরু করে দেয়, এই যে অপূর্ব, তোকে তো পার্টি অফিসে আর দেখিই না। থাকিস কোথায়?

সাময়িকভাবে দমে গিয়ে অপূর্ব বলে, ছোটখাটো একটা কাজকারবারের চেষ্টা করছি।

ওইসব ছুতো আমারে দিস না। কান পচে গেছে। তোর বয়সি ছেলেরা এখন সবাই দেখি এক কথাই বলে। আসলে গা এড়ানোর ছল। আরে বাবা, তোদের মতো ছেলেরা যদি অ্যাকটিভ না হয়, বুড়োরা মনে জোর পাবে কোথা থেকে বল? ইয়াংরাই পার্টির মেন শক্তি। একেই পার্টির পক্ষে সময়টা ভাল যাচ্ছে না।

সুযোগটা হাতছাড়া করেনি অপূর্ব। বলেছিল, কেন, সময় ভাল নয় কেন? এখন তো অনেক কটা দল আমাদের ফরে। কংগ্রেসের সঙ্গে তেমন ঝগড়াঝাঁটি নেই। আর নকশালরা তো ঝিমিয়ে গেছে।

কোথায় ঝিমিয়েছে। তোর মেজদাকেই জিজ্ঞেস কর না, ও তো রোজ কলকাতায় যায়। কী অবস্থা কলকাতার! সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে আছে মানুষ, এই বুঝি বোমা পড়ল, খুন হয়ে গেল কেউ।

মেজদা তখন শুধু নির্বাক শ্রোতা। একবার অপূর্বর দিকে দেখছে, অন্যবার জ্যাঠার দিকে। অপূর্ব বলে, কলকাতা বড় শহর, শান্ত হতে একটু সময় লাগবেই। আমাদের এদিকে তো আর তেমন ওদের দাপট নেই।

কথাটা উত্থাপনের উদ্দেশ্যই ছিল অপূর্বদের অ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে সুধাংশু জ্যাঠা কতটা ওয়াকিবহাল সেটা জানা। উত্তরে বড় একটা শ্বাস ফেলে জ্যাঠা বলে, নেই আবার!

এইটুকু বলেই চুপ করে যায়। অপূর্ব ফের খোঁচায়, প্রদীপ সেনগুপ্ত মারা যাওয়ার পর, মনে তো হয় এখানকার নকশাল সংগঠন ভেঙে গেছে। উনিই তো ছিলেন হোতা।

প্রদীপ সেনগুপ্ত মরে গেলেও ওর অস্ত্রশস্ত্রগুলো তো মরেনি। আমাদের এলাকার মধ্যেই আছে।

জ্যাঠার কথাটা শরীরের সম্মুখভাগে চাবুক হয়ে পড়েছিল। অপূর্ব আন্দাজ করতে পারে। সেই মুহূর্তে তার মুখ হয়ে গিয়েছিল সাদা। সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, সব জেনেশুনে জ্যাঠা এ-বাড়িতে এসেছে। অপূর্বকে সুযোগ দিচ্ছে শুধরে যাওয়ার। কেন কে জানে অপূর্বর তখন মনে হয়েছিল, একদিন হয়তো পার্টির নির্দেশে সুধাংশু জ্যাঠাকে খুন করতে হবে তাকেই। ব্যাপারটা হবে খুবই মর্মান্তিক। বাবার সঙ্গে খুবই নিবিড় সম্পর্ক ছিল জ্যাঠার। অপূর্বর কিশোরবেলার স্মৃতির মধ্যেও সুধাংশু জ্যাঠা মিশে আছে স্নেহস্পর্শের মতো।

সেদিন ওই একটি মারাত্মক কথা বলা ছাড়া, বাকি সময়টা নিরীহ জ্ঞান দিয়ে উঠে গিয়েছিল জ্যাঠা। কী মনে হতে অপূর্বও জ্যাঠার ব্যাপারটা নিয়ে পার্টিতে আলোচনা করেনি।

ক্রমে জ্যাঠার ক্ষমতা আরও বেড়েছে সি পি এম পার্টিতে। অপূর্ব ততই গুটিয়ে গেছে, নিজেকে লুকিয়ে নিয়েছে জ্যাঠার সামনে থেকে।

কই রে অপু, পেলি দেখতে ছেলেটাকে? রান্নাঘর থেকে ভেসে এল দিদির গলা। সংবিৎ ফেরে অপূর্বর, দেখে, গামছা মোড়া বন্দুক, ছুরি হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে। পাছে দিদি চলে আসে এখানে, গলা তুলে বলে, দেখছি।

পাঁচিলের ওপারে চোখ যেতেই দেখতেও পায়। দিদির বাড়ির পাশের ভিতে বরুণ ওরই বয়সি একটা মেয়ের সঙ্গে খেলা করছে। মেয়েটাকে আগে এখানে দেখেনি অপূর্ব। নতুন বালি, ইট ফেলা হয়েছে ভিতের ধারে। এবার ওখানে বাড়ি উঠবে। মনে হচ্ছে ওই মেয়েটারই বাড়ি। নতুন বন্ধু পেয়েছে বরুণ। বিকেলের ঢলে পড়া হলুদ আলোয় দুই কিশোর-কিশোরীর খেলা কী নিরুদ্বেগ, নির্বিঘ্ন লাগছে। কোমল উচ্ছ্বাস! ওদের সামনে পড়ে আছে অজানা ভবিষ্যৎ। জীবনটা ওদের ভাল কাটুক। স্বপ্নগুলো সত্যি হোক..... কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অপূর্ব খেয়াল করে, তার অস্ত্র ধরা হাত ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে।

॥ চোদ্দো ॥

'অবিনাশ চ্যাটার্জি, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল।' একটা চিরকুটে এইটুকু লিখে বেয়ারার হাত দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছেন। আধ ঘণ্টা হতে চলল এখনও ডাক আসেনি। প্রবাল সামন্ত কি অবিনাশকে মনে করতে পারছেন না, না কি এড়িয়ে যাচ্ছেন?

যদি দেখা করার ইচ্ছে না থাকে, এতক্ষণে বেয়ারা এসে বলে দিত, দেখা নেহি হোগা। স্যার বিজি হ্যায়।

কিছুই করার থাকত না অবিনাশের। নিরাশ হয়ে ফিরতে হত। আশা তার মানে এখনও আছে।

অফিসের বাইরের বারান্দায় পায়চারি করেই যাচ্ছেন অবিনাশ। একটাও চেয়ার নেই বসার।

যমুনা বসেছে বারান্দার ধারে নিচু পাঁচিলের ওপর। সাহেবি আমলের বাংলো, পাঁচিলগুলো প্রায় চওড়া বেঞ্চের মতো। মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে পাঁচিলের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। ঘুমচ্ছে মেয়ে।

অবিনাশ গিয়ে বসতে পারতেন ওখানে। কেমন যেন কুণ্ঠা হচ্ছে। দূরে গিয়েও বসা যায় না, বেখাপ্পা লাগবে। আসলে মৃগাঙ্কর বউয়ের সঙ্গে কোনওদিনই খুব বেশি কথা বলেননি অবিনাশ। অভিভাবকসুলভ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। এখন মাঝে মৃগাঙ্ক নেই বলে কথা প্রায় হচ্ছেই না। যা হয়েছিল ওই একবার, 'বউদি এসেছে' বলে শশাঙ্ক যখন ডেকে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে।

পরের দিনটা চিন্তা করেই কাটিয়ে দেন অবিনাশ। মাঝে একবার বেরিয়ে টেলিগ্রাম করে দেন দেবপাড়ায়, ফিরতে দেরি হবে। মৃগাঙ্ক ফিরল না কেন, কোথায় যেতে পারে? যমুনা এবার কী করবে? শশাঙ্ক তো বেশিদিন টিকতে দেবে না বাড়িতে।—ভাবনাচিন্তা যখন গিঁট পাকিয়ে যাচ্ছিল, অবিনাশ মনেপ্রাণে চাইছিলেন মৃগাঙ্ক হঠাৎ এসে ডাক দিক, অবিনাশদা, তুমি যখন আছ, চলে এলাম সাহস করে।

সাহস নয়, দুঃসাহস। যমুনার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছেন অবিনাশ, একটা বড়সড় গ্যাং, যাদের সঙ্গে পুলিশও জড়িয়ে আছে, খুঁজছে মৃগাঙ্ককে। অথবা বলা ভাল মেয়েটাকে। বাচ্চাটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে, অজান্তেই মৃগাঙ্ক গ্যাংটার স্বার্থে ঘা দিয়ে ফেলেছে। প্রশাসনের ক্ষমতাসমৃদ্ধ দলের সামনে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা মৃগাঙ্ক, অবিনাশ কারওই নেই। তবু মনে ক্ষীণ আশা। আগেও তো দুজনে এক সঙ্গে অনেক সাহসের কাজ করেছি, আরও একবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?

অবাস্তব, আবেগতাড়িত ভাবনা। ঠান্ডা মাথায় ভাবলেই বোঝা যায় মৃগাঙ্ক পড়েছে অযাচিত এক জটিল সমস্যায়। এর সমাধান করতে হলে, গ্যাংটার সমান শক্তিধর কাউকে ধরে এগোতে হবে। সেই অভিপ্রায়ে প্রবাল সামন্তর কাছে আসা। কিন্তু এখনও তাঁর সাক্ষাৎ মেলেনি। দেখা হলেও, উনি কতটা কী করতে পারবেন বোঝা যাচ্ছে না। অবিনাশের ধারণা হয়েছিল, প্রবাল সামন্ত সমস্তিপুরের বড় পুলিশ অফিসার হয়ে এসেছেন। সেইমতো তিনি যমুনাকে নিয়ে থানায় যান। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দাদা বলেছিল, এই হচ্ছে আমার ভাই, অবিনাশ চ্যাটার্জি। বিনা কারণে পুলিশ তাড়া করে বেড়াচ্ছে, পুলিশের কাছেই পৌঁছে যাও। জিজ্ঞেস কর, কেন খুঁজছেন?—এই পাওয়ারটাই সমস্তিপুরের মানুষদের মধ্যে থেকে উবে যাচ্ছে।

কথাগুলো দাদা বলছিল শশাঙ্ক আর রজতকে শুনিয়ে। কেননা তার একটু আগেই শশাঙ্ক, রজত দুজনেই অবিনাশকে পরামর্শ দিয়েছিল, সমস্ত ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ড না বুঝে, মৃগাঙ্কর সঙ্গে কথা না বলে, এরকম সরাসরি পুলিশকে ফেস করা ঠিক হবে না। ওদের হাতে আইন, ইচ্ছে করলে কোনও পেটি কেসে আমাদেরও জড়িয়ে দিতে পারে। উত্তরে অবিনাশ

শুধু বলেছিলেন, পুলিশে আমার চেনা-জানা আছে। আমি যমুনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি সাত-আট বছর সমস্তিপুরে নেই। পুলিশের আগেকার লোকজন সব পালটে গেছে। ওদের অ্যাটিটিচিউড এখন খুব খারাপ। করাপশানে ভর্তি। বলেছিল রজত। শশাঙ্ক নির্বাক। পরিস্থিতি তার আয়ত্তের বাইরে, অথবা সে নিজে পরিস্থিতির বাইরে থাকতে চায়।

অবিচলিত কণ্ঠে অবিনাশ বলেছিলেন, দেখি না চেষ্টা করে।

সেই ফাঁকে দাদা বীরগাথা শুনিয়ে দেয় শশাঙ্ক, রজতকে। রজত অবশ্য দাদার কথা গায়ে মাখে না। বলেছিল, ঠিক আছে, আমিও যাচ্ছি চল।

তোর গিয়ে কাজ নেই। দরকারমতো ডেকে নেব। বলে, সদরের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন অবিনাশ। বাচ্চা কোলে অনুসরণ করেছিল যমুনা। বউদি পিছু ডেকে বলে, বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার! ও আমাদের কাছে থাকুক। তোমরা তোমাদের কাজ সেরে এস। কতক্ষণ লাগবে কোনও ঠিক আছে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে অবিনাশ বলেন, না বউদি, বাচ্চাটা থাকুক। ওকেই তো খুঁজছে পুলিশ। দেখি, কী বলে।

বাড়িটাকে থমথমে অবস্থায় ফেলে রেখে, যমুনাকে নিয়ে রিকশায় উঠে বসেছিলেন অবিনাশ। মৃগাঙ্কর বউয়ের এত পাশাপাশি কখনও বসেননি। শরীরে শরীর ঠেকেছিল। সম্পর্কজনিত সম্ভ্রম ছিল অটুট।

পুরোটা রাস্তা একটাও কথা বলেনি যমুনা। কখনও মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকছে, কখনওবা ঠায় রাস্তায়। ও কি মৃগাঙ্ককে খুঁজছিল তখন?

রিকশা ব্যানার্জি লেন পার হতেই অবিনাশের কেমন যেন অস্বস্তি শুরু হয়, আর খানিকটা পরেই সেই চত্বর। রাস্তার ধারে গাছগুলো এখনও আছে, মাদার, শিমুল, নিম.. শিমুলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অবিনাশ প্ররোচনা দিয়েছিলেন মৃগাঙ্ককে, টমিরা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করছে।

গাছের পিছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে মৃগাঙ্ক দু হাত তুলে চেঁচাতে লাগল, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার, ডরো মত্... বলতে বলতেই গুলি এসে লাগল পায়ে...। সেই ঘটনা কি মৃগাঙ্ক তার বউকে বলেছে? চিনিয়ে দিয়েছে এই সেই জায়গা, যেখান থেকে শুরু আমার করুণা উদ্রেককারী জীবনের।

না। মৃগাঙ্ক জায়গাটা সম্ভবত চেনায়নি যমুনাকে, রাস্তাটা পার হওয়ার সময় ওর এক্সপ্রেশানে ছাপ পড়তই। ও ছিল একইরকম বিষণ্ণ উদাসীন।

থানায় পৌঁছে অপ্রত্যাশিতভাবে হতাশ হতে হয় অবিনাশকে। ও সি বলেন, প্রবাল সামন্ত নামে কোনও অফিসার সমস্তিপুরে বদলি হয়ে আসেননি।

অবিনাশ বিনয়ের সঙ্গে ও সি-কে বোঝান, মিস্টার সামন্ত আমার সঙ্গেই ট্রেনে এক কম্পার্টমেন্টে কলকাতা থেকে এসেছেন।

কথা কানে নেন না অফিসার। অবিনাশ বলতে বাধ্য হয়, ছেলেটার ধরা পড়ার কথা, সামন্তকে খুন করার চেষ্টা...

ও সি কী যেন একটু চিন্তা করেন। তারপর বলেন, হ্যাঁ, ওরকম একটা ছেলে অ্যারেস্ট হয়েছে বটে। তবে আমি ওই কেস হ্যান্ডেল করিনি। ছুটিতে ছিলাম।

তখনই কেমন যেন খটকা লাগে অবিনাশের, ও সি কিছু লুকোচ্ছেন। হয়তো অফিসিয়াল সিক্রেসি।

ও সি-র হিন্দিতে মৈথিলি টান। অবিনাশ কিছুক্ষণ ওই ধরনের হিন্দিতে গল্প করেও সুবিধে করতে পারলেন না। ও সি-র পেট থেকে বেরোল না কিছুই। সুপ্ত অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যে ভাবমূর্তির কথা দাদা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, এত তাড়াতাড়ি সেটা নষ্ট হতে দিতে ইচ্ছে করছিল না। কী জানি মৃগাঙ্ক হয়তো যমুনার সামনে তাঁর এক বিশাল ভাবমূর্তি তৈরি করে রেখেছে।

সেই কারণেই কি থানায় বসে ও সি-র প্রতিটি ঘাড় নাড়ার পর যমুনা করুণ আর্তিতে তাঁর দিকে দেখছিল?

খুবই হতাশ হয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অবিনাশ। ছায়ার মতো অনুসরণ করতে করতে যমুনা শুধু একবারই জিজ্ঞেস করেছিল, এবার কোথায় যাবেন? উত্তর দেননি অবিনাশ। কী করে দেবেন? তিনিও তো জানেন না, কোথায় যাবেন, কার কাছে?

থানার চৌহদ্দি ছেড়ে অনেকটাই এগিয়ে এসেছেন, হঠাৎ সামনে এসে উদয় হল এক কনস্টেবল। কোনও ভণিতা ছাড়াই সে বলতে শুরু করেছিল, আপ যিনকে সাথ ভেট করনা চাহতে হ্যায়, ম্যায় জানতা হুঁ পাতা।

মেহেরবানি করকে বাতা দিজিয়ে। মেরা বহুত জরুরি কাম হ্যায় উনসে। বলেছিলেন অবিনাশ।

পরিচ্ছন্নভাবে ঘুষ চেয়েছিল কনস্টেবল, চা-পানিকা খরচা দেনা পড়েগা।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে কনস্টেবলের হাতে দিয়েছিলেন অবিনাশ। টাকা পকেটে পুরতে পুরতে সে জানায়, প্রবাল সামন্ত একজন

আই পি এস অফিসার। কলকাতা পুলিশের এস পি ছিলেন। এখানে এসে জয়েন করেছেন সি বি আই-এ। উনি অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর। ওঁর অফিস এবং কোয়ার্টার এক সঙ্গেই। ম্যাজিস্ট্রেট বাংলোর পিছনে। —সব বলার পর কনস্টেবল বলে, ম্যায় আপকো ইতনা কুছ বলা, কিউ কি বিবি-বাচ্চা লে কর আপ তব সে উনকো ছুঁড় রহে হ্যায়। জরুর কুছ পরেসানবালি বাত হ্যায়। নেহি তো সি বি আই কা বারে মে পুলিশ কো ইতনা কুছ বোলনা নেহি চাহিয়ে।

কনস্টেবল ধরে নিয়েছে যমুনা, বাচ্চাটা তাঁর স্ত্রী ও সন্তান। অন্য সময় হলে কথাটার অভিঘাত ভিন্ন হত, যমুনার অভিব্যক্তি কেমন হল, কতটা লজ্জা পেল সে, সেটা দেখারও ইচ্ছে হয়নি অবিনাশের। তখন মাথায় ঘুরছে একটাই কথা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রবাল সামন্তর কাছে পৌঁছতে হবে।

এখন প্রায় সামন্তর দোরগোড়ায়, ডাক পাননি। একটা অস্থিরতা কাজ করছে শরীরে। একটা কথাও মনে হচ্ছে, কেন এলাম সামন্তর কাছে? হ্যান্ডকাফ পরা ছেলেটাকে যে নিষ্ঠুরতায় উনি মারধর করছিলেন, তাতেই ওর চরিত্রের আসল পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ট্রেনপথে অবিনাশের সঙ্গে ব্যবহারটা ছিল অভিনয়।

এরকম একটা লোকের দ্বারস্থ হলেন কেন অবিনাশ? কারণ, মানুষটি অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। কেমন অনায়াসে নিজের মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে ঘাতকের গালে চড় কষালেন। হিসেবমতো তিনি অন্যায় কিছু করেননি। যে ছেলেটি ওঁকে খুন করতে এসেছিল, সে যে-কারণেই হোক, 'খুন' করাটাও তো কম নিষ্ঠুর কাজ নয়। অবিনাশ কেন যে তখন ছেলেটির পক্ষ নিয়েছিলেন কে জানে! অসহায় বন্দি ছেলেটাকে মারার দৃশ্যটাই কি অবিনাশের মনকে বিচলিত করেছিল? ওঁর কি খেয়াল ছিল না, ঘণ্টাখানেক আগে ওই যুবকটি রক্তলালসায় খুন করতে গিয়েছিল সামন্তকে! খেয়াল ছিল, তবু যুবকটির পক্ষ নিয়েছিলেন অবিনাশ। প্রশাসনিক দমননীতির বিরুদ্ধে জেহাদ আজও তিনি মনের গভীরে লালন করেন। আবার প্রয়োজনে প্রশাসনকে ব্যবহার করতেও পিছপা হন না। অবিনাশের চরিত্রটা দ্বিচারিতায় ভরা। প্রবাল সামন্ত এবং সেই যুবক, যে নাকি নকশাল, রজত বলছিল, ওই দুজনের থেকে অবিনাশের চরিত্র অনেক মামুলি। বিশ্বাসের জায়গা অত্যন্ত দুর্বল। —নিজেকে কেন এত খাটো করছেন অবিনাশ? তীর্থের কাকের মতো সামন্তর অফিসের বারান্দায় পায়চারি করতে আর ভাল লাগছে না। একজন অনুপস্থিত মানুষের জন্য অবিনাশের কী বিপুল দায়। মৃগাঙ্ক নেই বলেই যমুনা আর কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটার দায়িত্ব কাঁধ পেতে নিয়েছেন।

মৃগাঙ্ক যে কেন উধাও হল কিছুতেই বুঝতে পারছেন না অবিনাশ। যমুনা যা বলেছে, তার থেকে কারণটা স্পষ্ট হয়নি। জেরা করতে বেশিক্ষণ মন চায়নি অবিনাশের। কেননা যমুনা প্রথম থেকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকোচ্ছিল, বাচ্চাটা তার নিজের। শশাঙ্কদের সেকথাই বলেছে সে। গোড়াতে শশাঙ্করা সেটা বিশ্বাস করেনি। বলেছে, তুমি যে পেটে ধরেছ, এক

শহরে থেকে আমরা সেটা জানতে পারলাম না! দাদারই তো দৌড়ে এসে খবর দিয়ে যাওয়ার কথা। এমনটাই তো করে দাদা।

যমুনা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, তোমার দাদা স্বভাব বদলেছে। কেন মানুষটা একই রকম থাকবে বল? প্রায় বছর ঘুরতে চলল, তোমরা আমাদের কোনও খবর নিয়েছ?

অপরাধবোধে ঢোঁক গিলেছিল শশাঙ্ক। এ সমস্ত বৃত্তান্ত অবিনাশদাকে শুনিয়ে যমুনার সামনে খাড়া করেছিল। অবিনাশ জানেন যমুনা অনেক কথা গোপন করছে। তার সব থেকে বড় প্রমাণ দেবপাড়ায় পাঠানো মৃগাঙ্কর চিঠি। যাতে লেখা ছিল, সে একটি মেয়ে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে।

সেই মেয়েটাকেই কোলে নিয়ে যমুনা নিজের শ্বশুরবাড়ির একটা ঘরে, খাটের ওপর গুম হয়ে বসেছিল। অবিনাশ ইশারায় শশাঙ্ককে ঘর থেকে যেতে বলেন। তারপর যমুনার কাছে গিয়ে বলেন, কার মেয়ে তুলে নিয়েছিল? এখন ওকে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে কেন?

যমুনা সরাসরি উড়িয়ে দেয় অবিনাশের কথা। বলে, মেয়েটা সত্যিই তাদের। অবিনাশ বলেছিলেন, মিথ্যে বোলো না। মেয়ে পেয়ে মৃগাঙ্ক ইতিমধ্যেই আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। কার মেয়ে সেটা কিছু লেখেনি। হয়তো না জেনেই কাণ্ডটা করে ফেলেছে।

একথার পর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে যমুনা। কাঁদতে শুরু করে অঝোরে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যমুনার কাছে ফিরে এসেছিলেন অবিনাশ। আশ্বাসের সুরে বলেন, তোমার চিন্তা নেই, আমি কাউকে বলব না, বাচ্চাটা তোমাদের নয়। এখন বলো, মৃগাঙ্ক কখন, কী কারণে নিরুদ্দেশ হল।

নিজেকে সামলে নিয়ে যমুনা যতটুকু বলেছে, তা মোটামুটি এরকম, বাচ্চাটাকে সত্যিই রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিল মৃগাঙ্ক। এমন স্নেহভরে বুকে করে নিয়ে আসে বাড়িতে, যমুনা ফিরিয়ে দিতে পারেনি। পরের দিন ভোরবেলায় সে বাচ্চা সমেত রওনা দেয় গোরক্ষপুরে দিদির বাড়ি। পাছে বাচ্চাটাকে কেউ ফেরত চাইতে আসে। আর একটা কারণও ছিল, দিদি তার প্রাণাধিক প্রিয়, সেখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে আসবে সমস্তিপুরে। লোকজনকে বলবে, মেয়েটা তারই গর্ভজাত। জন্মেছে দিদির বাড়িতে।

গোরক্ষপুরে দিন চারেকও কাটেনি, মৃগাঙ্ক গিয়ে উপস্থিত। বিধ্বস্ত চেহারা। পুলিশ তাকে খুঁজছে, আসলে হদিশ চাইছে বাচ্চাটার। গোরক্ষপুরে দুদিন থেকে, আবার উধাও হল মৃগাঙ্ক। যমুনা ধন্ধে পড়ে যায়। তার এখন কী করা উচিত? দিদি, জামাইবাবু নানান প্রশ্ন করতে লাগল, হয়তো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল ওরা। ওদের বিব্রত না করে, যমুনা নিজের অধিকারে ফিরে এসেছে শ্বশুরবাড়ি।

গোটা বর্ণনার মাঝে অনেক ফাঁক আছে। সব থেকে বড় যে খটকা, তা হল, মৃগাঙ্ক ওইভাবে দায় ফেলে পালানোর ছেলে নয়। ওকে আগাপাশতলা চেনেন অবিনাশ। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, মৃগাঙ্ক আর এই দুনিয়াতেই নেই। হয় পুলিশের গুলি, নয়তো কোনও অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।—ভাবনাটা মাথায় আসতেই হৃৎপিণ্ড চলকে ওঠে অবিনাশের। তড়িঘড়ি ঘাড় ফেরান যমুনার দিকে, ও হয়তো জানে মৃগাঙ্ক নেই। অধিকার বজায় রাখতে পড়ে আছে শ্বশুরবাড়িতে। এই যে সামন্তর কাছে আসা, সবই প্রহসন। যথাসাধ্য অভিনয় করে যাচ্ছে যমুনা।—চিন্তাটাকে দ্রুত মাথা থেকে তাড়ান অবিনাশ। তাঁর ভাবনা চিরকালই কল্পনার হাত ধরে অতল খাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

মেয়েটার মুখে হয়তো মাছি বসছে, হাত দিয়ে তাড়াচ্ছে যমুনা। পায়ে পায়ে ওদের দিকে এগোন অবিনাশ। অনেকক্ষণ দূরে দূরে আছেন, কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞেস করা উচিত। বাচ্চাটাকে একবারও মন দিয়ে দেখেননি অবিনাশ, নাম না জানা নক্ষত্র যতই শোভা দিক, আগ্রহ জাগায় না ততটা। তবে এই উপেক্ষা হয়তো যমুনাকে কষ্ট দিচ্ছে।

মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান অবিনাশ, খুবই ফুটফুটে মেয়ে। নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ধবধবে চড়া রোদ থমকে আছে মেয়েটার ঠিক পাশটিতে। এগোচ্ছে না, পাছে চোখে আলো পড়ে মেয়েটার ঘুম নষ্ট হয়।

বাবু আইয়ে, সাহাব বুলায়া।

পিছন ফেরেন অবিনাশ। সামন্তর আর্দালি ডাকছে। যমুনাকে বলেন, চল ভেতরে যাই।

লম্বা করিডোর ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন অবিনাশরা। উলটো দিক থেকে চার-পাঁচজন লোক হাতে ফাইল, কাগজপত্তর নিয়ে হেঁটে আসছে। ওদের হাঁটায় ব্যস্তসমস্ত ভাব, নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছে। এরাই সম্ভবত এতক্ষণ সামন্তর সঙ্গে মিটিংয়ে ছিলো।

লোকগুলো ক্রস করে গেলে, আর্দালি একটা ঘর দেখিয়ে বলল, যাইয়ো।

ঘরের দরজার ওপর প্রবাল সামন্তর নেমপ্লেট দেখবেন আশা করেছিলেন অবিনাশ, সেসব কিছুই নেই। এটা দেখেই বোঝা যায় সামন্ত সমস্তিপুরে প্রকাশিত হতে চান না। একই সঙ্গে আশঙ্কা হয় ভেতরে গিয়ে সেই মানুষটাকেই দেখব তো?

ঘরে ঢুকতেই সামন্ত হইহই করে উঠলেন, আরেঃ, অবিনাশবাবু, আসুন আসুন। সরি, অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি!

না, না, ইটস অল রাইট। আপনি ব্যস্ত মানুষ। বলতে বলতে চেয়ার টেনে সামন্তর টেবিলের এপ্রান্তে বসলেন অবিনাশ। পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে যমুনাকে বসতে বললেন।

সামন্ত বলে যাচ্ছেন, আপনাকে আগেও ডেকে নিতে পারতাম, গুছিয়ে আড্ডা মারা যেত না। অফিসিয়াল মিটিং চলছিল একটা। তবে আপনি যদি স্লিপে লিখতেন, মহিলা এবং একটি শিশু আছে আপনার সঙ্গে, অবশ্যই ডেকে নিতাম।

আশু কর্তব্য খেয়াল পড়ে অবিনাশের, যমুনার পরিচয় দেন সামন্তকে। তারপর বলেন, আমার বন্ধুর স্ত্রী একটা বড় বিপদে পড়েছে। সেই কারণেই আপনার কাছে আসা।

'বিপদ' শব্দটা সম্ভবত সামন্তর প্রাতরাশের মতো। গা করলেন না। বললেন, পরে শুনছি। আগে বলুন তো আপনি আমার অফিসের ঠিকানা পেলেন কোথা থেকে?

সত্যিটা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে নেন অবিনাশ, নিজের কাজ উদ্ধারের আগে সামন্তর মন অন্য দিকে ভাবিত করে লাভ নেই। গেলা ঢোঁকটা হাসি হয়ে ফিরে এল ঠোঁটে। অবিনাশ বললেন, সমস্তিপুর আমার হোমল্যান্ড। কাউকে খুঁজে নেওয়া আমার পক্ষে তেমন কঠিন কিছু না।

কথাটায় মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না সামন্ত। অবশ্য নিমেষেই মুখ থেকে অসন্তোষ ঝেড়ে ফেলে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ বলুন, আপনাদের সমস্যাটা কী?

অবিনাশ ধীরে ধীরে, গুছিয়ে সমস্তটাই বললেন। মানে যতটুকু শুনেছেন যমুনার থেকে। বর্ণনার মধ্যে নিজের কোনও ধারণা বা আন্দাজ কোনওটাই দিলেন না। মৃগাঙ্কর সপক্ষে একটাই কথা বললেন, আমার বন্ধুটির পক্ষে কোনও অপরাধমূলক কাজ করা খুবই অপ্রত্যাশিত এবং বেমানান। নিয়মিত মদের নেশা ছাড়া ওর তেমন কোনও বদগুণ নেই।

হাত দুটো জড়ো করে, আঙুলগুলো ঠোঁটের সামনে রেখে সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সামন্ত। লোকটাকে দেখলে কে বলবে, কদিন আগে মারাত্মক একটা ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছেন। মুখচোখে ভরপুর আত্মবিশ্বাস। কিন্তু কথা যখন শুরু করলেন, অন্য সুর, দেখুন অবিনাশবাবু, আমি এখন যে ডিপার্টমেন্টে আছি, তার সঙ্গে শহরের ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষণাবেক্ষণের কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা পুলিশের কাজ। তবু আপনি যখন এসেছেন, আমার যথাসাধ্য করব। তা ছাড়া কেসটা বেশ খটমট, ইন্টারেস্টিং।

ইন্টারেস্টিং শব্দটা ইন্টারটেনিং অনুপ্রাসে বিধল অবিনাশের শরীরে। থম মেরে গেলেন অবিনাশ। ভাবান্তরটা লক্ষ করলেন না সামন্ত। যমুনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হাজব্যান্ডের মিথ্যে বা বানিয়ে বলার ঝোঁক কতটা?

নেই। ছোট্ট অথচ কতটা গর্বের সঙ্গে উত্তরটা দিল যমুনা।

সামন্তর পরের প্রশ্ন, আপনি তো পুলিশকে ফেস করেননি, কর্তার মুখে শুনেছেন। উনি নির্দিষ্টভাবে পুলিশের কথাই বলেছেন, নাকি সঙ্গে সাদা পোশাকের অন্য লোকজন ছিল?

না, সেরকম কিছু তো বলেননি।

ভাল করে মনে করে দেখুন, আপনার হাজব্যান্ড শুধু পুলিশের কথাই বলেছেন, পুলিশের মতো বলেননি তো?

সামন্তর এই প্রশ্নটায় অবিনাশও ধন্দে পড়ে যান। জিজ্ঞেস করেন, 'মতো' বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন?

প্যারামিলিটারি ফোর্সের কথা। যেভাবে চেজ করেছে, কোথায় যেন মিলিটারিদের সঙ্গে মেলে।

যমুনা পড়েছেন অতল জলে। সামন্ত, অবিনাশের কথার থই খুঁজে পাচ্ছেন না। বুঝতে না পারা বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকে দেখছেন। খানিক পরে বুদ্ধি করে বলে ওঠেন, আমাদের এখানে বলাই সেনগুপ্ত নামে একজন আছেন, আমার স্বামীর বন্ধু। এক কারখানাতেই কাজ করেন। মেয়েটাকে পাওয়ার ব্যাপারটা জানেন উনি। পুলিশ প্রথমে ওঁকেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। আমাদের কোয়ার্টারের সন্ধান পুলিশ বলাইদার কাছেই পায়।

আপনি এত কিছু জানলেন কী করে?

আমার হাজব্যান্ড বলেছেন। যে দুদিন গোরক্ষপুরে ছিলেন তখন।

বলাই সেনগুপ্ত থাকেন কোথায়?

যমুনার উত্তর দেওয়ার আগে অবিনাশ আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন বলাই সেনগুপ্তকে মনে করার। সাত-আট বছর সমস্তিপুর ছেড়ে আছেন, স্মৃতি থেকে খসে গেছে অনেকে।

যমুনা ঠিকানাটা বলতেই মনে পড়ে যায় অবিনাশের। ও, বলাই। পাশে সেনগুপ্ত বসে যাওয়াতে একটু অচেনা ঠেকছিল। কালোর ওপর লম্বা করে ছিপছিপে ছেলেটা। নাটকফাটকে খুব উৎসাহী। বয়সে অবিনাশের সমান অথবা একটু বেশি। দেশভাগের সময় এপারে এসেছে। অবিনাশ যখন প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যমণি, বলাই দুর থেকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকত। বলাই যে মৃগাঙ্কর সঙ্গে চিনি মিলে কাজ করে, জানতেন না অবিনাশ। এই ঘটনায় বলাই এতটা জড়িয়ে আছে জানলে, এখানে আসার আগে ওর সঙ্গে দেখা করে এলে হত... অবিনাশের ভাবনার মাঝে ছেদ টানেন সামন্ত, বুঝলেন অবিনাশবাবু, কেসটা সত্যিই খুব ক্রিটিকাল। খুব সহজে সলভ হবে বলে মনে হয় না। আপনি আর কতদিন আছেন এখানে?

আজই ফেরার টিকিট ছিল। ক্যানসেল করে পাঁচদিন পর টিকিট কাটলাম।

নীচের ঠোঁট উলটে কী যেন ভাবছেন সামন্ত, ভাবনা শেষ করে মাথা নাড়লেন। বললেন, নাঃ এত তাড়াতাড়ি কিছু হবে বলে মনে হয় না। রেজাল্ট না জেনেই ফিরতে হবে আপনাকে। তবে এই কটা দিন আপনারা নিজের উদ্যোগে মৃগাঙ্কবাবুকে খোঁজাখুঁজি করবেন না। থানাতেও যাবেন না আজকের মতো। যমুনা দেবী যেমন শ্বশুরবাড়িতে আছেন, তেমনই থাকবেন। কোয়ার্টারে ফেরার দরকার নেই।

সামন্তর কথার মাঝপথেই বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে অবিনাশের। বলা শেষ হতেই অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী করে জানলেন, আমরা থানা হয়ে আসছি? সংযমী হেসে সামন্ত বলতে থাকেন, আমার ঠিকানা থানার লোক ছাড়া আর কেউ দেবে না আপনাকে। ভীষণ ঢিলেঢালা ওদের কাজকর্ম। আর আমার খোঁজে আপনি থানায় যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। কারণ সমস্তিপুর স্টেশনের ঘটনায় আপনি জেনে গিয়েছিলেন, আমি পুলিশের লোক।

তবুও বিস্ময়ের ঘোর কাটল না অবিনাশের। জিজ্ঞেস করেন, আপনি যখন জানেন, থানা থেকে আপনার ঠিকানা পেয়েছি, তাহলে কেন জানতে চাইলেন....

দেখছিলাম আপনি গোপন করতে কতটা হ্যাবিচুয়েটেড।

অপলক দৃষ্টিতে সামন্তর দিকে চেয়ে বসে আছেন অবিনাশ, লোকটার হাইট ক্রমশ বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে মাথাটা ছাদে না ঠেকে যায়। সামন্তর অভিব্যক্তিতে অহঙ্কারের চিহ্নমাত্র নেই, শরীর ছুঁলে হয়তো অহং-এর তাপ পাওয়া যাবে। নাকি বিপদের সঙ্গে ঘর

করতে করতে মানুষটা নির্মোহ হয়ে গেছে? মানুষটাকে নিজের মাপে নিয়ে আসার ইচ্ছায় অবিনাশ বলেন, আচ্ছা সামন্তবাবু, আপনি তো অনায়াসে আমাদের সমস্যা পাশ কাটাতে পারতেন, যেহেতু এই কেস আপনার ডিপার্টমেন্টের আওতায় পড়ে না। তবু কেন...

কথা কেড়ে নিয়ে সামন্ত বলেন, ট্রেনে জার্নি করার সময় আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। দিনরাত চোর গুণ্ডা-বদমাইশদের সঙ্গে থাকতে থাকতে মেজাজটাই খারাপ হয়ে যায়। আপনার মতো ঘরোয়া নিপাট ভালমানুষের সঙ্গ আমার কাছে দুর্লভ। তদুপরি আপনি বাঙালি।

ভাল ও বোকার মধ্যবর্তী দূরত্বটা মনে মনে মাপার চেষ্টা করেন অবিনাশ। সামন্ত কি তাঁকে ভদ্র ভাষায় বোকা, গোবেচারা মানুষ ভাবছেন? নিজের পৃথক সংসার, স্বাচ্ছন্দ্য এসব দেখতে গিয়ে অবিনাশ হয়তো আগের থেকে ভোঁতা হয়ে গেছেন অনেক। আর পাঁচজন গৃহী মানুষের মতো। কোনও বৈশিষ্ট্যই অবশিষ্ট নেই আর।—মনের ভেতর আলোড়ন চলছে। অস্তিত্ব সংকট। বাক্যবাণে সামন্তকে আঘাত না করলে ফিরবে না আত্মবিশ্বাস। সামন্তর কথাগুলোর মধ্যে দুর্বল অংশ খোঁজেন অবিনাশ, সহজেই পেয়ে যান, সমস্তিপুরে ধরা পড়া ছেলেটাও তো বাঙালি ছিল। তাকে সংশোধনের কি কোনও সুযোগ দিয়েছেন সামন্ত? এনকাউন্টারে মারা গেছে অজুহাতে তাকে হয়তো গুলি করে ফেলে দিয়েছেন সমস্তিপুরের কোনও অজানা গলিঘুঁজিতে। অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন সামন্তকে, আচ্ছা, ওই ছেলেটার কী হল, যাকে আপনি অ্যারেস্ট করেছিলেন স্টেশনে? খানিকটা শ্বাস ছেড়ে সামন্ত বলেন, তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই কোর্টে তোলা হবে। কেসের ডেট অনুযায়ী আমাকে তখন যেতে হবে কলকাতায়।

ভালই হল তো। কদিন বাড়ি ঘুরে আসতে পারবেন। হাসতে হাসতে বললেন অবিনাশ।

হাসি সংক্রামিত হল না সামন্তর মুখে, বদলে কীসের যেন ছায়া ঘনাল। অন্যমনস্কভাবে বললেন, ভাল হল না। ট্রেন জার্নিতে ওরা আবার অ্যাটেম্পট নেবে।

ওরা মানে?

ওই ছেলেটার দলবল। যাদের আমরা ধরতে পারিনি। সেদিন ওই ট্রেনেই ছিল। সামন্তও তার মানে ভয় পান। মৃত্যুর আশঙ্কায় তাঁর মুখটা সাধারণ মানুষের মতোই শুকিয়ে যায়।

সামন্তর দিকে ঠায় তাকিয়ে অবিনাশ, একেবারে নিষ্পলক। যমুনার কোলের বাচ্চাটা বোধহয় জাগল। ঘুম ভাঙা আদুরে কান্না শোনা যাচ্ছে। অবিনাশের এইভাবে তাকিয়ে থাকায় অস্বস্তি হচ্ছে সামন্তর, দৃষ্টি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে লাভ হল না দেখে, অবিনাশের চোখে চোখ রেখে সামন্ত জিজ্ঞেস করেন, কী দেখছেন?

ঘোর ভাঙে অবিনাশের। অপ্রতিভ হেসে বলেন, কিছু না।

আসলে এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই দেখছিলেন অবিনাশ, বা বলা ভাল দেখতে চাইছিলেন। খানিক আগে তাঁর একটা ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল। ট্রেনে সমস্তিপুরে আসার সময় সামন্ত ভোরের দিকে যখন বাথরুমে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, কেউ যদি তাঁর খোঁজে আসে, অবিনাশ যেন বলেন, ওই নামে কেউ এখানে নেই। —সামন্ত বাথরুমে যাওয়ার পর ঘুম এসেছিল অবিনাশের, সঙ্গে স্বপ্নও। দেখেন, কালো পোশাক পরে, মুখ ঢাকা চার-পাঁচজন লোক সামন্তকে খুঁজতে এসেছে। ওদের মধ্যে মৃগাঙ্ককেও দেখেছিলেন অবিনাশ। —এরকম উলটোপালটা স্বপ্ন অনেকেই দেখে। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হল, ঠিক তখন অথবা একটু আগে-পরে ফার্স্ট ক্লাসে সত্যিই খুন করার চেষ্টা হচ্ছিল সামন্তকে। উনি আত্মগোপন করেছিলেন স্লিপার ক্লাসে। অবিনাশের সহযাত্রী হয়ে। স্বপ্নটার মধ্যে এরকম একটা তাৎপর্য, নাকি নির্দেশ লুকিয়ে আছে, আগে খেয়াল করেননি অবিনাশ। মৃত্যুর আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত সামন্তর মুখ দেখে এখন সব মনে পড়ল। তাহলে কি সামন্তর মৃত্যুর সম্ভাবনা আগে থেকে দেখতে পাচ্ছেন অবিনাশ? সামন্ত দিয়ে শুরু, এইভাবে হয়তো অনেকের মৃত্যুর আগাম নির্দেশ পাবেন, এরকম একটা অলৌকিক বিশ্বাস মুহূর্তকালের জন্য অবিনাশকে বিমোহিত করেছিল। উনি জাগ্রত অবস্থাতেই মেডিটেশনের মতো ঠায় সামন্তর

দিকে তাকিয়ে খুঁজছিলেন মৃত্যুর পূর্বাভাস। নিকট ভবিষ্যতে সামন্তর জন্য কি মৃত্যু ওঁত পেতে আছে? বাস্তব কারণে কিছুই দেখতে পাননি। বরং তাঁর এই ভ্যাবলা মেরে বসে থাকাটাকে সামন্ত নিশ্চয়ই বোকা, ভাল মানুষ হিসেবেই গণ্য করেছেন।

যমুনার কোলেরটা এবার বেশ জোরেই কাঁদছে। অনেকটা বায়নার মতো। চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছে যমুনা। চেয়ার দুটোর পিছনে পায়চারি করতে করতে বাচ্চাটাকে চাপড় মেরে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে যমুনা। অবিনাশ সামন্তর উদ্দেশে বলেন, এখন তাহলে উঠি। আপনি প্লিজ কেসটাকে একটু দেখবেন। আজ-কালের মধ্যে এক সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।

আপনাকে আসতে হবে না। দরকার পড়লে আমিই ডেকে নেব। আপনার অ্যাড্রেস তো আমার জানাই আছে। তেমন মনে হলে নিজেই চলে যাব আপনার বাড়ি। ইনফ্যাক্ট অ্যাড্রেসটা নিয়েছিলাম আড্ডা মারতে যার বলে, সে তো হলই না, আপনি যদিও বা এলেন, সঙ্গে ক্রিটিকাল কেস নিয়ে। দোষ আপনার নয়... বলে বাকি ইশারায় সারলেন সামন্ত, বারখানেক টোকা মারলেন নিজের কপালে। তারপরই হাসতে লাগলেন, অনাবিল হাসি। যমুনার উদ্দেশে বললেন, আপনি একদম দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার কর্তার বন্ধুটি কলকাতায় ফিরে গেলেও, আমি তো আছি সমস্তিপুরে। সব ছেড়ে দিন আমার ওপর। যমুনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এই প্রথম তাঁকে হাসতে দেখলেন অবিনাশ।

ভরসা পাওয়ার হাসি।

অবিনাশ পিছু হটে দরজার দিকে এগোচ্ছেন, সামন্তর কথা এখনও শেষ হয়নি। যমুনাকে বলছেন, কী নাম রাখলেন মেয়ের?

খুবই সহজ, স্বাভাবিক কথোপকথন। তবু কী অসম্ভব ধাক্কা লাগল অবিনাশের বুকে। নাম জিজ্ঞাসা তো দূরে থাক, এ-ঘরে ঢোকার আগে মেয়েটার দিকে একবারই ভাল করে তাকিয়েছিলেন অবিনাশ। যমুনা যে মেয়েটার নাম রেখে ফেলতে পারে, একথাটা মাথাতেই আসেনি। সামন্তর এসেছে। উনি সাধারণ মানুষের মায়া, আকাঙ্ক্ষাগুলো স্পর্শ করতে পারেন। তুলনায় অবিনাশ মানুষের থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন, ভাবলোকের বাসিন্দা।

সামন্তর কাছে একপ্রকার হেরে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অবিনাশ। যমুনা পিছু পিছু এল।

দুজনে আবার রিকশায়। রাস্তায় ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। রিকশার হুড তোলা। মেয়েটার কান্না আপাতত থেমেছে। খিদে পেয়েছিল। ওর মুখে ফিডিং বোতল ধরেছেন যমুনা। কাঁধব্যাগেই ছিল দুধের বোতল। সাহেব-সুবোর অফিসঘরে মেয়েকে দুধ খাওয়াতে কেমন জানি বাধো বাধো ঠেকেছে।

রিকশায় উঠে মেয়েকে খাওয়াতে খাওয়াতে যমুনা আড়চোখে অবিনাশকে দেখছেন, একটু যেন বেশি গম্ভীর। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় এতটা ছিলেন না। এরকমটা কিন্তু হওয়ার কথা নয়। সামন্তবাবু যথেষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন, ওঁর হাবভাব দেখে মনে হয়েছে ভরসা করা যায়; সত্যি বলতে, মেয়েটাকে পাওয়ার পর থেকে যে ভয়মেশানো অল্প বাতাস যমুনা বুকে চেপে রেখেছিলেন এতদিন, তার খানিকটা সামন্তবাবুর অফিসঘরের বাতাসে রেখে এসেছেন। বুকটা এখন অনেক হালকা লাগছে। কিন্তু অবিনাশ ঠাকুরপোর ভারমুখ দেখেই ফিরে আসছে ভয়। তাহলে কি সামন্ত সাহেবের কথায় কোনওই আশ্বাস পাননি ঠাকুরপো? হতেই পারে। বিচক্ষণ মানুষ, সামন্ত সাহেবের দেওয়া ভরসাটা ফাঁপা মনে হচ্ছে হয়তো, বিপদ তার মানে রয়েই গেল যমুনাদের মাথায়। অবিনাশ ঠাকুরপো হাতড়ে যাচ্ছেন নিষ্কৃতির রাস্তা।

এই সময় যমুনার আর একটা কথাও মাথায় আসে। বোধহয় তাঁর নিজের জন্যই সমস্যাটা এমন জটিল হয়েছে। তিনি সমস্তিপুরে আসার আগে এমন একটা কাজ করেছেন, যা কাউকে বলেননি। অবিনাশ ঠাকুরপোর কাছেও গোপন করে গেছেন। এখন মনে হচ্ছে কথাটা গোপন করা ঠিক হয়নি। অবিনাশ ঠাকুরপো, সামন্তবাবু যদি কৃতকর্মটা জানতেন, সহজেই দিশা পেতেন একটা।

সেকেন্ড লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গেল রিকশা। আর কিছুটা এগোলেই বাড়ি। কথাটা অবিনাশ ঠাকুরপোকে বলে নেওয়া উচিত। গলা ঝেড়ে শুরু করেন যমুনা, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি।

অন্যমনস্ক হয়েছিলেন অবিনাশ। যমুনার গলা পেয়ে সংবিৎ ফেরে। বলেন, কিছু বলছ?

হ্যাঁ, একটা কথা আমার আগে বলা উচিত ছিল।

কী কথা?

জানি, শুনলে রাগ করবেন। তবু বলাটা বোধহয় দরকার। বলে, সময় নিচ্ছেন যমুনা। ভ্রূ কুঁচকে গেছে অবিনাশের। মাঝে শুধু রিকশার চেনের কিড়কিড় আওয়াজ। দুবার ঘণ্টি বাজাল রিকশাওলা। যমুনা ধীরে ধীরে বলেন, আসলে ও পালায়নি। আমিই এসেছি পালিয়ে।

তার মানে। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে অবিনাশের। অপরাধ ও ভয়মেশানো দৃষ্টি তুলে যমুনা কিছু বলতে যাবে, দেখে, বাড়ি চলে এসেছে। বাড়িতে সবার সামনে একথা বলা যাবে না।

॥ পনেরো ॥

বাড়ি বসে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল অপূর্বর। আজ রবিবার। বিকেলে বরুণ,অংশুর দিদিমণি আসেনি পড়াতে। সন্ধে নেমে যেতে অপূর্ব দিদিকে বলে, একটু বেরোচ্ছি, বাজার-দোকান থেকে কিছু করার থাকলে বল।

এখনই তেমন কিছু আনার নেই। যদি জি টি রোডের দিকে যাস, লাইব্রেরির সামনে এই সময় মাছের বাজার বসে। ভাল দেখে একটা পাকা মাছ আনিস। এই কদিন তো তোকে চারা, পুঁটি খাইয়ে গেলাম। বলে, টাকা বার করে দিয়েছিল দিদি।

অপূর্ব নেয়নি। বলেছে, থাক আমার কাছে আছে।

বাবাঃ, তুই কোথায় পেলি টাকা। মজা করে জানতে চেয়েছিল দিদি।

উত্তরে নকল গর্বে অপূর্ব বলে, তোর ভাইকে যতটা বেকার ভাবিস, ততটা কিন্তু নয়। খুচখাচ রোজগার সে-ও করে।

দিদি আর কথা বাড়ায়নি। বলেছে, ঠিক আছে যা। তাড়াতাড়ি ফিরিস। নইলে আবার চিন্তা হবে।

অপূর্ব বেরোতে যাবে, মাছের ছোট থলি নিয়ে বরুণ এসে হাত ধরল। পাশে থেকে কখন যেন শুনে নিয়েছে, মা আর মামার কথোপকথন।

বরুণের হাত ধরে অপূর্ব এখন জি টি রোড ধরে হেঁটে যাচ্ছে। জি টি রোডের এক ধারে গঙ্গা। একপাশে বসত। সন্ধের দিকে এই রাস্তায় বেশ মনোরম হাওয়া বয়। কিছু দূর অন্তর বাঁধানো ঘাট। সেখানে ইতস্তত লোকজন। হাওয়া খেতে এসেছে। নদীর বুকে অন্ধকার নেমেছে বলে জল দেখা যাচ্ছে না। ঘাট পারাপারের নৌকোর আলো দুলছে। দূরে বালি ব্রিজের আবছা আভাস। ওপারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মাথায় ডুম জ্বলছে। তার পাশে বাড়ি, ঘর, কারখানা, চিমনি থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া—সব মিলিয়ে গোটা দৃষ্টিপথ জুড়ে আপাত নিস্তরঙ্গ, শান্ত আবহ। গঙ্গার মৃদু ঢেউয়ের অনুষঙ্গে ক্ষণিকের জন্য অপূর্বর মাথা থেকে উড়ে যাচ্ছে ভয়। মনে হচ্ছে খামোকা আমি এতদিন দিদির বাড়িতে ঘরে বসে কাটালাম। দিদি বেচারি দোকান-বাজার সব করেছে। ভাগ্যিস বাড়ি থেকে দু'পা গেলেই রাখালের সবজির দোকান আর মাছওলা বেলার দিকে মাছ দিয়ে যায় বাড়িতে। এইভাবেই কটা দিন চালিয়েছে দিদি, অপূর্বকে জোর করেনি বাজার যেতে। জামাইবাবু বাজার করতে খুব ভালবাসে। রোজ সকালে বেছে বেছে টাটকা সবজি, মাছ নিয়ে আসে। দিদি খুব গুছিয়ে নানান পদ রাঁধে। ওদের মধ্যবিত্ত সংসারে ওইটুকুই যা শৌখিনতা।

অপূর্বর বাইরে বেরোনোর অনীহাটা টের পেয়েছে দিদি। আগে যখন দেবপাড়ায় এসেছে, জামাইবাবুর সঙ্গে বাজার গেছে। রেললাইনের ওপারে আনন্দপুর গ্রামে শস্তায় চাল পাওয়া যায়। সাইকেল করে গিয়ে এনে দিয়েছে। দিদি বলেছে, কী দরকার অতটা দূর সাইকেল ঠেঙানোর। ক'পয়সা আর সাশ্রয় হয়!

সেই দিদিই আবার জামাইবাবু অফিস থেকে ফিরলে ভাইয়ের গর্বে গরবিনী হয়ে চালের থলে দেখিয়ে বলেছে, দেখেছ, অপূর্ব কত শস্তায় চাল এনে দিয়েছে। একটাও কাঁকর নেই।

এবার দিদি একবারই টুকেছিল, কেন সে ঘরে গুটিয়ে বসে আছে? অপূর্ব অস্পষ্ট একটা অজুহাত দেয়। দিদি নিজের মতো কিছু বুঝে নিয়েছে। জোর করেনি বাইরে বেরোতে। অপূর্বরই ক্রমশ একঘেয়ে লাগতে শুরু করল।

দিদির বাড়িতে রোজ একটা বাংলা খবরের কাগজ আসে। এই কদিন খুঁটিয়ে পড়েছে অপূর্ব, তীর্থর ধরা পড়ার কোনও খবরই নেই। যেন ঘটেইনি কিছু। বদলে মূর্তি ভাঙার দু-একটা খবর ছাপা হয়েছে। ঘটনাগুলো কোনওটাই কলকাতা শহরে ঘটেনি। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলা শহরে। মাঝে একদিন এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদকীয় লেখা হল কাগজে। সম্পাদক মনে করছেন, নকশাল আন্দোলন বিলীন হয়নি, এটা মনে করিয়ে

দেওয়ার জন্যই এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এ এক ধরনের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা। রক্তপাতহীন এই নিধনক্রিয়া, আদপে রক্ত কিন্তু ঝরাচ্ছেই সাধারণ শান্তিকামী মানুষের বুকে।

হবেও বা। যেসব স্কোয়াড মূর্তি ভাঙছে, তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই অপূর্বর। মনীষীর মূর্তি ভাঙা নিয়ে নিজেদের স্কোয়াডে কোনও আলোচনা হয়নি এখন পর্যন্ত। যদি ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অপূর্ব কি পারবে? আচমকা কয়েকজন মনীষীর মুখ ভেসে ওঠে মনে, তাঁরা ধাতব বা সিমেন্টের নন, জীবন্ত। তাঁরাও যেন জিজ্ঞেস করে ওঠেন, পারবে? অপূর্ব পারবে ভাঙতে?

ও মামা, তোমার কি গাড়ির আলোতে কষ্ট হচ্ছে? হাতে আলতো টান মেরে জানতে চাইল বরুণ।

ভাবনা থেকে ফেরে অপূর্ব, খেয়াল করে উলটোদিক থেকে আসা বাসের জোরালো হেডলাইট এড়াতে সে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে। এরকম হয়তো আগেও করেছে কয়েকবার। সেই দেখেই বরুণ কথাটা বলল।

গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বাসটা। নেমে এল আবছা অন্ধকার। অনেকটা তফাতে জি টি রোডের হলুদ স্ট্রিট লাইট। দু-একটা আবার জ্বলছে না। গঙ্গার মাথায় আধখাওয়া নিস্তেজ চাঁদ। হাঁটতে হাঁটতে ভাগ্নের ধরে থাকা হাতটা দুলিয়ে অপূর্ব বলে, আমাদের মছলন্দপুরে তো এত গাড়িঘোড়া নেই, তাই জোরে আলো চোখে লাগে৷

ওখানে গাড়িঘোড়া নেই কেন? বরুণের সরল প্রশ্ন।

অপূর্ব বলে, ওটা যে গ্রাম। ওখানে বড় বড় গাড়ি চলে না। এখানকার মতো পাকা রাস্তা নেই। তারপর ধর ওখানে কত ভূত, পেতনি, শিয়াল, বাঘ, পেঁচা—গাড়ির আলোতে ওদের অসুবিধে হয় খুব।

আমার মামারবাড়ি থাকতে খুব ভাল লাগে।

সে কী রে, তোর ভূতে ভয় নেই?

না। আমাকে একদিন ভূত দেখাবে মামা?

আর একটা বাস বিপরীত দিক থেকে আসছে। এবার আর মুখ ঘোরায় না অপূর্ব। বরুণকে বলে, দেখাব। তবে তেনাদের দেখা পাওয়া এখন ভার।

কেন, ভার কেন?

মানুষরা তো ভারী বদমাইশ, এখন সব লম্বা লম্বা তেজালো টর্চ হয়েছে, সেগুলো জ্বেলে ভূতেদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ভূতেরা চলে গেছে আরও গভীর জঙ্গলে। বরুণের যেন একটু মন খারাপ হয়ে যায়। অপূর্ব বলে, আমাদের আগের গ্রামে আরও অনেক ভূত ছিল।

আগের গ্রামটা কোথায়?

খানসামা। ওপার বাংলায়। তোর বয়সে আমি ওইখানেই ছিলাম।

মামার দিকে মুখ তুলে বরুণ জানতে চায়, ওপার বাংলাটা কি গঙ্গার ওপারে?

হেসে ফেলে অপূর্ব। সত্যি শিশুমনের কী সরল হিসেব! ভাগনেকে বলে, না রে, গঙ্গার ওপারে নয়। এরকম আরও অনেক নদী পেরিয়ে খানসামা গ্রাম।

সেখানে ভূত-পেতনি বেশি থাকে কেন?

সেই গ্রামে অনেক গাছপালা, ধু ধু মাঠ, গরুর গাড়ি, মাটির রাস্তা... বলতে বলতে নিজের কৈশোরটাকেই যেন ছোঁয়ার চেষ্টা করে অপূর্ব। বরুণ মুখটা তুলেই রেখেছে, দুবার হোঁচট খায়। ভাগনেকে সামাল দেয় অপূর্ব। স্মৃতির সরণী ছেড়ে অপূর্ব এবার ছোট্ট ভাগনেটার জন্য বর্ণনার মধ্যে গল্পের মিশেল দেয়, আমরা জানিস তো ভূতেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতাম।

ধ্যাত! মিথ্যে কথা। বলে, বরুণ।

আজকালকার বাচ্চা তো, সহজ গুল মেরে পার পাওয়া মুশকিল। আর এক দফা চেষ্টা করে অপূর্ব, সত্যি রে। আমাদের গ্রামে ছিল অনেক বাতাবিলেবু গাছ। এত বাতাবি ফলত, খেয়ে শেষ করতে পারতাম না। শেষমেশ গরু-ছাগলে খেত। বাতাবি নিয়ে ফুটবল খেলতাম। অল্প বয়সি ভূতেরা আমাদের সঙ্গে জুটে যেত।

যারা খেলা দেখত, ভয় পেত না? মোক্ষম প্রশ্ন করল বরুণ।

একটু অপ্রস্তুত হয় অপূর্ব, গল্পটা সে কিন্তু চালিয়ে নিয়ে যাবে। ভাগনের সঙ্গে গল্পের রাজ্যটাকে সে বেশ উপভোগ করে। কত গল্প যে বলতে হয়েছে বরুণকে। অপূর্ব বলে যায়, আমাদের খেলা কে দেখবে। শহরের লোকেদের মতো গ্রামের মানুষের অত সময় নেই খেলা দেখার। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু বাবা যখন স্কুল ফেরত মাঠের পাশ ধরে হেঁটে যেতেন, উধাও হত ভূতগুলো। একটা ভূতকে হয়তো বল পাস করলাম, হঠাৎ দেখি নেই। তার মানেই বাবা ফিরছেন।

তোমার বাবাকে দেখে ভূতগুলো ভয় পেত?

আমার বাবা তোর দাদু হয়। দাদু বল।

কেন?

চুপ করে থাকে বরুণ। দাদুকে সে কোনওদিন দেখেনি, চেনে না। অপূর্ব বলে, তোর দাদু ছিলেন খুব তেজস্বী মানুষ, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ফতুয়ার আড়ালে ধবধবে পৈতে উঁকি মারত। উনি যখন কথা বলতেন, মনে হত যেন মেঘ ডাকছে। ভয় পাবে না ভূতেরা! উত্তর না দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বরুণ। মাথা নিচু, মামার হাতটা ছাড়েনি। কল্পনার জাল বিস্তার হচ্ছে ওর মনে। কল্পনা দিয়ে আঁকছে দাদুর চেহারা, গ্রাম, মাঠ, ভূত... ওর বয়সে অপূর্বরও ছিল কল্পনার বৃহৎ জগৎ। ছোটবেলায় বাস্তব প্রেক্ষাপট এতবার বদলেছে, এগ্রাম থেকে সে-গ্রাম, ওদেশ থেকে এদেশ। প্রতাপশালী হেডপণ্ডিত বাবার এপারে এসে বাংলার মাস্টারমশাই হয়ে যাওয়া, দাদার উদয়াস্ত পরিশ্রম, দারিদ্র... কখন যেন অলীক জগৎ বিদায় নিল অপূর্বর কাছ থেকে। তবু স্পর্শ লেগে আছে চেতনায়।

তীর্থঙ্করের বিশ্বাস অন্য রকম। ও বলে, বাচ্চাদের মন থেকে ভূত তাড়ানোর মতো কল্পনার জগৎটাকে বিদায় দেওয়া উচিত। অযথা কোনও মানুষকে বড় করে দেখানো ঠিক নয়। তবেই ওরা বড় হয়ে কঠিন বাস্তবকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে।

কথার সঙ্গে কাজ নিষ্ঠুরভাবে মেলাত তীর্থ। দু-চার দিনের জ্বরে ওর বড়দা হঠাৎ মারা গেছে, অপূর্ব তখন পার্টির কাজে বাইরে। ফিরে এসে দেখা করতে গিয়েছিল ওর বাড়িতে। তখন সন্ধে। দাওয়ায় বসে দুই বন্ধুতে কথা বলছে, যতবারই অপূর্ব ওদের বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ দেখাচ্ছে, কথা ঘুরিয়ে তীর্থ চলে যাচ্ছে অন্য প্রসঙ্গে। রাজনীতির কথাই হচ্ছিল বেশি। এমন সময় ওর ছোট্ট ভাইপোটা দুজনের মাঝে এসে দাঁড়ায়। ভাইপো অন্তু খুবই প্রিয় তীর্থর। ওকে কোলে এনে বসায়, জিজ্ঞেস করে কিছু বলবি অন্তু?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্তু বলে, ছোটকা, আমার বাবা কি তারা হয়ে গেছে? প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল তীর্থ। অন্তুকে বলে, তোকে কে বলেছে একথা?

মাসি আর ঠাম্মা বলেছে বাবা নাকি আবার জন্মাবে আমাদের বাড়ি। সত্যি ছোটকা? কোল থেকে নামিয়ে অন্তুকে মুখোমুখি বসিয়েছিল তীর্থঙ্কর। বলতে শুরু করে, শোন অন্তু তোর বাবা মানে আমার বড়দা মারা গেছে। মানুষ মারা গেলে তারাও হয় না, জন্মায় না। শেষ হয়ে যায়। আমরা...

কথার মাঝে বাধা দিয়ে অপূর্ব বলে উঠেছিল, কী হচ্ছে কী তীর্থ . .

দুম করে রেগে ওঠে তীর্থঙ্কর। বলে, তুই চুপ কর অপু। আমাকে বলতে দে। ছোট থেকে এদের মাথায় কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিলে, লড়াই করার অবস্থায় নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যাবে। এখন থেকে বাস্তবটা জানুক।

তীর্থই হয়তো ঠিক। অপূর্ব এতটা নির্মম হতে পারে না। পুলিশের হেফাজতে তীর্থ এখন কেমন আছে কে জানে! আজও বেঁচে আছে কি? ও মরে গেলে অন্তু আকাশে ওর কাকাকে খুঁজবে না। সেটা কি ভাল?

রাস্তাটা এবার বেশ আলোকিত হয়ে উঠছে। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায় অপূর্বর। বাজার এলাকায় এসে পড়েছে। দুপাশে দোকানপাট, গঙ্গা চলে গেছে আড়ালে। মানুষজনের ভিড়। বাস, প্রাইভেট গাড়ি চলছে ধীরে। দেবপাড়ায় পলিটিক্স করা লোকজন অপূর্বকে চেনে না।

এখানে অনায়াসে স্বচ্ছন্দ থাকতে পারে। তবু একটা অস্বস্তি রয়েই যাচ্ছে, কেউ বুঝি অনুসরণ করছে ঠিক। এই অস্বস্তিটা কি আজীবনের সঙ্গী হয়ে গেল?

দিদি বলছিল, দেবপাড়াতে থেকে যা, বাচ্চা দুটোকে পড়া আপাতত। জামাইবাবু তোর জন্য ছোটখাটো একটা চাকরি দেখে দেবেখন। —প্রস্তাব মন্দ নয়। আবার ততটা নিরাপদ নয় অবশ্যই। দেবপাড়ার পাশেই বালি, অপূর্বদের পার্টি ওখানে খুবই অ্যাকটিভ। পুলিশি দমন মারাত্মক। দেবপাড়া থেকে বালির যোগসূত্র খালের ব্রিজ। সন্ধেবেলা কোনও ইয়াং ছেলে সেটা পার হতে গেলেই পুলিশে ধরে। বছরখানেক আগে দিনের বেলাতেও ধরত। বালির দুজন নেতা অপূর্বর চেনা। ওঁরা মছলন্দপুরে পার্টির গোপন মিটিংয়ে গেছেন। দুজন খুবই সাহসী, একরোখা, অপূর্ব শুনেছে ওঁরা বালিতেই আছেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। চুটিয়ে সংগঠন চালাচ্ছেন। বালির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বুকে ঠুসে দিচ্ছেন বারুদ। ওঁদের সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছে হয়। এখানে থাকলে ওঁদের ডেরাই হবে অপূর্বর জন্য সঠিক আস্তানা। অগ্নিগর্ভ বালির আঁচ দেবপাড়ার গায়ে লেগে থাকে। আগুনের টুকরো হয়ে অপূর্বর বেশি দিন দিদির বাড়ি থাকা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু বালিতে সে যাবে কী করে, খালটা পার হতে গেলেই পুলিশ জেরা করছে।

মামা, ওই তো মাছের দোকান। আঙুল তুলে দেখাল বরুণ।

উঁচু মাচার ওপর সার সার মাছের দোকান। প্রত্যেক ডালার ওপর জোরালো বাল্ব জ্বলছে। চকচক করছে মাছের গা। দোকানের সামনে ভিড়। মাছের চেহারা, জাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ দামি। রুই, কাতলা, মৃগেল তো আছেই, চিংড়ি, ভেটকি, ইলিশ... সব বিশাল বিশাল সাইজ।

বিকেলে এ-বাজারে দামি মাছ-ই আসে। হামলে পড়ে কিনছে লোকজন। কেনার এই আগ্রহ এবং ক্ষমতা দেখলে অপূর্বর কেমন জানি সন্দেহ হয়, তাদের আন্দোলন কি অপ্রাসঙ্গিক!

নিজেও কিনতে এসেছে আজ। টাকাটা তার নয়, পার্টির। প্রবাল সামন্তকে নিকেশ করার ফান্ড। এখনও কিছু টাকা বেঁচে আছে। দিদির বাড়িতে এতদিন খেল অপূর্ব। একটা মাছ কেনাই যায়।

ভিড় কম মাছের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা নধর কাতলার দিকে তাকিয়ে ছিল অপূর্ব, মরার পরও বালবের আলোতে কী জৌলুস মাছটার। কবে মরেছে কে জানে! এমন সময় ঘাড়ের পিছনে, আরে, আপনি এখানে!

পিঠের সিরসিরানিটা শুরু হয়েই থেমে গেল। কারণ, কণ্ঠটি মহিলার। ঘাড় ফেরায় অপূর্ব। দেখে, অংশু বরুণের দিদিমণি। তার হাতেও বাজারের থলে, চোখে অপ্রত্যাশিত খুশি। মুখে হাসি টেনে অপূর্ব বলে, আপনিও মাছ কিনতে নাকি?

না, আমি টুকটাক বাজার সারব। আমাদের বাড়ি তো এই কাছেই। বলে, দিদিমণি নিচু হয়ে অপূর্বর হাত ধরা বরুণকে আদর করে। অপূর্ব জানে এই টকেটিভ মেয়েটি এক্ষুনি অনিবার্যভাবে বলবে, চলুন না, আমাদের বাড়িতে একবার। কাছেই তো। প্রস্তাবটা অনেক টালবাহানা করে কাটাতে হবে অপূর্বকে।

দিদিমণি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আন্দাজমতো কথা বলে না। বলে, মাছ নেওয়া হয়ে গেছে আপনার?

না, এখনও হয়নি। কেন?

চলুন না, আমাদের লাইব্রেরিটা দেখিয়ে আনি। আগে গেছেন কখনও?

মাথা নাড়ে অপূর্ব। দেবপাড়ার প্রাণবল্লভ লাইব্রেরির খুব নাম। গঙ্গার ধারে জমিদারের দান করা বিশাল বাড়িতে সরকারি লাইব্রেরিটা। যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি।

চলুন। ঘুরেই আসি। বলে অপূর্ব। বরুণ হাতটা একটু টেনে ধরেছে। বেড়াতে এসেও দিদিমণির উপস্থিতি তার বোধহয় ভাল লাগছে না। অপূর্ব হেসে ফেলে বরুণকে বলে, চল না, গঙ্গার ধারটা একটু ঘোরাও হবে, ঘাটে যদি ইলিশ ওঠে কিনে নেব।

এই আপনি কী করে জানলেন আমাদের লাইব্রেরি ঘাটে ইলিশ ওঠে? সবিস্ময়ে জানতে চায় বরুণের দিদিমণি।

মেয়েটির নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না অপূর্বর। উত্তরে বলে, জামাইবাবু বলেছেন।

মেয়েটি হাঁটা শুরু করেছে। সামান্য দূরে রাস্তার ওপারে লাইব্রেরির গেট। গেট না বলে তোরণ বলাই বোধহয় ভাল। মেয়েটি বলে যাচ্ছে, আপনার জামাইবাবু মানুষটি দারুণ। দিদিও খুব ভাল। এত আপন করে নেন! এরকম ফ্যামিলি ইদানীং...

নন স্টপ বকে মেয়েটা। প্রথম দিন আলাপে সেটা বুঝেছিল অপূর্ব। তারপর থেকে এড়িয়ে গেছে। আজ কেন জানি মনে হল একটু খোলামনে আড্ডা মারা যাক। সিদ্ধান্তটা কি ভুল নেওয়া হয়ে গেল? সামনের কিছুটা সময় কান ঝালাপালা করে দেবে দিদিমণিটি।

লাইব্রেরি গেটের উলটোদিকে এসে রাস্তা পার হয় অপূর্বরা। মেয়েটি বরুণের হাত ধরে নিজের কাছে নিতে যায়। কায়দা করে হাত ছাড়িয়ে বরুণ থেকে যায় মামার কাছে।

গেট পার হয়ে লাইব্রেরি চত্বরে ঢুকে এসেছে অপূর্বরা। চওড়া রাস্তা। অনেক গাছপালা। পাখিদের হইচই। বিশাল বিশাল থামওলা পুরনো স্থাপত্যের জমিদারবাড়ি। সামন্ত প্রভুরা আর কিছু না করুক এরকম বেশ কিছু বাড়ি রেখে গেছে ভারতবর্ষে। বেশ একটা আলাদা জগৎ। পুরনো সময় থমকে আছে যেন।

এখানে এসে বেশ একটা রিলিফ বোধ হচ্ছে অপূর্বর। মনের কোণে একটাই খচখচানি, মেয়েটার নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। ইদানীং এটা হয়েছে অপূর্বর, কমন কিছু নাম হঠাৎ হঠাৎ ভুলে যাচ্ছে। নাম খোঁজাটা থেকে নিজের মনের কাছে রেহাই চায় অপূর্ব, বড্ড চাপ পড়ে যাচ্ছে মাথায়।

মাঝখানে বরুণকে নিয়ে ধনুকের মতো রাস্তাটা ধরে হেঁটে যাচ্ছে অপূর্বরা। লাইব্রেরির এন্ট্রান্স সম্ভবত গঙ্গার দিকে মুখ করে। মেয়েটা বকে যাচ্ছে, বলে যাচ্ছে, এই বাড়ি এবং জমিদারের ইতিবৃত্ত। কত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, এই বাড়িতে কোন কোন মনীষী এসেছেন। আগে এটা দাতব্য হাসাপাতাল ছিল....

কোনও কথাই তেমন কানে নিচ্ছে না অপূর্ব। দিদিমণিকে থামানোর জন্যই এক সময় বলে ওঠে, আচ্ছা, তখন থেকে আপনি আমাদের লাইব্রেরি, আমাদের লাইব্রেরি করছেন কেন? ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না।

মেয়েটি সটান তাকায় অপূর্বর দিকে। ছদ্ম অভিমানে বলে, আপনিই বা তখন থেকে আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন? দিদির বাড়িতে তো তুমি বলছিলেন। অপ্রতিভ হয় অপুর্ব। বলে, সরি তুমি। তা আমার প্রশ্নটার উত্তর দাও।

কেন বলব না আমাদের লাইব্রেরি, দেবপাড়ার লোকেদের কত গর্ব জানেন এই লাইব্রেরিটাকে নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রন্থাগার এটা।

অপুর্ব ভাবে, সত্যি 'আমাদের' ফিলিংটা এদের কত সহজ এবং আন্তরিক। সে অর্থে অপূর্বর এদেশের কোনও অংশই নিজের মনে হয় না। শুধু কষ্টে, দুর্দশায় থাকা মানুষগুলোকে মনে হয় আপনার লোক। আমার মতোই।

সিরিয়াস ভাবনার মাঝে অপূর্ব লক্ষ করে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছে। সপ্রশ্ন চোখে তাকায় অপূর্ব।

মেয়েটি বলে, আর একটা কথা আপনাকে বলা হল না।

কী কথা? জানতে চায় অপূর্ব।

আমার না এই বাড়িতেই জন্ম হয়েছিল। তখন হাসপাতাল ছিল এটা। তার কিছুদিন পরে সরকার এটাকে লাইব্রেরি করবে বলে অধিগ্রহণ করে।

সত্যি! তাই বুঝি তুমিও পড়ানোর লাইনে চলে এসেছ। বলে, অনেকক্ষণ পর, নাকি অনেকদিন বাদে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে অপূর্ব।

লজ্জা পায় বরুণের দিদিমণি। বলে, আপনি না ভারী অসভ্য।

অপূর্ব অনেক চেষ্টাতেও নিজের মন্তব্যে কোনও অসভ্যতা আবিষ্কার না করতে পেরে,

আর এক দমক হেসে নেয়।

মেয়েটা বলে, খুব হাসা হচ্ছে না! হাসিটা সুন্দর বলে, খুব অহঙ্কার!

দিদিমণি নির্ঘাত প্রেমে পড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে আরও একবার হেসে ফেলছিল অপূর্ব, অনেক কষ্টে সামলায়, প্রেম নিয়ে প্রকাশ্যে পরিহাস শোভন নয়।

অপূর্বরা এখন অতি চওড়া সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির মতোই চওড়া সিঁড়িটা। এটাই লাইব্রেরির সম্মুখভাগ।

সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে অপূর্ব লক্ষ করে, দোতলার বাঁদিকে গাছপালা মোড়া সুন্দর একটা ঝুলবারান্দা। জমিদারবাবু নিশ্চয়ই ওই বারান্দায় বসে নদীর শোভা উপভোগ করতেন। ঢিমেতালে সন্ধে নামত। বেড়ে কাটিয়েছেন সময়টা। এখনকার বড়লোকরা ইচ্ছে করলেও পারবেন না সেই শোভা উপভোগ করতে। নদীর দুপারেই এখন নগর।

লাইব্রেরির দরজায় গিয়ে জানা গেল, মিনিট দশেক পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এখন আর নতুন করে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দিদিমণি স্পষ্টত হতাশ। বলে, কী হবে এখন? আর একদিন আসবেন আমার সঙ্গে?

তুমি এখানে জন্মেছ বললেও ঢুকতে দেবে না আজ!

রসিকতার উত্তরে দিদিমণির আলতো চাঁটি খায় অপূর্ব। বরুণ মাঝখানে বলে ওঠে, চলো না মামা, গঙ্গার ধারে যাই।

তাই চল। বলে, অপূর্বরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। লাইব্রেরির মাথার আলোটা ঘাট ছুঁতে পারেনি। নদীকে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওপারে শহরের আবছা অবয়ব দেখা যাচ্ছে দিব্যি। আলোটালো জ্বলছে। মাঝে নীরব অন্ধকারে বয়ে চলেছে নদী, ওর ভাঁড়ারে কত গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়ের স্মৃতি!

ঘাটে এসে দেখা গেল, শেষ ধাপের আগের ধাপে বসে আছে এক যুগল। ব্যস, আর কেউ নেই। এখানে এসে নদীটা দেখা যাচ্ছে। আবছা আলো পড়ে আছে জলে, সিঁড়িতে। আলোর উৎস ধরা যাচ্ছে না। সন্ধে উতরে গেলেও, সারা দিনের আলোর ভাপ রয়ে গেছে হয়তো। জলগন্ধী হাওয়াতেও অবশিষ্ট রয়েছে দিনের তাপ।

ঘাটের পাশে নৌকো বাঁধা। নৌকোটা এত বড়, গঙ্গার মৃদু ঢেউ তাকে দোলাতে পারছে না। পাটাতনে চলছে মাঝিদের রান্নার তোড়জোড়। উনুন জ্বলছে, রুটি বেলছে একজন। নৌকো থেকেই ভেসে আসছে রেডিয়োর হিন্দি গান।

কী হল, বসবেন না! বরুণের দিদিমণির গলায় আহ্বান।

হুঁশ ফেরে অপূর্বর। বলে, বসাই যায়।

দিদিমণি এগিয়ে যায় সিঁড়ির ধারে, সেখানে গোল চাতাল। তিন জনে বসে। বরুণ এখন আর দুজনের মাঝে নেই, মামার পাশে বসে গালে হাত দিয়ে নৌকোর দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা বয়সের আন্দাজে বেশি শান্ত। কথা বলে খুব কম। যেটুকু বলে বেশ গুছিয়ে। ওইটুকু মাথায় সর্বক্ষণ কী যেন ভাবে আর দেখে। ও কি বড় হয়ে দার্শনিক হবে? ভাগনের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে অপূর্ব ভাবে, এবার দিদিমণির নামটা জিজ্ঞেস করে নিলে হয়। খুব কি আঘাত পাবে? পাওয়ারই কথা। আর একটু অপেক্ষা করা যাক, যদি কথায় কথায় বেরিয়ে আসে নামটা।

কথা চালানোর জন্যই অপূর্ব বলে, এই নৌকোটা নিশ্চয়ই মাছ ধরার নয়, এত বিশাল ...

ঠিকই ধরেছেন, এই টাইপের নৌকোয় বালি তোলা হয়। চরা কাটে এরা। কদিন হল এসেছে। শীত পার করে যাবে। ওদের রান্নাবান্না, ঘর-সংসার সব ওই নৌকোতেই। ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ ওই কাঠের পাটাটা। ওই যে দেখছেন, নৌকো থেকে একটা তক্তা সিঁড়িতে নামানো... দারুণ না!

দারুণ কী অর্থে?- - জানতে চায় অপূর্ব।

বাঃ রে, কত সুন্দর জলের ওপর সংসার। ছোটবেলায় যখন ঘাটে আসতাম বেড়াতে, কল্পনা করতাম বড় হয়ে নৌকোতে সংসার করব। ইচ্ছেমতো ভেসে পড়ে নোঙর ফেলব

অন্য ঘাটে। সংসার করাও হবে, বেড়ানোও হবে।
তাহলে তো মাঝিকে বিয়ে করতে হয়।
করতাম।
মেয়েটার আদিখ্যেতা জব্দ করতে অপূর্ব বলে, ভাল করে লক্ষ করো, ওই নৌকোটায় কোনও মহিলা নেই। মাঝিরা কোন দূরদেশে ওদের মা-বাবা, বউ, ছেলেমেয়ে ফেলে এসে এখানে দিনমজুরি করছে। ওরা মোটেই সুখে নেই।
সুর কেটে যায়। নিরাশ ভঙ্গিতে মেয়েটি বলে, আপনি না ভীষণ আনরোমান্টিক। আপনি কেন এমন বলুন তো? আপনার দিদির বাড়িতে প্রথম দিন বেশ কথা বললেন, তারপর থেকেই গোমড়ামুখো। কী হয়েছে আপনার?
উত্তরে অপূর্ব হাসার চেষ্টা করে মাত্র। মেয়েটি ছাড়ার পাত্রী নয়। আবার শুরু করে, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কারও ওপর রাগ করে দিদির বাড়ি ঘাপটি মেরে বসে আছেন। কার ওপর এত রাগ মশাই? সে কে?
বকতে পারে বটে মেয়েটা! প্রশ্নগুলোও বড্ড মোটা দাগের। ওকে থিতিয়ে দেওয়ার জন্য অপূর্ব বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?
করুন।
তুমি যে বললে, তোমার বাড়ি কাছেই। বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে, এখানে কেন নিয়ে এলে আমাকে?
ওষুধে কাজ হয়েছে। চুপ করে আছে দিদিমণি। উঃ, কেন যে মেয়েটার নাম মনে পড়ছে না অপূর্বর। মেয়েটা চোখ তোলে। বলতে থাকে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কী হবে বলুন, দেখার তো কিছু নেই। শরিকি বাড়ির একটেরে আমরা থাকি। গত পঁচিশ বছর আমাদের পোরশানে কোনও রিপেয়ার হয়নি। ভাঙা মেঝে, খোবলানো দেওয়াল। সন্ধের পর থেকে একটা ঘরেই থাকার চেষ্টা করি আমরা, একটাই বাল্ব জ্বালানোর সামর্থ্য আমাদের। বাবা রিটায়ার্ড। মা চিররুগ্ণ। আমার আর বোনের টিউশানিতেই সংসার চলে। আমাদের কোনও ভাই বা দাদা নেই। আপনি বলুন, এসব কি দেখানোর জিনিস?
নৌকো থেকে ভেসে আসছে মুকেশের গান, জানে কাঁহা গয়ে ওহ দিন/ কহতে থে তেরি রাহ মে/ নজর কো হম... সিচুয়েশনের সঙ্গে গানটার মানে মিলছে না। অপূর্ব বলে, তোমাদের মতো পরিবার এ-দেশে সত্তর ভাগ। কুড়ি শতাংশ সরকারি কেরানি, অফিসার। বাকি দশ বড়লোক। এ নিয়ে এত হীনম্মন্যতার কী আছে! আমিও তো বেকার, আমাদের মছলন্দপুরের বাড়িও সচ্ছল নয়। দাদার একার রোজগারে সংসার চলে।
আমার কেন জানি মনে হয়, আপনি বেকার নন।
মানে।— ভীষণ অবাক হয়ে জানতে চায় অপূর্ব।
মেয়েটা হেলে পড়ে অপূর্বর গায়ে। বলে, আপনার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, খুব কেজো, কর্মঠ মানুষ আপনি।
এখনও অর্থটা উদ্ধার হয় না। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাতে যায় অপূর্ব, মুখটা বড্ড কাছে চলে এসেছে। ওর গরম নিশ্বাস পড়ছে অপূর্বর গায়ে। মেয়েটা বলে যায়, আপনি নিশ্চয়ই ব্যবসা-ট্যবসা কিছু করেন। খুব ঘোরা আর খাটুনির কাজ। কদিন বিশ্রাম নিতে এসেছেন দিদির বাড়িতে।
মেয়েটার কল্পনাশক্তি দেখে হতবাক হয়ে আছে অপূর্ব। কখন যেন একটা হাত অপূর্বর উরুর ওপর তুলে দিয়েছে মেয়ে, নখ দিয়ে কী যেন আঁকছে, ফের মুছে দিচ্ছে। ক্রমশ ক্যানভাস বড় করে নিচ্ছে মেয়েটা। বলে যাচ্ছে, আপনার দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কী করেন আপনি? বললেন, ঠিক জানি না। তবে কিছু করে তো নিশ্চয়ই। খুব ঘোরাঘুরি করে, রোজগার স্থায়ী হয়ে গেলে হয়তো বলবে।
অপূর্ব ভাবে খামোকা তার নামে হাওয়া তুলেছে দিদি, সেই হাওয়ায় নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠেছে মেয়েটা। এর স্বাস্থ্যে দারিদ্রের কোনও চিহ্ন নেই, সৌরভটাও ভারী

আকর্ষণীয়। কেমন যেন নেশা ধরে যাচ্ছে অপূর্বর। মেয়েটার হাতের ভাষা একদম পালটে গেছে, বুকের কাছে মুখ রেখে মেয়েটা বলছে, আপনাকে আমার ভীষণ পুরুষ পুরুষ লাগে। বেকারদের মতো হতাশ ভাব নেই একদম।

অপূর্বর ভেতরটা শক্ত হয়ে গেছে। চোখের সামনে মেয়েটার অর্ধোন্মুক্ত বুক। আবছা আলোয় কী নরম আহ্বান! কিশোর বেলায় যৌবনের শুরুতে খেলাচ্ছলে মেয়েদের বুকে হাত দিয়েছে অপূর্ব। এই আহ্বানের মুখোমুখি হয়নি কখনও। কান গরম হয়ে পুড়ে যাচ্ছে, মেয়েটা ঠোঁট তুলেছে, হয়তো চুম্বনের প্রত্যাশায়। সেসব পূর্বরাগে যায় না অপূর্ব, সরাসরি হাত ঢুকিয়ে দেয় ওর ব্লাউজের ভেতর। কিছুদিন যাবৎ সে তো শুধু পেটো, বোমা, বন্দুক, ছুরিই ধরেছে এ হাতে। এই তালুর শুশ্রূষার জন্য নরম সুখ পাওনা।

কিন্তু কী গরম! মেয়েদের বুক এত গরম হয় অপূর্ব জানত না। হাতসুদ্ধু বুকটা চেপে ধরে আছে মেয়ে। নুয়ে পড়েছে অপূর্বর শরীরে। জ্বলে যাচ্ছে অপূর্বর তালু। হঠাৎই মনে পড়ে যায় মেয়েটার নাম, দীপালি।

ঘোর ভেঙে যায় অপূর্বর। মনে পড়ে বরুণের কথা। ঘাড় ফেরাতে দেখে, শূন্য। বরুণ নেই। কোথায় গেল?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় অপূর্ব। প্রবল আশঙ্কায় সিঁড়ির ঢালুতে তাকায়, একদম ফাঁকা। সিঁড়ি ডুবে গেছে জলে। সেই প্রেমিক যুগলকেও দেখা যাচ্ছে না। কখন যে উঠে গেছে, অপূর্বদের পাশ দিয়েই গেছে, টের পায়নি। একটা ভয় খামচে ধরেছে অপূর্বর বুক:- বরুণ! বরুণ! বলে ডাকতে গিয়েও ডেকে উঠতে পারছে না।

ডাক দেয় দীপালি, বরুণ, বরুণ কোথায় গেলে!

দীপালি সিঁড়ির ওপর দিকে উঠে যায়। ও অনেক পজিটিভ। জলে তলিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি। যদিও কণ্ঠস্বরে লেগে থাকা অসহায় উদ্বেগ গোপন করতে পারছে না। অপূর্ব পারছে না নিজের জায়গা থেকে নড়তে, মনে হচ্ছে একটু আগে এই চাতালে লেগে ছিল বরুণের অস্তিত্ব, এটাকে হারাতে চাইছে না সে। সদ্য চলে যাওয়া সময় আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কেন এত দুর্বল হয়ে পড়ছে অপূর্ব। পাপ বোধ? ছোট্ট ভাগনেটাকে খেয়াল না করে সে লোভের বশবর্তী হয়েছিল।

অনিশ্চয়তা হঠাৎই কেটে যায়, অপূর্বর চোখে পড়ে গেছে, নৌকোর পাটাতনে যে

উনুন জ্বলছে, যা ঘিরে বসে আছে কিছু মানুষ, ওদের মধ্যে এক কিশোরও বসে আছে উবু হয়ে।

আটকে রাখা শ্বাস ছেড়ে বুক হালকা করে অপূর্ব। পিছনের মাঠ থেকে দীপালির গলা ভেসে আসছে। ডেকে যাচ্ছে বরুণকে। অপূর্ব হাঁক দেয়।—দীপালি চলে এসো, বরুণ এখানে।

নৌকা থেকে যে-তক্তাটা ফেলা আছে সিঁড়িতে, তাতে কিছুটা অন্তর আড়াআড়ি কাঠের টুকরো মারা, পা যাতে না হড়কায়। প্রথমে অপূর্ব, পিছনে দীপালি সতর্কভাবে পা ফেলে নৌকোয় উঠছে। দীপালি বলে, কী খারাপ ব্যাপার হল বলুন তো, এই ডেঞ্জারাস জায়গা দিয়ে কখন নৌকোয় উঠে গেছে টেরই পাইনি। আপনার দিদি যদি জানতে পারে...

উত্তর দেয় না অপূর্ব। নৌকোয় উঠে বরুণের মাথায় হাত রাখে। বরুণ মুখ তুলে তাকায়। অপূর্ব বলে, কী করছিস এখানে?

রুটি করা দেখছি। এদের রুটি কী বড় বড় দেখেছ?

অপূর্ব বোঝে, তার ভাগনে আজ থেকে বহির্বিশ্বে পা রাখল। পথ ছিল বিপদসংকুল।

লাইব্রেরিতে আর সময় কাটায়নি অপূর্ব। বরুণকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। দীপালিও রাস্তায় এসে বিদায় নেয়। যাওয়ার আগে লজ্জাবনত মুখে বলে, কাল পড়াতে যাচ্ছি। থাকবেন তো? —কথাটা 'থাকতেই হবে'র মতো শোনায়।

অপূর্ব নিরুত্তর ছিল। তারপর বরুণকে নিয়ে মাছের বাজারে যায়। মাছ কিনে বাস ধরে। দুটো স্টপ। রাসতলা। বাস থেকে নেমে সে আর বরুণ এখন হেঁটে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। যত

এগিয়ে আসছে দিদির বাড়ি, অপূর্বর মন বলছে, তার সঙ্গে দীপালির দেখা হওয়াটা দিদির না জানাই ভাল। কিন্তু কথাটা চাপা দেবে কী করে? বরুণ তো এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে সব হুড়হুড় করে উগরে দেবে। এইটুকু বাচ্চাকে মিথ্যে কথা শেখাতে মন চায় না। শেখালেও সে যে সব ঠিকঠাক বলবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবু একটা ক্ষীণ চেষ্টা চালায় অপূর্ব। একমনে হেঁটে যাওয়া ভাগনের উদ্দেশে বলে, হ্যাঁ রে বরুণ, দিদি যদি বলে, এত দেরি হল কেন? কোথায় কোথায় গিয়েছিলি? কী বলবি? মামার দিকে মুখ তোলে বরুণ। দ্বিধাহীনভাবে বলে, বলব, লাইব্রেরিতে ঘুরতে গেছিলাম। গঙ্গার ঘাট...

নৌকোয় উঠেছিলি নিশ্চয়ই বলবি না?

ছোট্ট মুখটায় চিন্তার ছায়া ঘনায়। মুখটা নামিয়ে নিয়েও ফের মামার দিকে তাকায় উত্তরের জন্য। অপূর্ব বলে, শোন, যদি তুই মুখ ফসকে নৌকোর কথা বলে ফেলিস, দিদি তো তোকে আস্ত রাখবে না। আমাকেও ভীষণ বকা দেবে। তার থেকে তুই বলবি, আমরা হাঁটতে হাঁটতে বালি ব্রিজে চলে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে মাছ কিনে বাস ধরি। দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেটাও বলার দরকার নেই। বুঝলি?

বাধ্য ছাত্রর মতো ঘাড় হেলায় বরুণ। এখন দেখা যাক কতটা কী করে!

দরজা খুলল অংশু। অপূর্বদের দেখে বলে উঠল, তোমাদের এত সময় লাগল কেন গো? মা চিন্তা করছে। দাঁড়াও না বকুনি খাবে।

অপূর্ব কোনও উত্তর দেয় না। বরুণও চুপ। অপূর্ব চটি ছেড়ে বাথরুমের দিকে যায় হাত-পা ধুতে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ইলা, কী ব্যাপার রে তোদের। সেই কখন বেরিয়েছিস—আমি তো ভাবলাম মামা-ভাগনে মিলে ছিপ নিয়ে বসে গেছিস কোনও পুকুরে। গিয়েছিলি কোথায়?

ওই একটু হাঁটতে হাঁটতে....

কথা অসম্পূর্ণ রেখে কলঘরে ঢুকে যায় অপূর্ব। এখান থেকেই শুনতে পায় দিদির গলা। বরুণ নিশ্চয়ই মাছের থলি দিয়েছে। দিদি বলছে, এ কী রে এত মাছ এনেছিস কেন! কে খাবে? যে লোকটা খেয়ে সব থেকে বেশি তৃপ্তি পেত, সেই তো নেই।

দিদির শয়নে স্বপনে জাগরণে জামাইবাবু। ভীষণ ভালবাসে অবিনাশদাকে। ওরকম কড়া ধাঁচের উচ্ছ্বাসবর্জিত মানুষটার মধ্যে দিদি কীভাবে যে প্রেমিকপ্রবরটিকে খুঁজে পায় কে জানে! ওদের প্রেমের বিয়ে। অপূর্বর আপসোস হয়, ওই সময়টা মজফফরপুরে থাকতে পারলে ভাল হত, প্রেমপ্রার্থী লাজুক অবিনাশদার রূপটা দেখা যেত। দিদিকে জিতে নিয়ে অবিনাশদা এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যায় অপূর্ব। রান্নাঘর থেকে ইলা বলেন, কটা চপ ভাজছি। বাইরে কিছু খেয়ে আসিসনি তো?

না। দে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। বলে, অপূর্ব একদম সামনের ঘরে নিজের আস্তানায় গিয়ে বসে।

দিদির জেরা সহজে পাশ কাটিয়ে অপূর্বর মাথায় এখন অন্য চিন্তা। দীপালির সঙ্গে আজ যা-কিছু হল, মোটেই অপূর্বর অনুকূলে নয়। মেয়েটা পড়াতে এলেই দেখা হবে অপূর্বর সঙ্গে। পাত্তা পেতে চাইবে। না দিলেই যাবে ক্ষেপে। ওর শরীর ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা ঋণ হয়ে গেল। শোধ না দেওয়া অবধি নিস্তার নেই। আজকের ঘটনার মধ্যে মনের কোনও ভূমিকা ছিল না। দুটি শরীর একে অপরকে চাইছিল, দুজনেই ছিল কাম-উপোসি। দীপালির দিক থেকে উশকানি ছিল যথেষ্ট, সেটা রেকর্ডেড নয়। শরীর প্রথম ছুঁয়েছে অপূর্ব। তার দায় অনেক। এবার হবে মন নিয়ে নাড়াচাড়া। যা আসলে ছলনা। ভালবাসার কথা আসবে। হাস্যকর। তবু মেয়েটাকে এড়াতে পারবে না অপূর্ব। কেউ সাক্ষী নেই, অথচ দীপালি পড়াতে এলেই অপূর্ব আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। কারণ তার চেতনায় দীপালির শরীরের ছোঁয়া লেগে গেছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি অপূর্বর নেই। হয়তো কোনও পুরুষেরই থাকে না।

জোর করে এড়াতে গেলে বিচ্ছিরি সিন ক্রিয়েট হবে। নজর পড়ে যাবে দিদির। তার

মানে যা দাঁড়াল, অপূর্ব নিজের হাতেই নির্বিঘ্ন আস্তানাটা নষ্ট করে ফেলল। এবার কোথায় যাবে সে? মছলন্দপুরে ফেরার মতো পরিস্থিতি নিশ্চয়ই এখনও হয়নি। আরও দু-তিন মাস আত্মগোপন করে থাকাই শ্রেয়। তারপর অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। আপাতত থাকবে কোথায়? গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে শেল্টার নেওয়া যায়, সেরকম বিশ্বস্ত জায়গা অপূর্বর আছে। দিদির বাড়ির আরামটা পাবে না। আরাম আজকাল বড্ড পেয়ে বসেছে, আরাম, নাকি অবসাদ?

এতদিন বুকভরা আশা নিয়ে গ্রামের অতি গরিবঘরে দিব্যি কাটিয়েছে। এখন বুকটা ফাঁকা। সংগঠন ভেঙে যাচ্ছে, সঙ্গীসাথীরাও আশপাশে নেই। এত দ্রুত তাদের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে যবনিকা পড়ে যাবে, স্বপ্নেও ভাবেনি অপূর্ব। তাহলে কি তাদের ভাবনায় কোথায় ভুল ছিল?

দুটো ঘর পার করে দিদি আসছে প্লেটে চপ নিয়ে। মাঝের ঘরের বিছানায় একটা প্লেট নামিয়ে দিল। অংশু, বরুণ ওখানে লুডো খেলছে। এ-ঘরে এসে দিদি বলে, সারাক্ষণ চোখ কুঁচকে কী এত ভাবিস! ঘুরে এসেও মন ভাল হল না?

দিদিদের কাঠসর্বস্ব সোফায় আধশোয়া হয়ে ছিল অপূর্ব। উঠে বসে। দিদি বসেছে খাটে। এই ঘরটা শোয়া-বসা দুটো হিসেবেই চালানো হয়। অপূর্বর হাতে প্লেট দিয়ে, দিদি একটা চপ তুলে নেয়। মুখে পুরে বলতে থাকে, তোর জামাইবাবু তো পরশু ফিরছে। হাওড়া স্টেশনে যাবি আনতে?

কেন, হঠাৎ? চপ খেতে খেতে জানতে চায় অপূর্ব।

এমনি, আসলে অনেকদিন পরে ফিরছে তো, বাড়ির লোক কেউ গেলে ভাল লাগবে। উত্তরে অপূর্ব সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসে। মানেটা দাঁড়ায়, এসব সেন্টিমেন্টের কোনও মূল্যই নেই। ইলা নিজের যুক্তি জোরালো করতে বলেন, তা ছাড়া ও-বাড়ি থেকে অনেক মালপত্তর পাঠিয়ে দেয়। ওই লটবহর নিয়ে আবার লোকাল ট্রেনে ওঠা। বেশ অসুবিধে হয় তোর জামাইবাবুর।

আর একটা চপ মুখে দিয়ে অপূর্ব বলে, আমি কিন্তু বেশি দিন তোর এখানে থাকব না। তুই কি আমাকে স্টেশনে পাঠিয়ে এখানে থাকাটা রেজিস্টার করতে চাস?

এই দেখো, কী কথার কী মানে! বললেন বটে ইলা, অভিব্যক্তি বলছে ধরা পড়ে গেছেন। সোফায় আর একটু খাড়া হয়ে বসে অপূর্ব। হঠাৎ সুর ঘুরিয়ে বলতে থাকে, হ্যাঁ রে দিদি, অবিনাশদা কি চেষ্টা করলে আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে? ভাইকে বুঝতে একটু সময় নিয়ে ইলা বলেন, মনে হয় তো পারে। এই কদিন আগেই ভালমামার ছোট ছেলেকে একটা পেট্রোল পাম্পে ঢুকিয়ে দিল। পাম্পের মালিক ওদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ছেলেটা পড়াশোনা খুব একটা দূর করেনি। সেই তুলনায় তুই তো অনেক শিক্ষিত।

সেটাই একটা সমস্যা। বলে, থামে অপূর্ব। ফের বলে, তবু তুই জামাইবাবুকে আমার জন্য বল। যে-কোনও একটা ছোটখাটো কাজ হলেই চলবে। তবে কন্ডিশন একটাই, চাকরিটা আমি এ-বাড়ি থেকে করব না। যত কম মাইনেই হোক, ভাড়াবাড়িতে থেকে চাকরি করতে যাব। সব থেকে ভাল হয়, কাজটা দূরে কোথাও হলে।

কেন এরকম বলছিস? বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চান ইলা।

অপূর্ব বলে, ব্যাপারটা ঠিক ভাল দেখায় না। চাকরিও করব, দিদির সংসারে বসে খাব! অবিনাশদাও পছন্দ করবে না নিশ্চয়ই।

এ সময় ঢোঁক গিলতেই হয় ইলাকে। কর্তার মতামত না জেনে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। এটা ঠিক পরাধীনতা নয়, এক্ষেত্রে মাস্টারমশাইয়েরই মর্যাদা দেন তাঁর কর্তাটিকে।... ভাবনার মাঝে অপূর্ব বলে, ঠিক আছে, তোর কথামতো জামাইবাবুকে রিসিভ করতে আমি হাওড়া স্টেশনে যাব। কিন্তু দেখিস, জামাইবাবু মোটেই আমার হাতে মালপত্তর চাপাবে না। কুলি ডেকে নেবে। গল্প করতে করতে ফিরবে আমার সঙ্গে। জামাইবাবুর স্বভাব আমি জানি। অযথা কারও সাহায্য...

কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় আলতো ঠক-ঠক। আওয়াজটা অচেনা। আরও কয়েকবার শব্দটা হয়। বাড়ির এই সদরে আসে বাইরের লোক। চেনা মানুষজন আসে রকের পাশে সরু প্যাসেজ ধরে অন্য দরজায়। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ওই দরজাটা তাড়াতাড়ি খোলা যায়। কে এল এসময়? দুর্গাপুজোর তো এখন ঢের দেরি। চাঁদা নয় নিশ্চয়ই।

আরও দুবার শব্দটা হতে, দরজা খুলতে উঠে যান ইলা। অপূর্ব যে খুলবে না, জানেন। বাইরের কারও সঙ্গেই মুখোমুখি হতে চাইছে না সে।

দোর খুলতে যে ছেলেটিকে দেখলেন ইলা, বয়সে অপূর্বর থেকে বছর দু-তিনেকের ছোট। উনি ছেলেটিকে না চিনলেও, ছেলেটি পরিচিতের হাসি হাসছে।

ঝট করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ছেলেটি বলে, চিনতে পারলে না তো বড়দি। আমি মছলন্দপুরের তোমাদের পাড়ারই ছেলে। অপূর্বর বন্ধু। তুমি আমাকে দেখেছ, মনে নেই।

অপ্রস্তুত হাসি ফুটে ওঠে ইলার মুখে। মিশে থাকে সামান্য অপরাধবোধ। মছলন্দপুর তাঁর বাপেরবাড়ি হলেও জন্মভিটে তো নয়। কতটুকু চেনেন মছলন্দপুরকে! ইলা ঘাড় ফেরান অপূর্বর উদ্দেশে, ও নিশ্চয়ই চেনে ছেলেটাকে।

ঘর পুরোপুরি ফাঁকা দেখে ইলার মনে সংশয় তৈরি হয়। মছলন্দপুর থেকে আসা ছেলেটাকে কি চিনতে চাইছে না অপূর্ব! বুকটা একবার ধক করে ওঠে।

ছেলেটা প্রায় ঘরে ঢুকে এসে বলে, আমাকে বসতে বলবে না বড়দি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন বলব না। নিশ্চয়ই বোসো। ইলার কণ্ঠে দ্বিধাগ্রস্ত আপ্যায়নের সুর। ছেলেটা সোফায় গিয়ে বসে। চপের প্লেটের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, অসময়ে এসে পড়লাম মনে হচ্ছে। তারপর হেসে বলে, অপূর্ব কোথায় বড়দি?

সতর্ক হন ইলা। অপূর্ব যখন চাইছে না ছেলেটির মুখোমুখি হতে, মিথ্যে বলতেই হয়, অপূর্ব কোথায় আমি কী করে জানব!

বলার সঙ্গে সঙ্গে ইলা লক্ষ করেন, মাঝের ঘর থেকে বরুণ এসে দাঁড়িয়েছে চৌকাঠে। প্রমাদ গোনেন ইলা, বরুণ যদি সত্যিটা বলে দেয়। বরুণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে।

ইলার কথার পর থেকে ছেলেটির ভ্রূ কুঁচকে আছে। কী যেন ভেবে নিয়ে বলে ওঠে, আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম অপূর্ব আপনার কাছেই আছে। এসেছিল কি দু-একদিনের ভেতর?

ছেলেটা যে চতুর, এতে কোনও সন্দেহ নেই। মাথায় চড়ে উঠতে দেওয়া যাবে না। ছেলেটাকে সংযত করতে ইলা বলেন, তোমার নামটা তো বললে না ভাই। আমাদের পাড়ায় কোনটা তোমাদের বাড়ি?

ছেলেটা বিগলিত হাসে। বলে, আমাকে 'তুমি' না বললেও চলবে বড়দি। অপূর্বকে যেমন ‘তুই’ ডাকেন, সে রকমই বলুন। আমার নাম বাবুজি। ভাল নামটা বিশাল বড়, মনে রাখতে পারবেন না। মছলন্দপুরে আপনাদের বাড়ির পাশে সুধাংশু জ্যাঠার বাড়ি, তার দুবাড়ি পরে আমাদের বাড়ি।

তুমি সরকার বাড়ির ছেলে? বলেন, ইলা। বললেন বটে, কিন্তু সরকারদের বাড়িটাই তিনি শুধু চেনেন। মানুষগুলোকে মনে করতে পারছেন না।

বাবুজি বলে ওঠে, ঠিক ধরেছেন। আমি সরকারদের ছোটছেলের বড় পুত্র।

চুপ করে গেল বাবুজি। আবার কী যেন ভাবছে, মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। বরুণ এখনও নড়েনি চৌকাঠ ছেড়ে। ইলার ভীষণ অস্থির লাগছে, মছলন্দপুরের ছেলেটা গেলে বাঁচেন।

নিজেকে শুনিয়েই যেন বলতে শুরু করে বাবুজি, আসলে কী হয়েছে জানেন বড়দি, আমাদের দক্ষিণ চাতরায় তীর্থ বলে একটা ছেলে থাকে। অপূর্বর বন্ধু। সে কিছুদিন যাবৎ বাড়ি ফিরছে না। ওর বাড়ির লোক চিন্তা শুরু করেছে, থানা-পুলিশও করবে ভাবছে। এই সময় আবার অপূর্ব নেই পাড়ায়। তীর্থদের বাড়ির লোকের ধারণা অপূর্ব-তীর্থ এক সঙ্গেই কোথাও উধাও হয়েছে। ওরা সেকথা বলে বেড়াচ্ছে জনে জনে। পুলিশকেও তাই বলবে।

কথাটা কানে গেছে সুধাংশু জ্যাঠার। বলে, একটু থামে বাবুজি। কথাটা আরও সহজ করে নিতে বলে, সুধাংশু জ্যাঠা সিপিএম-এর লিডার, জানেন তো?

জানি। বলেন ইলা।

বাবুজি ফের শুরু করে, সুধাংশু জ্যাঠা তো প্রায় আপনাদের বাড়ির লোক। আপনাদের বাড়িটাকে এলাকায় সিপিএম বাড়ি বলেই লোকে জানে। তীর্থদের বাড়ি পাক্কা কংগ্রেসি। ইদানীং তীর্থ নকশালদের সঙ্গে মিশছিল। তীর্থর সঙ্গে অপূর্বর নামটা জড়িয়ে যাওয়া পছন্দ করছেন না সুধাংশু জ্যাঠা। আমাকে বললেন, তুই একবার দেবপাড়ায় যা। অপূর্ব মাঝেমধ্যেই ইলার বাড়ি গিয়ে থাকে। দেখা হলে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। এখানকার লোকেদের ভুল ভাঙবে।

বাবুজির কথাগুলো কতটা জটিল বা সরল, সেই বিচারে না গিয়েও ইলা বুঝতে পারেন অপূর্ব বড় কোনও গোলমাল পাকিয়ে এ বাড়িতে ঘাপটি মেরে আছে। বাবুজি যত তাড়াতাড়ি এ-বাড়ি থেকে চলে যায় ততই মঙ্গল। তারপর অপূর্বর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা যাবে।

যে-পরিচয়সূত্র বাবুজি দিল, ওকে চা খেতে বলা উচিত। প্লেটের চপগুলো ঠান্ডা হচ্ছে। কিছুই বলছেন না ইলা। নীরবতা দীর্ঘ হচ্ছে।

এই নিস্তব্ধতা অসহ্য ঠেকছে অপূর্বর। ও এখন মাঝের ঘরের খাটের নীচে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু বরুণের দুটো পা। অংশু বসে আছে বিছানার ওপরেই। ও একটু লাজুক টাইপের।

সামনের ঘরের কথাবার্তাটুকুই শুনতে পাচ্ছিল অপূর্ব। আকার ইঙ্গিত নয়। এখন যদি বরুণ হাতের ইশারায় বাবুজিকে খাটের নীচটা দেখিয়ে দেয়, কিছুই করার থাকবে না অপূর্বর। কেন যে এখনও দেখায়নি, সেটাই বড় আশ্চর্যের। ওইটুকু ছেলে কী বিবেচনায় যে চুপ করে আছে কে জানে!

বাবুজি কেন এসেছে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে অপূর্ব। সুধাংশু জ্যাঠার ডান হাত বাবুজি। জ্যাঠা কোনওভাবে জেনেছেন অথবা আন্দাজ করে নিয়েছেন, অপূর্ব-তীর্থ মিলে কোনও অ্যাকশনে গেছে। তীর্থকে কোনওদিনই শেল্টার দেবেন না জ্যাঠা। ও কখনও সিপিএমের ধার মাড়ায়নি। সুধাংশু জ্যাঠা রাস্তা খোলা রেখেছেন শুধু অপূর্বর জন্যই। বাবুজিকে পাঠিয়েছেন দূত হিসেবে।

অপূর্বর ধারণা আরও দৃঢ় হল ও-ঘরের পরের কথাবার্তায়। বাবুজি সম্ভবত উঠে দাঁড়িয়েছে। দিদিকে বলছে, আজ তাহলে চলি বড়দি। অপূর্ব যদি ইতিমধ্যে আসে,. বলবেন, সুধাংশু জ্যাঠা বলেছেন, ও যেন মছলন্দপুরে ফিরে বাড়ি না ঢোকে। সোজা চলে যায় আমাদের পার্টি অফিসে। আপনাদের বাড়ির ওপর পুলিশ নজর রাখতে পারে।

একথা শুনে দিদির মুখের কী অবস্থা হল, জানল না অপূর্ব। পরের কথার জন্য কান খাড়া করে রেখেছে সে। বাবুজি এবার বরুণকে বলে, চলি ভাগনে। আমি কে জান?

নীরবতা। সম্ভবত ঘাড় নেড়ে না বলেছে বরুণ। আবার বাবুজির গলা, আমি তোমার সেজোমামার বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে খেলাধুলো করেছি। আম-কাঁঠাল খেয়েছি চুরি করে। শীতকালে এবার চলে এস, মামারবাড়ির খেজুররস খাওয়াব।

এতক্ষণে বরুণের গলা, তোমরা ভূতেদের সঙ্গে ফুটবল খেলেছ ছোটবেলায়, বাতাবিলেবু দিয়ে?

বাবুজি হাসছে। বলছে, সে আবার কী কথা! এসব কে বলল তোমাকে? ভয়ে পা পেটের মধ্যে গুঁজে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি। অপূর্ব জানে, এর উত্তরে বরুণ তাকে দেখিয়ে দেবে।

দিল না। বরুণ বলল, আমি জানি মামা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

তাই তুমি যাচাই করে নিলে? বলে হাসছে বাবুজি। সম্ভবত বরুণের গাল টিপে বলে, মিষ্টি ছেলে। গুড বয়।... আবারও চলি' বলে বেরিয়ে যায় বাবুজি। ওর চটির শব্দ ক্রমশ দূরে চলে যায়। বাইরের গেটের খোলা-বন্ধর আওয়াজ শুনে নিশ্চিন্ত হয় অপূর্ব, উৎকণ্ঠিত মাথাটা নামিয়ে দেয় শানে, কপালে স্নেহের স্পর্শর মতো লেগে থাকে দিদির বাড়ির মেঝের ঠান্ডা।

ও মামা, বেরিয়ে এসো। চলে গেছে তোমার বন্ধু।

মাথা তোলে অপূর্ব, হাঁটু মুড়ে বসে, ঘাড় হেলিয়ে বরুণ তাকে ডাকছে। ছোট্ট ভাগনেটার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে অপূর্ব, ওইটুকু ছেলের কী আশ্চর্য বোধশক্তি। অপূর্বর লুকিয়ে পড়া দেখে বুঝে নিয়েছে, অতিথির সামনে মামার উপস্থিতির কথা বলা যাবে না। ছেলেটা সত্যিই অন্য রকম। বলা যেতে পারে বরুণের জন্যই আজ বেঁচে গেল অপূর্ব! শিশুমুখের সারল্য দেখে বাবুজির মনে সন্দেহ জমাট বাঁধেনি।

খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসতেই দিদির মুখোমুখি পড়ে যায় অপূর্ব। কড়া চোখে তাকিয়ে আছে দিদি। অপূর্ব দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। জেরার ভঙ্গিতে দিদি বলে, ছেলেটা কেন এসেছিল তোর খোঁজে? ও কি সত্যিই তোর বন্ধু?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে অপূর্ব। দিদি আবার বলে, কী হল উত্তর দিচ্ছিস না কেন? সত্যি করে বল, কোথায় কী গোলমাল পাকিয়ে এসেছিস? কেন লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে তোকে?

অপূর্ব চুপ। ইলার গলা চড়তে থাকে, ছেলেটাকে মোটেই আমার সুবিধের মনে হল না। সৎ উদ্দেশ্যে আসেনি এ-বাড়িতে। আর একটা কোন ছেলের কথা বলছে, তোর সঙ্গে নাকি উধাও হয়েছে, সেই বা কোথায়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার নয়। নির্বাক থাকতেই হয় অপূর্বকে। ইলার গলা উঠে যায় সপ্তমে, কী মনে করিস তুই, পার্টিবাজি, গুণ্ডামি করে এসে দিদির বাড়িতে লুকিয়ে থাকবি, আর দিদি তোকে তোয়াজ করে যাবে! দিদিকে খুব বোকা ভাবিস না তুই? সরল, সাধাসিধে...

কথার মাঝে অপূর্ব বলে ওঠে, আজকের রাতটা থাকতে দে, কাল সকালেই চলে যাব।

ইলা আর অপূর্বর সামনে দাঁড়ান না। বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যান বিছানার ও প্রান্তে কোণের দিকে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে বিছানাতে বসে পড়েন। ইলার পিঠের কাঁপন দেখে অপূর্ব বোঝে, দিদি কাঁদছে। ভাগনে দুটো ভয়, বিস্ময়-চাউনি নিয়ে দুই গুরুজনকে পর্যায়ক্রমে দেখছে।

অপূর্ব সামনের ঘরে চলে আসে। ফের গিয়ে বসে সোফায়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাকিয়ে থাকে সিলিংয়ের দিকে। মনে পড়ে যায় বহুদিন আগের একটা দৃশ্য, বড়দি-মেজদি খানসামার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় খুব কাঁদছিল। অপূর্ব তখন খুব ছোট। ওকে বোঝানো হয়েছিল, দিদিরা বেড়াতে যাচ্ছে। 'বেড়াতে যাচ্ছে, তবু কেন কাঁদছে দিদিরা?" প্রশ্নটা বারবার করেছিল মাকে। মা কোনও রা কাটেনি। একটু বড় হতে অপূর্ব জেনেছিল, দিদিরা গেছে বিদেশে। আর হয়তো কোনওদিন দেখা হবে না। দিদিদের কথা মনে পড়লে কষ্ট হত খুব। রাগ হত মা-বাবার ওপর, একটা দিদিকে অন্তত রেখে দিতে পারত। দুজনকেই পার করে দিল!

বড়দির বিয়ের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে কদিনের জন্য এসেছিল অপূর্বরা। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় দিদি খুব কাঁদছিল, কান্নার ধরন দিদির একরকম। অনেকদিন হল ওদেশ ছেড়ে চলে এসেছে অপূর্বদের পরিবার। দিদির কান্না আজও থামেনি।

॥ ষোলো ॥

পাখিরা ভোর ভাগ করে নেয়। আলো ফুটতে না ফুটতেই ডাকে এক জাতের পাখি। তারপর অন্য দল। পরে আরও সব। ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে শুকদেবের। বিছানায় শুয়ে পাখির ডাক শুনে আন্দাজ করছিলেন, ভোরের এখন কোন ভাগ, আলো ফুটেছে কি বাইরে?

এখন যে-পাখিটা ডাকছে মিষ্টি স্বরে, তাকে চেনেন শুকদেব, দামা। কে চিনিয়ে ছিল এখন আর মনে নেই। খুব ভোরে মিঠে সুরে গান গায় পাখিটা। ওর গানটা শুনে নিতে পারলে সারাদিনটা মোটামুটি আয়ত্তে থাকে শুকদেবের

এরপর ডাকতে শুরু করবে বেনেবউ, টে টে টেউল, টে টে টেউল... বিছানা থেকে না উঠিয়ে ছাড়বে না।

সুধার পাখির ডাক শোনা বা চেনার ঝোঁক নেই। কর্তা ঘুম থেকে উঠে পড়লে, সেও উঠে পড়ে। চা বসায়। পাখিগুলোকে বাড়ির পুষ্যি বলেই মনে করে সুধা, ভাত, মুড়ি খেতেও দেয় আবার বকাবকি করতে ছাড়ে না, যখন কানের কাছে বেশি চেঁচামেচি করে।

চোখ বুজে দামার গানে কান পেতে আছেন শুকদেব, হঠাৎ পাখির সুরটা কেমন পালটে যায়। সরু শিসের মতো জোরে ডাক দিচ্ছে পাখিটা। ভয় পেলে এমনটা ডাকে। তাহলে কি বাগানে কেউ ঢুকল ফুল চুরি করতে?

মশারি তুলে বিছানা থেকে তড়িঘড়ি নেমে আসেন শুকদেব। ঘুম জড়ানো গলায় সুধা পাশ ফিরতে ফিরতে বলে, কী হল, উঠছ কেন?

বাথরুম যাব। তুমি শোও তো এখন। বলে, বাগানের দিকে দরজাটা খোলেন শুকদেব। একঝলক ভোরের গন্ধ এসে লাগে নাকে। চোখ বন্ধ করে লম্বা করে শ্বাস টানেন শুকদেব, মনের আনাচ-কানাচটা যেন নির্মল হয়ে যায়। চোখ খোলেন, বাগানের গাছপালায় নেমে এসেছে হিম। সামনেটা আবছা মতন। তার মধ্যেই ফুলচোরকে খুঁজতে গিয়ে শুকদেব দেখতে পান অবিনাশকে। ধুতিটা লুঙ্গির মতো পরেছে, গায়ে হাতওলা সাদা গেঞ্জি। এত ভোরে উঠে পড়েছে! কী করছে বাগানে? —ডাকতে গিয়েও ডাকেন না শুকদেব। অবিনাশ হেঁটে যাচ্ছে দোপাটি বনের ভেতর দিয়ে। মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে!

অবিনাশের এরকমভাবে হেঁটে যাওয়াটা অবিকল বাবার মতন। রাত থাকতেই ঘুম থেকে উঠে পড়তেন বাবা। প্রাতঃকৃত্য সেরে, স্নান করে চলে যেতেন বাগানে ফুল তুলতে। বাবার আর অবিনাশের চেহারায় অনেক অমিল। বাবা ছিলেন বেঁটে, তুলনায় অবিনাশ লম্বা। ঘাড় অবধি বাবরি চুল ছিল বাবার, অবিনাশের মিলিটারি ছাঁট। তবু কেন বাবার মতন লাগছে ওকে! —আরও কিছুক্ষণ ভাইয়ের হাঁটাচলার ওপর লক্ষ রাখেন শুকদেব, আবিষ্কৃত হয় বাবার দৈহিক ভাষার সঙ্গে অবিনাশের ভীষণ মিল। এটা আগে কখনও খেয়াল করেননি। এমনও হতে পারে, অবিনাশ এখন যে বয়সে পৌঁছেছে, বাবার এই বয়সেই তাঁকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শুকদেব। বাবা রোজ হেঁটে যেতেন ওই দোপাটি ঝোপের মধ্যে দিয়েই। —আসলে মানুষ মরে গেলেও তার ছাপ রয়ে যায় পৃথিবীতে, অনেকটা চলমান ছায়ার মতো।

এমন আত্মগত হয়ে আছে অবিনাশ, মনে হয় 'বাবা' বলে ডাকলে এক্ষুনি হয়তো সাড়া দিয়ে ফেলবে। ঝুঁকিটা নেন না শুকদেব। এত মিলের মধ্যে সামান্য ছন্দপতনও আছে। অবিনাশের আচরণে একটু যেন বিমর্ষ ভাব। বাবা ফুল তুলতেন দৃপ্ত ভঙ্গিতে, হাতে সাজি নিয়ে। অবিনাশ ফুল তুলছে না, শুধু চোখ বোলাচ্ছে গাছপালার ওপর। ওর কি মন খারাপ? —ভাবনাটা মাথায় আসতেই বুকটা কেমন হু হু করে ওঠে শুকদেবের, মনে পড়ে যায় আজ রাতেই অবিনাশের ফেরার ট্রেন।

খালি পায়ে বাগানে নেমে আসেন শুকদেব। পাখিরা দুই ভাইয়ের উপস্থিতি মেনে নিয়েছে। আমলকি, পেয়ারা, আম, জামের ডাল বদলা-বদলি করে ডেকে যাচ্ছে

খোশমেজাজে।

অবিনাশ এখনও দেখতে পাননি বড়দাকে। হেঁটে যাচ্ছেন বাগানের শেষের দিকে। যেখানে বেগুনের চাষ দিয়েছেন সুধা। সারি দেওয়া ছোট ছোট বেগুনের চারা। জমিটার দিকে তাকিয়ে অবিনাশ মনে করার চেষ্টা করেন, আগে এখানে কী কী গাছ ছিল। যেসব কেটে বউদি জমিটাকে সংসারের কাজে লাগিয়েছে। একটু নেড়া, শ্রীহীন লাগলেও, ফসলের প্রতিশ্রুতির জন্য জমিটা থেকে ফুটে উঠছে গরবিনী ভাব।

অবিনাশের পিছনে একটু তফাতে এসে দাঁড়িয়েছেন শুকদেব। ভাইকে ওভাবে জমিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তাঁর মনে হল, অবিনাশ বুঝি কিশোরবেলার রক্তগাঁদার ঝোপটা খোঁজার চেষ্টা করছে। — অল্প বয়সে শুকদেব ছিলেন থলথলে চেহারার শান্তশিষ্ট ছেলে। অবিনাশ ডানপিটে, ছিপছিপে চেহারা। ছোটভাই রজত দুবলা, পাতলা। ছায়ার মতো লেগে থাকত অবিনাশের পিছনে।

লাল গাঁদার ঝোঁপটা ছিল শুকদেবদের নকল রণক্ষেত্র। বাড়ির ভেতর থেকে একটা বাতিল চেয়ার নিয়ে এসে ঝোপটার সামনে ফাঁকা জমিতে রাখা হত। সেই চেয়ারে ডালপাতা বেঁধে তৈরি হত সিংহাসন। অবিনাশের নির্দেশে শুকদেব সাজতেন রাজা। বসতেন চেয়ারে। রজত মন্ত্রী। চেয়ারের পাশে থাকত দাঁড়িয়ে। মহা পরাক্রমশালী সেনাপতি অবিনাশ। হাতে কঞ্চি নিয়ে ঢুকে যেত লাল গাঁদার ঝোপে। নকল অসি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিত গাছ, ফুল। সে কী তাণ্ডব। শুকদেব চেয়ারে বসে, বাঃ বাঃ, কেয়া বাৎ, সেনাপতি! সব কো মার ডালো। কিসি কো ছোড়না নেহি, বলে যেতেন। ডায়লগটাও ছিল অবিনাশের শেখানো।

কখনও কখনও কৃপা করে অবিনাশ ডেকে নিত রজতকে। বলত, আপভি আ যাইয়ে মন্ত্রীজি, ইয়ে দুশমন লোগ বহুত জবরদস্ত হ্যায়।

বিষম উৎসাহে রজত লাফিয়ে চলে যেত ঝোপের মধ্যে।

অত তাণ্ডব সত্ত্বেও গাছগুলো পরের দিন সকালবেলা সতেজ, সটান। খিলখিলিয়ে হাসছে।

বাতাসে বোধহয় দাদার গন্ধ পেলেন অবিনাশ। ভ্রূ কুঁচকে ঘুরে দাঁড়ালেন। সামান্য বিরক্তির সুরে বললেন, তুমি আবার উঠে এলে কেন সাতসকালে? – দাদার পায়ের দিকে চোখ যেতে বললেন, চটিও পরোনি দেখছি।

সরল শিশুর মতন হাসেন শুকদেব। ভাইয়ের কথা পাশ কাটিয়ে বলেন, এই সময়টাকেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত বলে না রে?

না। সেটা আরও ভোরে। অন্ধকার থাকতে। বলে, পায়ে পায়ে এগোতে থাকেন অবিনাশ। শুকদেবও এগোন।

দুজনের হাঁটার নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই, এঁকেবেঁকে হেঁটে যাচ্ছেন নীরবে। শুকদেব বলতে শুরু করেন, তুই কি ইদানীং এত ভোরেই উঠিস দেবপাড়ায়?

না।

আজ উঠে এলি এখানে?

এমনি। ঘুম ভেঙে গেল তাড়াতাড়ি।

শুকদেবের বুঝতে অসুবিধে হয় না, অবিনাশ আসল কারণটা এড়িয়ে যাচ্ছে। আজ চলে যাবে, মনখারাপটা রাখছে লুকিয়ে। শুকদেব চলে যান অন্য প্রসঙ্গে, তোর মনে আছে, বাবা রোজ ভোরবেলা বাগানে ফুল তুলতেন? ভোর ছটার মধ্যেই পুজোটুজো সব শেষ।

কেন মনে থাকবে না! হালকা হাসি টেনে বলেন অবিনাশ। একটু থেমে বলেন, মনে হয় এই সেদিনের ব্যাপার। কীর্তনের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাবা ফুল তুলছেন, ভাইবোনরা এক এক করে উঠে বসছি বিছানায়। বাবার পুজোপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পড়ার আওয়াজ বাবার কানে পৌঁছানো চাই। তুমি ছিলে সব থেকে বেশি গেঁতো। প্রায়ই ধমক... স্বগত স্মৃতিচারণের মতো বলে যাচ্ছেন অবিনাশ।

কথার মাঝে শুকদেব বলেন, তোকে অনেকটা বাবার মতো দেখাচ্ছিল আজ। ফের ভ্রূ কুঁচকে যায় অবিনাশের। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকান। শুকদেব বলে যান, বাবার হাতে থাকত ফুলের সাজি, মুখে গান। গোটা দিনটাকে যেন আহ্বান করতেন উনি।

দাদার কথাগুলো অসংলগ্ন সংলাপ ভেবে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, নিহিত সূক্ষ্ম অর্থ টের পাচ্ছেন অবিনাশ। অথচ দাদার মুখে কোনও অভিসন্ধি, ঘুরিয়ে কথা বলার ভাব নেই।

শুকদেব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে যান, বাবার অতিরিক্ত ঈশ্বরভক্তি আমরা কোনও ভাইবোন পাইনি। উনি কিন্তু আশা করতেন আমরাও বয়সকালে গিয়ে ভগবানের কাছে নিজেদের সমর্পণ করব। কেন করলাম না বল তো? বাবা তো বেশ শান্তিতেই ছিলেন ঈশ্বর অবলম্বন করে। অবুঝ দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকেন অবিনাশ। দাদার কথাগুলো তো বুঝতে পারছেনই না, কেন হঠাৎ এ প্রসঙ্গ এল তাও অগম্য।

হাঁটতে হাঁটতে বাগানের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছেন দুই ভাই। সামনে আগাছার বেড়া। তারপরই একটু উঁচুতে রেললাইন। লাইনের ওপারে মুচি-মেথর পট্টি। ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলি পাকিয়ে। আঁচ পড়েছে ওদের উনুনে।—ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুকদেব বলেন, ব্যাপারটা হচ্ছে আড়ম্বর। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে বাবা আয়োজনটা এত বেশি করে ফেলতেন, খানিকটা ভড়ং বলে মনে হত। আমরা যেহেতু কাছাকাছি থাকতাম, চোখে লাগত বাড়াবাড়িটা।

বাবা এখন নেই। বাবার হয়ে উত্তর দেন অবিনাশ, একটা ব্যাপার কিন্তু তুমি বলছ না, বাবা কখনও আমাদের জোর করেননি ভগবান মানতে। উনি নিজের মতো থাকতেন। তার থেকেও একটা বড় চাপের মুখে বাবা রেখেছিলেন আমাদের।

কী সেটা?

ওই যে, আমাদের মধ্যে অবতারের লক্ষণ খোঁজা। এদিকে আমরা যেহেতু ওঁর আশেপাশেই থাকতাম, ভক্তি আর আড়ম্বরের মাঝে ফাঁকটা চোখে পড়ত স্পষ্ট।... বলতে বলতে গোলাপজমির একটা চারা মাড়িয়ে ফেলছিলেন শুকদেব। কনুই ধরে দাদাকে টেনে নেন অবিনাশ। ওঁরা এখন হেঁটে যাচ্ছেন কুয়োতলার দিকে। কুয়োপাড়ে দিনের প্রথম রোদ পড়ে আছে লাজুকভাবে। শুকদেব বলে যান, বাবার নামে যে গল্পটা এখনও চালু আছে, উনি ধ্যান করতে করতে মাটি থেকে দু হাত ওপরে উঠে যেতেন, সেটা যে কত মিথ্যে আমরা ভাইবোনেরা জানি। ঠাকুরঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে পুজো করলেও, আমরা ফুটোফাটা দিয়ে দেখেছি, বাবা এক ইঞ্চিও মাটি থেকে ওঠেননি। উনি বরং ধ্যানে বসার আগে বেশ কিছু যোগাসন করতেন। বাবার সম্বন্ধে যে ওই কথা রটিয়েছিল, সম্ভবত যোগাসনকালীন বাবাকে দেখে কোনও বিভ্রম হয়েছিল তার। সব থেকে খারাপ ব্যাপার যেটা বাবা কোনওদিন নিজের সম্বন্ধে ছড়িয়ে যাওয়া ওই গালগল্প স্বীকারও করেননি, অস্বীকারও না। রহস্যময় হেসে এড়িয়ে গেছেন।

কথা কেটে অবিনাশ বলেন, বয়সকালে হয়তো নিজেও বিশ্বাস করতেন, তাঁর সত্যিই এমনটা হয়। ধ্যানে বিভোর থাকতেন বলে টের পেতেন না।

এরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। মিথ্যের মধ্যে বাস করতে থাকলে মিথ্যেই একসময় সত্যি বলে ভ্রম হয়। —একটু থেমে শুকদেব নতুন উদ্যমে শুরু করেন, যেমন ধর, প্ল্যানচেটের সময় জানলার পাল্লাটা খুলে পড়ে গেল, কোনও না কোনও সময় পড়তই। আমরা জানতাম জানলার পাল্লাটা দুর্বল। তখন ভেঙে পড়াটা কাকতালীয়। প্ল্যানচেট শেষে বাবা এবং তাঁর বন্ধুরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আজকের আত্মাটি ছিল ভারী দুষ্ট, রাগী প্রকৃতির। — আমরা আড়ালে হাসতাম। লাভের লাভ কী হল, বাবা বাড়ি রিপেয়ারিংয়ে হাত দিতেন না। আত্মাদের যাতায়াতের অ্যাটমোসফেয়ার তৈরি হত। দরজার ক্যাচ-কোঁচ আওয়াজ, হঠাৎ হঠাৎ জানলার পাল্লা খুলে যাওয়া, ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়া... -

দাদার কথায় এতক্ষণে হেসে ফেলেন অবিনাশ। বলেন, তুমি সব মনেও রাখতে পার বটে!

শুকদেবও হাসেন। দুজনে এসে পড়েছেন কুয়োর চাতালে। কুয়ো না বলে ইঁদারা বলা ভাল। চওড়া বেড়। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চাতালটাও অনেকটা জায়গা জুড়ে। ইঁদারার বেড়ে বসেন দু ভাই। মুখে পড়েছে সূর্যের নরম আলো। কৈশোর এবং যৌবনেও নিশ্চয়ই কখনও বসেছিলেন এইখানে, এভাবেই। সূর্যের বয়স বেড়েছে সামান্যই। অবিনাশ, শুকদেবের মুখে জীবন-অভিজ্ঞতার গাঢ় ছাপ।

মনটা চা-চা করছে। কুয়োতলায় বসে রান্নাঘরটা সরাসরি দেখা যায়। অবিনাশ তৃষ্ণার্তের মতো তাকান, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। ধোঁয়ার মাঝে বউদির আবছা অবয়ব। তার মানে চা পেতে এখনও অনেক দেরি।

শুকদেবকে আজ কথায় পেয়েছে, অবিনাশের কাঁধে হাত রেখে বলেন, বাবাকে আমার খুব স্বার্থপর মনে হত জানিস। সংসারে থেকেও যেন নেই। সেই বন্যার সময়টা মনে আছে? বুকে নারায়ণশিলা বেঁধে নদী সাঁতরে চলে গেলেন অন্য গ্রামে। আমাদের কী হবে না হবে সে নিয়ে কোনও চিন্তাই নেই। উনি স্পষ্ট বলতেন, সংসারে কেউ কারও নয়। মায়া কাটানোটাই নাকি সাধনা। তখন থেকেই ঈশ্বরের প্রতি আমার বিরাগ সৃষ্টি হয়। আমি ভাবতাম, যাঁর সাধনায় বাবা এত স্বার্থপর, তিনি আর কত ভাল হবেন!

তোমার কি এখনও সেরকমই ধারণা? ঈশ্বর, অবতার এসব মানুষের খুব একটা প্রয়োজন নেই?

না। নেই। বেশ আত্মবিশ্বাসী শোনায় শুকদেবের গলা! অবিনাশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন দাদার দিকে। দাদা কি নাস্তিক? সেরকম তো মনে হয় না। বাড়িতে পুজো-আচ্চা হলে দিব্যি যোগ দেয়। কাঁধের পৈতেটাও ফেলে দেয়নি। তা হলে আজ এসব কথা বলছে কেন?

ভাইয়ের দিকে না তাকিয়েই যেন মনের ভাব বুঝে নেন শুকদেব। বলতে থাকেন, যে রাস্তায় এতদিন আমাদের ঈশ্বরকে চেনানো হয়েছে, রাস্তাটা ভুল। সংসারে কেউ কারও নয়, বলছেন বড় বড় সাধকরা। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা বলছেন, হয়তো কোনও সুপার পাওয়ার আছে। আমার ধারণা এসবই ভুল পথের নিশানা। নিজেরা দিগভ্রান্ত হয়ে মানুষকে নিয়ে গেছেন অজ্ঞানতার দিকে। আমার তো মনে হয় ভগবান আছেন মানুষের সঙ্গে, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে। সৌন্দর্যচেতনা, শুভবোধ ছাড়া ভগবান তো আর কিছু নয়। এই যে সমাজ-সংসারে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে মানুষ, অনেকদিন দেখা না হলে প্রিয় মানুষের জন্য মনখারাপ হয়, এসবের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন। তুই যে অবতারের কথা বলছিস, উনিও আছেন মানুষের মধ্যে। একদিন উনিই প্রমাণ করবেন 'ভগবান' আসলে একটি ধারণা মাত্র। দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে এবং ছেড়ে শুকদেব বলেন, মানুষ কোথায় গিয়ে গুলিয়ে ফেলে বল তো? -

নীরব থেকেই প্রশ্ন বহাল রাখেন অবিনাশ। শুকদেব বলেন, পাপ, অন্যায়, অপরাধ এই তিনটে শব্দকে যদি আলাদা করে বিচার করা যায়, তা হলে যা দাঁড়ায়, অন্যায় সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, 'অপরাধ' রাষ্ট্রের, 'পাপ'-এর সঙ্গে কার সম্পর্ক? ভগবান না থাকলে ‘পাপ নেই। তা হলে জগৎসংসার টিকবে কী করে? পাপী-তাপীতে ভরে যাবে বিশ্ব। অন্যায়, অপরাধ শব্দটাকেও খেয়ে নেবে পাপ। ওই 'পাপ' শব্দটা বড় ভয়ানক। ওটার একটা গতি হওয়ার দরকার। ওর ব্যবস্থা হবেই, মানুষই করবে। যিনি করবেন, তিনিই হচ্ছেন আগামী অবতার।

কথা শেষ করলেন শুকদেব। দম ছাড়লেন অবিনাশ। দাদা যদি আরও কিছু বলে, অবিনাশ নিশ্চিত তাঁর বিচারশক্তির বাইরে দিয়ে চলে যাবে। দাদাকে থামাতেই অবিনাশ বলেন, তোমার মাথা তো দেখছি ভালই কাজ করে! আবোল-তাবোল বকাটা তার মানে তোমার ভান।

ঘড়িহীন কবজি উলটে দেখেন শুকদেব। বলেন, ওই বড় জোর সকাল সাতটা পর্যন্ত। তারপরই মাথাটা গোলমাল পাকিয়ে যায়। ঘুম ভাঙে আশপাশের মানুষের। তাদের খালি স্বার্থচিন্তা, আর ধান্দাবাজি। নানান তেরছা কথা, মিথ্যে আচরণ দেখেশুনে মাথার ঠিক রাখতে পারি না।

অবিনাশ একটু যেন থম মেরে যান। বউদি হাতে দু কাপ চা নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। রান্নাঘর থেকে এখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে।

সুধা সামনে আসতে অবিনাশ বলেন, সে কী, তোমার তো এখনও উনুন ধরেনি। চা করলে কী করে?

দুজনের হাতে চা ধরিয়ে সুধা বলেন, স্টোভে করে দিলাম। তা দুই ভাইয়ে বসে কী বকরবকর হচ্ছে তখন থেকে!

চায়ে চুমুক মেরে অবিনাশ বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, আজ ভোর থেকে দাদা যা সব দারুণ দারুণ কথা বলছে, শুনলে ভড়কে যাবে। তোমরা খামোকাই দাদাকে নিয়ে চিন্তা কর।

শুকদেব এক মনে চা খেয়ে যাচ্ছেন। ঠোঁটের কোণে মিটমিটে হাসি। সুধা পলকখানেক কর্তার দিকে তাকান। তারপর অবিনাশের উদ্দেশে বলেন, আমাকেও মাঝেমধ্যে অনেক কিছু বলে, খুবই ঠান্ডা মাথার সেসব কথা। না হলে পাগলের সঙ্গে এতদিন কেউ ঘর করে!

কথাটা বলেই সলজ্জ ভঙ্গিতে সুধা খিড়কির দিকে পা বাড়ান। প্রবল বিষম খেয়ে হাসতে থাকেন শুকদেব। অবিনাশ হাত বাড়িয়ে দাদাকে আগলে রাখেন। হাসির চোটে দাদা যদি বেড় থেকে ইঁদারায় পড়ে যায়!

হাসির দমক সামলে শুকদেব বলেন, সুধার জন্যই আমার মধ্যে এখনও এত রস। নইলে কবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতাম। ভারী ভাল মেয়ে।

শেষ কথাটা খট করে কানে লাগে অবিনাশের। এতদিন বৈবাহিকজীবন কাটিয়ে দাদা নিজের স্ত্রীকে মেয়ে বলে সম্বোধন করছে। দাদাকেই এখন মনে হচ্ছে সংসারে থাকা এক স্বার্থপর সন্ন্যাসী। বউদির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরিই হয়নি।

চা শেষ করে ইঁদারার বেড় থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন অবিনাশ। পাশের রেললাইন দিয়ে একটা ট্রলি চলে গেল। ট্রলিতে লাল পতাকা। চেয়ারে বসে আছেন অফিসার। ট্রলিম্যান ঠেলছে। কিছু দূর ঠেলার পর নিজেরাও উঠে বসবে।

অবিনাশদের ছোটবেলায় বাবার বন্ধু সুবিমলকাকা ছিলেন রেলের অফিসার। উনি যখন ট্রলি করে এই লাইন দিয়ে যেতেন, অবিনাশরা উঠে পড়তেন ট্রলিতে। তারপর সে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা।

এক্ষুনি যাওয়া ট্রলির শব্দ দূরে চলে যেতে অবিনাশ দাদাকে বলেন, আমি একটু বেরোব এখন।

কোথায় যাবি এত সকালে? আজ রাতেই তো ট্রেন ধরবি। আজকের দিনটা অন্তত বাড়িতে থাক।

না গো, কাজ আছে। বেরোতেই হবে।

জলখাবার...

এসে খাব। বলে, বাগান থেকে বাড়ির দিকে এগিয়ে যান অবিনাশ।

শুকদেব পিছু ডাকেন, শোন। দাড়াতেই হয় অবিনাশকে। শুকদেব উঠে আসেন। ভাইয়ের সামনে গিয়ে বলেন, মৃগাঙ্ককে নিয়ে অত ভাবিস না। ঠিক ফিরে আসবে। এলেই আমি তোকে খবর পাঠাব। ওর মেয়ে-বউকে নিয়েও চিন্তার কিছু নেই। ওরা আমাদের হেফাজতে থাকল। দাদার কথা শেষ মনে করে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন অবিনাশ, শুকদেব ফের বলেন, আর একটা কথা। তোর যদি এরকম ধারণা হয়ে থাকে, মেয়েটা মৃগাঙ্কর, তা কিন্তু নয়।

ভীষণ অবাক হয়ে যান অবিনাশ। যমুনা ব্যতীত দুবাড়ির শুধুমাত্র তিনিই জানেন মেয়েটা মৃগাঙ্কর নয়। কথাটা দাদার কানে গেল কী করে! মনের ভাব গোপন করে অবিনাশ জানতে চান, তুমি কী করে জানলে মেয়েটা ওদের নয়?

জানিনি। বুঝেছি।

কীভাবে?

একজন ডাক্তার যেভাবে বোঝে। যমুনার চেহারায় সদ্য প্রসবের কোনও লক্ষণ নেই।

দুবাড়িতে কোনও বুড়ি মানুষ নেই ভাগ্যিস, তার চোখ এড়ানো মুশকিল হয়ে যেত।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন অবিনাশ, দাদার পর্যবেক্ষণ যে একদম যথাযথ সেটা স্বীকার করা ঠিক হবে কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। একটু সময় পর শুকদেবই বলে ওঠেন, তুই যা জানলি, এখনই কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। মৃগাঙ্ক আগে ফিরুক। দেখা যাক সে কী বলে।

ঝট করে একটা প্রশ্ন আসে মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন অবিনাশ, কথাটা তুমি আমায় বললে কেন?

শুকদেব খিড়কির দিকে হাঁটতে থাকেন। মাথা নিচু। বলতে থাকেন, মেয়েটা মৃগাঙ্কর জেনে তোর যতটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে, অজ্ঞাত, অপরিচিত জানলে হয়তো চিন্তা কম হবে।

সেই কারণেই বললাম। দেবপাড়ায় ফিরে গেলে, তোর এদের জন্য চিন্তা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

আর একপ্রস্থ অবাক হয়ে অবিনাশ দাদার দিকে তাকান, মানুষটা কী অসম্ভব বিচক্ষণ। অথচ সারা দিনটা তাল হারিয়ে বসে থাকেন।

খিড়কির চৌকাঠ ডিঙিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন শুকদেব। বাঁদিকের দেওয়াল আঁকড়ে বেড়ে ওঠা আঙুরগাছটাকে দেখেন। ভাইয়ের উদ্দেশে বলেন, তুই যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে গেলি, গাছটা কতটুকু ছিল মনে আছে, এই কবছরে কী তেজে বেড়েছে দেখ। ফল তো মুখে দেওয়া যায় না, এত টক। ঝাড়ে-বংশে কেটে ফেলতেও কারও মন চাইছে না। মায়া পড়ে গেছে।

কথা শেষ করে উঠোন পার হতে লাগলেন শুকদেব। রজতের মেয়ে দুটো বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ঘুমচোখে দাঁত ব্রাশ করছে। ঝুনুটা আধোগলায় বড়জেঠুকে কী যেন বলল। শুকদেব উত্তর করলেন। দুরে দাঁড়িয়ে কারও কথাই ঠিক শুনতে পেলেন না অবিনাশ। তাঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না, হঠাৎ গাছের প্রসঙ্গ কেন তুলল দাদা। কিছু কি মানে করতে চাইল? নাকি শুরু করে দিল দিনের প্রথম অসংলগ্ন কথা!

দাদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বেশ দেরি হয়ে গেল। অবিনাশ এখন রিকশায়। সমস্তিপুরের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। রাস্তায় লোক চলাচল করছে যথেষ্ট। অবিনাশ যাচ্ছেন বলাইয়ের কোয়ার্টারে। আরও সকাল সকাল পৌঁছনোর ইচ্ছে ছিল। গত দুদিন বেলার দিকে বলাইয়ের বাড়ি গিয়ে ওকে পাননি। বলাইয়ের বউ বলেছে, কী একটা কাজে বলাই নাকি দ্বারভাঙ্গা গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

কথা এবং ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা গিয়েছিল, ডাহা মিথ্যে বলছে বলাইয়ের বউ। অবিনাশ তারপর যান মৃগাঙ্কদের মিলে। সেখানে গিয়ে শোনেন বলাই ডিউটিতে আসছে বটে, শিফটের কোনও ঠিক নেই। তখনই অবিনাশ ঠিক করেন, বলাইয়ের বাড়িতে অসময়ে পৌঁছতে হবে, তাহলে যদি পাওয়া যায়।

সমস্তিপুরে থাকার দিন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। এখনও মৃগাঙ্কর ব্যাপারটার কোনও সুরাহা হল না। ভীষণ একটা ছেঁড়াফাটা মন নিয়ে ফিরে যেতে হবে দেবপাড়ায়। ট্রেন ধরতে যতটুকু সময় বাকি, তার মধ্যে যদি বলাইয়ের সঙ্গে দেখা করা যায়, অনেক কিছুই জানা যাবে। একমাত্র বলাই দিতে পারে মৃগাঙ্কর হালহদিশ।

প্রবাল সামন্ত এমনটাই মনে করছেন। উনিও খুঁজছেন বলাইকে। তবে পুলিশ দিয়ে নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

যমুনাকে নিয়ে অবিনাশ যেদিন সামন্তর অফিসে যান, পরের দিন সামন্ত লোক পাঠিয়ে ডাকেন অবিনাশকে। মৃগাঙ্কর কেসটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন উনি। তখনই বলেন, পুলিশের কোরাপশন নিয়ে একটা তদন্ত অলরেডি করছি আমি। সেই সূত্রে থানায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। কোথাও আপনার বন্ধুর এগেনস্টে কোনও কমপ্লেন বা ওয়ারেন্ট ইস্যু দেখলাম না। বরং বলাই সেনগুপ্তকে একটা পেটি কেসে থানায় নিয়ে এসে ইনটারোগেট করা হয়েছে, সে রেকর্ড আছে। আমি পার্সোনাল এফর্টে বলাইবাবুর খোঁজ করেছি, কেননা পুলিশকে

জানতে দেওয়া যাবে না আমি আপনাদের কেসটাও হ্যান্ডেল করছি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্লু ওরা হাপিস করে দেবে। সে যাই হোক বলাইবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যান্ড আই অ্যাম ভেরি মাচ শিওর, বলাই সেনগুপ্তই পারে কেসটার একটা দিশা দিতে। আপনি যে দুদিন আছেন চেষ্টা করুন বলাইবাবুকে খুঁজে পেতে। দেখা হলে বলবেন আমার কাছে আসতে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

চেষ্টাই করে যাচ্ছেন অবিনাশ, সময় ফুরিয়ে এল। আজও যদি দেখা না হয় বলাইয়ের সঙ্গে, অনেক উৎকণ্ঠা বয়ে নিয়ে ফিরতে হবে দেবপাড়া। যমুনা বলছিল বটে, যদি পারেন আর কটা দিন থেকে যান। আপনি সমস্তিপুরে আছেন জানতে পারলে ও ঠিক ফিরে আসবে।

অবিনাশ ছুটি বাড়াতে চাননি। অফিসে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে যদিবা ছুটি ম্যানেজ করা যায়, ইলাকে নিয়ে হবে মুশকিল, দ্বিতীয়বার টেলিগ্রাম পেলে ও ঠিক দু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সমস্তিপুর চলে আসবে। তখন যদি ছেলেদের পরীক্ষাও চলে, কোনও ভ্রূক্ষেপ করবে না।

তা ছাড়া যমুনার কথা শুনতেই বা যাবেন কেন অবিনাশ! যমুনার জন্যই আজ মৃগাঙ্ককে আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে। বাচ্চাটাকে কুড়িয়ে নিয়ে আসার পর, পুলিশকে না জানানোর যে আইনি ভুলটা করেছিল মৃগাঙ্ক, অন্য রাস্তায় সেটার সমাধানও করে ফেলেছিল। বাচ্চাটা দিব্যি মানুষ হত গোরক্ষপুরের অনাথ আশ্রমে।

যমুনার মাথায় কী যে চাপল, মেয়েটাকে আশ্রমে রেখে আসার পরের দিনই যমুনা কাউকে কিছু না বলে আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে। অফিসঘরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করে খুব। ভয় দেখায়, আপনারা ঘুষ নিয়ে এখানে বাচ্চা ভর্তি করেন, বলে দেব সবাইকে।

অগত্যা কর্তৃপক্ষ যমুনার কোলে মেয়ে দিয়ে মানে মানে বিদায় করে। -এসব ঘটনা যমুনার কাছেই জেনেছেন অবিনাশ। —মেয়েকে পেয়ে যমুনা আর দিদির বাড়ি ফেরেনি, পাছে মৃগাঙ্ক আর তপন মেয়েটাকে ফেরত দিয়ে আসতে বলে। যমুনা চলে যায় বাপেরবাড়ি মজফফরপুর। বাপেরবাড়ির লোকেরা একবেলাও টিকতে দেয়নি তাকে। পুলিশ তার কদিন আগে বাপেরবাড়িতে খোঁজতল্লাশ করে গেছে।

কোথায় যাবে, কার কাছে, কিছুই ঠিক করতে না পেরে যমুনা নিজের সব থেকে বেশি অধিকারের জায়গা শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসেছে।

মৃগাঙ্কও নিশ্চয়ই গোরক্ষপুরে বসে নেই, খুঁজে মরছে যমুনাকে। ও কি আন্দাজ করতে পারবে, যমুনা আছে সমস্তিপুরে, তার নিজের বাড়িতেই! যমুনা যে এত বড় ঝুঁকি নেবে, কারও পক্ষে অনুমান করা মুশকিল। আর সেই কারণেই হয়তো পুলিশ যমুনার নাগাল পাচ্ছে না। আবার যে-কোনওদিন পেয়েও যেতে পারে।

যমুনা এবং মেয়েটাকে নিয়ে যে-উৎকণ্ঠায় ভুগছেন অবিনাশ, তার সূত্র কিন্তু ওই মৃগাঙ্ক। ওরা যদি অন্য কারও মেয়ে-বউ হত, মনের ওপর এত চাপ ফেলতে পারত না।

মৃগাঙ্কর মধ্যে কী আছে যে, অবিনাশকে এত উদ্বেল করে। রক্তের সম্পর্ক নেই কোনও। হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক তাঁর অনুগত সব থেকে ঘনিষ্ঠ সহচর। তাকে ছাড়া দেবপাড়ায় তো দিব্যি কেটে যাচ্ছে অবিনাশের। মৃগাঙ্করও সয়ে গেছে দূরত্ব। বন্ধুর সাহচর্য পাওয়ার যে দিবারাত্রের চাহিদা, সেটা বয়স বাড়লে কমতে থাকে। সংসারধর্মে জড়িয়ে পড়ে মানুষ ক্রমশ ভুলতে থাকে কৈশোর-যৌবনের সঙ্গীকে। অবিনাশ ভোলেননি। কেন? তা হলে কি সেই অপরাধবোধ, তাঁর ভুলেই মৃগাঙ্ক খোঁড়া হয়ে গেছে। ক্ষতি যত বড়ই হোক, সেটা তো নেহাতই ভুল। একটা অ্যাকসিডেন্ট। মৃগাঙ্কও তাই মনে করে। তবু মৃগাঙ্কর প্রতি এত দুর্বলতা কেন! সাধারণ বুদ্ধির একজন ছেলে, বিচার-বিবেচনার শক্তি খুব বেশি নেই। দুনিয়ার প্রতি অভিযোগের ছায়ামাত্র নেই ওর মুখে। যখন যে কাজটা করার দ্বিধাহীনভাবে করে। আগুপিছু ভাবে না। অবিনাশের মুখোমুখি হলে অনাবিল হাসে। পাশে হাটে খুঁড়িয়ে, দুলে দুলে। পরাধীন ভারত থেকে স্বাধীন ভারতে এসেও মৃগাঙ্ক রয়ে গেছে এক রকম। রাজনীতির ধার ঘেঁষে না। বেঁচে আছে মাথা উঁচু করে। মৃগাঙ্ক হচ্ছে সেই স্পিরিট, যা ইদানীং ক্রমশ হারিয়ে

ফেলছেন অবিনাশ। সব থেকে বড় কথা মৃগাঙ্কর কোনও ঈশ্বরকেও প্রয়োজন হয়নি।

এবার সমস্তিপুর এসে সব কিছুর দেখা মিললেও, স্পিরিটের আস্বাদ পেলেন না। ছোঁয়া হল না ফেলে যাওয়া সময়। সব নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে মৃগাঙ্ক। পড়ে আছে ওর বিপর্যস্ত সংসার, নাকি কৃতকর্ম। বন্ধুর এই দায় থেকে কী করে মুখ ফেরাবেন অবিনাশ! এ তো সেই স্পিরিটকেই অস্বীকার করা।

ভোরবেলা দাদা বলেছিল, মেয়েটা মৃগাঙ্কর নয় জেনে অবিনাশের দায়ভার কিছুটা কমবে। জানতেন আগেই, দায় কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। অবিনাশ বেশ জানেন, রক্তের সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ছেলে মৃগাঙ্ক নয়। ও যখন কুড়িয়ে নিয়েছে মেয়েটাকে, নিজের করেই নিয়েছে।

আর একটা ব্যাপার ভারী আশ্চর্য করছে অবিনাশকে— দাদা বলছে বটে, মৃগাঙ্কর মেয়েটা অজ্ঞাত, পরিচয়হীন। অবিনাশের কেন জানি তা মনে হচ্ছে না। মেয়েটার দিকে এক-দু পলক স্থির দৃষ্টি ফেলেছেন অবিনাশ। মেয়েটা তখন ঘুমন্ত। ভীষণ চেনা লেগেছে ঘুমন্ত মুখটা। কেন লাগল এত চেনা! অনেকটা সেরকম, কোনও কোনও ঘটনার মধ্যে দিয়ে গেলে, মনে হয় আগেও যেন ঘটেছে এটা। হুবহু এক রকম। মেয়েটার মুখটাও তাই। ডাকটিকিটের মতো সেঁটে গেছে মনে। চোখ বুজলেই মেয়েটাকে যেন দেখতে পাচ্ছেন অবিনাশ।

রিকশায় বসে আর একবার বিষয়টা পরীক্ষা করছিলেন, মিলেও গেল। চোখ খুলতে দেখেন রিকশা চলেছে কোর্টের রাস্তায়। শশব্যস্ত হয়ে অবিনাশ রিকশাওলাকে বলেন, আরেঃ, তুম ডাহিনা কিউ যাতে হো? বাঁয়া চল।

রিকশাওলা হ্যান্ডেল ঘোরায়। বলে, কাঁহা যানে হোগা, আপ তো কুছ বাতায়া নেহি। সত্যিই রিকশায় উঠে, কোথায় যেতে হবে কিছুই বলেননি অবিনাশ। এতটাই অন্যমনস্ক আছেন। এখন বললেন, চিনি মিল কলোনি মে চল।

মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে অবিনাশ এখন পরিপার্শ্বের সঙ্গে চেতনা মিশিয়ে দিতে চাইছেন। রিকশা চলেছে ধাতব ঘণ্টি বাজিয়ে। দেবপাড়ায় রবারের হর্নের চলন বেশি।

অবিনাশ আপাতত কান পেতেছেন নিজের শহরে। মিলিয়ে নিচ্ছেন ফেলে যাওয়া জনপদের কলস্বর। কোথায় যেন ছন্দের অভাব লক্ষিত হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করেন কারণটা, সমস্তিপুরে টাঙা ভীষণ কমে গেছে। দুঘোড়ার গাড়ি তো প্রায় দেখাই যায় না। ইতিহাস ফুঁড়ে ঘোড়ার নালের যে ছন্দোবদ্ধ শব্দ সমস্তিপুরের বাতাসে ঘুরে বেড়াত, তা প্রায় বিলীয়মান।

ওই শব্দে সমস্তিপুরের নির্জনতা চুরমার হত না। আরও গাঢ়, গভীর হত। শব্দটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবিনাশের একটি বিষাদময় স্মৃতি, যা এখন ইতিহাস। সাক্ষী ছিলেন অবিনাশ, বাবার হাত ধরে গিয়েছিলেন বাহাদুরপুর ময়দানে। সুভাষচন্দ্র ভাষণ দেবেন। অবিনাশের তখন কিশোর বয়স। সুভাষচন্দ্র বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। উদীয়মান যুবক নেতা। তখনও নেতাজি হননি। তারুণ্যের প্রতীক। ময়দানে ভিড় হয়েছিল খুব। এক হাতে বাবাকে ধরে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সুভাষ বসুকে দেখছিলেন ভাষণ দিতে। মাথায় গাঁধীটুপি, পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে নয়, কী অদ্ভুত আন্তরিক সুরেলা গলা তাঁর। ভাষণের কিছুই বুঝতে না পারলেও, অবিনাশের মধ্যে একটা আশ্চর্য আবেশ তৈরি হচ্ছিল।

হঠাৎ, কখন জানি একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে সুভাষ বসুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে রব উঠল। শুরু হয়ে গেল হইচই, মঞ্চে ইট ছোড়াছুড়ি। দিগভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল ময়দানে জড়ো হওয়া সাধারণ মানুষ। বাবাও পালিয়ে এসেছিলেন অবিনাশকে নিয়ে। মাঠ ছাড়ার আগে অবিনাশ শেষবার তাকিয়েছিলেন মঞ্চের দিকে, মঞ্চে উঠে গেছে মাধব কাকা, বৈদ্যনাথ জ্যাঠা, আরও কয়েকজন। সুভাষচন্দ্রকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনছেন আগলে আগলে। সমস্তিপুরের ছোড়া ইট, নাকি লজ্জা, সেখানকার বাসিন্দা হয়ে পিঠ পেতে নিচ্ছেন।

বড় হয়ে অবিনাশ জানেন, সেদিন ইট ছুড়েছিল অহিংসায় বিশ্বাসীরা। বৈদ্যনাথ জ্যাঠার

লোকজন। অহিংসার সহিংস আক্রোশ!

ময়দান থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে আসার পর, যখন বাবার সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দে হাঁটছেন অবিনাশ, বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওরা কেন সুভাষচন্দ্রের ওপর রেগে গেল?

হেসেছিলেন বাবা। উত্তর দিয়েছিলেন অনেক পরে। বাবা বলতেন, গাঁধী হচ্ছেন রাসকিন-টলস্টয়ের ভাবশিষ্য আর সুভাষ বোস হেগেলের। দুই দর্শনের সংঘাত অনিবার্য। এটা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে।

যৌবনের শুরুতে অবিনাশ আকৃষ্ট হলেন সুভাষ বোসের আদর্শে। কেন হলেন না আর এক তারুণ্যের প্রতীক নেহরুর প্রতি? প্রাদেশিক পক্ষপাত কাজ করেছিল কি সেখানে? হতেও পারে। তবে তার থেকেও বেশি মনে পড়ে সেই বিষাদময় দৃশ্যের কথা। যার পর থেকে সুভাষ বোসের প্রতিটি ভাষণ, পদক্ষেপের খোঁজ রাখতেন অবিনাশ।

দৃশ্যটা দেখেছিলেন বৈদ্যনাথ জ্যাঠার বাড়িতে। বাহাদুরপুর থেকে বাড়ি ফিরে, বাবা সন্ধেবেলা ফের বেরোতে যাচ্ছেন। বিকেলে সভার গোলমালের জেরে সমস্তিপুর তখন ভীষণ শান্ত। রাস্তাঘাট শুনশান। অবিনাশ বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখন আবার কোথায় বেরোচ্ছেন আপনি?

যাই, কাছ থেকে একবার দেখে আসি। সুভাষকে বোধহয় বৈদ্যনাথদার বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

আমিও যাব আপনার সঙ্গে। বলে, বায়না ধরেছিলেন অবিনাশ। বাবা তাঁর মেজপুত্রটিকে প্রশ্রয় দিতেন বেশি। কারণ অজানা।

বৈদ্যনাথ জেঠুর বাড়িতেও সেই ভিড়। গাঁধীটুপি, সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা, ধুতি পরিহিতরা ঘিরে রেখেছেন সুভাষচন্দ্রকে। উনি বসে আছেন নিচু একটা খাটে।

এর তার হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে অবিনাশ দেখেছিলেন সুভাষচন্দ্রের অপমানে, হতাশায় জর্জরিত মুখ। কোনও কথা বলছিলেন না। কেউই বলছিল না প্রায়। শোকস্তব্ধ পরিবেশ। তখন বৈদ্যনাথ জ্যাঠার বাড়ির সামনে দিয়ে একটা টাঙা যাচ্ছিল। ঘোড়ার নালের খপখপ খপাখপ... শব্দটা গেঁথে গেল মনের গভীরে। ওই শব্দ হয়তো সুভাষচন্দ্রও শুনছিলেন মন দিয়ে। ঘোড়ার খুরের শব্দে ছিল বোধহয় দেশ ছাড়ার আহ্বান। কাবুল, বার্লিন, কোহিমা, সিঙ্গাপুরের দুর্গম পথ তাঁকে ডাকছিল।

রিকশাটা অনেকক্ষণ অচল রয়েছে। বাস্তবে ফেরেন অবিনাশ। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট ফেলা আছে। আশপাশে অনেক গাড়ি অপেক্ষা করছে গেট ওঠার। বাঁপাশে চোখ যায়। আরোহীহীন টাঙা দাঁড়িয়ে আছে। টাঙা পুরনো, বিবর্ণ। শীর্ণ ঘোড়া জোতা আছে তাতে। টাঙাওলা বৃদ্ধ। জীর্ণ পোশাক। দাড়ি আছে। ধর্ম চেনা যায় না।

অবিনাশ তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে আছে দেখে, সে-ও তাকায়। চোখে কোনও কৌতূহল নেই, আছে অপার নির্লিপ্তি। এই টাঙাওলাকে কি চিনতেন অবিনাশ? টাঙাওলাও কি চিনত তাঁকে? হয়তো চিনত। সমস্তিপুরের দুই পুরনো বাসিন্দা একে অপরের অপরিচিত হয়ে গেছেন।

লেভেল ক্রসিংয়ের গেট উঠতে থাকে। চঞ্চল হয় টাঙার ঘোড়া, সেই চঞ্চলতার সঙ্গে দিব্যি মিশ খেয়ে যায় অবিনাশের রিকশাওলা। দুটো গাড়িই এগোতে থাকে।

বলাইয়ের কোয়ার্টারের একটু আগেই রিকশা থেকে নেমে পড়েন অবিনাশ। ভাড়া মেটান রিকশাওলার। রিকশা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। উনি দাঁড়িয়ে থাকেন রাস্তায়। এখান থেকেই লক্ষ করেন বলাইয়ের কোয়ার্টারটাকে। বলাই বাড়ি ঢুকতে-বেরোতে গেলে চোখে পড়বে।

কিন্তু এভাবে কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকবেন। কাছে-পিঠে দোকানপাটও নেই। পথচলতি মানুষের সন্দেহ হবে। আড়াল বলতে রাস্তার পাশে সারি দেওয়া বড় বড় গাছ। এই বয়সে গাছের পিছন থেকে লক্ষ রাখাও মানায় না। তা হলে করবেনটা কী? ওদের দরজায় গিয়ে বলাইয়ের নাম ধরে ডাকলেই বলাইয়ের বউ বেরিয়ে এসে বলবে সেই একই কথা, নেই।

এদিকে দেখা যে করতেই হবে—ভাবতে ভাবতে চোখে পড়ে, ওদের দরজার পাশে রাখা

একটা সাইকেলের ওপর। আগের দুদিন ছিল না। অবিনাশের দুটি পা নিজের থেকেই এগোতে থাকে।

দরজার কড়া নেড়ে দাঁড়িয়ে আছেন অবিনাশ।

ভেতর বাড়িতে কোনও পুরুষের কণ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে না। ভেসে আসছে দুটি বাচ্চার পড়ার আওয়াজ। বলাইয়ের বউয়েরও কোনও সাড়াশব্দ নেই। আবার কড়া নাড়েন অবিনাশ। অপেক্ষা করেন।

একটু পরেই খুলে যায় দরজা। সামনে বলাইয়ের বউ। চেহারায় লেগে আছে সংসারের ব্যস্ততা। সেটা বিরক্তিতে বদলাতে সময় নেয় না। বলাইয়ের বউ ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে, আপনি বারবার কেন আসছেন বলুন তো? বলেছি তো ও নেই। দ্বারভাঙ্গা গেছে। ঠিক নেই কবে ফিরবে।

অবিনাশ কিছু বলতে যাবেন, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল বলাইয়ের বউ। এই প্রথম সমস্তিপুরের কেউ অবিনাশের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করল। মনের ভেতরের বাঘটা লাফিয়ে উঠতে চাইছিল, লাথি মেরে ভেঙে দিতে চাইছিল দরজা। পারল না। অপমান তাকে বিবশ করেছে।

মাথা নিচু করে দরজার সামনে থেকে সরে আসছেন অবিনাশ, টের পেলেন পিছনে দরজাটা আবার খুলল। ঘুরে তাকাতে প্রবৃত্তি হল না। হঠাৎ পুরুষকণ্ঠ, অবিনাশদা, ভেতরে আসুন।

ঘাড় ফেরাতেই হল। বলাইকেও চিনতে পারলেন সহজে।

বলাইয়ের বসার ঘরে এসে বসেছেন অবিনাশ। বলাই ইতিমধ্যে তার স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। অবিনাশ সেইসব সৌজন্যে কান পাতেননি। সরাসরি চলে এসেছেন প্রশ্নে, তুমি বোধহয় জান, যমুনা মেয়ে নিয়ে এখন মৃগাঙ্কর আসল পৈতৃক বাড়িতে।

জানি। খবর পেয়েছি। দেখা করিনি।

পরের প্রশ্নে যান অবিনাশ, যমুনার সঙ্গে কথা বলে যতটুকু বুঝেছি, মৃগাঙ্কর বিপদের ব্যাপারে তুমিই সব থেকে বেশি জান। ছিলে ওর পাশে পাশে। তোমাকে একবার পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। মারধরও করেছে।

ঠিকই শুনেছেন।

তুমি কি কোনও খবর পেয়েছ মৃগাঙ্কর? জান, এখন সে কোথায়?

কোথায় কখন থাকে জানি না। তবে দেখা করেছে দুবার।

বিষম বিস্ময়ে অবিনাশ বলেন, দেখা করেছে। কবে। কোথায়?

একদিন চিনি মিলে গিয়েছিল। আর একদিন দেখা হয় রাস্তায়, দুটো-দশটার ডিউটি করে ফিরছিলাম।

ও জানে, যমুনা, মেয়েটা এখন শশাঙ্কর কাছে?

জানে। আপনি সমস্তিপুরে এসেছেন, তাও জানে।

অভিমান ঘনিয়ে আসে অবিনাশের মুখে, প্রাণপণে উদ্বেগের রূপ দিতে চান সেই অভিব্যক্তির। ব্যর্থ হন। বলাই বলেন, বাচ্চাটার আর যমুনার সুরক্ষার কথা ভেবেই মৃগাঙ্ক কারও সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। পুলিশ বা পুলিশের চর মৃগাঙ্ককে চিনবে সহজে। ও যদি বাড়ি ফেরে, পরিবারসুদ্ধ ধরা পড়ে যাবে। মৃগাঙ্ক চায় যমুনা বুদ্ধি করে ফিরে যাক ওর দিদির বাড়িতে। পুলিশ এখনও যমুনাকে চেনে না। আপনি পারলে যমুনাকে একথা বুঝিয়ে বলবেন।

বলাইয়ের কথা শুনে নিয়ে অবিনাশ এবার আসল প্রশ্নটা করেন, আচ্ছা বলাই, মৃগাঙ্কর এরকম অবস্থা হল কেন? পুলিশের চোখে ওর অপরাধটা ঠিক কী? বলাই মিনিটখানেক চুপচাপ তাকিয়ে থাকে অবিনাশের দিকে। দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের কোনও অভিপ্রায় নেই। আছে নিরুপায় ভাব। বলাই বলতে শুরু করে, আপনাকে মৃগাঙ্ক কতটা মানে আমি জানি। তাই আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই। আপনি প্রয়োজন বুঝে তথ্যটা গোপন

করবেন অথবা বলবেন কাউকে। -ঢোক গিলে বলাই ফের বলে, মেয়েটার আসল মা ওপার বাংলার মেয়ে। একটা দল বেঁধে ওরা আসছিল এপারে। মেয়েটার মা তখন বিবাহিত হলেও কোনও সন্তানের জন্ম দেয়নি। বর্ডার পার হওয়ার সময় বউটা দল থেকে ছিটকে যায়। মাস দুয়েক কখনও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী, কখনও ইন্ডিয়ার সীমান্তরক্ষী, কখনওবা ইন্ডিয়ার পুলিশের হেফাজতে থাকে। এক সময় ছাড়াও পায়। ততদিনে সে অন্তঃসত্ত্বা।

কার দ্বারা? এই সময় প্রশ্নটা না করলেও চলত, এতটাই জরুরি এবং সংগত প্রশ্ন, করেই ফেললেন অবিনাশ।

উত্তরে বলাই বলল, সে খবরটা আমি জোগাড় করতে পারিনি। বউটা এবং তার স্বামী জানে। পুলিশ, মিলিটারি থেকে ছাড়া পেয়ে বউটি যখন কলকাতায় পৌঁছয়, আন্দাজমতো সেই আত্মীয়র বাড়িতে যায়, যেখানে তাদের যাওয়ার কথা ছিল। সেবাড়িতে দেখা হয় স্বামীর সঙ্গে। ওর স্বামী উদারমনস্ক এবং লড়াকু মানুষ। আত্মীয়টি প্রভাবশালী। পুলিশ, মিলিটারির এগেনস্টে ওরা কোর্টে যায়। তারপর থেকেই সেইসব অসৎ পুলিশ-মিলিটারিরা এক হয়ে ওই দম্পতির পিছনে পড়ে গেল। ওরা পালিয়ে এল সমস্তিপুরে। আপনি নিতাইকে চেনেন?

মনে মনে নামের সঙ্গে মুখ খোঁজেন অবিনাশ, কিছুতেই পান না। আসলে এইসব মারাত্মক তথ্য শুনে মাথাটাই ঘেঁটে গেছে। বলাই ফের বলতে শুরু করে, নিতাই রেলে কাজ করে। রেলকোয়ার্টারে থাকে। বাঙাল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। বলেন অবিনাশ।

নিতাই ওদের আত্মীয়। ওর বাড়িতেই ওঠে স্বামী-স্ত্রী। সমস্তিপুরের কোনও হসপিটালে অথবা নিতাইয়ের বাড়িতেই মেয়েটার জন্ম হয়। মেয়েটাকে ওরা চেনা রিকশাওলা মারফত ফেলে দিয়ে আসতে বলে। রিকশাওলা দয়াপরবশ হয়ে বাচ্চাটাকে রাস্তার এমন জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যায় যাতে পথচারীর চোখে পড়ে, যদি মেয়েটার একটা হিল্লে হয়। পড়ল তো পড়ল আমাদের মৃগাঙ্কর চোখেই, তুলে নিল বাচ্চাটাকে।—এতটা বলে থামল বলাই। দম নিচ্ছে।

দু হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল বলাইয়ের বউ। মুখে আগের সেই রাগ বা বিরক্তি নেই, বদলে সামান্য অপরাধী ভাব। টেবিলে কাপ নামিয়ে রাখার সময় অবিনাশের উদ্দেশে বলে, আপনার সঙ্গে কদিন খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না। আসলে আমাদের ওপর এমন ঝড়ঝাপটা...

না, না। কিছু মনে করিনি। বলে, চায়ের কাপ তুলে নেন অবিনাশ।

টেবিল থেকে কাপ তুলে বলাই বলে, সমস্তিপুর এসেও বাঁচতে পারেনি সেই দম্পতি, কীভাবে যেন খবর পেয়ে যায় বর্ডার সিকিউরিটি আর পুলিশ। এখানকার পুলিশ মারফত ওই দম্পতিকে মিথ্যে কেস দিয়ে অ্যারেস্ট করে। বাচ্চাটাকে না পেয়ে ক্ষেপে যায় পুলিশ। ওদের অপরাধের মস্ত প্রমাণ বাচ্চাটা। মরিয়া হয়ে খুঁজতে থাকে। ঠিক জানতে পারে, বাচ্চাটা আছে মৃগাঙ্কর কাছে। এর জন্য আমিও কিছুটা দায়ী, ওরা প্রথমে আমায় ধরেছিল, আমিই মৃগাঙ্কর সন্ধান দিই। না দিয়ে উপায় ছিল না। এমন কঠোর এবং চতুর ওদের জিজ্ঞাসাবাদ...

একদম চুপ করে গেল বলাই। অবিনাশও মন দিয়েছেন চা খাওয়ায়, কপালে অজস্র ভাঁজ। বাড়ির বাইরে একটা দাঁড়কাক ডাকছে। বুকটা কেমন খাঁ-খাঁ হয়ে যাচ্ছে অবিনাশের। নার্ভাস লাগছে ভীষণ। সাংঘাতিক বিপদে পড়ে আছে মৃগাঙ্ক। কীভাবে উদ্ধার পাবে, কে জানে।

চা শেষ করে বেতের সেন্টার টেবিলে কাপ নামিয়ে রাখেন অবিনাশ। অযথাই চোখ থেকে চশমা খুলে, মুখের ভাপ দেন কাচে। ধুতির খুঁটে মুছে ফের পরে নেন চশমা।

বলাই বলে, রাত থেকে এই সকালটুকু বাড়িতে থাকি। সারা দিন বাইরে বাইরে কাটাই। পাছে মৃগাঙ্কর খবরের জন্য কেউ দেখা করতে আসে। মৃগাঙ্কর সঙ্গে আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল, সমস্তিপুরের অনেকেই জানে। ওকে বেপাত্তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে আসবে। পুলিশের খোঁজা এখনও শেষ হয়নি, দরকার মনে করলেই খোঁচাবে আমায়। তাই

এক প্রকার গা ঢাকা দিয়ে আছি। সামনে পুজো, একদিনের জন্য রিহার্সালেও যাইনি।

কথা শেষ করে, চায়ের ফাঁকা কাপ নামিয়ে রাখেন বলাই। পাঞ্জাবির সাইড পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে অবিনাশকে অফার করেন। সিগারেটের নেশা নেই অবিনাশের, এখন একটা খেতে ইচ্ছে হল।

দুজনেই সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন চুপচাপ। ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে পর্দার ওপর দিয়ে, জানলার বাইরে। কাছাকাছি কোনও গাছে বসে ডেকেই যাচ্ছে দাঁড়কাকটা। কাঃ কাঃ।

নীরবতা ভাঙেন অবিনাশ, তুমি এত সব খবর জোগাড় করলে কী করে। ব্যাপারটা বেশ ঝুঁকির। এদিকে বলছ পুলিশকে এড়িয়ে যেতে চাও ....

আপনি হলেও ঝুঁকিটা নিতেন। মেয়েটাকে পাওয়ার পর এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, কৌতূহল হবেই। তা ছাড়া মৃগাঙ্কর পরিত্রাণের রাস্তা খোঁজার জন্যও রিস্কটা আমি নিয়েছি।

কথাটা মনের কোথায় যেন সামান্য আঘাত করল, মৃগাঙ্কর পরম সুহৃদ একজন আছে সমস্তিপুরে। অবিনাশের বেশি না ভাবলেও চলবে।

প্রবাল সামন্তর কথাটা তুলতে যাবেন অবিনাশ, বলাই বলে ওঠে, আপনার কিন্তু দেশ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি অবিনাশদা। সমস্তিপুরে বাঙালির সংখ্যা এমনিতে কম। আপনার মতো ডাকাবুকো, ব্যক্তিত্ববান মানুষ, যাঁর জন্ম, কর্ম, বাড়ি এখানেই, উচিত হয়নি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। আমার বিশ্বাস, আপনি থাকলে মৃগাঙ্কর ব্যাপারটা অন্য রকমভাবে ট্যাকল করতে পারতেন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে এখানকার ওপর মহল আপনাকে এক ডাকে চেনে।

এতক্ষণ যা যা বলল বলাই, তা সবই প্রায় ঠিক, অবিনাশও জানেন সেটা। একটা কথাই কানে বড় বাজল, 'উচিত হয়নি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া।' অবিনাশ তো দেশ ছাড়েননি, রাজ্য বদলেছেন শুধু। বলাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'দেশ' শব্দটাই বলে ফেলল। 'দেশ' বলতে সাধারণ বোধে মানুষ নিজের বেড়ে ওঠার জায়গাটাকেই বোঝে। বাকিটুকু তো শুধুই তথ্য।... ক্রমশ অন্যমনস্ক হয়ে যান অবিনাশ। বলাই সামনে বসে আছে, খেয়ালই থাকে না। দাঁড়কাকটা ডেকে যায় অক্লান্তভাবে বলাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন অবিনাশ। কলোনির ফাঁকা রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। রোদ চড়েছে, প্রায় দশটা বাজে।

বলাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যেন মৃগাঙ্ক সম্পর্কিত দায়ভারটা কমে গেছে। শরীরটা হালকা লাগছে এখন। এতে খুশি হওয়ার বদলে বিষণ্ন হয়েছেন অবিনাশ। মৃগাঙ্ক তার মানে পর হয়ে গেল। ওর ভাল-মন্দ ভাবার জন্য বলাই আছে। প্রয়োজন নেই বলেই মৃগাঙ্ক দেখা করছে না অবিনাশের সঙ্গে।

বলাইয়ের বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে কর্তব্য মনে করে প্রবাল সামন্তর হদিশ দিয়ে এসেছেন অবিনাশ। বলেছেন, আমার মনে হচ্ছে ওঁর সঙ্গে দেখা করলে তোমাদের উপকার হবে।

'দেখি', বলে চুপ করে গিয়েছিল বলাই। বিদায়ের শেষ মুহূর্তে অবিনাশের একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, রাতের গাড়িতে ফিরছি। এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা আছি সমস্তিপুরে। এর মাঝে যদি মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখা হয় তোমার, বোলো পারলে মিনিট খানেকের জন্য দেখা করে যেতে। —কথাগুলো চোখে নিয়ে বলাইয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, মুখে কিছু বলেননি।

এই কদিন সমস্তিপুরকে অপূর্ণ লাগছিল, মৃগাঙ্ক নেই তাই। বলাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, এখন সে রকম বোধ হচ্ছে না। সমস্তিপুরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে, রোদ-হাওয়ার আড়ালে মিশে মৃগাঙ্ক। —কথাটা মনে হতে, একবার পিছন ফিরে দেখে নেন অবিনাশ। খাঁ-খাঁ করছে রাস্তা। অনেকটা এগিয়ে এসেছেন বলাইয়ের কোয়ার্টার ছেড়ে। কিন্তু এখনও কেন শুনতে পাচ্ছেন দাঁড়কাকের কাঃ কাঃ?

শব্দটায় কান পাতেন অবিনাশ, শব্দটা আসছে নিজের মাথা থেকেই। মাথায় বসে দাঁড়কাকটা বলছে, যাঃ যাঃ। ভাগ।

সন্ধে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। সুগার মিলের বাতিল স্টোররুমের পাশে ঘন অন্ধকার। জোনাকি পোকার নীলচে আলো তারার মতো জ্বলছে। ওখানে আছে ঘন আগাছার ঝোপ, দিনেরবেলা দেখা যায়। ডিউটিতে এসে ওখানেই নেশা করে পড়ে থাকতেন মৃগাঙ্ক। এদিকে বড় একটা কেউ আসে না। আলো মরে গেলে তো নয়ই। কিন্তু এখন ওই অন্ধকারে ঝিঝি, উচ্চিগুড়ের ডাক ছাড়াও দুটি মানুষের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে।

মানুষটা তোকে খুবই ভালবাসে রে। চলে যাচ্ছে আজ।

জানি। কিন্তু কী করব, দেখা করতে গেলেই তো ধরা পড়ে যেতাম।

রেললাইন ডিঙিয়ে বাড়ির পিছন দিয়েও তো ঢুকতে পারতিস। পুলিশ টের পেত না কিছু পুলিশের থেকেও অবিনাশদাকে ভয় বেশি। একবার দেখা হলে আর ছাড়ত না। নিয়ে যেত যমুনার কাছে। যমুনাও কি ছাড়তে চাইত তখন সেটা অবশ্য ঠিক কথা। তোর যা এখন অবস্থা আবেগ দেখালে চলবে না। সে যাই হোক, অবিনাশদা একটা কাজের কাজ করেছে। কলকাতা থেকে এক সি আই ডি অফিসার এসেছেন নতুন, অবিনাশদার চেনা। আমাদের দুজনের কথা বলে রেখেছে তাঁকে। উনি আশ্বাস দিয়েছেন, ব্যাপারটা দেখবেন। আমাদের দুজনকে দেখাও করতে বলেছেন।

সে তুমি যা ভাল বুঝবে।

দেখি, অফিসারটা সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিয়ে। তারপর যাওয়া যাবেখন। খানিক নীরবতা।

অবিনাশদার সঙ্গে কথা বলে কী মনে হল? সমস্তিপুরে ফেরার কোনও ইচ্ছা দেখলে?

না। আমি তো মুখের ওপর বলেই দিলাম, সমস্তিপুর ছেড়ে গিয়ে আপনি ভুল করেছেন। শুনল, কিছু বলল না। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ।

আর বোধহয় ফিরবে না। দুই ছেলেই স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে। বউদিও সংসার করছে গুছিয়ে। তা ছাড়া ওখানে যখন বাড়ি করে নিয়েছে...

এবার তুই যা। পেচ্ছাপ করতে যাওয়ার নাম করে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। ডিপার্টমেন্টে খোঁজ পড়ে গেল বোধহয়। তোর টাকাপয়সা কিছু লাগবে? না। আছে এখনও।

দরকার পড়লে চাইবি।

কিন্তু কতদিন?

মনে হয় বেশিদিন নয়। পুলিশ যখন দেখবে, ওদের ক্ষতি করার কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নেই। ভুলে যাবে।

আমার তা মনে হচ্ছে না। কাল রাতে পুরনো কোয়ার্টারে ফিরতে গিয়েছিলাম, দেখলাম প্লেন ড্রেসে একজন পুলিশ দূর থেকে কোয়ার্টারে নজর রেখেছে।

আর একটু ধৈর্য ধর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

গাছপালা নড়ার শব্দ। তারপর ঝুপ। পাঁচিল ডিঙিয়ে একজন গেল ওপারে। অন্ধকারে পড়ে রইল ঝিঁঝির কোরাস। জোনাকির চঞ্চল আলো।

স্টেশনে এসে জানা গেল ট্রেন ছাড়বে দু ঘণ্টা দেরিতে। তার মানে রাত এগারোটা। অবিনাশকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন রজত আর শুকদেব।

প্ল্যাটফর্মে লাগেজ নামানোর পর অবিনাশ দাদা আর ভাইয়ের উদ্দেশে বললেন, তোমরা আর বসে থেকে কী করবে, বাড়ি চলে যাও। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। রিজার্ভেশন তো করাই আছে।

দু ভাইয়েরই পা নড়ছে না। রজত গাঁইগুঁই করছে। ধমক মেশানো গলায় অবিনাশ বলেন, না না, তোমরা যাও, বাড়ির লোক চিন্তা করবে।

রজত বলে, দাদা যাক। আমি থাকি। দাদা বাড়িতে বলে দেবে ট্রেন লেট।

না। তুইও যা দাদার সঙ্গে। বললেন, অবিনাশ।

কথার সুরটা এরকম ছিল, আমি চলে যাচ্ছি, দাদার মন খারাপ। তোর পাশে থাকা উচিত।

সুরটা সম্ভবত অনুধাবন করতে পারল রজত, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায়ের

মুহূর্ত নিশ্চিত জেনে, শুকদেব বুকে জড়িয়ে ধরেন অবিনাশকে। প্রায় কানে কানে বলেন, দূরে থাকার একটা ভাল দিকও আছে, টানটা টের পাওয়া যায়। মন খারাপ করিস না। বাড়ি ফিরেই পৌঁছনো সংবাদ দিস।

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে অবিনাশ দাদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। রজতও করে তাঁর দুই দাদাকে। দাদা আর ভাইয়ের পিঠে হাত রাখেন অবিনাশ। দাদার মুখে হাসি, চশমার ভেতর দিয়ে নামছে জল। দৃষ্টি সরিয়ে নেন অবিনাশ, প্রসারিত করেন। দেখেন, প্ল্যাটফর্ম চত্বরে বহু মানুষ। অনেকেই এসেছে তাদের নিকটজনকে ট্রেনে তুলে দিতে। তাদের কারও কারও চোখের কোণে লুকিয়ে আছে সজল দরদ।

দাদা, ভাইকে ভিড়ে মিশে যেতে দেখার পর, নিজের হোল্ডঅলের ওপর এসে বসলেন অবিনাশ। রাতের প্ল্যাটফর্মের কোলাহলের মধ্যে কোথায় যেন শ্রান্তি মিশে থাকে। দিনের মতো প্রাণবন্ত নয়। মনটা অলসভাবে ফেলে রাখেন এইসব শব্দে। চারপাশে কথাবার্তা সব হিন্দিতেই, এর ফাঁকে এক-দুবার বাংলাও ভেসে এল। কোনও বাঙালি পরিবার যাচ্ছে কলকাতায়। কোনও কৌতূহলও তৈরি হয় না, চুপচাপ বসেই থাকেন অবিনাশ। এখনও সমস্তিপুর থেকে ট্রেনে ওঠেননি, মনে হচ্ছে যেন বাড়ি থেকে চলে এসেছেন অনেক দূরে। আসলে বিদায়ের পালা শুরু হয়েছে বাড়ি থেকেই। তিনি সেটা প্রলম্বিত করতে চাননি। সেই কারণেই দাদা আর ভাইকে প্ল্যাটফর্ম থেকে ফিরিয়ে দেওয়া। ফিরে যখন যেতেই হবে, মনটা খারাপ করে লাভ কী।

বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলেন, বউদি, মালবিকা, ছোট্ট দুটো মেয়ে রুনুঝুনু, যাদের এবার ভাল করে দেখাও হল না, সবার চোখে জল। ওদের পিছনে বাবাকেও যেন একবার দেখতে পেলেন অবিনাশ, ছায়ায় মিশে হাত নাড়ছেন।

রিকশায় উঠতে যাবেন, চোখ গিয়েছিল পাশের বাড়ির সদরে। সেখানেও একজন তাঁকে বিদায় জানাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েকে কোলে নিয়ে যমুনা।

রিকশায় না উঠে এগিয়ে গিয়েছিলেন অবিনাশ। যমুনাকে আর বিশেষ কিছু বলার নেই, বলাইয়ের কাছে যা জেনেছেন সবই বলেছেন। মৃগাঙ্ক সমস্তিপুরেই আছে, ওর ইচ্ছে তুমি দিদির বাড়ি ফিরে যাও। যমুনা তার কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি।

কী ঠিক করল, সেটা জানাতেই বোধহয় দাঁড়িয়েছে দরজায়। এইভাবে প্রকাশ্যে আসা ওর পক্ষে বেশ ঝুঁকির। বিশেষ কিছু বলার আছে নিশ্চয়ই।—এইসব ভাবতে ভাবতে এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অবিনাশ। মেয়েটা শুক্লপক্ষ চাঁদের মতো কোল আলো করে আছে। ওই আলোয় যমুনাকেও লাগছে অপূর্ব সুন্দর।

কোনও কথাই বলেনি যমুনা। পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকায় অবিনাশের দিকে। বোধহয় প্রথমবার। তারপর মেয়েসুদ্ধ ঝুঁকে পড়ে অবিনাশের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। আশীর্বাদের জন্য হাত তুলেও ওদের মাথায় রাখতে পারেননি অবিনাশ। মনে হয়েছিল ওই চন্দ্রালোক নির্ঘাৎ ভীষণ উত্তপ্ত। মুখে বলেছিলেন, মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখা হলে আমায় চিঠি দিতে বোলো।

ঘাড় হেলিয়েছিল যমুনা। মেয়েটার দিকে আর এক পলক তাকিয়ে রিকশার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন অবিনাশ।

এখন মাথায় সমস্তিপুরের কেউ নেই, ভেসে উঠছে দেবপাড়ার বাড়িটা। ওরা নিশ্চয়ই সব ভাল আছে।

সামনে দিয়ে রামদানাওলা যাচ্ছিল। অংশু খুব ভালবাসে খেতে। গোয়ালাকে বলে পেঁড়া আনিয়ে বাড়ির জন্য দিয়েছে বউদি। রামদানা নেওয়া হয়নি। অবিনাশ রামদানাওলাকে ডাকতে যাবেন। পাশ থেকে কে যেন তাঁকে ডাকে, অবিনাশদা, চললে তা হলে।

ঘাড় ঘোরাতেই চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারেন না অবিনাশ। গলাটা চেনা চেনা লাগে।

চাদরের ঘোমটা অল্প সরে যেতে প্রকাশিত হয় মৃগাঙ্কর মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফে

ভরা। চোখ দুটো কিন্তু আগের মতোই উজ্জ্বল। সবিস্ময়ে অবিনাশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তুই!

পারলাম না থাকতে। চলে এলাম। আর যদি দেখা না হয়।

উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে অবিনাশের। অশেষ চেষ্টায় সংযত রেখেছেন নিজেকে। হাত দুটো রাখেন মৃগাঙ্কর কাঁধে। বলেন, অলুক্ষুণে কথা বলছিস কেন! এমন কিছু হয়নি। বলাইয়ের সঙ্গে আমার সব আলোচনাই হয়েছে। প্রবাল সামন্ত নামে একজনের কথা বলেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করিস। আর তেমন যদি বুঝিস, যমুনা আর মেয়েকে নিয়ে সোজা দেবপাড়ায় চলে আসবি।

সে আমি জানি। শেষমেশ একটা অন্তত যাওয়ার জায়গা আছে আমার। মুশকিল হচ্ছে সমস্তিপুর ছেড়ে যেতে মন চায় না। এখানেই জন্ম, বেড়ে ওঠা, মরতেও চাই এখানে। তাই তো অনেকটা আত্মার মতো টিকে আছি। কেউ আমার টিকিটিরও খোঁজ পাবে না।

অবিনাশ এতটা নিশ্চিত নন। গভীর আশঙ্কায় মৃগাঙ্কর আশপাশে চোখ বোলান, কোনও বিপদ ওঁত পেতে নেই তো? ওকে আরও কিছুক্ষণ পেতে চাইলেও অবিনাশকে বলতে হয়, তুই আর এখানে দাঁড়াস না, পালা। খামোকা রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। যা যা বললাম মনে রাখিস।

মৃগাঙ্ক সেকেন্ডখানেক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন, ঢোঁক গিলে বলেন, বউদি, ভাইপো দুটো, সব ভাল আছে তো?

আছে। তুই এখন যা।

ঘুরে যান মৃগাঙ্ক। খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে হেঁটে মিশে যান ভিড়ে। প্ল্যাটফর্মের গেট পার হওয়ার পরও অবিনাশ তাঁকে লোকজনের মধ্যে থেকে শনাক্ত করতে পারেন। কারণ ওঁর লেংচে হাঁটা। অর্থাৎ মৃগাঙ্ক মোটেই ততটা সুরক্ষিত নয়। বুকটা ফাঁকা হয়ে যায় অবিনাশের, কেমন যেন হায় হায় করে ওঠে।

মুখ ঘুরিয়ে শরীর ছেড়ে দেন হোল্ডঅল্লের ওপর। এতক্ষণে দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে অবিনাশের। আশপাশে আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই। প্ল্যাটফর্মে বসে একা একাই ডুকরে ওঠেন।

॥ সতেরো ॥

লাস্ট লোকালের আগের গাড়িতে অপূর্ব মছলন্দপুরে এসে নামল, স্টেশনের দুপাশ অন্ধকার চাদরে ঢাকা। গ্রামটাকে দেখাই যাচ্ছে না। তবু গাছপালা, বাতাসের গন্ধে টের পাচ্ছে, ফিরে এসেছে নিজের এলাকায়।

ট্রেন থেকে নেমেছে গুটিকয় যাত্রী। কেউ লক্ষ করেনি অপূর্বকে বাড়ি ফেরার তাড়ায় হেঁটে যাচ্ছে রেলগেটের দিকে।

অপূর্ব ও রাস্তায় যাবে না। প্ল্যাটফর্মের পিছন দিয়ে নেমে যাবে ক্ষেতজমিতে। গোবরডাঙায় কলেজ করাকালীন স্টেশনে চেকার থাকলে, ওই রাস্তা দিয়েই চলে যেত বাড়ি।

স্টেশন-রাস্তায় এখনও কিছু দোকানপাট খোলা থাকে, অনেকেই অপূর্বকে চেনে। যদি খবর হয়ে যায় সে ফিরেছে, কারা যে অভ্যর্থনা করতে আসবে অপূর্ব আন্দাজ করতে পারছে না। পুলিশ, সুধাংশু জ্যাঠার পার্টি, তার নিজের পার্টির দু-একজন অথবা তীর্থর বাড়ির লোক। এখনই কাউকে ফেস করতে চাইছে না অপূর্ব। আগে বাড়ি ফেরা যাক।

এই আখ্যানের ভিন্ন প্রজন্মের দুই পলাতক, মৃগাঙ্ক ও অপুর্ব বাড়ি ফিরতে চাইছে, রাষ্ট্রযন্ত্র একই কায়দায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই পলাতকের হয়তো কোনওদিনই সাক্ষাৎ হবে না, তবুও ওরা মহাকালের নিরিখে একে অপরের পরম আত্মীয়।

প্ল্যাটফর্ম থেকে চাষের জমিতে নেমে এল অপূর্ব। চাঁদের আলোর তেমন জোর নেই, আকাশ পরিষ্কার, ঝকঝক করছে তারা। আবছা একটা আলো পড়ে আছে চাষের জমি, আলে। রাতের নিজস্ব আলো। দিব্যি পথ চলা যায়।

কাঁধে ঝোলা নিয়ে চেনা আলপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে অপূর্ব। মাটি থেকে উঠে আসছে পোকামাকড়ের চেনা-অচেনা ডাক। এ এক অন্য জগৎ। কীটপতঙ্গের পৃথিবী নিজের খেয়ালে চলছে। সাপখোপও থাকে আলধারে। ভয় সেভাবে ছুঁচ্ছে না অপূর্বকে। ছোঁয়ার কথাও না। সব থেকে খারাপ সম্ভাবনার কথা মাথায় নিয়েই সে মছলন্দপুরের মাটিতে পা রেখেছে।

চারদিন হল দেবপাড়া ছেড়েছে অপূর্ব। জামাইবাবুর সঙ্গে এবার দেখা হল না। মানুষটা অপূর্বর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর হলেও, সান্নিধ্য পেতে ভাল লাগে। কী একটা যেন আছে অবিনাশদার মধ্যে। অন্তলীন এক ধরনের প্রশ্রয়।

দেখা হল না দীপালির সঙ্গেও। না হয়ে ভালই হয়েছে। ব্যাপারটা গড়াত। সামলাতে পারত না অপূর্ব। মেয়েটা আগ্রাসী এবং মরিয়া। ডানা ওর পুড়বেই। মিছিমিছি অপূর্ব তার দায় নেবে কেন? ঘটনাচক্রে দীপালি যদি ভাল কোনও ছেলে পেয়ে যায়, তার একটা সম্ভাবনা তো রইল।

দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে অপূর্ব প্রথমে যায় বাগবাজারে শুভর মামার বাড়িতে। ওখানেই থাকে শুভ, চাকরি করে ছোটখাটো একটা প্রাইভেট ফার্মে। শুভর আসল বাড়ি গোবরডাঙায়, অপূর্বর কলেজবন্ধু। খুবই গভীর সম্পর্ক ছিল দুজনের। অপূর্বর প্রভাবে শুভও ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতি করত। ওর বাবা খুব বিচক্ষণ মানুষ। ছেলে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেন মামাদের কাছে। মামাদের অবস্থা ভাল। চাকরিটা শুভর বড়মামা করে দিয়েছেন।

আপাতনিশ্চিত একটা জীবনের দিকে হেঁটে গেলেও, অপূর্বকে ভোলেনি শুভ। নিয়মিত চিঠিপত্র দিত। অপূর্বও বেশ কয়েকবার ওর মামার বাড়িতে গিয়ে থেকে এসেছে। নানান কথা, গল্পের মাঝে ভুলক্রমেও অপূর্ব বুঝতে দেয়নি তার এখনকার রাজনৈতিক বিশ্বাস। কারণ শুভ এতটাই ভালবাসে অপূর্বকে সোজা চলে আসত মছলন্দপুর। সব কথা বলে দিত মাকে।

বাগবাজারের বাড়িতে গেলে শুভর মামারা দারুণ ব্যবহার করতেন অপূর্বর সঙ্গে। এবার

করলেন না। শুভও কেমন যেন একটু পালটে গেছে। গম্ভীর, রাশভারী ভাব এসেছে ওর চোখমুখে। ওর থাকার ঘরটাও বেশ ঝকঝকে-তকতকে হয়েছে। ঘরে ঢুকে প্রথমে কাঁধের ঝোলাটা কোথায় রাখবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না অপূর্ব। ঝোলাটা রাখতে হবে গোপনে, সাবধানে। অস্ত্র দুটো আছে।

এক ফাঁকে আলমারির পিছনে ঝোলাটা গুঁজে দিয়ে, বাকি দুটো দিন শুভর জামাপ্যান্ট পরে কাটিয়ে দিল অপূর্ব। শুভর শেভিং সেটে দাড়ি কেটেছে, নিজেকে পালিশ করেছে শুভর ঘরের মানানসই। লাভ হয়নি। পরের দিন রাতে শুভ গলা ঝেড়েটেড়ে বলে, তুই কি এখানে কদিন থাকবি ঠিক করেছিস?

হ্যাঁ। কেন? কোনও অসুবিধে আছে? শুভর প্রশ্নকে গুরুত্ব না দিয়ে ঠাট্টার সুরে জানতে চেয়েছিল অপূর্ব।

শুভ গম্ভীর হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলে, আসলে কী হয়েছে জানিস, মামারা ঠিক পছন্দ করছে না তোর এখানে থাকাটা।

কেন! আমি তো আগেও এ-বাড়িতে দু-চার দিন থেকে গেছি।

তা থেকেছিস, মামারা ভয় পাচ্ছে অন্য ব্যাপারে। পুলিশ ইদানীং যা ধরপাকড় চালাচ্ছে, কারও বাড়িতে ইয়াং কোনও ছেলে এসে থাকলেই, নকশাল সন্দেহে তুলে নিচ্ছে। 'রিলেটিভ' বললেও শুনছে না। সে অর্থে তুই তো মামাদের কেউ না। যদি পুলিশ ধরে, কী উত্তর দেবে।

শুভর কথা শুনে, ভেতর ভেতর চমকে উঠেছিল অপূর্ব। শুভরা কি টের পেয়ে গেছে, সে নকশাল। ঝোলাটা সার্চ করেনি তো?

একদম টের পেতে না দিয়ে শুভর সামনে থেকে সংযত ভঙ্গিতে উঠে গিয়েছিল অপূর্ব, উদ্দেশ্য আলমারির পিছনে গুঁজে রাখা ঝোলাটা দেখা। ওই সময় শুভ বলতে থাকে, বুঝতেই তো পারছিস, এ-বাড়িতে আমার কথার তেমন দাম নেই। আমি নিজেই আশ্রিত।

অপূর্বর ততক্ষণে দেখা হয়ে গেছে, কাঁধঝোলাটা যথাস্থানে, একই রকমভাবে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

আলমারির সামনে এসেছিল অপূর্ব। পাল্লায় লাগানো আয়নাটায় নিজেকে দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তখনই আবিষ্কার করে, যতই সে দাড়িফাড়ি কেটে ফিটফাট থাকার চেষ্টা করুক, চেহারায় 'পলাতক' মার্কা ছাপ পড়ে গেছে।

সে-রাতে শুভর সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি অপূর্ব। কথাও দেয় চলে যাবে কালকেই। অনেকটা রাত জুড়ে গল্প করে দুজনে। সব কলেজবেলার গল্প। দুজনেই হয়তো টের পাচ্ছিল সম্পর্কটা আলগা হয়ে যাচ্ছে, আর কোনওদিন দেখা নাও হতে পারে। বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আবৃত্তি করছিল তাদের প্রিয় একটা কবিতা—

> এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে
> এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
> সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
> পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।
> জোড়া দীঘি, তার পাড়েতে তালের সারি
> দূরে বাঁশঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
> পচা জল আর মশায় অহংকারী
> নীরব এখানে অমর কিষাণপাড়া...

সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতাটা একবার কলেজ ফাংশানে ডুয়েট আবৃত্তি করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল শুভ, অপুর্ব। এই মুহূর্তে অন্ধকার মাঠে হাঁটতে হাঁটতে কবিতাটা আবার আবৃত্তি করে অপূর্ব, নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই কেমন যেন মুগ্ধ হয়ে পড়ে। নিজের জন্য কেন জানি কষ্টও হয়।

শুভর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় শুভ দুটো একশো টাকার নোট দিয়ে বলেছিল, এটা রাখ। কদিন আগে উটকো রোজগার হয়েছে, তুইও কিছু খরচা কর।

করুণাটা নিতে দ্বিধা করেনি অপূর্ব, তার সঙ্গে আর একটা জিনিসও চেয়ে নিয়েছিল, আফটারশেভ লোশন। বলেছিল, এত দামি লোশন আশ্রিতের মাখা মানায় না, এটাও নিলাম, কেমন।

ভীষণ বোকা বোকা হয়ে গিয়েছিল শুভর মুখ। মুখটা মনে পড়তে এখন হাসি পাচ্ছে অপূর্বর।

বাগবাজার ছেড়ে অপূর্ব যায় পার্ক সার্কাস, কমরেড সুনির্মল ঘোষের বাড়ি। জানতই এই ধরপাকড়ের সময় সুনির্মলদা হয় জেলে থাকবে, না হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে। তবু একটা চান্স নিয়েছিল। সুনির্মলদা শীর্ষস্থানীয় লিডার হলেও, অপূর্বর সঙ্গে একটা আলাদা সম্পর্ক ছিল। গোবরডাঙায় এসে বেশ কয়েকবার মিটিং করে গেছেন সুনির্মলদা। তখনই অপূর্বকে তাঁর পছন্দ হয়ে যায়। একবার শ্রীরামপুরের জুট মিলে দাঙ্গা লাগার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সুনির্মলদার ক্যুরিয়র এসে ডেকে নিয়ে যায় অপূর্বকে। কলকাতায় বসে সুনির্মলদা নির্দেশ দেন, কীভাবে দাঙ্গা রুখতে হবে।

অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল অপূর্ব, এক রাতের মধ্যে পাঁচশো পোস্টার লিখে সেঁটে দিয়েছিল জুট মিল চত্বরে। দাঙ্গাবাজদের নাম উল্লেখ করে পোস্টারে লেখা ছিল 'দাঙ্গা লাগালে গলা কেটে নেওয়া হবে। এই কাজে অপূর্বকে সাহায্য করেছিল মিলের বেশ কিছু শ্রমিক। ওই হুমকিতেই কাজ হয়। ঠান্ডা হয়ে যায় মালিকের পোষা গুণ্ডারা। অপূর্বর কর্মতৎপরতায় ভীষণ উৎসাহিত হয়েছিলেন সুনির্মলদা। বলেছিলেন, তোকে বারবার প্রয়োজন হবে আমার।

সেভাবে আর দরকার পড়েনি। তবে যখনই অপূর্ব কলকাতায় এসেছে, দেখা করেছে সুনির্মলদার সঙ্গে। ওঁর কাছে কিছুক্ষণ থাকা মানেই নতুন করে চার্জড হওয়া। মার্কসবাদ থেকে লেনিন, মাও-এর চিন্তাধারা, সমস্ত কিছুর ওপরেই ছিল পরিষ্কার ধারণা। সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন অপূর্বকে। গান শুনতে ভালবাসতেন খুব। বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন মিউজিক। বাখ, মোজার্ট, বিটোফেন প্রথম সুনির্মলদার কাছেই শুনেছে অপূর্ব, একটা ছোট্ট বিদেশি টেপরেকর্ডার ছিল ওঁর। গান শোনাতে শোনাতে বোঝাতেন সোনাটা ফর্ম কাকে বলে, কনসোনেন্স, ডেসোনেন্স... অপূর্ব ব্যাপ্ত হত। মনে হত আমি বরিশালের নই, মছলন্দপুরে আমার বাড়ি নয়, আমি ভারতেরও না, আমি পৃথিবীর একজন।

সুনির্মলদার চিন্তাভাবনা যতটা আন্তর্জাতিক স্তরের, স্বভাবের দিক থেকে ততটাই ঘরোয়া। নিজের মেয়ে-বউয়ের প্রতি কী গভীর ভালবাসা। ওদের ছোট্ট এক কামরার ঘরে আর্থিক অনটন যতই থাকুক, আনন্দের অভাব কখনওই হত না। পুচকে মেয়েটার সামান্য জ্বর বা দু-একটা হাঁচি পড়লেই ভীষণ উদ্বিগ্ন হতেন সুনির্মলদা, বউদি হাসত। বলত, দেখ অপূর্ব, তোমার সশস্ত্র সংগ্রামী দাদাকে। মেয়ের সামান্য শরীর খারাপে কেমন হেদিয়ে পড়েছে।

সেই সুনির্মলদাকে এখন দিনের পর দিন আন্ডারগ্রাউন্ডে পরিবার ছেড়ে থাকতে হচ্ছে। স্কুলের চাকরিটাও গেল বলে। ওদের বাড়ি গিয়ে অপূর্ব এবার দেখে এসেছে কী অবর্ণনীয় অবস্থা। শীর্ণ চেহারা হয়েছে বউদির। মরিয়া হয়ে ছোটখাটো একটা চাকরির চেষ্টা করছে। মেয়েটা প্রায় সব সময় ঘ্যানঘ্যান করছে, টেপে সিম্ফনি চালিয়ে দিলে শান্ত হয়।

অপূর্ব একদিনের বেশি থাকেনি পার্ক সার্কাসে। শুভর দেওয়া দুশো টাকা বউদির হাতে দিয়ে চলে আসে শিয়ালদা স্টেশনে। দেড়দিন প্ল্যাটফর্ম চত্বরে কাটায় এবং বুঝতে পারে তার কোথাও আর যাওয়ার জায়গা নেই।

আজ সকালে এক মারোয়াড়ি প্ল্যাটফর্মের ভিখারিদের খাইয়ে পুণ্য করে গেল। অপূর্বও সারিতে বসে খেয়েছে। তারপর দিয়েছে লম্বা ঘুম। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে কেমন যেন বাসি বাসি লাগে। ঝোলা থেকে শুভর লোশনটা বার করে। দাড়িওলা মুখেই মেখে নেয়। গন্ধটা অগুরুর মতো মনে হচ্ছিল। ছুড়ে ফেলে দেয় শিশি। তখনই ঠিক করে, ফিরে যাবে বাড়ি। যা হয় হোক।

সেইমতো অপূর্ব মছলন্দপুরে ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু মাঠ ফুরোচ্ছে না। সে জানে না, তার

বাড়ির দোরগোড়ায় পুলিশ অপেক্ষা করছে কি না। নিজের স্কোয়াডের কমরেডরাও ছেড়ে দেবে না তাকে, জানতে চাইবে তীর্থর খবর। সুধাংশু জ্যাঠা বাবুজিকে পাঠিয়েছিলেন— উদ্দেশ্য শেল্টার দেওয়া, নাকি পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া। —কিছুই আন্দাজ না করতে পেরে মাঠের ওপর বসে পড়ে অপূর্ব। একটু পরে শুয়েও পড়ে। আকাশের তারাগুলো আগের থেকে আরও উজ্জ্বল লাগছে। চাঁদ যেন সাদা লণ্ঠন, এইমাত্র কেউ পলতেটা দিয়েছে উশকে। মাঠে শুয়ে রাতের আকাশ এভাবে কখনও দেখেনি অপূর্ব। অসংখ্য তারা, ঘন নিবিড় ব্রহ্মাণ্ড পরিবার। নিজেকে বড় তুচ্ছ লাগে। এই পৃথিবীর পোকামাকড়ের মতোই সে একজন।

কানের কাছে কটকট করে কোনও একটা পোকা ডেকে ওঠে, ডাকটা হুবহু নকল করে অপূর্ব। মজা পায় যেন। আরও বেশি করে যেন মাটির গন্ধ পায়, মাটির ভেতরের গন্ধ।

তারা খসে পড়ে দক্ষিণ কোণে। নির্বিকার তাকিয়ে থাকে সে। মনে মনে একটা অলস অনুসন্ধান চালায়, কেন আমি আজ এইখানে এইভাবে পড়ে আছি? প্রসন্ন চক্রবর্তীর সেজছেলের পথ কি এই মাঠে এসে হারিয়ে গেল? আরও অনেক বন্ধু ছিল স্কুলকলেজে। তাদের পথ তো ফুরোয়নি। যা হোক তা হোক করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। অপূর্ব কেন বেছে নিল এই পথ? সেই অর্থে রাজনৈতিক পরিবেশ তার বাড়িতে ছিল না। বাবা প্রায় শর্তাধীনভাবেই এপারে এসে সিপিএম পার্টি করতেন, আবার পুজোআচ্চাও করতেন চুটিয়ে। শুধু সুধাংশু জ্যাঠার ধমকানিতে বন্ধ রেখেছিলেন যজমানি।

সংসারকে একটা থিতু অবস্থা দিতে বাবাকে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছিল! ঠিকমতো যত্ন নিতে পারেননি সন্তানদের। ধর্মের দিক থেকে সংখ্যালঘু ছিলেন ওপার বাংলায়, এলেন এপারে। ছোড়দি বিয়ে করল মাসির ছেলেকে। অনাচার সহ্য হল না বাবার, মারা গেলেন। ধর্ম-আসক্তি বাবাকে মারল। তিষ্ঠতে দিল না সারা জীবন। অপূর্বর তাই ধর্মবিশ্বাস নেই। দেশাত্মবোধও তাকে সেভাবে পীড়িত করে না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে দেখে এসেছে, আশেপাশে ভীতসন্ত্রস্ত স্বজন, পরিজন।

ক্লাস টেনের একটা ঘটনার কথা খুব মনে পড়ে, খাঁটুরা স্কুলে নাইনে দুবার ফেল মেরে প্রীতম ভর্তি হল অপূর্বদের স্কুলে ক্লাস টেনে। প্রীতমের প্রভাবশালী বাবা কীভাবে যেন ম্যানেজ করেছিল স্কুল কমিটিকে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগেনি ছাত্রদের। বখে যাওয়া ছেলে হিসেবে প্রীতম ততদিনে বেশ নাম কামিয়েছে। চাতরা থেকে গোবরডাঙার ছাত্ররা তাকে এক ডাকে চেনে। অপূর্বরা ঠিক করে রেখেছিল প্রীতমের সম্ভাষণ কীভাবে করবে।

প্রথম দিন স্কুলে এসে প্রীতম লাস্ট বেঞ্চের কোণে ঘাড় নিচু করে বসেছিল। ফার্স্ট পিরিয়ডে দেবনারায়ণ স্যার এলেন। রোল-কল শুরু হল। দিব্যি চলছিল নাম ডাকা, যখনই এল প্রীতমের নাম, ক্লাস জুড়ে শেয়াল ডাকা শুরু হল।

দেবনারায়ণ স্যার রোল-কলের খাতা বন্ধ করে তাকিয়ে রইলেন ক্লাসসুদ্ধু ছাত্রের দিকে। ক্লাস থামলে উনি বলতে শুরু করেন, আমি জানি কেন তোমরা হইচই করছ। নতুন বন্ধুকে তোমরা মেনে নিতে পারছ না। যেহেতু ওর নামে বেশ কিছু বদনাম আছে, খারাপ ছেলে বলেই লোকে ওকে জানে। কিন্তু তোমরা যদি ওকে সাদরে গ্রহণ না কর, ও তো খারাপ ছেলেই থেকে যাবে। একটা কথা জানবে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা মহৎ মানুষ থাকে। কোন সময় সেটা জেগে ওঠে বলা যায় না। আমাদের সমাজে মানুষকে সব সময় ছোট করে দেখতে শেখানো হয়। ভালবাসা, আন্তরিক ব্যবহার মানুষকে বড় করে। তোমাদের বন্ধুত্বের স্পর্শে প্রীতমও একদিন ভাল ছেলে হয়ে উঠবে। তখন দেখো, কেমন গর্ব হয়।

হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর প্রীতমের কী হয়েছে জানা নেই অপূর্বর। সেদিন দেবনারায়ণ স্যারের কথার পর সারা ক্লাস আর টু শব্দটি করেনি। ওই নিস্তব্ধতার মাঝে একটু একটু করে পালটে যাচ্ছিল অপূর্ব। দিশা পাচ্ছিল জীবনের। অজ্ঞাতেই দেবনারায়ণ স্যার একটা পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সেই দিনের গল্পটা অপূর্ব বড় হয়ে অনেক বন্ধুর কাছেই করেছে, যেমন শুভ, তীর্থঙ্কর।

শুভ একবার শুনেই চলে গিয়েছিল অন্য কথায়। তীর্থ ছিল চুপ করে। পরে একাধিকবার গল্পটা শুনতে চায়। কখনও একা, কখনওবা আড্ডার মাঝে। গল্পটা শুনে নিজেকে অনুপ্রাণিত করত সম্ভবত। অপূর্বর বলা শেষ হলেই ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ত খুশির আভা।

দেবনারায়ণ স্যার মারা যান অকালে। সামান্য রোগভোগে। তাঁর কথাগুলো অপূর্ব বাহিত হয়ে তীর্থর কাছে পৌঁছয়, সেখান থেকে আরও অনেকের কাছে। দেবনারায়ণ স্যারের মতো মাস্টারমশাইরা বেঁচে আছেন এইভাবে।

তীর্থ অবশ্য ব্যক্তি দেবনারায়ণ স্যারকে গুরুত্ব দেয় না। বলে, সময়, সময়ই তোর কানে ওই কথাগুলো বলেছিল। আমাদের বিপ্লব সময়ের ফসল। মাঠে শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে অপূর্বর কেমন যেন মনে হয়, পাশে অন্য কারও শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চমকে চোখ খুলতে টের পায়, এতক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিল। চকিতে পাশ ফিরে দেখে, কেউ নেই। অথচ মনে হচ্ছিল যেন তীর্থ শুয়েছিল পাশে। হয়তো আছে, অন্য কোনও মাঠে, পুলিশের গুলি খেয়ে, উপুড় হয়ে। এখনও শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে। একটু পরেই থেমে যাবে।

শ্বাসকষ্টটা অপূর্বর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। মাঠে শুয়ে সে টের পায় পৃথিবী পাশ ফিরছে। সে থেকে যাবে স্থির। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র কেমন বাঙ্ময়! কেউ খসে যাচ্ছে না। ছুটে যাচ্ছে যোজন যোজন দূরে। কেন স্থবির হয়ে যাবে অপূর্ব

খামচে ধরে মাটি। মাঠ থেকে উঠে বসতে চায় অপূর্ব, পারে না। টাল খায় মাথা। এর মধ্যেই ভেসে আসে অজস্র স্মৃতি, অনেক অনেক মুখ। অংশু, বরুণ, মেজদার মেয়ে পুতুলের মুখটাও মনে পড়ে। ওরা আগামী প্রজন্ম। ওদের কত গল্প, রূপকথা শুনিয়েছে অপূর্ব। ছোট্টগুলোর কাছে অপূর্ব দেবনারায়ণ স্যার। এত তাড়াতাড়ি মরলে চলবে কেন?

তীর্থ নিষ্ঠুর। ওর ভাইপোকে কখনও কোনও কল্পনার রাজ্য দেয়নি। তীর্থর মরাই উচিত। এই তো কদিন আগেই বরুণের জন্যই ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে অপূর্ব। বেঁচে তাকে থাকতেই হবে।

উঠে বসেছে অপূর্ব। মনে পড়ছে অংশু বরুণের দিদিমণির কথা। সেই কবোষ্ণ বুক জীবনের অমোঘ আহ্বান।

মাঠে উঠে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব। মাথা অল্প অল্প টলছে। হাঁটতে থাকে। কোথায় যাবে জানা নেই। কোনখানে সে নিরাপদ! বাঁচার জন্য বড় কাঙাল হয়ে উঠেছে প্রাণ।

চরাচর আপাতত নিস্তব্ধ। পোকারা নিশ্চুপ। লাস্ট লোকাল চলে গেছে বহুক্ষণ। হিম নামছে মাঠে, পুকুরে, গাছপালায়। অপূর্ব হেঁটে যাচ্ছে এলোমেলো পায়ে। কাছের মাঠ থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে একপাল। ঠিক যেমন অপূর্বরা ডেকেছিল ক্লাস টেনে। একটা খারাপ ছেলেকে দেখে।

॥ আঠেরো ॥

বালি ব্রিজে বাসটা ওঠার পর থেকে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন ইলা। মায়ের মন্দিরটা ভাল করে দেখা গেলেই প্রণাম করবেন। গঙ্গার ওপর পেঁজা মেঘ আর নীল আকাশ। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পিছনেও একই চালচিত্র। কী অপূর্ব লাগছে আজ।

আসলে পুজো নাকের ডগায়। ঠিক দশদিন পরই ষষ্ঠী। তাই আকাশে-বাতাসে এত সাজো সাজো রব।

ইলার বত্রিশ বছরের জীবনটা নানান জায়গায় কেটেছে। দেবপাড়ার আশেপাশে প্রকৃতিতে পুজোর আয়োজন টের পান সব থেকে বেশি। এই কারণে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। ইচ্ছে আছে সমস্তিপুরের সবাইকে একবার নিয়ে এসে দেবপাড়ায় পুজোটা কাটাবেন। সেটা কতটা সম্ভব কে জানে। অত বড় বাড়ি ছেড়ে সবাই কি আসবে!

অবিনাশ ফিরেছেন দিন কুড়ি হয়ে গেল। বলছিলেন, সমস্তিপুরের বাড়িটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কদিন কর্তার মন খারাপ ছিল বেশ। ধীরে ধীরে সামলে গেছেন। আবার জড়িয়ে গেছেন এখানকার কাজে, অফিসে, বন্ধুদের সঙ্গে। এখন তো তাঁর মনে আবার নতুন পুলক ....

যেদিন ফিরলেন, একবেলা থিতোতে দিয়ে সাঁঝবেলা ইলা খবরটা দেন। বেশ ভয়ে ভয়ে বলেন, তুমি তো আবার বাবা হতে চললে মনে হচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য ওঁর মুখ থেকে দেশের বাড়ি ছেড়ে আসার বিষণ্ণতা উধাও হল। বলেছিলেন, সত্যি!

শরীরের ভাবগতিক দেখে সেরকমই টের পাচ্ছি। এখনও ডাক্তার দেখাইনি। এ মাসে শরীর খারাপের ডেট পার হয়ে গেল। ভেবে রেখেছি তুমি এলে যেমন যা করাতে বলবে...

কর্তার সমস্ত আনন্দ চোখে এসে জমা হয়েছিল। চশমার আড়ালে উদ্বেল দৃষ্টি। বলেছিলেন, দেখো, এবারও ছেলেই হবে।

কেন, মেয়ে কী দোষ করল?

অপ্রতিভ হয়েছিলেন উনি, না দোষের কথা নয়। আসলে বংশের মর্যাদা রক্ষার দায় তো বিধাতা আমার ওপরেই দিয়েছেন। দাদা নিঃসন্তান। রজতের দুটোই মেয়ে....

কথা কেটে ইলা বলেছিলেন, মেয়ে যদি নামজাদা হয়, তা হলে কি বংশের মান বাড়ে না?

যুক্তির দিক দিয়ে বাড়ে। সমাজ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয় না। বিখ্যাত কোনও মহিলার বাবা-ঠাকুর্দার খোঁজ কেউ করে না, ইতিহাসও এ ব্যাপারে কিপটেমি করে। মাঝখান থেকে মহিলার শ্বশুরবাড়ির নামটাই চলে আসে বড় করে। কৃতিত্বের ভাগ অনেকটাই তারা নিয়ে নেয়।

এটা তো অন্যায়। বলেছিলেন ইলা।

হ্যাঁ, সত্যিই অন্যায়। কিন্তু তুমি-আমি মিলে তো সমাজকে পালটাতে পারব না। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ির দাবি পুরোটা অন্যায্য নয়। একটি মেয়ে জীবনের বেশির ভাগটা কাটায় শ্বশুরবাড়িতে। বাপেরবাড়ি থেকে পায় রক্তের ধারা। স্বামীঘরের উপযুক্ত পরিবেশ তাকে বড় হতে, নামী হতে সাহায্য করে।

মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন ইলা। বলেছিলেন, ওকথা বোলো না, বেশির ভাগ শ্বশুরবাড়ি মানেই জেলখানা। সব সময় তাঁবে রাখতে চায় বউদের। যদি কেউ নাম করে জানবে নিজের মনের জোরেই করেছে।

তা অবশ্য ঠিক। তবে ব্যতিক্রমও আছে। বলে, খানিকক্ষণ উদাস হয়ে বসেছিলেন উনি। তারপর যেন নিজেকে শুনিয়েই বলেন, আমি ঠিক ওই ধরনের মর্যাদা রক্ষার কথা বলছি না। পুত্রসন্তান চাইছি একটা বিশেষ কারণে। বড় কাজের জন্য। নাম হওয়াটা সেখানে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কী কাজ? কোন কারণ? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন ইলা। ক্ষণিক অপেক্ষার পর উত্তর না পেয়ে ফের বলেন, সেই কাজ কি তোমার বাকি দুই ছেলের দ্বারা সম্ভব নয়?

কর্তা ছিলেন নিরুত্তর। দৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল চলে গেছেন চিন্তার গভীর জগতে। ইলার অন্য একটা আশঙ্কাও হয়, অবিনাশ হয়তো কন্যাসন্তান জন্মের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন। বিষয়টার সহজ সমাধানের জন্যে বলে উঠেছিলেন, এক কাজ করি, এই বাচ্চাটাকে নষ্টই করে দিই বরং।

কর্তার পিঠে অদৃশ্য চাবুক পড়ল যেন। চমকে তাকিয়েছিলেন ইলার দিকে। ওই তাকানোতেই ওঁর মনের ভাব বুঝে যান ইলা। মাথা নামিয়ে নিয়েছিলেন অপরাধ বোধে। তবু কথা শোনাতে ছাড়েননি উনি। বলেছিলেন, মেয়ে হয়ে, কন্যাসন্তানের ভয়ে তুমি বাচ্চা নষ্ট করতে চাইছ। তা হলেই বোঝো, শুধুমাত্র শ্বশুরবাড়িতেই মেয়েদের তাঁবে রাখার চেষ্টা হয় না। অনেক আগে থেকেই মেয়েরা প্রাপ্য ভালবাসা থেকে হয় বঞ্চিত।

ইলার তো তখন অপ্রস্তুত অবস্থা। কর্তার উদ্বেগ কমানোর জন্য কথাটা বলতে গেলেন, পড়লেন মুশকিলে। মিনমিনে গলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে ইলা বলে উঠেছিলেন, আবার একজন আসা মানেই তো খরচা বাড়া। ধারটারগুলো এখনও শোধ হল না।

সব ধীরে ধীরে হয়ে যাবে। তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না। তুমি যদি ভেবে থাক সন্তানজন্মের নিয়ন্তা আমরা, তা কিন্তু ভুল। আমরা নিমিত্ত। প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনে প্রাণ আনে পৃথিবীতে। অনেক হিসেব-নিকেশ করেই তো চলি আমরা, পারলাম সম্ভাবনা এড়াতে?

দোষীর মতো মুখ করে বসেছিলেন ইলা। অথচ তাঁরই সব থেকে বেশি আনন্দ হচ্ছিল। কোন মেয়ে না চায় মা হতে! দুটো ছেলে তো আছেই, ইলা মনে মনে চাইছেন, এবার যেন তাঁর মেয়েই হয়। ইচ্ছেটা কর্তাকে বোঝানোর উপায় নেই, কথার ঘোরপ্যাঁচে ইলা পৌঁছে গেছেন কন্যাজন্মের বিপক্ষে। এ যে কী জ্বালা... আর একটু হলে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করাটা হত না। বাসটা চলে এসেছে ব্রিজের শেষ প্রান্তে। গাছপালার ফাঁকে মন্দিরের চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে। ঝট করে কপালে হাত ঠুকে প্রণামটা সেরে নিলেন ইলা।

ঘাড় ঘুরিয়ে সোজা হয়ে বসতেই উলটোদিকের সিটে চোখ আটকে গেল। একজন বুড়ো মানুষ ইলার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টিতে কি লুকিয়ে আছে সামান্য ভর্ৎসনা? গুরুজনপ্রতিম মানুষ সম্ভবত চোখ দিয়ে বলছেন, নিজের ভাবনায় এতটাই মশগুল, মায়ের মন্দিরটাকে ভুলে যাচ্ছিলে প্রণাম করতে! ভদ্রলোকের মুখে হঠাৎ যেন শ্বশুরমশাইয়ের আদল ফুটে ওঠে। চোখ সরিয়ে নেন ইলা। বাসটা নামছে ঢালু বেয়ে।

সেদিন কথায় কথায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে পড়া ইলাকে উদ্ধার করেন কর্তা নিজেই। নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার ধিক্কারে ইলা যখন বসেছিলেন থম মেরে, উনি হঠাৎ বলে ওঠেন, তোমার নাম ইলা না হয়ে উর্বরা হলে যথার্থ হত।

বিস্মিত, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে কর্তার দিকে তাকিয়েছিলেন ইলা। অবিনাশ হাসছিলেন মিটিমিটি। একটু পরে বলেন, আমি একটু বেহিসেবি হলেই তুমি দেখছি মা হয়ে পড়। আগের দুটোর বেলা তাই হয়েছে। তুমি সদাই প্রস্তুত।

একদম ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ভীষণ লজ্জায় মুখ ঝামটে উঠেছিলেন ইলা। নিজের রসিকতায় প্রাণ খুলে হাসছিলেন অবিনাশ। বিব্রত অবস্থা কাটাতে ইলা উঠে যান সামনে থেকে, তাঁরও হাসি চাপতে কষ্ট হচ্ছিল।

রান্নাঘরে এসে নিজের মনেই খানিকক্ষণ হেসে নিলেন ইলা। বারকয়েক অস্ফুটে বলেছিলেন, অসভ্য, অসভ্য কোথাকার। তারপর স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপান। মনে পড়ছিল খানসামা গ্রামের কথা। সে-বাড়ির জমিও ছিল খুব উর্বর। পাকশালার মাটি নিকানো সরু বারান্দায় বসে ডাল, সরষে আরও নানান জিনিস বাছত মা। খেয়ালখুশি মতো কিছু বীজ ছড়িয়ে দিত মাটিতে, সেগুলোই পরে গাছ হয়ে, ফুল ফুটে রাঙিয়ে দিত হেঁশেলঘরের পাশের জমি। বিশেষ করে শীতকালে দূর থেকে নিজেদের বাড়িটাকে দেখে মনে হত যেন একটি খুকি রঙিন ফিতে মাথায় দিয়ে হাসছে।

ঊর্বরা বলতে কি তেমনটাই বুঝিয়েছিলেন উনি? নিশ্চয়ই তাই। না হলে রাতে অমন বায়না করবেন কেন, কখনও যা করেননি! একটা সুতো রাখতে দেননি শরীরে। ডুম ল্যাম্পের নীলচে আলোয় হাঁ করে তাকিয়েছিলেন ইলার দিকে। লজ্জা ঢাকতে ইলা ওঁর শরীরটাকেই নিজের শরীরে টেনে নেন। মুখে, চুলে, বুকে মুখ গুঁজে দিতে দিতে কর্তা বলছিলেন, তোমার গা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ছাড়ছে ইলা। আমগাছে বকুল এলে এরকম গন্ধ ছড়ায়। আম মুকুলের গন্ধ।

শরীরটাকে অতি সাবধানে আদর করছিলেন অবিনাশ। যেমন কোনও কৃষক তার ফসলের ওপর হাত বোলায়। 'সুখ'টা অসহ্য ঠেকছিল ইলার, অবিনাশকে গ্রহণ করেন নিজেই, বলা যেতে পারে আগ বাড়িয়ে। এর আগে কখনও এরকম করেননি। কর্তা কী মনে করলেন, কে জানে!

সুখানুভূতি চরম পর্যায়ে পৌঁছতেই ইলা মনে মনে বলে উঠেছিলেন, হা, ভগবান। খুব কম মেয়েই তার ঈপ্সিত পুরুষটিকে পায়। কোন পুণ্যবলে আমাকে তা দিলে, জানি না। দিয়েইছ যখন, কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব কোরো না।

অলুক্ষুণে কথাটা কেন যে তখন ভেবেছিলেন! আসলে মানুষ যখন পরিপূর্ণভাবে কিছু পায়, হারানোর ভয় শুরু হয় তখন থেকেই।

জোর একটা ঝাঁকুনি খেল বাসটা। প্রথমেই হাত দুটো চলে গেল পেটে। ধড়াস করে উঠল বুক। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে, মনটাকে শরীরের ভেতর চালান করে দিলেন, কোনও ক্ষতি হয়ে গেল না তো?

একইভাবে মিনিটখানেক বসে থেকে নিশ্চিন্ত হলেন ইলা। বুকের ভেতরটা এখনও ধড়ফড় করছে। শান্ত হতে সময় লাগবে।

শরীরের এই অবস্থায় বাসে ওঠা উচিত হয়নি ইলার। কর্তা জানতে পারলে প্রচণ্ড রাগ করবেন। ঝুঁকি নিয়েই বেরিয়ে পড়েছেন আজ। নিজেকে সামলাতে পারেননি। কয়েকটা ব্যাপারে কিছুদিন ধরেই মনের মধ্যে অশান্তি চলছে। অবিনাশকে খুলে কিছু বলেননি। কর্তাকে এসব বিষয়ে না জড়ানোই ভাল।

সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু অপূর্ব। সে দেবপাড়া থেকে চলে যাওয়ার পর আর কোনও খবর নেই। অপূর্ব যে দেবপাড়ায় কিছুদিন ছিল, এটুকুই জানেন অবিনাশ। শুনে একটু অবাকও হয়েছিলেন। বললেন, আমার অপেক্ষায় আর একটা দিন থাকতে পারল না! কী এমন কাজ পড়ল যে চলে যেতে হল?

দায়সারা উত্তর দিয়েছিলেন ইলা, অতশত কিছু বলেননি। হঠাৎ কী খেয়াল হতে চলে গেল। বলে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। কথা শেষ করে কর্তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন ইলা, বিশ্বাস করানো গেল কি? ঠিক বোঝা গেল না।

মিথ্যেটা বলতেই হয়েছিল ইলাকে। আসল কথা তো বলা যায় না, আপন ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। তা হলে তো বাবুজির কথাও বলতে হয়। বাবুজিকে দেখে অপূর্বর লুকিয়ে পড়া... খামোকা কর্তার মাথায় চিন্তা বাড়িয়ে কী লাভ!

এক কথায় অপূর্বর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াটা ভীষণভাবে কষ্ট দিয়েছিল ইলাকে। অভিমান হয়েছিল। দুশ্চিন্তা সেভাবে হয়নি। ইলা ধরেই নিয়েছিলেন, অপু মছলন্দপুরেই ফিরে গেছে। কিন্তু সমস্ত হিসেব গুলিয়ে দিল মেজদা। দিন পাঁচেক আগে দুপুরবেলা হঠাৎ বাড়ি এসে হাজির। কর্তা রোজকার মতো অফিসে। মেজদাকে দেখে ভারী অবাক হয়েছিলেন ইলা, একই সঙ্গে মন কু গাইছিল, মছলন্দপুরের বাড়িতে কিছু হয়নি তো? মা কেমন আছে? মেজদা তো কাজ ছেড়ে হঠাৎ দেবপাড়ায় আসার লোক নয়। শেষ কবে এসেছিল মনেই নেই ইলার। মেজদার একটা মহৎ গুণ, ঠোঁটের ফাঁকে সব সময় একটা হাসি লেগে থাকে। এত খাটে তবু হাসিটা মলিন হয় না কখনও। চেহারায় অবশ্য কঠিন শ্রমের ছাপ স্পষ্ট।

সেদিন দুপুরে তেতেপুড়ে এসে একই রকম হাসছিল মেজদা। ওইটুকুই যা সান্ত্বনা।

জলটল খেয়ে বলল, তোরা কেমন আছিস দেখতে এলাম।
বিশ্বাস হয়নি ইলার। বলেছিলেন, বাজে কথা বোলো না। এতদিনে তোমার সময় হল, আমরা কেমন আছি দেখতে আসার। যদি এলেই, বউদি, পুতুলকে নিয়ে এলে না কেন? নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে।
ধরা পড়ে যাওয়ার হাসি হেসেছিল মেজদা। হাত তুলে বলেছিল, বলছি, বলছি। আগে কিছু খেতে দে দেখিনি। আজ হাফবেলা অফিস করে বেরিয়ে এসেছি। টিফিন খাওয়া হয়নি।
খুব তাড়াতাড়ি লুচি-তরকারি করে মেজদাকে দিয়েছিলেন ইলা। খেতে বসে মেজদা আসল কারণটা বলে, প্রায় এক মাসের ওপর অপূর্ব বাড়ি ফেরেনি। আগেও এরকম করেছে, তবে এতদিনের জন্য নয়। বেরোনোর সময় বলে যায় না কোথায় যাচ্ছে। এবার বেশি দেরি হচ্ছে দেখে, বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছিল কাজ সেরে সে ইলার কাছে আছে। কিন্তু বাবুজি এখান থেকে ঘুরে গিয়ে বলেছে, অপূর্ব দেবপাড়াতেও নেই। তারপর থেকে মায়ের রাতের ঘুম গেছে। মেজদার কানের কাছে গুনগুন করছে সর্বক্ষণ, একবার ইলার বাড়ি যা, এতদিনে নিশ্চয়ই ওখানে এসে বসে আছে। যদি না পাস, জামাইয়ের সঙ্গে শলা কর, সে বিচক্ষণ মানুষ, উচিত পরামর্শ দেবে।
মায়ের ঠেলাতেই মেজদা এসেছে বোনের বাড়ি। সে নিজে ততটা চিন্তিত নয়, অপূর্ব ইয়াং ছেলে, কোথাও কোনও কাজে আটকে গেছে, ফিরে আসবে ঠিক।
দাদার মতো নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না ইলা। কেননা তিনিই তো জানেন বা বুঝতে পেরেছিলেন, অপূর্ব লুকিয়ে থাকতে এসেছিল এখানে। নিজের সংসারের কথা ভেবে ইলা তাকে উৎখাত করেছেন। তারপর সে গেল কোথায় দিদির ওপর রাগ করে?
অনেক কথাই মুখে এসে জমা হচ্ছিল ইলার, ঢোঁক গিলে পাচার করছিলেন পেটে। অপূর্ব সম্বন্ধে তাঁর জানা সামান্য তথ্যও বাপেরবাড়ির লোকেদের উদ্বেগে রাখবে। এদিকে মেজদা থাকতে থাকতে কর্তা যদি এসে পড়েন, জানাজানি হয়ে যাবে অপূর্ব এসেছিল এ-বাড়িতে। অবিনাশ জানেন অর্ধসত্য।
দুশ্চিন্তায় রীতিমতো ঘাম দিয়েছিল শরীরে, মেজদাকে বলেই ফেলেন, এক্ষুনি তোমাদের জামাইকে অপূর্বর ব্যাপারে কিছু বলার দরকার নেই। পাঁচটা কাজ নিয়ে থাকে, নানান চিন্তা ঘোরে মাথায়। হয়তো দেখা গেল কিছুই নয়। অপূর্ব আছে কলকাতায় কোনও বন্ধুর বাড়ি। আজ-কালের মধ্যেই ফিরে যাবে মছলন্দপুরে। মাঝখান থেকে তোমাদের জামাইকে ব্যস্ত করা হবে।
আমারও সেকথাই। কিন্তু মাকে কী বোঝাই বল তো? জানতে চেয়েছিল মেজদা। ইলা বলেছিলেন, মাকে বলবে, ইলাকে সব বলে এসেছি, ও জামাইকে যা বলার বলবে। সেই ভাল। তাই বলব। বলে, ফের গুছিয়ে বসতে যাচ্ছিল মেজদা। বলে কি না, বেলা তো হয়েই গেল, অনেকদিন অবিনাশের সঙ্গে দেখা নেই। আজ দেখা করেই যাই। অপূর্বর ব্যাপারে অবশ্য কোনও কথা তুলব না।
সামান্য ঝুঁকিটুকু নিতে চাননি ইলা। মিথ্যে করে বলেছিলেন, দেখা হলে তো ভালই হত। কিন্তু ওর ফিরতে আজ নটা-সাড়ে নটা। ইউনিয়নের মিটিং আছে। তুমি এত সময় বসে থাকবে কী করে? লাস্ট ট্রেন দূর অস্ত, এখান থেকে দমদম যাওয়ার বাস-ট্রেন কিছু পাবে না।
মিথ্যেটা ধরতে পারল না দাদা। বড়ই ভাল মানুষ। নিরাশ হয়ে বলেছিল, তাহলে আর কী, চলেই যাই। সবাই এত কাজকম্ম নিয়ে থাকি, নিকট আত্মীয়দের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয় না। যদিবা আজ সুযোগ হল...
মেজদা আর সময় ব্যয় করেনি। বরুণকে আর এক প্রস্থ আদর করে জানতে চেয়েছিল, কী খেলনা চাই। পরেরবার যখন আসবে, কিনে আনবে।
বরুণ নিজের আবদারটা তো বলেই, সঙ্গে দাদারটাও যোগ করে দেয়। অংশু তখন স্কুলে। বরুণের স্কুল ছিল সকালে।

মেজদা চলে যাওয়ার পর অপূর্বকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়লেও, সাময়িক একটা নিশ্চিন্ততা এসেছিল। কিছুটা সময় পাওয়া গেল ভাবার। কর্তা হঠাৎ যদি এসব শুনতেন, থই পেতেন না কিছুই। তখন ইলার হত কঠিন সমস্যা।

যদিবা দুটো দিন সময় পাওয়া গেল ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার, অপূর্বর ব্যাপারে যোগ হল নতুন এক উপদ্রব। ঝামেলাটা এমন জায়গা থেকে এল, একদম আসাই করেননি ইলা, অংশু বরুণের দিদিমণি দীপালি দু-তিন দিন হল বারেবারে অপূর্বর প্রসঙ্গ তুলছে, আসলে খোঁজ নিচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। গতকাল আর থাকতে পারেননি ইলা, সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী ব্যাপার বল তো দীপালি, কদিন ধরে দেখছি তুমি মাঝে মাঝেই অপূর্বর কথা তুলছ।

লোকদেখানো লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেছিল দীপালি। তারপর বলে, আসলে ওঁর সঙ্গে আলাপ হল, গল্প হল কত। খুবই ভাল মানুষ। হঠাৎ চলে গেলেন, কিছু বললেন না। শুনে তো ইলার চোখ বড় বড়, সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছিলেন, কখন এত গল্প হল? ও তো বাড়িতে সবসময় গোমড়া মুখেই বসে থাকত।

কেন, একদিন বাজারে দেখা হল না! সন্ধেবেলা গিয়েছিলেন মাছ কিনতে। আমরা গেলাম...

সব কথাই বলল দীপালি। অস্বীকার করার উপায় নেই, একমাত্র সাক্ষী তখন ঘাড় নিচু করে পড়ায় নিবিষ্ট। মাথা কিছুতেই তুলছিল না বরুণ। ছেলেটা এই বয়সে কী ওস্তাদ। পুরো ঘটনাটা চেপে গেছে। অপূর্বই বলেছে চেপে যেতে। কথা রেখেছে মামার। অংশু ওর থেকে পাঁচ বছরের বড়, মায়ের কাছে কোনও কথাই লুকোয় না। বরুণটা বড় হয়ে কেমন হবে কে জানে! এ বিষয়ে কর্তার সঙ্গে আপাতত কোনও আলোচনা করা যাবে না।

দীপালির কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ইলা একটা-দুটো প্রশ্ন করেছিলেন বরুণকে, মাথা না তুলে ঘাড় নেড়ে দীপালির পক্ষে সায় দিয়েছিল বরুণ।

ইলার তো চিন্তার একশেষ। বেহায়া মেয়েটা তখনও বলে যাচ্ছিল, উনি বলেছিলেন, আপনাদের মছলন্দপুরের বাড়িতে একদিন নিয়ে যাবেন। আমাদের বাড়িতেও যেতে চাইছিলেন সেদিনই। ঘাটে বসে গল্প করতে গিয়ে এত সময় চলে গেল, ভাবলাম আপনি আবার চিন্তা করবেন, তাই আর নিয়ে যাইনি বাড়িতে। মাকে অপূর্বদার কথা বলেছি। সেদিন নিয়ে যাইনি বলে মা আবার খুব রাগারাগি করল। বলল, কেন নিয়ে এলি না! ছেলেটা মনে মনে কী ভাবল বল তো। আসলে আমি আন্দাজ করতে পারিনি, উনি হঠাৎ...

দীপালির নির্লজ্জ কথাগুলো শোনার আর প্রবৃত্তি ছিল না ইলার, ততক্ষণে মনে মনে কপালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন, কেন অপূর্ব এত কিছু চেপে গেছে? ও কি অন্য কোনও সমস্যা লুকোতে গিয়ে পাত্তা দিয়ে ফেলছে দীপালির মতো ফালতু মেয়েকে! কিছুক্ষণ বাজে বকবক করে হালকা হতে চেয়েছিল? অপূর্ব যে এই কথাগুলোই দীপালিকে বলেছিল, হলফ করে বলা যায় না। কথাগুলো মানায় না অপূর্বর চরিত্রের সঙ্গে। বরুণের কাছে যাচাই করা যাবে না। ওইটুকু ছেলে তো আর ওদের কথায় কান দিয়ে বসে থাকেনি। সে গিয়েছিল মামার সঙ্গে ঘুরতে। কিন্তু চিন্তার বিষয় যেটা, অপূর্ব কেন দীপালির সঙ্গে দেখা হওয়াটা লুকিয়ে গেল? ইলা জানলে কী এমন ক্ষতি হত! বড়জোর সতর্ক করতেন ভাইকে।

অপূর্বর এই ধরনের আচরণ খুবই অদ্ভুত, কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে ওর। এমন কিছু, যাতে ওর হাবভাব, চরিত্র সব পালটে গেছে। সেদিন কেমন চোরের মতো লুকিয়ে পড়েছিল বাবুজিকে দেখে। অপূর্ব কি নিজের অবস্থা থেকে নীচে নেমে গেছে, বাঁচতে হচ্ছে লুকিয়ে চুরিয়ে। কী এমন অপরাধ করেছে সে?

অপূর্বর ছোটবেলার সেই নিষ্পাপ মুখটার কথা বারেবারে মনে পড়ে যাচ্ছিল ইলার। সেই অবোধ ছোট্ট ভাই। ইলারা যখন দেশ ছেড়ে চলে আসছেন, অপূর্ব মায়ের আঁচল টেনে ধরে ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞেস করছিল, দিদিরা কোথায় যাচ্ছে? মা কোনও উত্তর দিচ্ছিল না। কাঁদতে ভয় পাচ্ছিলেন ইলা, শীলা। পাছে ভাইটা মনে কষ্ট পায়। অপূর্বর সেই সরল, নিষ্পাপ মুখের ছাপ দুই বোন বুকে করে নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। স্বাধীন জন্মেছে পরে। মজফফরপুরে

থাকতে দুই বোন বাবার চিঠিতে জানতে পেরেছিলেন তাঁদের আর একটা ভাই হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই চাক্ষুষ না হওয়া ভাইয়ের প্রতি টান সেভাবে তৈরি হয়নি। অপূর্বই দুই বোনের স্নেহ অনেকটা আদায় করে বসে আছে। এত দূর ভাবার পরই ইলার মনে সংশয় জাগে, আচ্ছা, শীলাও কি এখনও ভাইয়ের প্রতি টান অনুভব করে? না কি অনাসৃষ্টির বিয়ে করার পর, বাড়ির লোক ওকে যেমন ত্যাগ করেছে, ও-ও ভুলেছে সবাইকে। শুধুমাত্র দিদিকে ছাড়া। কারণ গোপনে হলেও সম্পর্কটা বজায় রেখেছেন ইলা। ভাবনার মাঝে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসে, অপূর্ব শীলার বাড়ি গিয়ে বসে নেই তো? থাকতেও পারে। দীপালির, কথা শুনে যা বোঝা গেল, অপূর্ব যথেচ্ছ মিথ্যে কথা বলছে ইদানীং। হয়তো শীলার সঙ্গে ওর যোগাযোগ রয়েছে, চেপে গেছে বাড়ির সবাইকে। কদিন আগেও তো ওর সামনে শীলার কথা তুলতে এমন ভাব করল, যেন তার যে আরও একটা দিদি আছে, মনে রাখতে চায় না। —সব মিথ্যে। মহা মিথ্যেবাদী হয়েছে ছেলেটা।

খুব একটা নিশ্চিত না হয়ে, কেবল ধারণা সম্বল করে ইলা আজ শীলার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। শীলাটার সঙ্গেও অনেকদিন দেখা নেই। পেট জুড়ে এসে গেছেন একজন, বছর খানেক দেখা হবে না। আজ সকাল থেকেই মনটা খুব আনচান করছিল, অপূর্বকে নিয়ে দুশ্চিন্তাটা কারও সঙ্গে ভাগ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।— এইসব সাত-পাঁচ ভেবে ইলা ঝুঁকি নিয়েছেন বাস চড়ার। এখন অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, একই সঙ্গে তটস্থ। বাসটা আজ যেন বড্ড বেশি লাফাচ্ছে, রাস্তাও হয়ে গেছে লম্বা। আর একটা ব্যাপারেও মনটা খচখচ করছে, সামনে পুজো, শীলার ছেলেটার জন্য নতুন জামাকাপড় কিছু নেওয়া হল না।

জানলার বাইরে তাকান ইলা, বনহুগলি এসে গেছে। আর চার-পাঁচটা স্টপেজের পর বরানগর বাজার। ইলাদের বাড়ি বরানগর বাজারের পিছনে। নিজেদের বাড়ি নয়, ভাড়ার। শীলাকে বিয়ে করার পর বিপুলদা পাইকপাড়ার বিশাল পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে ভাড়াবাড়িতে উঠে আসে। পাইকপাড়ার বাড়িটা শুধু বিশালই নয়, যথেষ্ট আরাম-বৈভবে ছিল বিপুলদা। মাসি-মেসোর একমাত্র সন্তান। শীলার জন্য সব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তুলনায় শীলাকে ত্যাগ করতে হয়েছে কম। সে হারিয়েছে আত্মিক কিছু সম্পর্ক। একে অপরকে পাওয়ার জন্য এত ত্যাগ-তিতিক্ষা! বিপুলদা-শীলার প্রেম অনাচার হলেও, ভালবাসাটা পরীক্ষিত। এরকম কোনও পরীক্ষার সামনে পড়তে হয়নি ইলাকে। ভালবাসা, সুখ, সমৃদ্ধি সব যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে ইলার কাছে। অলক্ষ্যে কোথাও কোনও ফাঁক থেকে যায়নি তো?

আরও দুটো স্টপেজ চলে গেল। মাথা থেকে সংশয় তাড়ান ইলা, একেই বোধহয় বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো চিন্তা। এমন হতে পারে মনের গভীরে সহজাত অন্ধ ঈর্ষা ফণা তোলে, দেখতেই পায় না নিজের বোনকে পর্যন্ত।

বাসটা বি টি রোডে পড়ে বেশ ভালই চলছে, গর্তটর্তগুলো কম। বাসের ভেতরে যাত্রীদের দিকে চোখ বোলান ইলা, দুপুর বলে বাসে ভিড় নেই, উলটোদিকের সিটে শ্বশুর ধরনের সেই বৃদ্ধকে দেখা যাচ্ছে না। নেমে গেছেন কখন যেন।

পুরুষ যাত্রীদের চোখেমুখে ভারহীন ফুরফুরে ভাব। মহিলা যাত্রীরা সে তুলনায় অনেক গম্ভীর। ইলা জানেন, বাসের সব মেয়েই সংসার অথবা বাড়ির চিন্তা মাথায় নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। ছেলেদের সে হ্যাপা নেই। কর্তারও থাকে না। নিজেই স্বীকার করেছেন একদিন। বলেছেন, কাজের মধ্যে যখন থাকি, মাঝে মাঝে ভুলে যাই সংসারের কথা।

মাঝে মাঝে নয়, বাইরে থাকলে ভুলেই থাকেন সংসারের সবাইকে। চকিতে কখনও হয়তো মনে পড়ে। মনে মনে তো জানেন, বাড়িতে এমন একজনকে বন্দি করেছেন, সে সব খেয়াল রাখবে। যদিও সেই বন্দিত্বের শেকল হল ভালবাসা। কেনই-বা সেই শেকল সর্বক্ষণ পরে বসে থাকবেন ইলা!

ঝুঁকি নিয়ে আজকের এই বেরিয়ে পড়াটা আসলে অঘোষিত বিদ্রোহ। সাক্ষী নিজেই। তবু এর স্বাদই আলাদা।

'বাজার, বরানগর বাজার' কন্ডাক্টারের চিৎকারে ঘোর ভাঙে। তাড়াতাড়ি বাস থেকে

নেমে আসেন ইলা।

বাঁয়ে-ডাঁয়ে গাড়ি দেখে ধীর লয়ে রাস্তা পার হন। দরমা, কঞ্চিঘেরা বাজার চত্বর এখন ফাঁকা। তবে সকালে যে এলাকাটা জমজমাট ছিল, তার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। বাজারের পাশে গলির মুখে একটা পান-সিগারেটের দোকান খোলা রয়েছে। ভালই হল, শীলার ছেলেটার জন্য বিস্কুট-চকলেট নেওয়া যাবে।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্কুট-চকলেট নেওয়ার পর দুটো মিষ্টি পান দিতে বলেন ইলা। দোকানের পরিচ্ছন্নতাই পান কিনতে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে। এমনিতে পানের নেশা নেই তাঁর। কখনও-সখনও শখ করে খান। দুটো নেওয়ার কারণ একটা দেবেন শীলাকে।

একটা সাজা পান ইলার দিকে বাড়িয়ে দোকানি বলে, অন্যটা মুড়ে দিই কাগজে?
ইলা ঘাড় নাড়েন। দোকানির থেকে পানটা নিয়ে মুখে দেন। টাকা বার করেন হাতে ঝোলানো ছোট্ট বটুয়া থেকে। বটুয়াটা কাচ বসানো, রঙিন সুতো দিয়ে কারুকাজ করা। শীলা দিয়েছিল। কারও দেওয়া জিনিস তার সামনে ব্যবহার করলে খুশি হয়। পান খেয়ে শীলার বাড়িতে ঢোকাটাও শীলার জন্যই। দিদিকে পান খেতে দেখলে সে আহ্লাদে মরে। বলে, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করলেই তোর চেহারাটা অদ্ভুত বদলে যায় দিদি মনে হয় বিরাট কোনও জমিদারবাড়ির বউ।

ইলাও সেটা জানেন, তাঁর সাজগোজের চেহারার প্রেক্ষাপটে অনেকেই যে একটা ধনী পরিবারের কল্পনা করে, অপরিচিতের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেই টের পান। অথচ ইলা মানুষ হয়েছেন অতি সাধারণভাবে। আত্মীয়ের আশ্রয়ে। এখনও রয়েছেন ছাপোষার মতোই। তা হলে কি ঠাকুর্দার আভিজাত্য এখনও ছাপ ফেলে রেখেছে শরীরে? ঠাকুর্দা শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন চক্রবর্তী ছিলেন অতি সম্পন্ন সরকারি কন্ট্রাকটর। একেবারে খাঁটি সাহেব। বরিশালের বাগদা গ্রামে ছিল ঠাকুর্দার প্রাসাদের মতো বাড়ি। বাবা মানুষ হয়েছেন ওই বাড়িতেই। বরিশাল কলেজে পড়তেন। হাতখরচা বাবদ ঠাকুর্দার কাছে দশ টাকা বেশি চেয়েছিলেন বাবা। ঠাকুর্দা রাজি হননি। বাবা অভিমান করে চলে যান খানসামা গ্রামে, নিজের মামার কাছে। মামার তদবিরে জমিদার রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর নায়েব হন। জমিদারি প্রথা তখন অস্তাচলের পথে। রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী বাবা ছাড়াও আর একজন নায়েবের ওপর কাছারির দায়িত্ব দিয়ে কলকাতায় এসে আছেন। জমিদারি প্রথা পুরোপুরি উচ্ছেদ হয়ে গেলে, বাবা খানসামা হাই স্কুলের হেডপণ্ডিত হন। বাবার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। সব শেষে ওপার বাংলার খাস জমি ফেলে রেখে বাবা মাইগ্রেশন নিয়ে চলে এলেন এপারে। সামান্য টাকাপয়সা, গয়না, যা-কিছু এনেছিলেন সঙ্গে করে, মছলন্দপুরে জমি কিনে বাড়ি করতেই সব ফুরিয়ে গেল। এপারে এসে অনেক কষ্টে জোগাড় করেছিলেন প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি। তার সঙ্গে পুরোহিতগিরি বজায় রেখেছিলেন। যজমানিতে ওপার বাংলায় বাবার মোটামুটি পশার ছিল। এপারে তো ব্রাহ্মণ ভর্তি। খুব একটা সুবিধে করতে পারছিলেন না। সুধাংশু জ্যাঠার নির্দেশে এক সময় ছেড়েই দিতে হল পৌরোহিত্য। সি পি এম পার্টি করলে ওইসব বৃত্তি ছাড়তে হবে।

শেষ বয়সে একটা অজগাঁয়ে, জীর্ণ কুটিরে দেহ রাখলেন পিয়ারীমোহন চক্রবর্তীর একমাত্র সন্তান। যিনি সেই যে অভিমান করে পিতার ছত্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আর কখনও ফিরে যাননি। —একটা কথা ভেবে ভীষণ অবাক হন ইলা, মাত্র দশ টাকা। ঠাকুর্দা যদি টাকাটা দিতে রাজি হয়ে যেতেন, ইলাদের এতটা খারাপ অবস্থা হত না।

কত সামান্য কারণে, কী সাংঘাতিকভাবে ভুগতে হচ্ছে বংশধরদের। মানুষের অকারণ জেদ, আত্মম্ভরিতা কত বড় হয়ে দেখা দেয় ভবিষ্যতে। একটাই সান্ত্বনা, ঠাকুর্দাকে দেখতে হল না এত সব।

পরলোক, পরজন্ম যদি সত্যিই থেকে থাকে আর ঠাকুর্দার যদি জন্ম না হয়, অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই দেখছেন বংশের দুর্দশা। এর মধ্যে একজনকে দেখে তাঁর মন কিছুটা হলেও জুড়োবে। তাঁর ফরসা আদুরে চেহারার এই নাতনিটি। যে এখন ঠোঁট লাল করে ঢিমে লয়ে

নিঝুম গলি ধরে এগিয়ে চলেছে বোনের বাড়ির দিকে।

ডানদিকে একটা তস্য গলি, ঢুকে গেলেন ইলা। শেষ বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকে শীলারা।

গ্রিলের গেটের ভেতর দিয়ে হাত বাড়ালে কলিংবেল। বাজান ইলা। বছর বারোচোদ্দোর যে মেয়েটি বেরিয়ে আসে ইলা তাঁকে চেনেন না। শীলারা বাড়ি বদল করল নাকি? মেয়েটি গেটের কাছে এসে জানতে চাইল, কাকে চাই?

সামনে আসাতে মেয়েটিকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কাজের মেয়ে। তবে চেহারায় মিষ্টি ভাব আছে। ইলা বলেন, শীলারা নেই?

না, মাইমা এখন নেই। আপনি এসে বসুন। বলে, মেয়েটি সঙ্গে করে আনা চাবিকাঠি দিয়ে ভেতর দিকের তালা খুলতে লাগল।

গেট খোলার পর ভেতরে এসে ইলা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কে, ভাল করে না জেনেই তুমি ঢুকতে দিলে কেন?

লাজুক হেসে মেয়েটি বলে, আপনি মাইমার দিদি, দেখলেই বোঝা যায়।

ঠোঁট উলটে ইলা বলেন, বাঃ, ভারী বুদ্ধিমতী তো! ধর, যদি ভুল হত তোমার, কী করতে?

হতেই পারে না। মাইমা বলেই রেখেছে, দেখিস লতা, যে-কোনওদিন আমার দিদি আসতে পারে দুপুরে, বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখিস না। ঢুকতে দিস ভেতরে। কথাটা শুনে ভাললাগায় ভরে যায় মন, শীলা তার মানে প্রত্যেক দুপুরে তাঁর প্রত্যাশায় থাকে।

ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে ইলা কাজের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন, তা তোমার মাইমা এই ভরদুপুরে কোথায় বেরোল?

আমাকে ‘তুই’ করে বলবেন বড়মা, মাইমা স্কুলে গেছে।

মেয়েটি যেন একটু বেশিই চালাকচতুর। হবে না কেন, কলকাতার কাজের মেয়ে বলে কথা। ইলা বলেন, স্কুলে গেছে কেন? সায়কের স্কুল তো সকালে।

ইলাকে আর একপ্রস্থ অবাক করে মেয়েটি বলে, ভাই তো বাড়িতে। ঘুমোচ্ছে।

তা হলে শীলা কেন গেছে?

পড়াতে। দিদিমণি।

হতবাক হয়ে গেছেন ইলা। চাকরি করছে শীলা! তাঁকে কিছু জানায়নি তো! চিঠি ছাড়া জানানোর উপায় নেই। শেষ কবে শীলার কাছে এসেছেন মনে পড়ছে না। মাস দু-তিনেকের বেশি তো নয়। তখন তো ওর চাকরি করার মনোভাব টের পাওয়া যায়নি! ঘরে ঢুকে এসেছেন ইলা। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগছে। শীলাদের দুটো থাকার ঘর আর রান্নাঘর, বাথরুম, পায়খানা। অল্প জায়গার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এতক্ষণে চোখে পড়ে সায়ককে। এ-ঘরের বিছানাতে শুয়ে আছে কুঁকড়ে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে। শীলা ছাড়া সায়ককে দেখে কেমন যেন নিরাপত্তাহীন মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেয়াল হয়, তিনিও বাড়িতে বরুণকে সন্ধ্যার হেফাজতে রেখে এসেছেন। অংশু স্কুলে। স্কুল থেকে ফিরলে সন্ধ্যাই ওদের খেতে দেবে। দায়িত্বটা নিখুঁতভাবে পালন করে সন্ধ্যা। আগেও অনেকবার সন্ধ্যার ওপর নির্ভর করে দুপুরে বেরিয়েছেন ইলা। কোনও অসুবিধে হয়নি। সন্ধ্যা হয়তো শীলার কাজের মেয়ের থেকে একটু বড়। তবে অনেক বোকাসোকা। ওর ওপর দু ছেলের ভার দিয়ে ইলা যখন বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, শীলা কেন বেরোবে না! সন্ধ্যার মা মালতী অবশ্য অনেকদিন ধরে কাজ করছে ওবাড়িতে। খুব বিশ্বাসী। শীলার কাজের মেয়েটা কেমন, কে জানে।

বাথরুমে যাওয়ার আগে বটুয়া টেবিলে রাখবেন ভাবছিলেন ইলা, না রেখে হাতে নিয়েই এগিয়ে যান।

মেয়েটা আসছে পিছন পিছন। ইলা জানতে চান, কতদিন হল চাকরি করছে শীলা? এই তো মাসখানেক হল। তখন থেকেই তো আমায় রেখেছে।

কখন ফেরে স্কুল থেকে?

আর একটু পরেই চলে আসবে। আপনার জন্য চায়ের জল চাপাই বড়মা?

এখন নয়। শীলা ফিরুক। বলে, বাথরুমে ঢুকে যান ইলা।

কল চালিয়ে হাতে-পায়ের ধুলো ধুতে ধুতে ইলা ভাবেন, শীলার হঠাৎ চাকরি করার দরকার পড়ল কী কারণে। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে, কলকাতায় মাসির বাড়িতে থাকার সময় প্রাইভেটে বি এ পরীক্ষাটা দিয়েছিল, ডিগ্রিটা কাজে লেগেছে। কিন্তু শীলার তো চাকরি করার মনোভাব কোনওদিনই ছিল না। হঠাৎ কি কোনও অভাবে পড়েছে। সে সম্ভাবনা খুব কম। বিপুলদার চাকরি প্রাইভেট কোম্পানিতে হলেও, কোম্পানিটা বেশ বড়। বিপুলদার পদটাও উঁচু। নিজের কর্তার কাছে সব কিছু জেনে পরখ করে নিয়েছেন ইলা। কর্তা বলেছেন, বিপুলদার মালিক বিড়লা গোষ্ঠী। ওদের ওপর নাকি ভারত সরকারও ডিপেন্ড করে।

শীলা করতে পারল না! কী এমন হল হঠাৎ?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ইলা যান সামনের ঘরে। আলো জ্বালিয়েছে লতা। সায়ক উঠে বসেছে বিছানায়। মাসিকে দেখে একগাল নির্মল হাসি হাসে। চোখে ঘুমভার। বলে, কখন এলে মাসি? আমাকে ডাকোনি কেন?

ইলা বিছানায় গিয়ে বসেন। সায়কের একমাথা ঘন চুল ঘেঁটে দিতে দিতে বলেন, এই তো এসেছি বাবা।

মা তো নেই। স্কুলে গেছে। তুমি চলে যাবে না তো?

কেন যাব! আমি তোমার কাছে এসেছি। বলেন ইলা।

সায়ক খুশি হয়। বলে, সত্যি। মুহূর্তে মুখের ভাব বদল হয় ছেলেটার, নালিশের গলায় বলে, জান তো, মা রোজ স্কুলে যায়, আমার একটুও ভাল লাগে না। বাচ্চাটার কথা পিন হয়ে ফোটে ইলার বুকে। সায়ককে কোলের কাছে টেনে এনে প্রবোধ দেন, যাক না মা। তুমি দুপুরে লতার কাছে থাকবে, খেলবে।

লতাদিটা একদম বোকা। কোনও খেলা পারে না। চাইনিজ চেকার, ব্যবসায়ী, কিচ্ছু না। হাঁদা একটা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লতা প্রতিবাদ করে ওঠে, না গো বড়মা, খেলতে আমারও ইচ্ছে যায়। মাইমাই বলেছে ভাইকে দুপুরে ঘুম পাড়াতে। বিকেলে এসে পড়াতে বসে। লতার কথার পিঠে সায়ক বলে, হ্যাঁ গো মাসি। মা না একটুও খেলতে দেয় না। সকালে ইস্কুল। দুপুরবেলা ঘুমোনো। বিকালে মা পড়ায়, সন্ধেবেলা বাবা।

শুনে ইলারই হাঁফ ধরে যায় আর কি! অবাক হয়ে ভাবেন, এইটুকু বাচ্চার ওপর কেন এত পড়ালেখার চাপ দিচ্ছে শীলা, বিপুলদা? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার করতে চায় কি? সে যদি হওয়ার হয়, এমনিই হবে। নিজের মাথার জোরে। ইলা তো অংশু, বরুণকে নিয়ে এত কিছু ভাবেন না। অংশুটার পড়াশোনার আগ্রহ বরাবরই, ঠেলা মারতে হয় না। বরুণটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। তা নিয়ে কখনও দুশ্চিন্তায় ভোগেন না। ছেলেটা বাড়ির আশেপাশে বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকে, তা দেখেও চোখ জুড়োয়!

মাসি, আমার একটা দাদা আর ভাই আছে না? জিজ্ঞাসা নয়, যেন সমর্থন চায় সায়ক।

হ্যাঁ, কেন?

আমি বলেছি ওদের কথা লতাদিকে। আমি দাদা আর ভাইটাকে তো কোনওদিন দেখিনি, নিয়ে যাবে আমাকে তোমাদের বাড়ি?

বাচ্চাটার সরল আবদারে মুহূর্তে চোখের শিরায় বান ডাকে ইলার। গলার কাছে কষ্ট জমাট বাঁধে। সায়কের মাথা নিজের বুকে নিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব বাবা। তোমার স্কুলের ছুটি পড়ুক।

গলাটা বোধহয় একটু কেঁপে গেল। নিজেকে সামলাতে ইলা বলেন, দাঁড়া, তোর জন্য চকলেট-বিস্কুট এনেছি। সেটা তো দেওয়াই হয়নি।

বুক ছেড়ে চট করে সোজা হয়ে বসে সায়ক। মুখ থেকে মনখারাপ উধাও। সোৎসাহে

বলে, ক্রিম বিস্কুট এনেছ তো?

হ্যাঁ বাবা, মনে আছে তোর পছন্দ। বলে, বটুয়া থেকে বিস্কুট, চকলেট বার করতে থাকেন ইলা। সায়ক কাজের মেয়েটার উদ্দেশে বলতে থাকে, তোমাকে একটাও দেব না। একদম চাইবে না বলে দিচ্ছি।

মুখ ভেংচে লতা বলে, আমার ভারী বয়ে গেছে। আমি ওসব খাই না। আমি কি বাচ্চা!

ওদের ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলেন ইলা। তখনই কলিংবেল বেজে ওঠে।

সায়কের চোখেমুখে অদ্ভুত এক আলো ছড়িয়ে পড়ে, অনেকটা মেঘ সরে যাওয়া চাঁদের মতো। টের পেয়েছে, মা ফিরল।

লতা যায় দরজা খুলতে। একটু পরে ঘরে ঢোকে শীলা। দিদিকে দেখে আগের মতোই আনন্দে উদ্বেল হয়। আপসোসের সুরে বলে, ইস্, আজকে আসবি জানলে বেরোতাম না।

উত্তরে ইলা হাসেন। বুঝতে পারেন হাসিটা একটু আড়ষ্ট হয়ে রইল। সায়ক 'ওমা, ওমা শোনো না' বলে, কী যেন বলতে যায় শীলাকে।

দাড়াও, হাত-মুখ ধুয়ে আসি, তারপর শুনছি। বলে, শীলা চলে যায় ভেতর ঘরে। ইলা বোনপোর কাছে জানতে চান, কী বলতে যাচ্ছিলি মাকে! আমাকে বল।

কিছু না। বলে চুপ করে বসে থাকে সায়ক।

কাজের মেয়েটা বলে, এবার চা করি? মাইমা তো এসে গেছে।

ঘর ছেড়ে চলে যায় লতা। এখানে এখন শুধুই সিলিং ফ্যানের মৃদু শব্দ। ইলা মনে মনে প্রশ্নগুলো সাজিয়ে নেন। অনেক কথা জানার আছে শীলার কাছে। যে সম্ভাবনার কথা মাথায় নিয়ে এসেছিলেন এ-বাড়িতে, বোঝাই যাচ্ছে সেটা মেলেনি। অপূর্ব আসেনি এখানে। এসে থাকলে এতক্ষণে কাজের মেয়েটা, সায়ক অপূর্বর প্রসঙ্গ তুলত। অপূর্বর জন্য চিন্তা মাথা থেকে না যেতেই, শীলাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু হল। এই যে লোকে বলে, মেয়েদের আসল বাড়ি হল শ্বশুরবাড়ি, কর্তাও সেদিন বলছিলেন, কোনও কৃতী মহিলার সাফল্যের পিছনে মহিলার শ্বশুরবাড়ির অবদানকেই গুরুত্ব দেয় মানুষ। রক্তের ধারাকে ততটা পাত্তা দেয় না। কিন্তু মেয়েরা তো কোনওদিনই বাপের বাড়িকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। বাড়ি বদলে গেলেও, মনের মধ্যে থাকে আগের বাড়ি। বাবা, মা, ভাই, বোন— গোটা কুমারীবেলা।

বাবাঃ, এলি তা হলে! কেন এতদিন আসিসনি রে দিদি? আমি তো ভাবলাম তুইও সবার মতো আসা বন্ধ করে দিলি। ঘরে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে কথাগুলো বলল শীলা।

আলগা আবেগে গা ভাসালেন না ইলা। সরাসরি বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই চাকরি করছিস?

হ্যাঁ, ওই ছোটমতো আর কি। কাছেই একটা মেয়েদের স্কুলে। জুনিয়র স্কুল। ক্লাস এইট অবধি। এখনও পার্মানেন্ট হইনি। টাইম লাগবে। বলে, বিছানায় এসে বসল শীলা। বোনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন ইলা। একটা ঝুটো মুক্তোর হার ঝুলছে শীলার গলায়। চোখ টানছে ঠিকই, আসলে তো খেলো শৌখিনতা। কাজেকম্মে বেরোলে সোনা ছেড়ে মেয়েরা আজকাল এই ধরনের গয়না খুব পরছে।

ভ্রূ কুঁচকে অবুঝ হাসি নিয়ে শীলা জিজ্ঞেস করে, কী দেখছিস রে অমন করে?

তোকে হঠাৎ চাকরি নিতে হল কেন? জানতে চান ইলা।

এমনিই, সংসারের খরচ বাড়ছে না!

খরচ বাড়ালেই বাড়ে। ক মাস আগে দেখে গেলাম গ্যাসের উনুন কিনেছিস। আরও কিছু কিনলি নাকি?

ম্লান হাসে শীলা। খুবই ম্লান। ছেলের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, কী বলছিলি তখন?

বড়দের মাঝখানে চুপ করে বসেছিল সায়ক। মায়ের নজর পেয়ে চাঙ্গা হয়। বলে, মা, লতাদির সঙ্গে মাঠে খেলা দেখতে যাব? তুমি তো মাসির সঙ্গে গল্প করবে, পড়া হবে না।

যেয়ো। বলে, মাথা নিচু করে বিছানার চাদরের দিকে তাকিয়ে থাকে শীলা। চাদরে বন-

জঙ্গলের ছবি আঁকা।

ইলা সামান্য উদ্বেগ মেশানো গলায় জানতে চান, বিপুলদার অফিসে কোনও গোলমাল হয়নি তো? মুখ না তুলেই মাথা নাড়ে শীলা। ইলা বলেন, তাহলে তোকে কেন বাচ্চাকে কাজের লোকের হাতে ছেড়ে রোজগারের জন্য বেরোতে হচ্ছে?

নিজের হাতে স্বাধীনভাবে খরচা করতে ইচ্ছে হয় না! বলে, মুখটা ওঠায় শীলা। চোখ কিন্তু বলতে চাইছে অন্য কথা। চোখেই তো মানুষের সত্যি কথাটা লুকিয়ে থাকে। বিপুলদা তোকে স্বাধীনভাবে খরচা করতে দেয় না বুঝি? কই, আগে তো একথা কখনও বলিসনি! তোর খরচা করার ধরন দেখেও মনে হয় না, পাইপয়সার হিসেব দিতে হয় বিপুলদাকে। দু-চারবার গেছি তো তোর সঙ্গে বাজার করতে।

ব্যাপারটা ঠিক তা নয় রে দিদি। আমি যেটা...

থাম। যা বোঝার আমি ঠিকই বুঝতে পরছি। কলকাতায় থেকে তোর লোভ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বড়লোক প্রতিবেশীদের দেখে দেখে আজ এটা কিনব, কাল ওটা। বিপুলদার মাইনেতে সেসব সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। ভুলে যাস না, আমরা দু বোনে কী কষ্টে, পরের আশ্রয়ে মানুষ...

কথা শেষ হয় না। চা নিয়ে ঢোকে লতা। ওর হাত থেকে কাপ দুটো নিতে নিতে শীলা বলে, যা তো লতা, ভাইকে একটু ঘুরিয়ে আন।

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় লতার। খুশি হওয়া গলায় সায়ককে ডাকে, চল ভাই ঘুরে আসি।

বিছানা থেকে নামতে নামতে সায়ক ইলার উদ্দেশে বলে, তুমি চলে যাবে না মাসি। আমরা এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

তাড়াতাড়ি ফিরো। বলে, ইলা ফের বোনের দিকে মন দেন, শীলা চোখে চোখ রাখছে না। চাকরি করতে যাওয়ার আসল কারণ গোপন করতে চাইছে আপ্রাণ। ওর প্রতিরোধ আলগা করতে, কথা ঘোরান ইলা, কাজের মেয়েটা কিন্তু ভালই পেয়েছিস। খুব চটপটে, বেশ বুদ্ধি রাখে। রাতদিনের জন্য রেখেছিস না কি?

না। কাছেই ওদের বাড়ি। সন্ধেবেলা ছেড়ে দি।

রান্নাটাও কি ওই করে?

মাথা নেড়ে 'না' বলে শীলা। মুখে বলে, বাটনা বাটা, জোগাড়টোগাড়গুলো করে দেয়।

কথা ঢুকে পড়েছে কানাগলিতে, দু বোনই ঠিক করতে পারেন না, এরপর কোন প্রসঙ্গ আনা যায়।

নীরবতা ভাঙে শীলা, স্বগতোক্তির ঢঙে বলে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যই চাকরিটা নিয়েছি।

কেন, তোর ভার কি বইতে পারছে না বিপুলদা?

বইছে। বাধ্য হয়ে।

শীলার কথায় প্রবল ঝড়বৃষ্টির গন্ধ পান ইলা। কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, বাধ্য হয়ে মানে, তোরা তো একে অপরকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলি।

ও আর আমাকে ভালবাসে না দিদি।

মাথায় ছাদ ভেঙে পড়লেও এত আশ্চর্য হতেন না ইলা, এদিকে বৃষ্টি এসে গেছে শীলার চোখে। হেঁচকি তুলছে বারবার। বোনকে বুকে টেনে নেন ইলা। পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, এত ভেঙে পড়ছিস কেন! কী হয়েছে খুলে বল। আমি তো আছি নাকি তোর সঙ্গে। —বলতে বলতে ইলার কেন জানি এই অসময়ে মনে পড়ে ভুলে যেতে চাওয়া একটা দিনের কথা, বাবা মারা গেছেন। খবর পেয়ে ইলা, অবিনাশ, অংশু সমস্তিপুর থেকে মছলন্দপুর পৌঁছলেন। তখনও বরুণ জন্মায়নি। যাতায়াতে এতটা সময় লাগে, বাড়ির লোক ততক্ষণে শোক সামলে উঠেছে। মছলন্দপুরে মাটির দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ কাঁদলেন বটে, কেউ সঙ্গ দিল না। এমনকী মা-ও না। মায়ের চোখে জ্বলছিল ধিকিধিকি আগুন। ইলা যখন একটু সামলেছেন, মা এসে বলেছিল, বোনটারে কী শিক্ষাই দিলা! আত্মীয়ঘরে বিয়া কইরা

বাপটারে মারল। এর লগেই কি তোর সাথে পাঠায়াছিলাম অরে।

ইলা তখন কিছু মনে করেননি। শোকে বিলাপ করছিল মা। আজ কেন মনে পড়ছে কথাটা?

শীলা একটু শান্ত হয়েছে। চোখটোখ মুছে সোজা হয়ে বসে। ইলা জানতে চান, ভালবাসে না কেন, হঠাৎ এই পরিবর্তনের মানে?

জানি না।

শীলার কথার সুরে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, মিশে আছে হাল ছেড়ে দেওয়া ভাব। বিষয়টা ভীষণ গোলমেলে লাগে ইলার কাছে। স্পষ্ট করে বোঝবার জন্য জানতে চান, তুই কি ওর সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেছিস? কী দেখে বুঝলি, তোকে ভালবাসে না?

খুব দরকার ছাড়া আমার সঙ্গে কথা বলে না। ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। আমার সঙ্গে শোয় না পর্যন্ত। ও শোয় এ-ঘরে। আমি, সায়ক পাশের ঘরে।

আশ্চর্য! কথাটা মুখ ফুটে বেরিয়ে যায় ইলার। একটু ভেবে নিয়ে বলেন, তুই জিজ্ঞেস করিসনি, কেন এরকম করছে?

করেছি। আমার প্রতি কোনও অনুযোগ নেই ওর। কখনও ঝগড়া বা রাগ করে না। আমি যখন চেঁচামেচি করি, জোর করি, বলি, কেন শোবে না আমার সঙ্গে? ওর একটাই কথা, অনেকদিন এক সঙ্গে শোয়া-বসা করলাম, একটা বয়সের পর প্রত্যেক মানুষের একটু আলাদা থাকা উচিত।

কী ভীষণ অবান্তর কথা, ইলা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন শীলার দিকে। উনি ভাবতেই পারেন না, এক ছাদের তলায় থেকে কর্তা ছাড়া আলাদা শোওয়ার কথা। রাতটুকুই তো নিজের মানুষটাকে সব থেকে কাছে পাওয়া যায়। মানুষটাও অপেক্ষা করে তাঁর জন্য। এই বয়সেই বিপুলদার কীসের এত বৈরাগ্য। ইলা ফের জিজ্ঞেস করেন বোনকে, হ্যাঁ রে, বিপুলদা কোনও গুরু-মহারাজের পাল্লায় পড়ে যায়নি তো? খুব কি ঠাকুর ঠাকুর করছে?

না, সেরকম কোনও লক্ষণ নেই। এতক্ষণ যে প্রশ্নটা মনে চেপে রেখেছিলেন ইলা, করেই ফেললেন, বিপুলদা কি অন্য কোনও মেয়ে ...

না রে দিদি, প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল। যথেষ্ট গোয়েন্দাগিরি করেছি, লুকিয়ে পিছন পিছন ওর অফিস অবধি গেছি, ফিরেছি। হঠাৎ পৌঁছে গেছি অফিস টাইমে। সন্দেহ করার মতো কিছু পাইনি। ওর ব্যাগ হাঁটকেছি, ডায়েরি পড়েছি, জামাপ্যান্টে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি লম্বা চুল অথবা আবছা সিঁদুরের দাগ। কিছু পাইনি।

ঠোঁট উলটে গভীর চিন্তায় ডুবে যান ইলা। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানের সেই একঘেয়ে শব্দ। চিন্তার মধ্যে থেকেই ইলা প্রায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, মনে হচ্ছে বিপুলদার বাড়ি থেকেই কানে মন্তর দেওয়া হচ্ছে। ঘরের ছেলেকে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা।

তাও নয়। আমি খোঁজ নিয়েছি। আগে তবু মা-বাবার খোঁজ নিতে সপ্তাহে একবার ও-বাড়ি যেত, ইদানীং যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে।

তা হলে যায় কোথায় সে? অধৈর্য হয়ে পড়েন ইলা। শীলা বলে, কোথাও না। অফিস ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসে। চা জলখাবার খেয়ে, ছেলেকে পড়াতে বসে যায়।

গোটা সমস্যাটা ইলার বোধবুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম সম্পর্কও হয়! ঝগড়া-বিবাদ হলেও না হয় মানা যেত, সেটাও একটা সম্পর্ক। ঝগড়ার সম্পর্ক। দিদি, তুই কিন্তু এখনও একটা প্রশ্ন আমাকে করিসনি।

বোনের কথায় কপালে ভাঁজ পড়ে ইলার। শীলার চোখে আবছা রহস্যময় হাসি, কী বলতে চাইছে বোন? আর কী-ই বা জানার আছে!

উত্তরটা শীলা নিজেই দেয়, জিজ্ঞেস করলি না তো, আমি কোনও পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি কি না?

কথা তো নয়, যেন কারেন্ট মারে ইলার শরীরে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন বোনের দিকে, সত্যিই তো এই কারণটা ভেবে দেখা হয়নি। পরক্ষণেই মনে হয় একথা ভাবতে

যাবেনই বা কেন, শীলা তো খারাপ মেয়ে নয়। বিয়েটাই যা একটু গোলমেলে করে ফেলেছে। তবু নিজের মুখেই যখন কথাটা তুলেছে, আশঙ্কা থেকেই যায়। সামান্য উদ্বিগ্ন স্বরে ইলা জানতে চান, হ্যাঁ রে, সত্যিই সেরকম কিছু হয়েছে নাকি রে?

বুকে জমিয়ে রাখা শ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ে শীলা। বলে, উলটোটা হয়েছে। পুরুষ মানুষ দেখলেই আমি আজকাল এড়িয়ে চলি। সবাইকে কেমন যেন আজব, অদ্ভুত লাগে।

ফের দুবোন চুপ। গলি থেকে ভেসে আসছে শিলওলার ডাক, শিল কাটাবে... শিল... শিল কাটাউ-উ...। এই ডাকটা শুনলেই ইলার মন চলে যায় নিজের রান্নাঘরে, শিলটার কারুকাজ ভোঁতা হয়ে যায়নি তো? এই মুহূর্তে মন বলছে অন্য কথা, নিজেই অনাকর্ষণীয় কারুকার্যহীন হয়ে যাচ্ছেন না তো কর্তার চোখে? অবিনাশ যদি হঠাৎ একদিন বিপুলদার মতো আচরণ শুরু করেন, কোথায় যাবেন তিনি? এমনিতেই কর্তার চোখ খুব সজাগ, ইলা ইদানীং ব্লাউজের ভেতর কিছু না পরে ছোটখাটো বাজার-দোকান সারেন। ভেতরজামা পরলে বড্ড দমচাপা লাগে আজকাল। কর্তার চোখে ধরা পড়েছেন বেশ কয়েকবার। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে উনি বলেছেন, এ কী! ভেতরে কিছু পরনি কেন? চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে, দেখতেও খারাপ লাগে। জিনিসটা তো এমনি এমনি বেরোয়নি বাজারে, প্রয়োজনেই মানুষ কেনে।

লজ্জায় অধোবদন হয়েছেন ইলা, বলতে পারেননি নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখতে বড্ড দমচাপা লাগে।

শীলাকে নিয়ে ভাবতে বসে নিজেকে নিয়েই ভেবে যাচ্ছেন ইলা। দ্রুত মাথা থেকে আজেবাজে চিন্তা তাড়ান। শীলাকে বলেন, বিপুলদার এই বদলটা ঠিক কবে থেকে শুরু হল?

তুই যে লাস্ট এসেছিলি, তার দিন দশেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। তখন তোকে কিছু বলিনি, ভেবেছিলাম আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

কী থেকে শুরু হল, তোর সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মনোমালিন্য, অফিসে কোনও ঝামেলা...

কথার মাঝেই মাথা নাড়ে শীলা। বলে, সেসব কিচ্ছু না। যেদিন থেকে ও আলাদা শুতে শুরু করল, দিনটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। সায়কের স্কুলে হাফ-ইয়ারলির রেজাল্ট বেরিয়েছিল সেদিন। রেজাল্ট বেশ খারাপই হয়েছিল। আমারই দোষ, খুব একটা চাপ দিতাম না পড়াশোনায়। ক্লাস থ্রি-র ওইটুকু বাচ্চাকে কী চাপ দেব বল তো? —একটু থামল শীলা। ফের বলতে শুরু করে, অফিস থেকে ফিরে ওর বাবা দেখল রেজাল্ট, একদম গুম মেরে গেল। আমাকে বা সায়ককে এতটুকু বকাঝকা করল না। চা, টিফিন খেয়ে বসে গেল ছেলেকে পড়াতে। আগে কখনও পড়াত না, অফিস থেকে ফিরে রেস্ট নিয়ে পাড়ার ক্লাবে যেত তাস খেলতে। সেদিন থেকে তাস খেলা বন্ধ, অফিস থেকেও ফিরে আসে তাড়াতাড়ি। সে রাতে হঠাৎ আলাদা শুতে গেল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? বলল, আজ একটু আলাদা শুই, মাথাটা জ্যাম হয়ে আছে, ভাল ঘুম দরকার।

আমি সেদিন আর কিছু বলিনি। তারপর থেকে দেখি রোজই একই কাণ্ড করছে, কথা বলাও কমিয়ে দিল ধীরে ধীরে। আগের মতো ছেলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে না। তবে পড়ায় ভীষণ মন দিয়ে। ছেলেটাও পড়ে, ভয়ে ভয়ে। আমিও কেমন জানি ওকে ভয় পেতে শুরু করলাম।

তাই তুই চাকরিটা নিলি। এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেনি বিপুলদা?

করেছিল, জোরালোভাবে কিছু নয়। বলেছিল, সংসার, চাকরি দুটো এক সঙ্গে পারবে সামলাতে? শরীর বইবে না। আমি বলেছি, পারব। তোমাকে ভাবতে হবে না। ব্যস আর কোনও কথা বলেনি।

যে কারণেই রাগ বা অভিমান হয়ে থাক, তোর ওই কথায় রাগ তো আরও বাড়ল। কিন্তু আমি কী করব দিদি, ওর হাবভাব দেখে যা মনে হচ্ছে, হয় নিজে কোনওদিন সংসার ছেড়ে চলে যাবে, নয়তো আমাকে দেবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে। তখন আমি কোথায় যাব? আমার

যে কোনও জায়গাই নেই যাবার। নিজের চারপাশে কুয়ো খুঁড়ে ওকে বিয়ে করেছি। কোনও আত্মীয়স্বজনই আমাকে আশ্রয় দেবে না। চাকরিই আমাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে।

কথাটা ধ্রুব সত্যি। ইলাও আশ্বাস দিতে পারেন না। নিজের সংসারে বোনকে আশ্রয় দেবেন। এ ব্যাপারে তাঁকেও কর্তার মুখাপেক্ষী হতে হবে। এটাও নিশ্চিতভাবে জানেন, কর্তা রাজি হবেন না প্রস্তাবে। শীলা কি শরণার্থী হওয়ার অভিশাপ নিয়েই জন্মেছে? সেই কবে খানসামা ছেড়েছিল দুই বোন। মজফফরপুর এসে স্থায়ী ঠিকানা পেয়ে যান ইলা, শীলা জায়গা বদলাতেই থাকে, ওপার বাংলা থেকে বিহার, সেখান থেকে কলকাতা। এখানে এসেও বিপুলদাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। এখন আবার আস্তানা খুঁজছে, একা। ভাবনা মুলতুবি রেখে ইলা জিজ্ঞেস করেন, বিপুলদা কখন ফেরে অফিস থেকে?

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে শীলা বলে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে। কেন?

ভাবছি, আজ দেখা করে যাব।

দেখা করে কিছু বলবি ভাবছিস?জানতে চায় শীলা।

হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন ইলা।

নিজে এখনও ঠিক করেননি কী বলবেন। শীলা এবার মনের কথাটাই বলে ওঠে, তুই ওকে কী বলবি, আমার বিয়ের পর তুই ওর সঙ্গে দু-চারটের বেশি কথা বলেছিস বলে তো মনে পড়ে না আমার। সে-ও তোর সামনে থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে।

ঠিকই লক্ষ করেছে শীলা। এ-বাড়িতে যোগাযোগ রাখলেও, বিপুলদাকে ঠিক এড়িয়ে যাওয়া নয়, পাত্তাই দেন না ইলা। ভাবটা এমন করেন, তোমাকে আমি বোনের বর হিসেবে স্বীকারই করি না। সেই বিপুলদার সঙ্গে কী করে এখন ওদের দাম্পত্যকলহ নিয়ে কথা বলবেন? এতে এক প্রকার ওদের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলবেন, সমস্যার কোনও সুরাহা হবে বলে তো মনে হয় না। ভীষণই জটিল সমস্যা। কর্তার পরামর্শও চাওয়া যাবে না। উনি জানেন না, ইলা বোনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তা হলে উপায়?

দিদির দুশ্চিন্তা লাঘব করতে শীলা বলে, তুই বা এতক্ষণ অপেক্ষা করবি কী করে? অবিনাশদাও তো ফিরে আসবে অফিস থেকে। তার আগেই তোকে ঢুকতে হবে বাড়ি। ওর ফিরতে দেরি হচ্ছে ইদানীং। অফিসে নাটকের মহড়া চলছে।

প্রসঙ্গ ঘোরানোর সুযোগ পেয়ে শীলা বলে, তোর মনে আছে দিদি, আমরা মজফফরপুরে থাকতে অবিনাশদাদের নাটক দেখেছিলাম একবার। বড়দা মেয়ে সেজেছিল। অবিনাশদার বউ। আমরা তো হেসে খুন।

বেঙ্গলি ক্লাবের সেই নাটকের কথা মনে পড়ে গেল ইলার, শীলার সঙ্গে উনিও হেসে ফেললেন। হাসির রেশ মুখে নিয়েই শীলা বলে, দিদি, অবিনাশদার নাটক দেখাবি আমাকে? আমাকে কার্ড পাঠিয়ে দিবি, আমি চুপিচুপি গিয়ে দেখে আসব। কতদিন হয়ে গেল অবিনাশদাকে দেখিনি। স্টেজে দেখলে আরও মজা হবে, কী দাপটে অ্যাক্টিং করে! মজফফরপুরের নাটকটা খুব মনে আছে আমার।

ঘরের আবহাওয়া মোটামুটি হালকা হয়ে আসছে। গলি দিয়ে হেঁকে যাওয়া নানান ফেরিওলার ডাক শুনে টের পাওয়া যায়, দুপুর গড়িয়ে চলল বিকেলের দিকে। ইলা বলেন, পাঠিয়ে দেব কার্ড। আর একটা দারুণ ব্যাপার, নাটকটা তোর অবিনাশদার লেখা। ওদের অফিসে নাটকের খোঁজ চলছিল, অনেক বইটই কেনা হল, পড়া হল। কিছুতেই পছন্দ হয় না। তোর অবিনাশদা নিজের লেখা নাটক নিয়ে ভয়ে ভয়ে পৌঁছল অফিসে। সে নাটক এক চান্সে সবার পছন্দ। এখন ওই নিয়ে মজে আছেন। বাড়ি ফিরেও নাটক থেকে রেহাই নেই, সামনের ঘরে পায়চারি করে আর পার্ট বলে.....

গল্পের মাঝে হইচই করতে করতে ঘরে ফেরে সায়ক আর কাজের মেয়েটা। সায়ক সোজা বিছানায় উঠে আসছিল, ধমক দেয় শীলা, বাইরের হাত-পা আগে ধুয়ে এসো। বাধ্য ছেলের মতো সায়ক চলল বাথরুমের দিকে। দুপাশে পা ফেলে থপথপ করে হাঁটছে। ওর

পিছনটা দেখেই বোঝা যায় সামনের মুখ কতটা বিষণ্ণ। শীলার উদ্দেশে ইলা বলেন, তোদের অশান্তির জেরে ছেলেটা না মনমরা হয়ে যায়। এত শাসন করছিস কেন ওকে!

না রে দিদি, তুই জানিস না, ভীষণ বদমাইশ হয়েছে ছেলেটা। বাইরের লোকের সামনে এমন ভাল মানুষ সেজে থাকে, বুঝতেই পারা যাবে না। এমন ফাঁকিবাজ, পড়াশোনা নিয়ে জোর করলে বই নিয়ে বসবে, একফোঁটা পড়বে না। সাধে কি রেজাল্ট খারাপ হয়েছে!

অনেক কিছুই বলল শীলা, কানে বিধে রইল বাইরের লোক কথাটা, সম্পর্কটা যতই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করুন ইলা, বোন তাকে বাইরের লোক ভাবে। কারণ হয়তো গোপনে ইলার এই যোগাযোগ রাখাটাকে শীলা করুণা বলেই গণ্য করে।

লতা এতক্ষণ পর্যায়ক্রমে দুই বোনকে দেখছিল। শীলার উদ্দেশে বলে ওঠে, হ্যাঁ গো মাইমা, দোকান-টোকান যেতে হবে?

কেন রে?

মিষ্টির দোকান।

ও, দিদির জন্য বলছিস?

আর কিছু বলে না লতা, মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুদ্ধি তো আছেই মেয়েটার, ব্যবহারটাও পালিশ করা। ইলার আপসোস হয়, আহা, এরকম একটা মেয়ে যদি দেবপাড়ায় পাওয়া যেত...

শীলা বলে, সত্যি রে দিদি, তোকে কিছু খেতে দেওয়াই হয়নি। কথায় কথায় একদম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। কী খাবি বল? লুচি-তরকারি করতে বলি?

না না, বিকেলের দিকে অত ভারী কিছু খাই না। মুড়িটুড়ি মেখে দে। তারপর আর একবার চা খাওয়া যাবে। ততক্ষণে নিশ্চয়ই এসে পড়বে বিপুলদা।

ইলার কথা শেষ হতে, লতা অনুমতি চায় শীলার কাছে, তাহলে তাই করি।

ঘাড় হেলিয়ে ‘হ্যাঁ' করে শীলা। সায়ক ফিরে এসেছে ঘরে, দু বগলে বইখাতা। উঠে আসে বিছানায়। ইলা অবাক হয়ে জানতে চান, এ কী রে, এত বইপত্তর নিয়ে এলি কেন?

চোখ বড় বড় করে সায়ক বলে, বাবা এক্ষুনি আসবে। এসেই পড়াবে আমাকে।

হেসে ফেলেন ইলা। বলেন, বাবাঃ, তুই যেন বি এ পরীক্ষা দিবি!

কলিংবেল বাজে। তিনজনেই তাকায় দরজার দিকে। শীলা বসেই থাকে। বলে, এল বোধহয়। বেলটা আবার বাজতে, ভেতর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে লতা, এগিয়ে যায় দরজা খুলতে।

ইলা নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতেই ঘরে ঢোকে বিপুলদা। আগের থেকে একটু রোগা হয়েছে। ইলাকে দেখে অপ্রতিভ হওয়ার বদলে রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে পড়ে। বলে ওঠে, আরেঃ, ইলা কখন এলে?

এই বিপুলদাকে ইলা চেনেন না, বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছেন, কতটা হাসবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না। সৌজন্য রক্ষার্থে বলেন, এসেছি অনেকক্ষণ। এবার উঠব। আশাভঙ্গের দৃষ্টিতে দিদির দিকে তাকাল শীলা, ধরে নিয়েছিল দিদির প্ররোচনায় সম্পর্কের বরফ অবস্থা কিছুটা হলেও, গলবে। এদিকে বিপুলের ব্যবহারে বেশ ঘাবড়ে গেছেন ইলা।

টেবিলে অফিসের ব্রিফকেস নামিয়ে বিপুলদা বলে, উঠবে তো বুঝলাম। এতদিন পরে এলে, বোন কিছু খাইয়ে-দাইয়েছে তো?। উত্তরটা দেয় শীলা।

মুড়ি মাখা হচ্ছে বিপুলদা বলে, ধুস্, শুধু মুড়ি দিয়ে কী হবে। এইমাত্র দেখে এলাম কোলের দোকানে সিঙ্গাড়া ভাজছে, নিয়ে আসছি কটা।

বিপুলদার আচরণ এতই অপ্রত্যাশিত, বিছানা থেকে উঠেই পড়লেন ইলা। বললেন, আমাকে যেতে হবে। বেশ দেরি হয়ে গেল। চিন্তা করবেন উনি।

শীলা হতাশ গলায় বলে ওঠে, মুড়িটুকু খেয়ে যাবি না। চা হয়তো চাপিয়ে দিয়েছে। না রে। খুব তাড়াতাড়ি একদিন আসবখন। ওদিকে অংশু-বরুণের দিদিমণি চলে আসবে পড়াতে। মনেই ছিল না কথাটা।

দীপালির কথাটা মুখে আসতে, অপূর্বর চিন্তাটাও মাথায় ঠোক্কর মারে। যে জন্য আজ এখানে আসা, তার কোনও সুরাহা হল না। তবু আলগোছে বোনকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে অপূর্বর দেখাসাক্ষাৎ হয়?

হতভম্ব দৃষ্টিতে শীলা বলে, আমার সঙ্গে! কেন?

না, এমনি বলছিলাম। অনেকদিন দেবপাড়ায় যায়নি তো। কোনও খোঁজও পাচ্ছি না। কিছুই না বুঝে দিদির দিকে তাকিয়ে থাকে শীলা। দৃষ্টি সরিয়ে নেন ইলা। বিছানায় বসে থাকা বোনপোর গাল টিপে বলেন, চলি। ভাল হয়ে থাকবে। সায়ক বলে, ওই কথাটা মনে আছে তো?

মনে করতে পারেন না ইলা, মাথাটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। সায়ক ফের বলে, তুমি একটা জায়গায় আমায় নিয়ে যাবে বলেছ।

মনে পড়ে যায় ইলার। সায়কের চুল ঘেঁটে দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। দরজার দিকে এগিয়ে যান ইলা। পিছনে থেকে কাজের মেয়েটা বলে ওঠে, এ কী গো বড়মা, চললে! আমি যে মুড়ি মেখে নিয়ে এলুম।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ইলা শুধু হাসেন। মনে মনে বলেন, তোর 'বড়মা' ডাকটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

দোরগোড়ায় গিয়ে চটি পরছেন ইলা। বিপুলদা, শীলা উঠে এসেছে সামনে। বিপুলদা বলে ওঠে, চলো, তোমাকে বাসস্ট্যান্ড পৌঁছে দিই।

এতটাই বিস্মিত হন ইলা, আপত্তি জানানোর ক্ষমতাটুকু চলে যায়। এই কি সেই বিপুলদা, ইলাকে দেখলেই যে পালাত।

গলি ধরে অনেকটা হেঁটে এসেছেন দুজনে, কোনও কথাই হয়নি এতক্ষণ। ইলার অস্বস্তি বোধ হয়। তৃতীয় কারও উপস্থিতি নেই বলে আড়ষ্ট হয়ে আছে বিপুলদা। একই সঙ্গে শীলার হয়ে কিছু বলার সুযোগটা হেলায় হারাচ্ছেন ইলা। শীলা হয়তো আশা করে বসে আছে, দিদি নিশ্চয়ই বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে ওর বরকে কিছু বলবে।

বিপুলদার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ইলা শুরু করেন, শীলার মনটা এবার ভাল দেখলাম না। বিপুলদার দিক থেকে কোনও উত্তর নেই। একবার শুধু তাকাল। একটু সময় নিয়ে ইলা বলেন, হঠাৎ চাকরি নিল কেন শীলা?

স্বাধীনভাবে খরচা করতে পারবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে। নিরুত্তাপ উত্তর দেয় বিপুলদা।

ইলা বলেন, ও কি সংসারে স্বাধীন নয়? আগে তো কখনও এরকম বলেনি।

এর উত্তর আমার থেকে ভাল ওই দিতে পারবে।

বিপুলদার কাটা কাটা কথায় দিশেহারা লাগে ইলার, মনে হয় ভুলই হয়েছে ঘুরিয়ে প্রসঙ্গটা তুলতে যাওয়া। তার থেকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই হত, কেন আমার বোন কষ্টে আছে? কথাটা বেখাপ্পা শোনাত বড্ড। বি টি রোড এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। পথ ফুরিয়ে এল। শেষ চেষ্টা করেন ইলা, ধরা যাক শীলার মনে কোনও ভুল ধারণা বা ভীতি জন্মেছে, সেটা কাটানোর দায়িত্ব তো তোমারই।

চেষ্টা করেছিলাম। লাভ হয়নি। মেয়েরা যখন একবার রোজগার শুরু করে, মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো হয়ে যায়। পাগল পাগল ভাবটা কিছুতেই কাটানো যায় না।

রাস্তা মোটেই এবড়োখেবড়ো নয়, তবু একটা হোঁচট খেলেন ইলা। বিপুলদার কথাটা কতটা নিন্দাসূচক এবং অসম্মানজনক বুঝে ওঠার আগেই মাথায় এসে গেল অন্য একটা প্রসঙ্গ, ইস্, শীলা কত মাইনে পায়, সেটা তো জানা হল না। কত টাকা রোজগার করলে একটা মেয়ে স্বাধীন হয়?

একদম কাছাকাছি এসে পড়েছে বড় রাস্তা। আগের কথার রেশ টেনে বিপুলদা বলতে শুরু করে, তুমি একটু যোগাযোগ রেখো ইলা। শুনলে তোমার কথাই শুনবে শীলা। আমাকে ঠিক ভরসা করে না।

ইলা চুপ করে থাকেন। বি টি রোডে উঠে বলেন, ও, ভাল কথা। তোমাদের অবিনাশদার অফিসের নাটক আছে রঙ্গনায়। আমি কার্ড পাঠিয়ে দেব দুটো। এখান থেকে কাছেই হবে তোমাদের, দেখে এসো।

মুখ দেখে বোঝা যায় খুশি হয়েছে বিপুলদা। বলে, অবশ্যই পাঠিয়ে দিয়ো। অবিনাশবাবুকে এক-দুবার দেখেছি দূর থেকে, আলাপ হয়নি। আসল পরিচয় না দিয়ে এবার ভাবছি আলাপ করে নেব। শীলা ওঁর কথা খুব বলে, অনেক গল্প করেছে আমার কাছে। দারুণ মানুষ।

বাসস্ট্যান্ডটা বাঁদিকে। হাঁটতে হাঁটতে প্রমাদ গোনেন ইলা, কে জানে, আবার কী ফ্যাসাদে পড়তে যাচ্ছেন। আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনলেন না তো? নাটক দেখতে আসার কথা না বললেই বোধহয় ভাল হত।

স্টপেজে দাঁড়িয়ে শ্যামবাজারের দিকে তাকিয়ে আছেন ইলা, বাসের দেখা নেই। এমন সময় অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বিপুলদা, সায়ককে এবার কেমন দেখলে ইলা? সবিস্ময়ে বিপুলদার দিকে দৃষ্টি ফেরাল ইলা। বলেন, মানে?

আগেরবার যখন দেখে গিয়েছিলে, তার থেকে কি একটু বোকা, ডাল মনে হল?

নাঃ! একথা বলছ কেন? ভ্রূ কুঁচকে জানতে চান ইলা।

বিপুলদা বলে, রেজাল্টটা এমন খারাপ করল হঠাৎ নিজে পড়াতে শুরু করলাম, কোনও উন্নতি হচ্ছে না। দিন দিন কেমন যেন বোকা হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

বিপুলদার গলা স্বাভাবিক ঠেকে না ইলার কাছে, প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, ওইটুকু ছেলেকে নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই বয়সে বাচ্চারা একটু চঞ্চল হয়।

বড় একটা শ্বাস ফেলে বিপুলদা বলে, ওর সমস্ত খারাপের জন্য তো আমরাই দায়ী। কথাটা ভীষণ দুর্বোধ্য ঠেকে ইলার কাছে, হতাশার গভীরতাটা টের পান। ইলা বুঝতে পারেন এই হতাশাই অন্ধকার এনেছে শীলার সংসারে।

তোমার বাস আসছে ইলা। বলে বিপুলদা।

ইলা তাকাল ডানদিকে, তিন নম্বর বাসটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। শীলার জন্য মন খারাপ হয়। হঠাৎ মনে পড়ে, ওর জন্য পান কিনেছিলেন, দেওয়া হয়নি। বটুয়া খুলে কাগজে মোড়া পানটা বার করেন ইলা। বিপুলদাকে দিয়ে বলেন, এটা শীলাকে দিয়ো, গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছিলাম দিতে।

বাস এসে দাঁড়ায়। একবারও পিছন না ফিরে উঠে পড়েন ইলা।

॥ উনিশ ॥

আজ নবমী। ষষ্ঠী থেকেই পড়াশোনার পাট উঠে গেছে বরুণের। তিন দিন সকালবিকেল খালি খেলা, ক্যাপ বন্দুক ফাটানো, ভটচাযবাড়ির পুজোর ভোগ, প্রসাদ খাওয়া। অসুর থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর পেঁচাটা পর্যন্ত ভীষণ চেনা, নিজেদের লোক হয়ে গেছে। আজ ঘুম ভাঙতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল, হাতে রইল একটা মাত্র দিন, রাত পোহালেই দশমী।

হাতের তালুতে সাদা পাউডার মাজন নিয়ে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে আছে বরুণ, এখনও দাঁতে আঙুল চালায়নি, আকাশের দিকে দেখছে, মনে হচ্ছে আকাশও পরেছে নতুন জামা।

পাঁচিলে এসে বসল জোড়া শালিখ। সঙ্গে সঙ্গে কপাল বুকে হাত ঠেকাল বরুণ। দিনটা ভাল যাবে। মন ভাল হতে থাকল তার।

দাঁতটা মাজ তাড়াতাড়ি। পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাবি না!

দাদার কথায় ঘাড় ফেরায় বরুণ। দাদার হাতে লাল টুথব্রাশটা চোখ টানে। কিছুদিন হল দাদার বায়নাতে মা ব্রাশটা কিনে দিয়েছে, মাজন অবশ্য গুঁড়ো। বরুণও বায়না করেছিল, মা দেয়নি। বলেছে, তোর মাড়ি নরম, ছড়ে যাবে।

কবে যে মাড়ি শক্ত হবে! আঙুলে মাজন নিয়ে সজোরে দাঁত মাড়ি ঘষতে থাকে বরুণ।

দেখিস ঢোঁক গিলে ফেলিস না, মাজন চলে যাবে পেটে। উপোস ভেঙে যাবে।

বরুণ জানে দাদা খেপাচ্ছে, একটা-দুটো ঢোঁক সে গিলেই ফেলে, কখন গেলে খেয়াল থাকে না। বাড়ির সবাই জানে দাঁত মাজার পরই বরুণের ভীষণ খিদে পেয়ে যায়। খাওয়ার জন্য যেরকম বায়না ধরে, মা বলে, এমন করছিস যেন পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে।

'পেটের ছেলে পড়ে যাওয়াটা কী ব্যাপার ঠিক বোঝে না বরুণ। তখন এত খিদে পায় বোঝার ইচ্ছেও থাকে না। খিদে মিটে গেলে মন চলে যায় অন্য দিকে।

পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার কথায় গায়ে জ্বর আসে বরুণের। কতক্ষণ উপোস থাকতে হবে!না থেকেও উপায় নেই। এই তো গত পরশু, সপ্তমীর দিন, দাঁত মেজে রান্নাঘরে ঢুকেছিল বরুণ। মা ছিল না। ফাঁকায় পড়েছিল নকুলদানার শিশি। মা হয়তো একটু আগে শিশি থেকে নকুলদানা নিয়ে বাড়ির ঠাকুরকে জল দিয়েছে, ভুলে গেছে শিশিটা লুকোতে। বরুণ চুপিচুপি এক মুঠো নকুলদানা নিয়ে মুখে পুরেছিল সেদিন। তারপর যায় ভটচাযবাড়িতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। অখিলজ্যাঠার সঙ্গে মন্ত্র পড়ে ঠাকুরের দিকে ফুল ছুড়ে দেওয়ার পরই বরুণ লক্ষ করে মা দুগ্গা হাসছে। যেন সব জানে।

বরুণের মা বলে ঠাকুর অন্তর্যামী। সব কিছুই জানতে পারেন। দেখতে পান। নিশ্চয়ই পায়, নইলে সপ্তমীর দিন ওরকম হাসছিল কেন! অষ্টমীর দিন সকালে কোনও দুষ্টুমি করেনি বরুণ, মাজনও ঢোঁক গেলেনি। পুরো উপোস থেকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। মা দুগ্গা হাসছিল অন্য রকম। খুশি হলে বরুণের মা যেমন হাসে।

একটা ব্যাপার ভেবে বরুণের খুব আশ্চর্য লাগে, ভটচাযবাড়ির দালানে দাঁড়িয়ে মা দুগ্গা কী করে বরুণদের বাড়িটা দেখতে পায়।

ষষ্ঠীর দিন বাবার হাত ধরে পুজো দেখছিল বরুণ। পাশ থেকে কারা যেন বলাবলি করছিল, ঠাকুরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে। বরুণ বাবার হাত টেনে, কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল, প্রাণপ্রতিষ্ঠা মানে কী বাবা?

বাবা বলেছিল, ঠাকুর তো এতদিন মাটির ছিল, তোর অখিলজ্যাঠা মন্ত্র পড়ে প্রতিমার মধ্যে প্রাণ দিচ্ছে। জীবন্ত হচ্ছে সব ঠাকুর।

পেঁচা, ইঁদুর, ময়ূর, সিংহ, হাঁস এরাও কি জ্যান্ত হচ্ছে?

নিশ্চয়ই। বলেছিল বাবা। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বরুণ তাকিয়েছিল প্রতিমাগুলোর দিকে। কেউ এতটুকু নড়াচড়া করেনি। পেঁচাটা মনে হয় দু-তিনবার চোখের পাতা ফেলেছিল। আর মা দুগ্গা হাসছিল মিটমিট করে। এ আবার কেমন জীবন্ত হওয়া। কাঠামো বাঁধা থেকে

প্রতিমা তৈরি হওয়া দেখেছে বরুণ, ভটচাযবাড়ির নকাকা ঠাকুর গড়ে। সেই যে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে দিয়েছে মূর্তিগুলোকে, ক্ষমতা নেই ওখান থেকে এদিক-ওদিক যাওয়ার। — কথাটা মাকেও জিজ্ঞেস করেছিল বরুণ। মা বলেছে, বাহনরা যদি চলাফেরা করত, একে অপরকে খেয়ে ফেলত না!

ব্যস সব গুলিয়ে গিয়েছিল বরুণের। মা ঠিক কথাই বলছে, বাবার কথাও অমান্য করা যাচ্ছে না। তবু যেন কোথায় গোলমাল থেকে যাচ্ছে। অনেক ধোঁয়া ধোঁয়া আবছা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় বরুণের মাথায়। কীভাবে জিজ্ঞেস করবে কথা খুঁজে পায় না।

মাজনসুদ্ধু থুতু নালায় ফেলতে গিয়ে বরুণ দেখে, পাঁচিলে বসা একটা শালিখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখছে। কেন কী জানি বরুণের মনে হয়, শালিখটাই পাড়া ঘুরে সবার খবর দিচ্ছে মা দুগ্গাকে।

কই রে, এবার ধুয়ে নে মুখটা। বলল, দাদা।

কুয়োর পাশে হাতে টেপা কল। দাদা হ্যান্ডেল চেপে জল তোলে। বরুণ কুলকুচি করে মুখ ধোয়। এক আঁজলা জল নিয়ে ছুড়ে দেয় শালিখপাখির দিকে। পাখিটা ওড়ে না, সরে বসে। বরুণকে চোখ ছাড়া করে না।

মা রান্নাঘর থেকে হাঁক দেয়, ওরে, তোদের হল? তাড়াতাড়ি পুষ্পাঞ্জলিটা দিয়ে আয়। আমি জলখাবার করছি।

জলখাবারের কথা শুনেই পেট মুচড়ে খিদে পায় বরুণের।

খিদে নিয়েই বরুণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ভট্টচার্যবাড়িতে কিছুক্ষণ অন্তর ঢাকে কাঠি পড়ছে, সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ। নবমী বলে আওয়াজটাও কেমন যেন ঝিমানো, দুঃখী-দুঃখী।

গলির গায়ে ভিতটার ওপর এখন অনেকটাই দেওয়াল উঠে গেছে। আধখানা বাড়িটার দিকে তাকায় বরুণ, মন্দিরা বলেছিল মা-বাবার সঙ্গে পুজোয় একদিন আসবে। কাল অবধি আসেনি। আজও হয়তো আসবে না। ওদের পাড়ার পুজোয় মেতে আছে। ওরা থাকে পঞ্চাননতলায়। পুজোর আগে শেষ যেদিন এসেছিল নিজেদের বাড়ি তৈরি হওয়া দেখতে, বলেছিল, আমাদের পাড়ায় ঠাকুর দেখতে গেলে, আমাদের বাড়িতেও আসিস কিন্তু।

সে আর যাওয়া হয়নি। কী করে হবে, পাড়ার সব কটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভটচাযবাড়িতেই পড়ে থাকে। সকালে ঢাকে কাঠি পড়া থেকে শুরু করে রাতে ধুনুচি নাচ পর্যন্ত। বাড়ির লোক মাঝেমধ্যে নড়া ধরে টেনে নিয়ে যায় চান-খাওয়া করাতে। দুপুরে ভোগ খাওয়াটা অবশ্য ভট্টচার্যবাড়িতে বাঁধা। এসব ছেড়ে কি অন্য পাড়ার পুজো দেখতে ইচ্ছে করে? পুজোর একটা দিন দেবপাড়ার সমস্ত ঠাকুর মায়ের সঙ্গে রিকশায় চেপে দেখে নেয় বরুণ। দেখতে দেখতে ভাবে কখন ফিরে আসবে ভট্টচার্যবাড়ি। কত কিছু হয়তো ঘটে যাচ্ছে ও-বাড়িতে, দেখা হচ্ছে না।

ভটচাযবাড়ির গলিতে ঢুকে পড়ে বরুণ। ধূপ, ধুনো, ফুলের গন্ধ তাকে ডাকে।

ঠাকুরদালানে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড়। একদল পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে। বরুণ তার মানে পরেরবার। আরও কিছুক্ষণ সহ্য করতে হবে খিদেটা। ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে প্রতিমার একদম সামনে যায় বরুণ, এ কী রে বাবা, তার সব বন্ধুই বসে গেছে পুষ্পাঞ্জলি দিতে, বাড়িতে গিয়ে একবার ডাকল না!

অভিমান হয় বরুণের, চোখ বুজে বসে থাকা বন্ধুদের দিকে রাগী চোখে তাকায়। দীপু, বুলবুলি, মাতন ভটচাযবাড়ির ছেলেমেয়ে, ওরা কেন এত তাড়াতাড়ি সেরে নেবে পুষ্পাঞ্জলি? গতকাল মাতন-বুলবুলি বাড়ি থেকে ডেকে এনেছিল বরুণকে, আজ কী এমন হল!

রাগ চড়তে থাকে বরুণের, ঠিক করে দেবে না পুষ্পাঞ্জলি। সিরাজুল, মনোয়ারারা তো দেয় না। মা দুগ্গা পাপ দেয় না ওদের। ওরা মুসলমান। ওদের ঠাকুর আল্লা। আল্লা ঠাকুরের কোনও মূর্তি হয় না, সিরাজুলের কাছে জেনেছে বরুণ। চোখ বুজে মন দিয়ে আল্লাকে ডাকলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। নামাজ পড়তে পড়তে সিরাজুল দেখেছে। বরুণ জানতে

চেয়েছিল, কেমন দেখতে তোদের ঠাকুর? সিরাজুল বলেছিল, বলতে নেই।

মনোয়ারা, সিরাজুল দুগ্গা পুজোয় বরুণদের সঙ্গে আনন্দ করে, ঘোরেফেরে, শুধু পুষ্পাঞ্জলি দেয় না আর ভোগ খায় না এক পাতে বসে। বরুণের ভীষণ খারাপ লাগে। পাড়ায় ওরাই শুধু মুসলমান। বরুণ ঠিক করে, সেও এবার মুসলমান হয়ে যাবে। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার ঝামেলা থাকবে না। — ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে সিরাজুলের বাবা আনসারচাচা বছরে এক মাস সারা দিন উপোস করে থাকে। সূর্য ডুবলে ফল-মিষ্টি খায়। একটু বড় হলে সিরাজুলকেও ওসব করতে হবে। —মনে মনে মুসলমান হওয়া থেকে পিছিয়ে আসে বরুণ। কী দরকার বাবা, এক-দু ঘণ্টা উপোস করে থাকলে তার পেট চুঁইচুই করে।

প্রতিমার সামনের জটলা থেকে বেরিয়ে আসে বরুণ। বন্ধুদের ছাড়া পুষ্পাঞ্জলি সে কিছুতেই দেবে না, একদম বাজে লাগে। মাকে গিয়ে বলবে, দিয়ে এসেছি, খেতে দাও।

ফাঁকায় এসে চারপাশে চোখ বোলায় বরুণ, দাদাকে খোঁজে। মনে হচ্ছে এখনও আসেনি। দাঁত মেজে, চান করে, ধুতি-গেঞ্জি পরে আসবে দাদা, দাদার খুব ভক্তি। যদি দেখতে পায় বরুণ পুষ্পাঞ্জলি না দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছে, ক্যাক করে ধরবে।

ভটচাযবাড়ির দালানে ভেসে বেড়াচ্ছে পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র। মন্ত্রের গায়ে নবমীর সকালের গন্ধ। দাদার অপেক্ষায় উঠোনের গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে বরুণ, যেই ঢুকবে, চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাবে সে। বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে এসে মেতে যাবে পুজোয়।

আলোদিদা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বরুণকে জিজ্ঞেস করে, কী হল দাদুভাই, তুমি একা একা ডায়রে আছ যে বড়! বন্ধুরা কই?

উত্তর দেওয়ার আগে বরুণের চোখ আটকে যায় আলোদিদার হাতে ধরা কচি কাঁঠালপাতায়। এক লহমায় বুঝতে পারে, কার জন্য পাতাগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চকিতে তাকায় কলঘরের সামনের দালানে, ওখানেই বাঁধা থাকে বলির পাঁঠা। কালকেরটা ছিল বাদামি রঙের, আজকেরটা সাদাকালোর ছোপ।

আলোদিদা এগিয়ে গেছে পাঁঠার কাছে। পিঠে হাত বুলিয়ে কাঁঠালপাতা খাওয়াচ্ছে দিদা। পাঁঠাটা জানে না ঘণ্টাখানেক বাদে তাকে কাটা হবে। যদি জানত, নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠালপাতা খেত না।

ওর মাংস দিয়েই ভোগ রান্না হবে। খাওয়ার সময় পাঁঠাটার কথা মনে পড়ে বরুণের। কষ্ট হয়, আবার একথাও ভাবে, মা দুগ্গাকেই তো প্রথমে ওর মাংস দেওয়া হয়, সেই সময় কাপড় দিয়ে আড়াল করা হয় প্রতিমা। খুব জোরে ঢাক বাজায় যোগেন আর নগেন ঢাকি। ওদের স্যাঙাৎ কালু, বরুণের থেকে একটু বড়, কাঁসরে বোল তোলে কাঁই না না, কাই না না, খেয়ে নাও না, খেয়ে নাও না...

দুগ্গা মাকে খেতে বলে কান্নাকাটি করে কালুর কাসি। কাপড়ের বাইরে আসনে বসে থাকা অখিলজ্যাঠার হাতের ইশারায় ওরা একসময় বাজনা থামায়। কাপড় সরানো হয় প্রতিমার সামনে থেকে, সবাই হামলে দেখে ভোগের অবস্থা। পাথরের থালা, পিতলের হাঁড়ি ভর্তি ভোগচুড়োয় পাওয়া যায় মা দুগ্গার হাতের ছাপ। বরুণও দেখেছে। তাই মা দুগ্গার যখন আপত্তি নেই পাঁঠার মাংস খেতে, বরুণ কেন মিছিমিছি মন খারাপ করবে। আজকের পাঁঠাটা মজাসে পাতা চিবোচ্ছে, যত ইচ্ছে খা। বোকা হাঁদা কোথাকার। সপ্তমী থেকেই একটা ইচ্ছে বরুণের মাথায় চাগাড় দিচ্ছে, খালি মনে হচ্ছে চুপিচুপি গিয়ে পাঁঠার দড়িটা খুলে দিলে কেমন হয়। এ বছরই পারবে না, সাহসে কুলোচ্ছে না ঠিক, সামনের বছর আর একটু বড় হবে তো, তখন একবার দেখবে চেষ্টা করে।

অবোধ পশুটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় বরুণ। চোখ যায় উঠোনের গেটে, এই রে, দাদা আসছে। পুষ্পাঞ্জলি এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি, শান্তির জল ছেটাচ্ছে অখিলজ্যাঠা। দাদা গিয়ে যদি না দেখতে পায় বরুণকে, এক্ষুনি খোঁজাখুঁজি শুরু করবে।

পিছু হটতে থাকে বরুণ। কে যেন চিৎকার করে ওঠে, এই ছোঁড়া, কী করছিস কী! চমকে উঠে বরুণ দেখে, আর একটু হলে হাঁড়িকাঠে ধাক্কা মারছিল সে। পায়ের তলায় গোবর

নিকনো মাটি, তেল চকচকে হাঁড়িকাঠে সিঁদুর লাগানো। কেমন যেন জ্যান্ত-জ্যান্ত লাগে জায়গাটাকে। ছিটকে সরে আসে বরুণ।

একদিকে বাচ্চা পাঁঠাটা পাতা খেয়ে যাচ্ছে বোকার মতো, এদিকে হাঁড়িকাঠ, অখিলজ্যাঠার মন্ত্র উচ্চারণ, ধূপ, ধুনো, ফল, ফুলের গন্ধের মধ্যে মানুষের হইচই... কিছুই ভাল লাগে না বরুণের। এত লোকজনের মধ্যেও একা-একা লাগে। গেট লক্ষ করে দৌড়েতে থাকে বরুণ, এক্ষুনি তার মাকে ভীষণ প্রয়োজন।

ভেবেছিল বাড়ি পৌঁছে মাকে জড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। হল না। মা বসে আছে সামনের ঘরে। মন্দিরা আর ওর মা এসেছে বাড়িতে। গল্প করছে মায়ের সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে বরুণ। তিনজনের চোখ যায় ওর দিকে। মন্দিরার চোখে খুশির ঝলক। যেন বরুণকেই খুঁজছিল এতক্ষণ। ইলা বরুণের উদ্দেশে বলেন, কী রে, দিয়ে এলি পুষ্পাঞ্জলি?

নির্দ্বিধায় ঘাড় হেলায় বরুণ। ইলা হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে টানেন। মাকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে থাকলেও, পারে না বরুণ। মন্দিরা তার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

মন্দিরার মা রুনু ইলার উদ্দেশে বলেন, আপনার এই ছেলেটি কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে। একদম রাজপুত্র। স্বভাবটিও ভাল। ওই তো প্রথম আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করল। ওর দেখাদেখি পাড়ার বাকি বাচ্চারা মন্দিরার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। আমার মেয়ে গোড়ার দিকে বায়না ধরেছিল, তোমরা যতই নতুন বাড়ি কর আমি যাব না। এখন এ-পাড়ায় নতুন বন্ধু পেয়ে প্রায়ই বলছে, বাড়ি কবে শেষ হবে। বরুণের কথা তো হামেশাই বলে।

বরুণ চকিতে মন্দিরার দিকে তাকায়, মেয়েটার চোখে হাসি। ইলা বলেন, অত ভালভাল করবেন না। আমার এ ছেলেটি ভেতর ভেতর মহা বিচ্ছু। লেখাপড়ায় একদম মন নেই, খালি খেলা।

মা নিন্দে করলেও, কথার সুরে প্রশ্রয়ের আভাস পায় বরুণ। তাই সে মনে কিছু করে না। মায়ের দিকে করুণ চোখ তুলে একবার তাকায়। ইলা বলেন, হ্যাঁ বাবা, দিচ্ছি খেতে। তারপর মন্দিরার মায়ের উদ্দেশে বলেন, আপনারা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এসে জলখাবারটা এখানেই খাবেন। আমি ব্যবস্থা করছি।

না দিদি, সে উপায় নেই। ভটচাযবাড়ির বড়জন আমার কর্তাকে পইপই করে বলে দিয়েছেন, পুজোর একটা দিন সকাল থেকে ওদের বাড়িতে থাকতে। খাওয়া-দাওয়া সব ওখানেই। কর্তা তো দুপুরের আগে আসতে পারবেন না। ওঁর নানান কাজ। সকাল থেকে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে হবে আমাকে, বললেন রুনু।

খাট থেকে নেমে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ইলা বলেন, তাহলে আর কী বলি, চা-টাও খাওয়াতে পারলাম না আপনাদের, উপোস ভঙ্গ হবে। আসুন না কাল একবার সন্ধের দিকে, কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমার কর্তাটিও থাকবে সন্ধের সময়।

কাল না পারি অন্য দিন তো আসবই। কাল ও-বাড়িতে বিজয়া করতে অনেকে আসে। বুঝতেই তো পারছেন, জয়েন্ট ফ্যামেলি ... বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান রুনু। মন্দিরাও উঠে আসে। ও পরেছে গোলাপি ফ্রক। কালো হলেও মন্দিরাকে বেশ ভালই লাগছে বরুণের। কী চনমনে। মনেই হচ্ছে না উপোস করে আছে।

ওদের দরজা অবধি এগিয়ে দেন ইলা। পাশে মায়ের শাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে বরুণ। মন্দিরার মায়ের উদ্দেশে ইলা বলেন, কবে নাগাদ আপনারা আসছেন এ-পাড়ায়?

বরুণদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজেদের অর্ধেক তৈরি হওয়া বাড়ির দিকে তাকিয়ে রুনু বলেন, মাস দুয়েকের মধ্যেই চলে আসব মনে হচ্ছে। এখান থেকে মন্দিরার স্কুলটাও কাছে হবে। সময় পাবে পড়াশোনা করার।

ও যেন কোন ক্লাসে পড়ে? জানতে চান ইলা।

ক্লাস থ্রি। আপনার ছেলের ক্লাসে।

আপনার মেয়ের স্কুলটা তো খুব ভাল। মেয়েও নিশ্চয়ই লেখাপড়ায় দারুণ হ্যাঁ, ওই আর

কী। এখন তো ক্লাসে ফার্স্ট হয়। উঁচু ক্লাসে উঠলে কী করবে জানি না। বললেন রুনু।

বরুণ ফের অবাক হয়ে তাকায় মন্দিরার দিকে, আশ্চর্য মেয়ে তো! ক্লাসে ফার্স্ট হয়, এতক্ষণ উপোস করে থেকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, এর থেকে দুরে থাকাই ভাল। বড়দের কথোপকথনে মন্দিরার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, বরুণকে জিজ্ঞেস করে, তুমি আসবে না পুজোবাড়ি?

একটু থতমত খেয়ে বরুণ বলে, যাচ্ছি একটু পরে।

মন্দিরা আর ওর মা গেট খুলে হেঁটে যায় ভট্টচার্যবাড়ির দিকে। ইলা ছেলেকে বলেন, শুনলি, মেয়েটা ফার্স্ট হয়। দেবাঙ্গনা গার্লসে ফার্স্ট হওয়া মানে বিরাট ব্যাপার। ও-ও পড়ে থ্রিতে। চোখের সামনে গাদাগাদা নম্বর পাবে, আর তুই হবি টেনেটুনে পাস। ঘরে ঢুকে আসেন ইলা। ফের ছেলেকে বলেন, এবার থেকে লেখাপড়ায় একটু মন দাও। মন্দিরাকে দেখে যতটা চাঙ্গা হয়েছিল বরুণ, মায়ের কথা শুনে ততটাই ভেঙে পড়ে, মেয়েটার কি না আসলেই চলছিল না এ-পাড়ায়।

মা চলে গেছে রান্নাঘরে। বরুণ একা মাঝের ঘরে দাঁড়িয়ে। নবমীর দিনটাই তার মাটি হল। এর থেকে বাবার সঙ্গে বাজার গেলেই ভাল হত, বিছানায় জেগে ঘুমোনো বরুণকে বাবা ডেকে ছিল দু-তিনবার। বাজার যেতে দুটো পুজো পড়ে, নিউ কলোনি আর মিলনী সংঘ। নিউ কলোনির অসুরটা নাকি তাগড়াই হয়েছে, দীপু বলছিল। কাছাকাছি ক্লাবের সব কটা ঠাকুর ওর দেখা হয়ে গেছে। বরুণের দেখার কথা আজ সন্ধেবেলা। মায়ের সঙ্গে রিকশা করে। আজ যেন কোনও কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছে না। ভটচাযবাড়িতেও যেতে ইচ্ছে করছে না আর। আচ্ছা, কোনওভাবে কি মন্দিরাদের এ-পাড়ায় আসাটা আটকানো যায় না?

বেশিক্ষণ বাড়িতে বসে থাকতে পারল না বরুণ। ভট্টচার্যবাড়ির ঢাকের আওয়াজ বদলে যাচ্ছে, ভেসে আসছে হইচই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বরুণ দেখল, বাড়ির সামনে ইটপাতা রাস্তায় মানুষজন হাঁটাচলা করছে তড়িঘড়ি পায়ে। আজ বাদে কাল হলেই পুজো শেষ। সবার মধ্যে তাড়া পড়ে গেছে পুজোর সব আনন্দটুকু উসুল করে নেওয়ার। বরুণ কেন বাদ থেকে যাবে?

জলখাবার অনেক আগেই সারা হয়েছে বরুণের। বাড়িতে বসে ক্যাপ-বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বাবা কী যেন লিখছে, বরুণের হাতে বন্দুক দেখে বলেছে, ক্যাপ ফাটাস না, আমার ডিসটার্ব হবে।

তাহলে কী করবে এখন সে? দাদা এক ফাঁকে এসে খেয়ে নতুন জামাপ্যান্ট পরে বেরিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে আশপাশের ঠাকুরগুলো দেখবে। বরুণকে ডাকেনি, দাদা জানে বরুণ ভট্টচার্যবাড়ির পুজো ছেড়ে সহজে নড়তে চায় না। যদি ডাকত দাদা, বরুণ চলে যেত ওদের সঙ্গে। ভট্টচার্যবাড়িতে পাঁঠাবলির আগেই দাদারা ফিরে আসবে।

নেহাত নিরুপায় হয়ে বরুণ গলি ধরে ভটচার্যবাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

পুজোর উঠোনে এসে চারপাশে চোখ বোলায়। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে যার কাজে ব্যস্ত। সকালের পুজো মোটামুটি সারা। এর পর পাঁঠাবলি।

বন্ধুদের খোঁজে বরুণ, পায় না। কোথায় গেল সব? মন্দিরার মাকে দেখা যাচ্ছে প্রতিমার সামনে বড় জ্যাঠাইমাকে কাজে সাহায্য করছে।

কলঘরের সামনে বাঁধা পাঁঠাটা এখন আর কাঁঠালপাতা খাচ্ছে না। করুণ চোখে এদিক-ওদিক দেখছে আর মাঝেমধ্যে ব্যা-ব্যা করে ডেকে উঠছে। ও কি টের পেয়েছে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে? আর কিছুক্ষণ পর দিব্যদা শিবুদা ওকে চান করাতে নিয়ে যাবে! আজ সকালেই দিব্যদারা পাঁঠাটাকে কিনে এনেছে দুর পাড়ার কোনও বাড়ি থেকে। নিয়ে আসার সময় পিঠে হাত বুলিয়েছে কত, তখন পাঁঠা বেচারি জানত না আজ কপালে তার কী আছে।

হঠাৎ বন্ধুদের কলকাকলি কানে আসে বরুণের। শব্দের দিকে ঘাড় ফেরায়। ভটচাযবাড়ির বাগান ধরে হেঁটে আসছে ওরা। বরুণের নাম ধরে দু-একজন ডাকে। ওই দলে মন্দিরাও আছে। হাসছে বরুণকে দেখে।

বরুণ বুঝতে পারে মন্দিরার এ-পাড়ায় আসাটা কোনও মতেই আটকানো যাবে না। সব বন্ধুই মেনে নিয়েছে ওকে।

উঠোনে এসে পৌঁছল বন্ধুরা। মন্দিরা অভিমানী গলায় বরুণকে বলে, এত দেরি করলি কেন?

ওর প্রশ্নের ধরনটা অন্য রকম, সুরের মধ্যে বিশেষ কিছু মিশে আছে। উত্তর না দিয়ে বরুণ ভ্রূ কুঁচকে মন্দিরার দিকে তাকায়, কাচের বাদামি গুলির মতো মন্দিরার চোখের মণি চকচক করে। বরুণ বোধ করে মেয়েটা অন্য রকম, বাকি বন্ধুদের থেকে একদম আলাদা।

বরুণদের দলে মাতন হচ্ছে লিডার গোছের। ও বলে, চল ছাদে যাই। ওখান থেকে বলি দেখব।

সবাই চল-চল করে ওঠে। প্রস্তাব আনন্দে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপুন ওর ক্যাপ ভরা বন্দুকটা পরপর চারবার ফাটিয়ে নেয়। বাপুনের বন্দুকে রোল ক্যাপ, পরপর ফাটানো যায়। বরুণ বন্দুক নিয়ে বেরোয়নি, বেরিয়ে লাভ হত না, ওর টিপ ক্যাপ। একটা করে বন্দুকে লাগিয়ে ফাটাতে হয়। মায়ের কাছে রোল ক্যাপের বায়না করেছিল বরুণ। মা বলেছে, ওতে অপচয় হয়। ছোট থেকে অপচয় শিখলে বড় হয়ে দুঃখ পাবি।

'অপচয়' মানেটা ঠিকঠাক না বুঝলেও শব্দটাকে সমীহ করে বরুণ। বাড়িতে বাবামার মধ্যে প্রায়ই কথাটা ওঠে। 'অপচয়' শিখতে ভয় পায় বরুণ।

কী রে, তুই তো দেখবি না বলি? জিজ্ঞেস করে দীপু।

বরুণ দুপাশে মাথা নাড়ে। মন্দিরা অবাক। বলে, কেন, ও দেখবে না কেন? মাতন বলে, ও ভয় পায় বলি দেখতে। যেই পাঁঠাকে চান করিয়ে নিয়ে আসা হবে ও পালাবে বাড়িতে।

পালানোর কথা শুনেই বোধহয় মন্দিরা খপ করে বরুণের হাতটা চেপে ধরল। নিরুপায় বরুণের দৃষ্টি যায় কলঘরের বারান্দায়। এ কী, সাদা-কালো ছোপ পাঁঠাটা নেই। কেউ কি দড়ি খুলে দিল? বরুণের মতো আর একজনের মাথাতেও তাহলে ঘুরছিল বলির পাঁঠাকে মুক্তি দেওয়া।

বরুণকে নিরাশ করে চান করানো পাঁঠা কোলে উঠোনে উদয় হয় শিবুদা। পাশে দিব্যদাও আছে। দুজনের পরনে ধুতি, গেঞ্জি। অনেকটাই জলে ভেজা। দুজনের মুখে মজা পাওয়া হাসি। পাঁঠাটা একদম চুপ।

চার ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে শিবুদারা। মুকুন্দজ্যাঠা প্রতিমার সামনে বারবার মাথা ঠুকছে। খালি গা, পরনে লাল ধুতি। মুকুন্দজ্যাঠা বলি দেবে। প্রত্যেক বছর দেয়। থাকে মেদিনীপুর না কোথায়। পুজোর সময় আসে। এমনিতে ভাল মানুষ, একলা একলা থাকে। পুজোর কটা দিন দালানে, সিঁড়িতে বসেই কাটিয়ে দেয়। বাচ্চারা তার সামনে যতই লাফাঝাঁপা করুক, কখনওই বকে না। সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। খেতে ডাকলে খুব একটা ইচ্ছে নেই, ভাবে উঠে আসে।

বলির ব্যাপারটা যদি না থাকত এ-বাড়ির পুজোয়, কেউ খেয়ালই করত না, মুকুন্দজ্যাঠা আছে।

মা দুগ্গাকে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাঠা। অখিলজ্যাঠা সিঁদুর দিয়ে চোখ আঁকা খাঁড়া তুলে দেয় মুকুন্দজ্যাঠার দুহাতে। ঢাক, কাঁসর বেজে ওঠে সজোরে। ঢাকের বোল এখন আলাদা, যেন বলছে, ধড় নিবি না মুণ্ডু নিবি, ধড় নিবি না মুণ্ডু নিবি... বলছে, ঠাঁই না না, ঠাঁই না না, কিছুই চাই না, কিছুই চাই না.... কালুর কাঁসি।

একথা বলার কারণ সম্ভবত যোগেন, নগেন, কালুদের সব থেকে বেশি দরকার পাঁঠার ছাল। ঢাক ছাওয়ায় এই দিয়ে।

পাঁঠাটাকে নিয়ে আসা হয়েছে হাঁড়িকাঠের কাছে। কে যেন মাটির মালসায় দুটো ছাড়ানো কলা নিয়ে এসে হাঁড়িকাঠের পাশে রাখল। পাঁঠাটা খেতে যাচ্ছিল কলা, শিবুদা টান মেরে সরিয়ে নিল।

বলির চত্বর ঘিরে লোক জমছে। গাটা কেমন সিরসির করতে থাকে বরুণের।

কোনও বছরই সে বলি দেখে না, শেষ মুহূর্তের কিছুক্ষণ আগে সে পালিয়ে যায় বাড়িতে।

মন্দিরার থেকে দু-একবার নিজের হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করল বরুণ, পারল না। আরও জোরে চেপে ধরল মন্দিরা।

বাচ্চারা এখান থেকে সরো, বাচ্চারা দূরে যাও। বলে, তাড়া দিতে লাগল দীপেশকাকু। বরুণরা ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর দালানে উঠে প্লাস্টারহীন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে যায়। ছাদের পাঁচিলের গায়ে দাঁড়িয়ে বলির জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যায়। বড়দের আড়ালে পড়তে হয় না।

মন্দিরার থেকে হাতটা ছাড়ানো যাবে না বুঝে নিয়ে বরুণ চোখ বুজে থাকে। কানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টার আওয়াজ, মানুষের হইচই। সব কিছু তলায় ক্ষীণ ব্যা-ব্যা শব্দ।

এ কী, তুই চোখ বন্ধ করে আছিস কেন? কী হল তোর? জানতে চায় মন্দিরা। ফের বলে, চোখ খোল। চোখ খোল। আমি তো কোনওদিন পাঁঠাবলি দেখিনি, কই আমি তো ভয় পাচ্ছি না।

মন্দিরা আঙুল দিয়ে টেনে বরুণের চোখের পাতা খোলার চেষ্টা করে, বরুণ সর্বশক্তি দিয়ে বন্ধ করে থাকে চোখের পাতা। কানটাও বন্ধ রাখতে পারলে ভাল হত, একটা হাত ধরে আছে মন্দিরা। এত শব্দ, হইচইয়ের ভেতর কচি গলার ব্যা-ব্যা, ডাকটা যেন ছুঁচের মতো কানে বিধছে। এই ডাকটা কি পৌঁছচ্ছে দুর পাড়ায় পাঁঠাটার মায়ের কানে? মা হয়তো কোনও মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। বাচ্চাটার ডাক শুনে, অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোথা থেকে আসছে তার ছেলের গলার আওয়াজ!

তুই দেখবি না তো, আমিও দেখব না। বলে, মন্দিরা। হাতটাও ছেড়ে দিয়েছে বরুণের। অবাক হয়ে চোখ খোলে বরুণ। দেখে, মন্দিরা হাতের চেটো দিয়ে দুচোখ চেপে ধরে আছে।

নিজের সচিত্র মহাভারতের গান্ধারীর ছবিটা মনে পড়ে যায় বরুণের। হেসে ফেলে। বন্ধুদের কে যেন বলে ওঠে, ওই দেখ! মন্দিরা সরিয়ে নেয় চোখের আড়াল বলির চত্বরে দৃষ্টি যায় বরুণের, এই প্রথম সে দেখে শূন্য থেকে নেমে আসছে চোখ আঁকা খাঁড়া। সবাই খুব চেঁচাচ্ছে। ঝপ। এমন চমকে উঠল বরুণ, যেন ছাদ অবধি রক্ত ছিটকে এল।

বরুণ পালাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দৌড় লাগিয়ে, ভট্টচার্যবাড়ির গেট পেরিয়ে চলে গেল সে। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। জামায় যেন রক্ত লেগে আছে।

মন্দিরাদের অর্ধেক তৈরি হওয়া বাড়িতে ঢুকে পড়ে বরুণ। ছাদহীন ঘরের কোণে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে। বুকের মধ্যে ঝপঝপ শব্দ। বারবার নামে চোখ আঁকা খাঁড়া বাচ্চা পাঁঠাটার ওপর।

শরীরটা নিজে থেকেই কেঁপে উঠছে বরুণের। যেমন ভাবে কাঁপছিল মুণ্ডুহীন পাঁঠাটার ধড়।

এইভাবে কতক্ষণ কাটল কে জানে। হঠাৎই বরুণের কানে আসে একজনের গলা, তুই এইখানে! আমি সারা জায়গায় খুঁজে মরছি তোকে।

মন্দিরার গলা। বরুণ মুখ তুলবে না। মেয়েটা তাকে ঠকিয়েছে, ওর জন্যই আজ দেখতে হল বলি।

মন্দিরা গায়ে ঠেলা দেয়, তুই ছেলে হয়ে এত ভিতু কেন রে! এখানে এসে বসে আছিস!

আর কোনও বন্ধুর গলা পাওয়া যাচ্ছে না, মানে মন্দিরা একাই এসেছে। ওকে শাস্তি দেওয়া দরকার। ধীরে ধীরে মুখ তোলে বরুণ, মন্দিরার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শাস্তি দেওয়ার স্পর্ধা উবে যায়। মন্দিরার কপালে বলির রক্তের তিলক। এখনও শুকোয়নি। এটা ভটচাযবাড়ির নিয়ম, বলির পর ধড়টা উপুড় করে ধরা হয় মাটির মালসায়, যে মালসাতে ছাড়ানো কলা রাখা ছিল। রক্তে উপচে পড়ে মালসাটা। সেই রক্ত দিয়েই টিকা লাগানো হয় উপস্থিত সবাইকে।

মন্দিরার গায়ের রং কালোর দিকে, তবু কী জ্বলজ্বল করছে টীকাটা! কেন কে জানে,

মন্দিরার ওপর প্রবল আক্রোশ জাগে, বরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কপালের তিলকটা ঘষে ঘষে মুছে দেয়।

অতর্কিত আক্রমণে মন্দিরা বিহ্বল হয়, চুল এলোমেলো, আনন্দ পণ্ড হওয়া মুখ। রাগী চোখে বরুণের দিকে তাকিয়ে ফুঁসতে থাকে। তারপর শোধ নেয়, বরুণকে দেওয়ালে ঠেসে ধরে, বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয় দাঁত।

কামড়ে ধরেই আছে মন্দিরা। বরুণের ব্যথা লাগছে ভীষণ। অদ্ভুত এক ধরনের ভালও লাগছে, মন্দিরার চুলে, শরীরে বুনো ফুলের গন্ধ। বরুণদের পাড়ার মাঠ, পুকুরের গায়ে অনেক ঝোপজঙ্গল আছে, খেলতে খেলতে কখনও-সখনও সেখানে চলে যায় ঘেঁটু, আকন্দ, লোধ, ধুতরো ফুলের গন্ধে ঘোর লাগে। সেরকমই একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে বরুণ। চার দেওয়ালের মাথায় চৌকো নীল আকাশে পাক খাচ্ছে চিল।

ঠিক ভোরের আলো নয় আবার বিকেলেরও নয়। ভোর বিকেল মেশানো অদ্ভুত এক আলো বরুণের চারপাশে। আকাশের রংটাও অচেনা, স্লেট রঙের।

বুক সমান সবুজ ঘাসের বন। দু হাতে ঘাস সরিয়ে ডিঙি মেরে হেঁটে যাচ্ছে বরুণ। বন ফুরোচ্ছে না। ফুরোনোর কোনও আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না আশপাশ থেকে। বরুণ এখানে কীভাবে এল জানে না। হাঁটছে অনেকক্ষণ ধরেই, ভয় এখনও সেভাবে গ্রাস করেনি।

দু হাতে ঘাস সরানোর সময় প্রতিবারই মনে হচ্ছে, দেখতে পাবে মাঠ, যার ওপর আঁকা বাড়ি ফেরার রাস্তা।

কোথাও কী পাখি ডাকছে, সি-ই-ই-ই চিপ চিপ চিপ নাকি মনের ভুল। আকাশে উড়ছে না কোনও পাখি, অথচ তাদের ছায়া চকিতে এসে পড়ছে ঘাসের জঙ্গলে। প্রজাপতি, ঘাসফড়িং সবই ছায়া ছায়া, তাদের ডানার মিহি শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে বরুণ।

এই হারিয়ে যাওয়া পরিস্থিতিতে মায়ের কথা মনে পড়ছে না যে তা নয়। ডাকতেও ইচ্ছে করছে মা-মা করে, কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে, তার ডাকে এই আশ্চর্য নির্জনতা ভেঙে খানখান হবে নিশ্চয়ই। করণীয় ভুলে ঘাসজঙ্গল ভেদ করে শুধু হেঁটে যায় বরুণ। সময় কি এখানে এগোয় না, কেন পালটাচ্ছে না আলোর রং? সূর্যটাই বা কোথায়? চাঁদ! তারারা কি দেখা দেবে রাত্তিরে?

মৃদু হাওয়া বয়। বুনো ফুলের গন্ধ এসে লাগে নাকে। গন্ধটা ভীষণ চেনাচেনা। আর একবার গন্ধটা বুক ভরে নেওয়ার আগেই বরুণ এসে পড়ে জঙ্গলের বাইরে।

এখানকার আলো-বাতাস তার চেনা। তবে পায়ের তলায় মাটি নরম। কাদা নেই অবশ্য। হাঁটতে থাকে বরুণ। একবার পিছন ফিরে দেখে ফেলে আসা ঘাসের বন। মন খারাপ করে তার।

নরম মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে বরুণ চলে এসেছে একটা মাঠে। এখানকার মাটি ততটা তুলতুলে নয়। মাঠের ওপর অজস্র আঁকাবাঁকা রাস্তা। কোন রাস্তা ধরে হাঁটবে ঠিক করতে পারে না। যা হোক একটা পথ বেছে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

বিভিন্ন ঘুরপথ অতিক্রম করে বরুণ এখন থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে কোনও পথ নেই, তিনটি রেখা আড়াআড়ি পড়ে আছে। যেনবা এক্কা-দোক্কার কোর্ট আঁকা। কোনও বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল হয়তো এখানে খেলে গিয়েছিল, আঁকা কোর্ট রয়ে গেছে। মুছে গেছে তেক্কা-চৌক্কার মাঝের দাগটা।

খেলার নিয়মে লাফিয়ে লাফিয়ে কোর্ট পার হয় বরুণ। তারপর অতল খাদ। - ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলতেই সে দেখে, তার হাত চিত হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। স্বপ্নে এই হাতের ওপর দিয়েই হেঁটে আঙুল থেকে লাফিয়ে নেমেছে বরুণ। ঘাসের জঙ্গলটা খোঁজে, বদলে দেখতে পায় মন্দিরার দাঁতের আবছা দাগ।

অন্য হাত দিয়ে দাগটা বারবার মোছার চেষ্টা করে বরুণ, যেন শরীরে গজিয়ে ওঠা ঘাসের বনটা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

মা এসে জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়। চোখধাঁধানো আলো এসে পড়ে ঘরে। মা বলে, ওরে

ওঠ, কত বেলা হয়ে গেল দেখছিস! তোর দাদা কখন উঠে চলে গেছে পুজোবাড়ি। বরুণের খেয়াল হয় আজই পুজোর শেষ দিন। দশমী। মন ছটফট করে ওঠে বরুণের। ভটচাযবাড়ি থেকে ভেসে আসছে পুজোর শব্দ। বিকেলবেলাই যোগেন, নগেন ঢাকি বোল তুলবে, ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ... ঠাকুর যাবে বিসর্জন...। ঠাকুর থাকবে... মশারি তুলে বিছানা থেকে তড়িঘড়ি নেমে আসে বরুণ।

কাকঠকানো চাঁদ উঠেছে আজ। এখন সন্ধে। সমস্তিপুরের সরকারি বাংলো পাড়া অন্যান্য দিনের মতোই নির্জন, কিন্তু অস্পষ্ট নয়।

প্রবাল সামন্তর চেম্বার থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন মৃগাঙ্ক আর বলাই অনেকদিন পর মৃগাঙ্ক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখছেন সমস্তিপুরের ওপর আহ্লাদে পড়ে থাকা জ্যোৎস্না।

মিটিমিটি হাসছেন মৃগাঙ্ক। বলাই বলেন, কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন! চল।

পা বাড়ান মৃগাঙ্ক। বলে ওঠেন, ওঃ, গেল কদিন বটে লুকোচুরি খেলা। কী বল?

বলাই কোনও উত্তর দেন না। দুজনেই নেমে আসেন বারান্দা থেকে। মৃগাঙ্কর খুঁড়িয়ে হাঁটাটা গত কিছুদিনের তুলনায় অনেক স্বাভাবিক, সাবলীল, পা দুটো বেশ ভারহীন বোধ হচ্ছে। পাশে বলাইদাকে গম্ভীরভাবে হেঁটে যেতে দেখে মৃগাঙ্কর কেমন জানি সন্দেহ হয়, তা হলে কি বিপদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি? প্রশ্নটা করতেই হয়, তুমি কি ঠিক ভরসা পেলে না সাহেবের কথায়? চুপচাপ হয়ে আছ কেন?

তক্ষুনি কোনও উত্তর দেন না বলাই। আরও খানিকটা ভেবে হাঁটতে হাঁটতেই বলেন, ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে আমি ভাবতে পারিনি। সামন্ত সাহেবের আশ্বাস কতটা নির্ভরযোগ্য সেটা নিয়েই চিন্তা হচ্ছে।

আমি কিন্তু ভাবছি না। বলেন মৃগাঙ্ক। একটু থেমে আরও বলেন, সামন্ত সাহেবকে আমিও চিনি না, শুধু এটুকু জানি অবিনাশদা নিজে এসে কথা বলে গেছে মানেই, করে রেখেছে পাকা কাজ। আর তুমি তো শুনলে, সামন্ত বলছিলেন, অবিনাশদার সঙ্গে যমুনাও এসেছিল এখানে। মেয়েটাও ছিল। এত কিছু দেখেশুনে সাহেব মিথ্যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবে আমাদের। তা ছাড়া যাওয়ার দিন স্টেশনে অবিনাশদা তো নিজের মুখে আমায় বলল, সামন্তসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

মৃগাঙ্কর কথা শুনে বলাই ওঁর মুখের দিকে তাকান, সত্যি, ছেলেটা কী পরিমাণ বিশ্বাস করে অবিনাশদাকে। একেবারে অন্ধ ভক্ত। মানুষটা দুটো আশার কথা শুনিয়ে ফিরে গেছে। সেটাই আঁকড়ে ধরে আছে মৃগাঙ্ক।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন বলাই। পথ চলতে চলতে বলেন, অবিনাশদার করে যাওয়া ব্যবস্থা বা সামন্ত সাহেবের আন্তরিকতা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমার চিন্তা অন্য জায়গায়।

কী নিয়ে চিন্তা হচ্ছে বল?

ব্যাপারটা হচ্ছে, সামন্ত যে ভরসার কথা বললেন, তা সত্যিই কতটা অভ্রান্ত, উনি নিজেই কি সেটা ভাল করে জানেন?

হঠাৎ তোমার একথা মনে হচ্ছে কেন?

কারণ আছে। সামন্ত সাহেব তো দেখেননি কীরকম মরিয়া হয়ে পুলিশ তোকে আর মেয়েটাকে খুঁজছিল। টের পেয়েছি আমরা।

তো? বুঝতে না পেরে জানতে চান মৃগাঙ্ক

বলাই বলেন, সামস্ত সাহেবের কথামতো পুলিশ এবং প্যারামিলিটারি ফোর্সের মিলিত প্রচেষ্টা এত তাড়াতাড়ি থেমে যাবে এটা হতে পারে না।

না যাওয়ার কী আছে। সামন্ত সাহেব তো বললেন, উনি ভেতর ভেতর সব খবরাখবর নিয়েছেন। আমাদের খুঁজে বার করার জন্য বর্ডারের মিলিটারিরা এসেছিল থানায়। ওসি ওদের সাহায্যও করে। কিন্তু কতদিন ছুটি নিয়ে বসে থাকবে মিলিটারি, বিপদ ততটা নেই বুঝে ফিরে গেছে ডিউটিতে। আর এখানকার ওসি এখন বদলি হয়ে পূর্ণিয়ায়।

বলাই বলেন, এসবই আমাদের শোনা কথা। সামন্ত সাহেবের থেকেই শোনা। সমস্তটাই চোখের আড়ালে ঘটেছে...

এখানে এসে কথায় বাধা দেন মৃগাঙ্ক, বলেন, না, আমিও খবর নিয়েছি, সমস্তিপুরের বড়বাবু বদলি হয়েছেন।

বদলি হওয়া মানেই নজরদারি উঠে যাওয়া নয়। কে বলতে পারে, তোকে খুঁজে বার করার জন্য ওসি এখানকার কোরাপটেড পুলিশদের বলে কয়ে যায়নি? গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়াও অসম্ভব কিছু না।

জনহীন চওড়া রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন দুজন। চাঁদের আলোয় রাস্তা এখন দীর্ঘাকার। বলাইদার কথা শোনার পর মৃগাঙ্কর চোখে আলো ক্রমশ কমতে থাকে। আচমকাই বলাইয়ের দিকে ঘুরে যান মৃগাঙ্ক। খামচে ধরেন বলাইয়ের কাঁধ। ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, কেন তুমি এত ভয় দেখাচ্ছ? কেন বিশ্বাস করতে পার না মানুষকে? তুমি কি বলতে চাও কোনও দিনই আমার বাড়ি ফেরা হবে না।

মৃগাঙ্কর আক্রোশটা যে আসলে হাহাকার, বুঝতে অসুবিধে হয় না বলাই সেনগুপ্তর। শান্তভাবে মৃগাঙ্কর হাত দুটো নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বলেন, শত্রুপক্ষের অনুসরণ কী জিনিস, আমি জানি মৃগাঙ্ক। কুমিল্লা ছেড়ে যখন পালিয়ে আসছিলাম এ-দেশে, শিয়ালদা স্টেশনে পর্যন্ত দেখতে পাই ওদেরকে। ইন্ডিয়ায় ঢুকে এসেছি তবুও। সেই কারণেই বলছি, এখনই এত নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই।

তা হলে কী করতে বল আমাকে? হতাশ গলায় জানতে চান মৃগাঙ্ক। বলাই সেনগুপ্ত উত্তর দেওয়ার আগেই মৃগাঙ্ক ফের বলেন, কতদিন যমুনার হাতে ভাত খাইনি বল তো। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছেন বলাই। একটা বাহারি টাঙা রিনঠিন শব্দ তুলে ক্রশ করে গেল তাঁদের। তার খানিকক্ষণ পর একটা মোটরগাড়ি দুজনের শরীরে হেডলাইট ফেলে পার হল। মোটরগাড়ির আলো চাঁদের আলোর জন্য আজ অনেকটাই নিষ্প্রভ। ওই আলোতেই মৃগাঙ্ক দেখলেন, বলাইদার মুখে অসংখ্য ভাঁজ। বেচারা! মৃগাঙ্কর চিন্তায় পুজোটা ভাল করে কাটাতে পারেনি। অভিনয় করেনি বাঙালিটোলার নাটকে। প্রবাসীদের কাছে দুর্গাপুজো যে কতটা আপন উৎসব, প্রবাসী মাত্রই তা জানে। এখানকার বিহারিরাও খুব মজা করে ওই কটা দিন। বলাইদার জন্য খারাপ লাগে মৃগাঙ্কর, মাসখানেক আগেও মৃগাঙ্কর কীর্তিকলাপ দেখে তিরস্কার করত বলাইদা। এক প্রকার হেয় করত। ঘটনাক্রমে মৃগাঙ্কর অবস্থা যত খারাপ হতে লাগল, তত ভালবেসে ফেলল বলাইদা। ভারী অদ্ভুত মানুষ।

এখান থেকে মহাদেবস্থানের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। খানিকটা এগোলেই চৌরাস্তার মোড়। এখনও ঠিক হল না মৃগাঙ্কর পরবর্তী পদক্ষেপ। সিদ্ধান্ত জানাতে একটু বেশিই সময় নিচ্ছে বলাইদা। এত কী ভাবার আছে কে জানে! অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন মৃগাঙ্ক। বলাইদার উদ্দেশে বলেন, কী হল, কিছু বল।

এতক্ষণে মুখ তোলেন বলাই। যেন খানিকটা বলা হয়ে গেছে, এইভাবে শুরু করেন, তুই ভাবিস না পুলিশ হাত ধুয়ে নিলে সব সমস্যার সমাধান। আর একটা লোক তোকে খুঁজছে।

কোন লোক? চোখ কুঁচকে জানতে চান মৃগাঙ্ক।

বলাই বলেন, বাচ্চাটার মায়ের স্বামী। যে লোকটা পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের এগেনস্টে কলকাতার কোর্টে মামলা করেছিল। হেলাফেলা করার লোক সে নয়।

কিন্তু তাকে তো সমস্তিপুরের পুলিশ অ্যারেস্ট করে কলকাতায় চালান করেছে।

করুক। ফিরে সে আসবেই। পিছনে বড়লোক আত্মীয় আছে, আর আছে জেদ। বাঙালের জেদ।

এই অবস্থায় বলাইদাকে ঘটি-বাঙাল প্রসঙ্গ আনতে দেখে হেসে ফেলেন মৃগাঙ্ক। ভাগ্যিস লক্ষ করে না বলাইদা। পরের কথায় চলে যায়। তুই আপাতত কোয়ার্টারে ফিরিস না। কটাদিন নিজের বাড়িতেই থাক। রাস্তাঘাটে খুব একটা বেরোবি না। পরিস্থিতি আর একটু বুঝে নেওয়া ভাল।

ঠিক আছে। তুমি যা বলবে, তাই হবে। বলে বলাই সেনগুপ্তর কথায় সায় দেন মৃগাঙ্ক।

দুজনে এসে পড়েছেন রাস্তার মোড়ে। ভোলানাথ মন্দিরের সামনেটা জোরালো আলো।

বাকি চার রাস্তার জ্যোৎস্নাই সম্বল। মন্দিরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টার ভারী শব্দ।

বাঁপাশের রাস্তাটা গেছে মৃগাঙ্কর বাড়ির দিকে। বলাই যাবেন সোজা, লেভেল ক্রসিং পার হয়ে।

চলি বলাইদা। হপ্তাখানেক বাড়িতেই থাকছি। ডিউটি জয়েন করছি না আপাতত। তুমি সময় করে এসে দেখা করে যেয়ো। বলে, বাড়ির রাস্তায় পা বাড়ান মৃগাঙ্ক। ওঁর যাওয়ার পথে তাকিয়ে মনে মনে দুর্গা দুর্গা বলতে যাবেন বলাই, দেখেন, মৃগাঙ্ক ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসছে।

সামনে আসতে বলাই জিজ্ঞেস করেন, কী হল আবার?

লাজুক হেসে মৃগাঙ্ক বলেন, আমার চেহারাটা কি খুব খারাপ লাগছে বলাইদা? যমুনা ঘাবড়ে যাবে না তো?

বলাই হাসেন। আরও লজ্জা পান মৃগাঙ্ক। বলেন, সেলুনে দাড়িটাড়ি কেটেই যাই কী বল?

এই অবস্থাতেই যা, তুই যে কী চিজ, তোর বউ ভাল করেই জানে। পাগল কোথাকার। বলে, প্রসন্ন হাসি নিয়ে রেল গেটের দিকে এগোন বলাই। মৃগাঙ্কর দ্বিধা কাটে না।

সেলুনে ঢোকা হল না, বাড়িতেও না। মনের নানা টালবাহানা কাটিয়ে মৃগাঙ্ক চলে এসেছেন তাঁর পছন্দের ঠেকায়। কানাইয়ার ঝোপড়া। আত্মগোপনকালীন কখনও-সখনও মদ তিনি খেয়েছেন, এখানে আসার সাহস হয়নি। সন্ধের পরে মৃগাঙ্কর ঠিকানাটা অনেকেই জানে।

খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে মৃগাঙ্ক হেঁটে যান নিজের নির্দিষ্ট জায়গায়। ফাঁকাই আছে। কেউ বসেনি, ঠেকাটা আজ একটু নিরালা নিরালা লাগে। অন্ধকার কম বলেই বোধহয় নেশার আসর তেমন জমেনি। চাঁদের আলোটাই সব মাটি করেছে।

ইট পাতাই আছে মাঠে, তার ওপর বসে পড়েন মৃগাঙ্ক। আজ সব নেশারুকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কানাইয়া বেকার বেকার লম্পটা জ্বালিয়ে রেখে মদ ঢালছে বোতলে। অন্যান্য দিনের মতোই ওকে সাহায্য করছে ছেলে রঘুপতি।

জ্যারিকেন থেকে বোতলে, গ্লাসে ঠাররা ঢালায় এতই নিবিষ্ট কানাইয়া, মৃগাঙ্ক এতদিন পর এলেন, খেয়ালই করছে না। মৃগাঙ্কও ঠিক করেন ডেকে মদ চাইবেন না। ওদের এসে দিয়ে যেতে হবে। কত পুরুষের ভাগ্য কানাইয়ার, ব্রাহ্মণের সন্তানকে মদ খাওয়াতে পারছে। এখানেই অর্ধেক পাপ মাফ।

অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকেন মৃগাঙ্ক। আকাশের দিকে তাকান, টলটল করছে চাঁদ। চারপাশের দীর্ঘ বৃক্ষরাজি চাঁদটার নাগাল পেতে চাইছে। কানাইয়ার ঠেকটা এই জন্যেই এত ভাল লাগে মৃগাঙ্কর। মনে হয় সমস্তিপুর থেকে অনেক দুরে কোনও জঙ্গলের মধ্যে বসে আছেন। সভ্যতার বাইরে।

কানে মিঠে সুর ভেসে আসে মৃগাঙ্কর। ভারী সুন্দর গ্রামীণ সুর। ঘাড় ফেরান, দেখেন, তাঁর থেকে খানিকটা দূরে বসে একটা লোক নেশার ঝোঁকে গেয়ে চলেছে, মকাইয় রে, তোর গুণ গাইল না জালা/ আগে আগে হাল চলে, পিছে সে জোতালা/ মকাইয় রে...

একই পক্তি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে চলেছে লোকটা, সুরে অদ্ভুত এক দুলুনি আছে, ভীষণ সংক্রামক। মৃগাঙ্কও গাইতে থাকেন লোকটার সঙ্গে।

কানাইয়ার ছেলে রঘুপতি গ্লাস-বোতল হাতে এগিয়ে আসে। মৃগাঙ্কর সামনে সাজিয়ে দেয় নেশার সরঞ্জাম। কাগজে করে ভেজা ছোলা, নুন এনেছে ছেলেটা। পরম আত্মীয়র মতো জিজ্ঞেস করে, ক্যায়া খবর বাঙ্গালিবাবু। ইতনা দিন কাঁহা থে?

উত্তর দেন না মৃগাঙ্ক। রহস্যময় হাসি মুখে নিয়ে গেয়ে যান, মকইয় রে, তোর গুণ গাইল না জালা...

দেশ গয়ে থে ক্যায়া?

রে... আবারও উত্তরের বদলে গান... আগে আগে হাল চলে, পিছে সে জোতালা/ মকইয়...

রঘুপতি এবার ফিসফিসিয়ে বলে, দোবার পুলিশ আপকো টুটনে আয়া থা ইহা হামলোগ বোলা, আপ কলকত্তা চলে গঁয়ে।

মৃগাঙ্কর মুখে আবারও হাসি, একই গান। মাঝে দু ঢোঁক মেরে নিয়েছেন। সমস্ত দুশ্চিন্তা হয়ে গেছে উধাও। তার চোখে এখন ভাসছে বিহারের কোনও গ্রামের বিস্তীর্ণ খেত। অপরাহ্নের শেষ ভাগে হাল চষছে কোনও চাষি। হালে জোড়া স্বাস্থ্যবান দুটো বলদ। লাঙলের স্পর্শে পুলকিত হচ্ছে মাটি। আগামী ফসলের গুণকীর্তন করতে করতে চাষি নিজের কাজ করে যাচ্ছে, মকইয় রে, তোর গুণ... কল্পনাটা পুরনো লাগে। এরকম ভারতবর্ষের স্বপ্নই তো দেখতেন যৌবনে। এখন মেলে না।

কোথাও একটা ঝুটঝামেলা হচ্ছে। স্বপ্ন থেকে ফেরেন মৃগাঙ্ক। মাঠের শেষ প্রান্তে একটা লোককে 'দে মার' দিচ্ছে রঘুপতি। কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছে মদ খেয়ে টাকা না দিয়ে পালাচ্ছিল লোকটা। এর আগেও নাকি একদিন এরকম করেছে। আজ তক্কে তক্কে ছিল রঘুপতি।—এই ধরনের ঝামেলা মদের ঠেকে অতি স্বাভাবিক প্রায় নিয়মিত ঘটনা। আগেও অনেক দেখেছেন মৃগাঙ্ক। সয়ে গেছে। আজ মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এতদিন পর শান্তিতে নেশা করছিলেন, মৌতাত এসেছিল বেশ। চিৎকার চেঁচামেচিতে স্বপ্নটাও গেল ছিটকে। ঝামেলাটা থামছেও না।

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মৃগাঙ্ক। হাতে ধরা আছে ঠাররার বোতল। এই বোতলটা রঘুপতির মাথায় ভাঙবেন, অথবা ঠকবাজের মাথায়। তবে যদি ওরা থামে।

টলোমলো পায়ে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ান মৃগাঙ্ক। এ কী দেখছেন তিনি, আভরণহীন ধবধবে একটা সাদা ঘোড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে নেশার চাতালে! ঘোড়াটাকে চিনতে কোনও অসুবিধে হয় না মৃগাঙ্কর। খোঁড়া হওয়ার পর থেকে ঘুমের ভেতর এই ঘোড়াটাকে প্রায়ই দেখেছেন তিনি। গোটা রাজপথ জুড়ে ঘোড়াটা লক্ষ্যহীন ছোটাছুটি করে। একে শেষবার দেখেছেন পুলিশ যেদিন ধরতে এসেছিল মৃগাঙ্ককে। ঘোড়াটা মৃগাঙ্কর দরজায় সামনের দুটো পা তুলে ধাক্কা দিচ্ছিল। আজ কেন এল সে?

সাদা ঘোড়া মৃগাঙ্কর সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। ভঙ্গিতে পিঠে ওঠার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ঘোড়াটা কোথায় নিয়ে যেতে চায় জানেন না মৃগাঙ্ক। হাত থেকে খসে পড়ে ঠাররার বোতল। মৃগাঙ্ক উঠে পড়েন ঘোড়ার পিঠে। ঘুরে গিয়ে চলতে শুরু করে ঘোড়া। মৃগাঙ্ককে দেখায় পৌরাণিক কোনও বীরের মতন।

পৈতৃক বাড়ির সামনে এসে ঘোড়াটা থামল। পিঠ থেকে নেমে এলেন মৃগাঙ্ক। রাস্তায় তাঁর এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের কজন সাক্ষী রইল কে জানে। পাশাপাশি দুবাড়ির বারান্দায় আপাতত কেউ নেই। শুকদেবদার ডিসপেনসারি বন্ধ। তবে বাইরের আলো জ্বলছে। আলো জ্বালা আছে নিজেদের বাড়ির বারান্দাতেও। এটা একটু অস্বাভাবিক। শশাঙ্ক হিসেবি ছেলে, অযথা কারেন্ট খরচা করে না। মৃদু হাওয়ার মতো আত্মপ্রসাদ খেলে গেল শরীরে, দুবাড়ির লোকেরা কি আগেভাগে খবর পেয়ে গেছে, তিনি ফিরছেন! তাই জ্বালানো আছে বাইরের আলো!

বাড়ির দালানে ওঠার সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ান মৃগাঙ্ক, ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ছাপ। সদরের দিকে এগিয়ে গেছে। হয়তো পার হয়েছে চৌকাঠ, দরজা বন্ধ বলে দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা কি এর মধ্যেই হাঁটতে শিখে গেল! ভারী আশ্চর্য হন মৃগাঙ্ক।

বহু দিন পর নিজেদের বাড়ির কড়া নাড়েন সসংকোচে। একটু পরেই দরজা খুলে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে শশাঙ্কর বউ। প্রথমটায় চমকে উঠে বলে, কে! তারপর চিনতে পারে। পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।

বাড়িময় পুজো পুজো গন্ধ। ভেতর দালানে পড়ে থাকা ছোট্ট পায়ের ছাপ চলে গেছে ঠাকুরঘর অবধি। এক লহমায় মৃগাঙ্ক বুঝতে পারেন, আজ লক্ষ্মীপুজো।

দালানেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়েন মৃগাঙ্ক। শশব্যস্ত হয়ে ভাইবউ বলে ওঠে,

এখানে বসলেন কেন? ঘরে চলুন।

হাতের ইশারায় মৃগাঙ্ক বলেন, এখানেই ঠিক আছি।

শিখা চলে যায় ভেতর বাড়িতে খবর দিতে। মৃগাঙ্ক নিশ্চিত যমুনা, মেয়েটা এখনও এ-বাড়িতেই আছে। তিনি না ফেরা অবধি অন্য কোথাও যাবে না।

দালানে বসে চাঁদটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিটিমিটি হেসে চাঁদের উদ্দেশে মৃগাঙ্ক বলেন, তাই বলি, আজ তোমার এত বাড়বাড়ন্ত কীসের, আজ যে লক্ষ্মীপুজো ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম।

শাড়ির খসখসে আওয়াজে মুখ ফেরান মৃগাঙ্ক— যমুনা। লালপেড়ে গরদের শাড়ি। বড় সিঁদুরের টিপ। মাথায় সাবানও দিয়েছে। কী অপূর্ব লাগছে। যমুনাকে দেখে সরল শিশুর মতো নিঃশব্দ হাসেন মৃগাঙ্ক। বলেন, মেয়ে কোথায়?

ঘরে।

নিয়ে এসো, একটু দেখি।

নোংরা জামা কাপড়গুলো ছাড়, চান কর আগে। তবেই নিয়ে আসব কাছে।

বেশ কসরত করে মেঝে থেকে ওঠেন মৃগাঙ্ক। এই ফাঁকে গামছা নিয়ে আসে যমুনা। শশাঙ্ক কোথায় জিজ্ঞেস করতে যাবেন মৃগাঙ্ক। হুটতে-পুটতে সদর দিয়ে ঢোকে ভাই। বলে, যাক, এসে গেছ তাহলে। ভালই হল, আজ দিনটাও শুভ। আর কোনও গণ্ডগোল নেই তো?

আপাতত নেই বলেই মনে হচ্ছে। তবে কটাদিন এ-বাড়িতেই থাকব। অবস্থাগতিক বুঝে যাব কোয়ার্টারে। তোর কোনও....

দাদার কথার মাঝে শশাঙ্ক বলে ওঠে, কী যে বল উলটোপালটা, এ তো তোমারও বাড়ি। আমি কি তাড়িয়ে দিয়েছি তোমাকে? যদিও লোকে... বলে থেমে যায় শশাঙ্ক। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলে, যাই, ও-বাড়িতে খবর দিই। আমি তো এতক্ষণ ও-বাড়ি বসেছিলাম। রজতদা পুজো করছে। ওখানের সারা হলেই নিয়ে আসব আমাদের বাড়ি। বাঙালিটোলার বাপি, কালুরাও রজতদাকে নিতে এসেছে।

প্রয়োজনের থেকে বেশি কথা বলে বেরিয়ে গেল শশাঙ্ক। মৃগাঙ্কর বুঝতে অসুবিধে হল না দাদার জন্য শশাঙ্কর উৎকণ্ঠা কম ছিল না।

কুয়োতলার উদ্দেশে এগোতে যাবেন মৃগাঙ্ক, পা টলে গেল বিশ্রীভাবে। যমুনা স্বামীকে ধরে সামাল দিলেন। মৃগাঙ্ক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, ধরলে কেন, রাস্তাঘাটের জামাকাপড় আমার, খামোকা পুজোর শাড়িটা অশুদ্ধ হল।

গ্রাহ্য করলেন না যমুনা। মৃগাঙ্ককে ধরে ধরে নিয়ে চললেন কুয়োতলায়। হিসহিসে গলায় বলতে লাগলেন, তোমারই বা কী আক্কেল, পুজো-আচ্চার দিন বাড়ি ফিরলে, নেশা না করলেই চলছিল না। আমি কালই কোয়ার্টারে ফিরে যাব।

খুবই লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে হাঁটেন মৃগাঙ্ক। যমুনা আরও কীসব বলে যায়। সব ঠিকঠাক মাথায় ঢোকে না। যমুনার কণ্ঠস্বর প্রাণভরে শোনেন।

অপর পক্ষে যমুনা যতই শাসন করুন না কেন, কর্তাকে এভাবে ধরে রাখতে তাঁর ভালই লাগছে। এমনকী মৃগাঙ্কর গা থেকে ভেসে আসা দেশি মদের গন্ধটাও আজ ততটা উৎকট, উগ্র মনে হচ্ছে না। গন্ধটা তাঁকে দিচ্ছে নিবিড় আশ্বাস। যা এতক্ষণ পুজোর ধূপধুনোও দিতে পারছিল না।

কুয়োপাড়ে উবু হয়ে বসেছেন মৃগাঙ্ক। যেন ফিরে গেছেন শৈশবে। কপিকল করে জল তুলে যমুনা মাথায় ঢেলে দিচ্ছে। কী শান্তি যে লাগছে মৃগাঙ্কর! আজ বড় আনন্দের দিন। নেশাগ্রস্ত ভাশুরকে দেখে ভাইবউ নাক সিঁটকাল না। শশাঙ্কও নিরুদ্দেশ দাদাকে পেয়ে বেশ বিহ্বল। আর যমুনার অশেষ মমতা।

এখন যে দৃশ্য রচিত হয়ে চলেছে এই নির্জন কুয়োতলায় তার সাক্ষীর অভাব নেই। বেড়ার ধারে গাছপালা, চাঁদ, পলেস্তারা খসা পাঁচিল, সবাই দেখছে এই নিষ্কাম সরল প্রেমের দৃশ্য।

আচমকা গা কেঁপে ওঠে মৃগাঙ্কর, ভীষণ সুখে। কত তুচ্ছ আয়োজনে আসে সুখ! যমুনার

ঢালা জলের আড়ালে দু-চার ফোঁটা কেঁদে নেন মৃগাঙ্ক।

ব্রজসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঘটা করে লক্ষ্মীপুজোর চল ছিল না। পুজো হত পটের ঠাকুরে, নমো নমো করে। অবিনাশের বিয়ের পর ইলাই বছরে বছরে পুজো বড় করে ফেলেন। বাঙালবাড়ির মেয়ে। ব্রজসুন্দর আপত্তি করেননি। নিজেই কোথা থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলেন পাথরের লক্ষ্মী। ছাঁচের মাটির মূর্তি সমস্তিপুরে দুষ্প্রাপ্য।

সেই মূর্তির সামনে বসে পুজো করছেন রজত। শুকদেব বসে আছেন একটু পিছনে। বাড়ির ছোট্ট দুটো মেয়ে আজ শাড়ি পরেছে, মা-জেঠিমার দেখাদেখি আঁচল ফেলেছে কাঁধে। হাত জোড় করে চেয়ে আছে মূর্তির দিকে। পরিবেশটা বেশ ভালই লাগে শুকদেবের। ইলার কথা বড্ড মনে পড়ে, ও চলে গেছে বাংলায়, পুজো রয়ে গেল বিহারে।

বাবা গত হওয়ার পর ছোটভাই রজত পুরোহিত হয়। ওর এসব ব্যাপারে আগ্রহ আছে। সংস্কৃত উচ্চারণ স্পষ্ট, কণ্ঠটিও সুমধুর। পুজোর ভঙ্গির ওপর এত যত্ন নেয় রজত, ভাবের কোথায় যেন অভাব ঠেকে। —এটা একান্তই শুকদেবের ধারণা, নয়তো রজতের ডিমান্ড ভালই। বাড়ির পুজো সেরে যাবে শশাঙ্কদের বাড়ি। তারপর বাঙালিটোলায় আরও দু বাড়ি। বাপি, কালু অলরেডি ওকে নিতে এসে গেছে।

সমস্তিপুরের একমাত্র ফুলটাইমার পুরোহিত গৌর জ্যাঠা পর্যন্ত স্বীকার করেন, রজতের পুজো সত্যিই চোখ ভরে দেখার, কান ভরে শোনার, তবে দক্ষিণার ব্যাপারে এত উদার না হলেই বোধহয় ভাল করত। আমার বাজারদর উঠতে চায় না। আমাকে তো খেতে হয় এই করেই। ওর না হয় চাকরি আছে।

কথাটা কানে গেছে রজতের। সে তাই চার বাড়ির বেশি পুজো করে না।

ডিমান্ড যতই থাকুক রজতের, ওর পুজোয় মন ভরে না শুকদেবের, বাবার পুজোয় ছিল অদ্ভুত ভক্তিভাব। হৃদয়াবেগ উৎসারিত হত কণ্ঠ দিয়ে। তুলনায় রজতের সবই যেন লোকদেখানো, বিশেষ করে বড়দার সামনে নিজেকে জাহির করা। 'জ্যাঠা ভাবটা' পুজোর আসনে বসলে আরও যেন পেয়ে বসে ওকে।

নিঃশব্দে পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন শুকদেব। জরুরি একটা কাজ এই ফাঁকে সেরে নেওয়া যাক। মাথাটা এই মুহূর্তে কাজ করছে ভাল। —রুগির কপালে হাত দিয়ে যেমন জ্বর আন্দাজ করা যায়, শুকদেব ডাক্তারি মন দিয়ে বুঝতে পারেন নিজের মানসিক অবস্থা।

আলো জ্বালিয়ে ডিসপেনসারি ঘরে বসেন শুকদেব। চিঠি লিখতে হবে অবিনাশকে। সমস্তিপুরের কিছু খবর এখনই ওকে জানানো উচিত, বেচারা চিন্তায় থাকে। পরে শুকদেব চিঠি লেখার মুডে থাকবেন কি না, কোনও ঠিক নেই। বাকিরা যদি ভুলে যায় ওকে এখানকার খবর জানাতে।

প্যাড পেন নিয়ে শুরু করেন, স্নেহের অবিনাশ, আশা করি দেবপাড়ার সকলে কুশলে আছে। পৌঁছনো সংবাদের পর তোর আর কোনও চিঠি পাইনি। আমি উত্তর দিয়েছিলাম একটা। ডাক ব্যবস্থার যা হাল আজকাল, হয়তো পাসনি। যাই হোক, এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবি। আগের চিঠিতে ইলার শরীরের অবস্থা জানিয়ে যে সুখবরটা দিয়েছিলি, ডাক্তার হিসেবে খানিকটা মনোযোগ রয়েই যায়।

যে ওষুধগুলো লিখে দিয়েছিলাম ইলা নিশ্চয়ই সেগুলো খাচ্ছে। মাস দুয়েক পর ওষুধ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে।

যদিও ইলাকে নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তা কিছু করি না, ওর ফিজিকাল সিস্টেম ভাল। আর একবার মা হতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। যদি না নিজের হাতে সংসার করতে গিয়ে শরীরপ্রতিমার কোনও ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে।

ইলার চাপা স্বভাবটার জন্য আমার একটু আশঙ্কা হয়। মুখ ফুটে নিজের অসুবিধের কথা সহজে বলে না। এর কারণ সম্ভবত ছোট থেকেই বাবা, মা, দেশ ছেড়ে জীবন কাটিয়েছে, তাই। ওর দিকে লক্ষ রাখিস।

এখানে আমরা সবাই মোটামুটি এক প্রকার। দুর্গাপুজো কাটল ভালই। আজ লক্ষ্মীপুজো। বাড়িতে পুজো হচ্ছে এখন। একটু আগে একটা সুখবর এল, মৃগাঙ্ক ফিরেছে। —নিশ্চয়ই নড়েচড়ে বসলি। —হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে শশাঙ্কর বউ খবর দিয়ে গেল।

প্রকাশ্যে, সদরদরজা দিয়েই মৃগাঙ্ক ফিরেছে বাড়িতে। যা বোঝা যাচ্ছে, বিপদ আর ওর পিছু লেগে নেই।

মৃগাঙ্ক নিশ্চয়ই আজকালের মধ্যে দেখা করবে আমার সঙ্গে, ওকে বলব তোকে সবিস্তারে সব কিছু জানাতে। আপাতত ওর বাড়ি ফেরার খবর দিয়ে তোকে আশ্বস্ত করলাম। মৃগাঙ্কর জন্য তোর উৎকণ্ঠা আমার অজানা নয়।

আমার মনে হয় মৃগাঙ্ক এবার অনেক বদলে যাবে। সংসারের সম্পূর্ণ স্বাদ পেতে যাচ্ছে সে। স্বাভাবিক সংসারী মানুষ হয়ে উঠবে। ওর ওপর দিয়ে যে ঝড়ঝাপটা গেল তা ছিল বদলের পূর্বাভাস।

যে-বীজটি মৃগাঙ্ক রোপণ করল নিজের সংসারে, সেই মেয়ে যদি উচ্চ জাতের হয়, বাকি জীবনটা ও সুখেই কাটাবে। আর বীজটি আমাদের খিড়কি দরজার আঙুরগাছের মতো হলে, মেনে নিতে হবে বাধ্য হয়ে। টক ফলের গাছটাকেই আমরা ওপড়াতে পারলাম না, সেখানে...

চিঠি এত দূর অবধি পৌঁছতেই ডিসপেনসারির পিছন দরজা দিয়ে ঢোকে মৃগাঙ্ক। হাঁপাতে হাঁপাতে। সামনের দরজা বন্ধ, তাই ঘুরে এল।

সামনের চেয়ারে এসে ধপাস করে বসে মৃগাঙ্ক। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে কপালে হাত রাখে। হতাশ গলায় বলে, বড়দা, মেয়েটাকে বোধহয় বাঁচানো যাবে না।

কেন, কী হয়েছে?

হঠাৎ চোখ উলটে পড়ে আছে।

জ্বরটর কিছু ছিল সকাল থেকে?

হ্যাঁ ছিল, যমুনা বলছিল আজ দুপুর থেকেই নাকি জ্বর এসেছে। আমি ফেরার পর মেয়েটার দিকে লক্ষ দেয়নি, ব্যস....

অত চিন্তা করতে হবে না। আমি তো আছি। চল দেখি। বলে, ওষুধের ব্যাগ গুছিয়ে নেন শুকদেব। অসমাপ্ত চিঠিটার দিকে তাকান। মনে মনে বলেন, চিন্তা করিস না অবিনাশ, ডাক্তার হিসেবে আমি ততটা খারাপ নই।

॥ একুশ ॥

দিন কুড়ি হতে চলল অপূর্ব বাড়ি ফিরেছে। যতটা আশঙ্কা করেছিল তার কিছুই প্রায় ঘটেনি। পুলিশ আসেনি তার খোঁজে, নিজের স্কোয়াডের কমরেডরাও না। সি পি এম পার্টির ছেলেরা আসবে না, কারণ অপূর্ব এখন তাদেরই হেফাজতে।

কিছুদিন আগেও অপূর্বরা গোপন মিটিংয়ে সি পি এমের মুণ্ডুপাত করেছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণির পাশাপাশি সি পি এমের সোভিয়েত শোধনবাদকে বসিয়েছে। পার্টির অবস্থা যদি খারাপ না হত, অপূর্বদের খতমের লাইনে ছিল অনেক সি পি এম লিডারের নাম। লিস্ট অবশ্য দেখানো হয়নি অপূর্বকে। তেমনটাই নিয়ম। নির্দেশ এবং ব্যক্তির নাম একদিনে একই সঙ্গে আসবে। অপূর্ব খুব ভয়ে ভয়ে ছিল, সুধাংশু জ্যাঠার নাম তার হাতে না আসে। কাজটা সে কিছুতেই করতে পারত না। তাদের পরিবারের জন্য জ্যাঠা যা করেছে, ভোলার নয়। বিশেষত অনুপস্থিত বাবার ছায়া যেন লেগে রয়েছে সুধাংশু জ্যাঠার গায়ে। জ্যাঠা যখন মা-দাদার সঙ্গে বসে গল্প করে, ওপারের খানসামা গ্রামটাই যেন উঠে আসে মছলন্দপুরের ঘরে।

বাবার সঙ্গে সুধাংশু জ্যাঠার অমিল একটা জায়গায়, পলাতক জীবনে বাবা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়েছে, জ্যাঠা হয়েছে ভাস্বর। যখন যেখানে থেকেছে জানান দিয়েছে নিজের উপস্থিতি। এখন তো জাঁকিয়ে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। জ্যাঠা যে নকশালদের হিটলিস্টে থাকতে পারে, একথা নিজে জানে। তবু কী দৃপ্ততার সঙ্গে বুক উঁচিয়ে চলাফেরা করে।

কমরেড অলকেশদার কাছে জ্যাঠার প্রসঙ্গ একদিন তুলেছিল অপূর্ব, সুধাংশুবাবুর স্পিরিটটা দেখেছ। যখন সি পি এমের অন্য লিডাররা আমাদের জুজুর মতো ভয় পাচ্ছে, উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুক চিতিয়ে। প্রসঙ্গ উত্থাপনের আসল উদ্দেশ্য ছিল, জ্যাঠার বিষয়ে পার্টি কী ভাবছে সেটা আন্দাজ করা। অলকেশদার প্রতিমন্তব্যে অবশ্য কিছুই বোঝা গেল না। বলেছিল, স্পিরিট। আপসের স্পিরিট। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হয়ে যাওয়া।

অপূর্ব এভাবে দেখে না ব্যাপারটা। ব্যক্তি সুধাংশু জ্যাঠা এবং তার বিশ্বাসকে আলাদা করতে পারে। জ্যাঠা অপূর্বদের পরিবারের ইতিহাসের অংশ। সেই ইতিহাসকে মনে রেখে অপূর্ব শেষমেশ জ্যাঠার কাছেই আশ্রয় নেয়।

রাত্তিরবেলা মাঠ থেকে উঠে অপূর্ব প্রথমে বাড়ি ঢোকেনি, জ্যাঠার বাড়িতেই যায়। জ্যাঠা কোন ঘরে শোয় জানে অপূর্ব। জানলায় টোকা মারতেই উঠে এসেছিল, যেন জেগেই থাকে সারারাত। অপূর্বকে দেখে একটুও চমকায়নি। জানতে চেয়েছিল বাড়ি গিয়েছিল কি না। অপূর্ব মাথা নাড়তে বলল, ভালই করেছিস। এত রাতে বাড়ি ফিরলে তোর মায়ের চোখে ব্যাপারটা ভাল ঠেকবে না। এমনিতেই তোর জন্য চিন্তায় মরছে। রাতটা আমার কাছে থাক। কাল সকালে ফ্রেশ হয়ে বাড়ি যাস।

কোথায় ছিলি, কী করছিলি কিছুই জানতে চাইল না জ্যাঠা। তখনই অপূর্বর মনে হয়েছিল, জ্যাঠা সব জানে। অপূর্বর সমস্ত গতিবিধি। ধারণাটা আরও দৃঢ় হয় জ্যাঠার পাশে শোয়ার আগে।

জ্যাঠার ঘরে বিস্কুটের কৌটো থাকে, চারটে বিস্কুট আর জল দিয়ে জ্যাঠা বলেছিল, আপাতত এই খেয়ে শুয়ে পড়। কাল যে বাড়ি ঢুকবি, দিন সাতেকের আগে বেরোবি না। আমি তার মধ্যে বাইরের পরিস্থিতিটা সামলে নেব। আর একটা কথা মনে রাখবি। এই কদিনের ভেতর কেউ যদি তোকে বাড়ি গিয়ে ডাকে, এক ডাকে বেরিয়ে আসবি না। ভাল করে বুঝেসুঝে নিয়ে তাকেই ডাকবি বাড়ির ভেতরে। সে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে যাবি না।

এতগুলো সতর্কবাণী শোনার পর অপূর্ব অসহায়ভাবে বলেছিল, আমার বোধহয় মছলন্দপুরে ফেরা ঠিক হল না, তাই না জ্যাঠা?

কেন ফিরবি না। নিশ্চয়ই ফিরবি। এখানে তোর বাড়ি, স্বজন, পরিজন। সবাই মিলে তোকে আগলে রাখবে। এটাই সমাজের নিয়ম। তুই শুধু সমাজটাকে একটু ভালবাসিস। হিস্টিরিয়া রুগির মতো আক্রমণ করে বসিস না। বিপ্লব, সমাজ বদল কোনওটাই রাতারাতি আসে না।

সব কিছু বলেও সবটা বলল না। নকশাল বলে দাগিয়ে দিল না অপূর্বকে। এই জন্যেই শ্রদ্ধা করতে হয় ওঁকে। এই ধৈর্য কজন নেতার থাকে। নিজেকে বদলানোর খানিকটা নিভৃত সময় পেয়ে গেল অপূর্ব।

এই কটা দিন অপূর্বকে কেউ ডাকতে আসেনি, এমনকী তীর্থর বাড়ির লোকও না। জ্যাঠা যে খুবই শক্তপোক্ত নিরাপত্তাবলয় তৈরি করছে, বাড়ি বসে টের পাচ্ছে সে। শুধু একটা ব্যাপারেই চিন্তা হচ্ছে, তাদের স্কোয়াডের অবস্থা কী রকম? সবাই কি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেল। না কি ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। ওদের আটকানো জ্যাঠার পার্টির ছেলেদের কম্ম নয়। ওরা আসবেই যে-কোনও দিন, যে-কোনও সময়। ফেরত চাইবে তীর্থকে আর অস্ত্র দুটো। ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলতে চায় অপূর্ব। তাই গত দুদিন একটু সাহস দেখাচ্ছে সে, বাড়ির হাতায় ঘুরছে, বাগানের মাটি খুঁড়ে চাষ দিচ্ছে মায়ের জন্য। পুকুরঘাটে চান করাচ্ছে মেজদার মেয়ে পুতুলকে। একই সঙ্গে লক্ষ রাখছে আসছে কি না কেউ। খবর নিশ্চয়ই পৌঁছেছে, সব জায়গায়।

তীর্থর বাড়ির কেউ না আসাটা সব থেকে অবাক করেছিল অপূর্বকে। উত্তরটা পেয়ে গেছে কুন্তলার কাছে। তীর্থর বাড়ির পাশে থাকে কুন্তলা, অপূর্বর মেজবউদির সঙ্গে আড্ডা মারতে আসে। কুন্তলা একদিন বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করে বসল, হ্যাঁ গো অপূর্বদা, তুমি সত্যিই জান না তীর্থদা কোথায় গেছে?

বিব্রত বোধ করেছিল অপূর্ব। বলে, এভাবে বলছিস কেন?

না, আসলে তীর্থদা তো খুব বন্ধু ছিল তোমার। তোমাকে কিছুই না বলে এতদিন বেপাত্তা থাকবে!

তুই এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? ওর বাড়ির লোক তো কেউ এল না খোঁজ করতে। পালটা প্রশ্নে কুন্তলাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল অপূর্ব। থামেনি সে। বলেছিল, তীর্থদার বাড়ির লোক কী করে আসবে। সুধাংশুবাবু পরিষ্কার করে তীর্থদার মাকে বলে দিয়েছেন, ছেলের বেশি খোঁজ করতে যাবেন না। তীর্থ নকশাল করত, এলাকার সবাই জানে। ফেরার হলে এমনিই ফিরবে। অতিরিক্ত খোঁজতল্লাশি করতে গেলে আপনাদের সুদ্ধু ভিটেছাড়া করবে পুলিশ। তারপর থেকেই খুব ভয় পেয়ে গেছে ওদের বাড়ির লোক। শুধু জেঠিমা লুকিয়ে কাঁদে।

কুন্তলার কথার শেষে নেমে এসেছিল গভীর নীরবতা। তখনই অপূর্বর মনে হয় কুন্তলা ইদানীং বেশি বেশি আসছে মেজবউদির কাছে। তীর্থদের বাড়ির দূত হয়ে কাজ করছে কুন্তলা। না কি অন্য বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল তীর্থর সঙ্গে? সদ্য অতীত মনে করার চেষ্টা করে অপূর্ব। কুন্তলা এমনিতে সরল, উৎসাহী মেয়ে। তীর্থর বাড়িতে বসে যখন আড্ডা মারত অপূর্ব, দেখেছে, বাড়ির মেয়ের মতোই ও-বাড়িতে মিশে আছে কুন্তলা। অপূর্বদের চা, মুড়ি দিতে এসে খানিক বসে যেতে চাইত। তাড়া করত তীর্থ।

ওই ঘটনার মাঝে হয়তো লুকিয়েছিল কোনও ইঙ্গিত, যা থেকে গেছে অপূর্বর অলক্ষ্যে। তবে তীর্থর সঙ্গে প্রেম ব্যাপারটা ঠিক যেন খাপ খায় না। যা তিরিক্ষি মেজাজ!

কুন্তলা এ-বাড়িতে এলে অস্বস্তিটা কিন্তু এড়াতে পারে না অপূর্ব। মনে হয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। উপায় নেই।

এভাবে গৃহবন্দি হয়ে থাকা আর ভাল লাগে না। অসহ্য নৈঃশব্দ্যের ভেতর দিয়ে বদলে যাচ্ছে অপূর্ব। বিশ্বাস, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে সে। কোথাও কোনও সাড়া পড়েনি। গ্রাহ্যই করছে না কেউ। অদ্ভুত এক দমবন্ধ পরিস্থিতি।

অপূর্ব পালাবে। দূরের কোনও গ্রামে, নদীর চরায়, বন-জঙ্গলে ডেরা বাঁধবে সে।

জীবনটাকে শুরু করবে নতুনভাবে।... লাগামহীন ভাবনা। ভাতঘুমের ঝিমটি লেগেছে অপূর্বর। মা ডেকে ওঠে, ও অপু, তরে ডাকতাসে। ঘুমাইলি না কি?

বিছানা থেকে উঠে জানলায় যায় অপূর্ব, এখান থেকে দেখা যায় সদর। বাবুজি এসেছে। ঘর থেকেই হাঁক পাড়ে অপূর্ব, ভেতরে আয়।

ঘরে ঢুকে বাবুজি বলে, পেন্টিং করতে যাচ্ছি। যাবি নাকি আমাদের সঙ্গে? 'পেন্টিং' অর্থাৎ দেওয়াল লিখতে যাচ্ছে বাবুজিরা। একটু সময় নিয়ে অপূর্ব বলে, জ্যাঠাকে একবার জিজ্ঞেস করি!

সুধাংশুজ্যাঠাই তো বলল, তোকে সঙ্গে নিতে। পার্টির কাজে একদম সময় দিচ্ছিস না, চল চল সবাই দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।

অপূর্ব জানে না, বাবুজিরা তার সম্বন্ধে কত দূর কী জানে। এটুকু বুঝতে পারছে,

জ্যাঠার নির্দেশ এসেছে বাইরে বেরোনোর। তার মানে পরিস্থিতি অনুকূলে। এরকমই কিছু একটা চাইছিল অপূর্ব। বাবুজিকে বলে, তুই গিয়ে দাঁড়া, আমি আসছি।

বাবুজি বেরিয়ে যায়। লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরতে থাকে অপূর্ব। সি পি এমের হয়ে দেওয়ালে লিখতে যাচ্ছে, স্কোয়াডের কমরেডরা যখন জানবে, কী রি-অ্যাকশান হবে ভাল করেই জানে অপূর্ব। ফলও জানা। একটাই যা ভরসা, স্কোয়াডের আজও কোনও অস্তিত্ব আছে কি না, এ কদিন ঘরে বসে বোঝা যায়নি। বাইরে গেলে টের পাওয়া যাবে। পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্কের একটা হেস্তনেস্ত চাইছে অপূর্ব। বিমলদার মতন গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সে, যা করবে প্রকাশ্যে।

শেষদুপুর থেকে বিকেলের মাঝামাঝি বেশ কটা দেওয়াল, লেখা হয়ে গেল। চুনের বেস মারা ছিল আগে থেকে। মাটির বাড়ির দেওয়াল, স্কুলবাড়ির পাঁচিল, সদ্য তৈরি হওয়া পাকা বাড়ির রং ঘুচিয়ে অপূর্বরা এখন উদয় সংঘর ক্লাবঘরের দেওয়াল সাদা করছে। কাল লেখা হবে।

এই দেওয়াল লিখনে সরাসরি হাত লাগায়নি অপূর্ব, দলে থেকেছে। বেশ কয়েক মাস আগে তাদের লাল অক্ষরে লেখা, সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ, সাইন বোর্ডে মার্কসবাদী, কাজে কংগ্রেস।- এখন অস্পষ্ট। বিনা দ্বিধায় মুছে দিচ্ছে বাবুজিরা। বদলে লেখা হচ্ছে, সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ, দিনে নকশাল, রাতে কংগ্রেস। অপূর্ব নীরব সমর্থক। সে শুধু চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে, এমন কেউ কী দেখছে তাকে, যে জানে অপূর্বর পূর্ব রাজনৈতিক পরিচয়! দেখুক। তাঁড়াতাড়ি গিয়ে খবর দিক পার্টির অভ্যন্তরে, তারপর যে শাস্তিই নেমে আসুক, মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত অপূর্ব। সে জানবে শাস্তি দেবার সামর্থ্যটুকু এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি তার দলের।

পাকা রাস্তার গায়ে বড় নালা, তার পাশে চাষের জমিতে জোরজবরদস্তি গজিয়ে ওঠা ক্লাবঘর। সাদা দেওয়াল থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকায় অপূর্ব। যথারীতি কিছু দর্শক জমেছে। ওদের মধ্যে একজনকে দেখে বেশ অবাক হয় অপূর্ব, কুন্তলা। ও কেন দাঁড়িয়ে?

নালা ডিঙিয়ে কুন্তলার সামনে যায় অপূর্ব। জিজ্ঞেস করে, কী রে, তুই এখানে কী করছিস? যাচ্ছিলি কোথায়?

টিউশন পড়াতে। ছোট্ট করে উত্তর দেয় কুন্তলা।

দাঁড়িয়ে গেলি যে বড়।

দেখছিলাম।

কী দেখছিলি?

তোমাদের। আবার অস্ফুট ছোট্ট উত্তর কুন্তলার।

মুশকিল হল অপূর্বর, কুন্তলা এমন অস্পষ্টভাবে বলল কথাটা, তোমাদের না তোমাকে, ঠিক বোঝা গেল না। ফের জানতে চাওয়া ভাল দেখায় না। পরিস্থিতির ভার কমাতে অপূর্ব বলে, দেওয়াল লেখায় আবার দেখার কী আছে। সময় নষ্ট না করে নিজের কাজে যা।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে অপূর্বদা।

কুন্তলার কথনভঙ্গিতে সচকিত এবং বিস্মিত দুটোই হয় অপূর্ব। একটু সময় নিয়ে বলে, কী কথা?

ভাবছি, এখানে বলব নাকি তোমার বাড়ি গিয়ে। আসলে কথাটা এমন ব্যক্তিগত, আমি চাইছি অন্য কেউ না শুনুক। দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে কুন্তলা।

এখানেই বল। এখানে শোনার কেউ নেই।

কুন্তলা এবার স্পষ্ট চোখে তাকায় অপূর্বর দিকে। খানিক পরে বলে, তীর্থদা যাওয়ার আগে আমাকে বলে গিয়েছিল কোথায় যাচ্ছে, সঙ্গে কে থাকছে তাও। অনেক কথাই আমাকে বলত তীর্থদা। শর্ত ছিল একটাই কাউকে বলা চলবে না। আমি এখনও আশা করে আছি, তীর্থদা ফিরবেই। তাই কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু তোমাকে এদের সঙ্গে দেখে কেমন যেন ভয় করছে।

পলকহীন অপূর্ব তাকিয়ে আছে কুন্তলার দিকে। পা দুটো যেন ক্রমশ বসে যাচ্ছে রাস্তার পিচ ফুঁড়ে। সামনে থেকে চলে যাচ্ছে কুন্তলা। প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও অপূর্ব বলে উঠতে পারছে না, আমিও তোর মতো তীর্থের জন্য অপেক্ষা করছি। জানি ফিরবে না। তবুও... '

উদয় সংঘর সামনে থেকে সেই যে বাবুজিদের দল থেকে ছিটকে গেছে অপূর্ব তারপর থেকে একা একাই ঘুরছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামল মছলন্দপুরে। বাড়ি বাড়ি থেকে ভেসে আসছে শাঁখের আওয়াজ। দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করার শব্দ। পায়ে পায়ে অপূর্ব চলে এসেছে নিজেদের পাড়ায়, বাড়ি ঢোকেনি। এ-গলি ও-গলি ঘুরপাক খাচ্ছে। এদিকে ইলেকট্রিসিটি আসেনি। সামনে কালীপুজোর অমাবস্যা। গলি অন্ধকার। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মানুষ হেঁটে গেছে অপূর্বর পাশ দিয়ে, অপূর্বর লম্বা চেহারাটার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে, হয়তো চিনতে পেরেছে কিংবা পারেনি। —অপূর্ব বুঝতে পারে এভাবে আর বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যাবে না। একই লোকের সঙ্গে দুবার দেখা হয়ে গেলে কৌতূহল বাড়বে। তার থেকে সংশয়টা কাটিয়ে ফেলাই ভাল। সরাসরি চলে যাওয়া যাক তীর্থদের বাড়ি। অনেকক্ষণ ধরে দ্বিধা-সংকোচে ভুগছে সে।

অপরাধী যেমন নিজের কৃতকর্মের জায়গায় ঘুরেফিরে একবার আসেই, অপূর্বর তেমনই যেতে ইচ্ছে করছে তীর্থর বাড়ি। কুন্তলাকে যদি এত গোপন খবরটা দিয়ে থাকে তীর্থ, বাড়ির দু-একজনকে নিশ্চয়ই আভাসে ইঙ্গিতে কিছুটা বলেছে। অন্তত এটুকু তো বলতেই পারে, আমি আর অপূর্ব বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি।

বাড়ির লোক সব জেনেও ভয়ে আসছে না অপূর্বর কাছে। আসার রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে সুধাংশু জ্যাঠা। অপূর্বর নিজেরই একবার যাওয়া উচিত, সরেজমিনে বুঝে আসা দরকার ওরা কতটা কী জানে?

তীর্থরা তিন ভাই, এক বোন। বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। কুন্তলার বয়সি। বাবা মারা গেছেন আগেই। বছর খানেক হল বড়দা মরে গেল হঠাৎ। মেজদা গোটা সংসার টানছে। অবস্থাটা দেখতে অনেকটা অপূর্বদের বাড়ির মতো হলেও, তফাত অনেক। অপূর্বর অবিবাহিত বোন নেই। বড়দা মজফফরপুর থেকে এখনও টাকা পাঠায়। এ ছাড়াও যদি কোনও অসুবিধেয় পড়ে বড়দি-জামাইবাবু তো আছেই। সে ক্ষেত্রে অপূর্ব যদি ধরা পড়ত পুলিশের হাতে, সংসারের খুব একটা ক্ষতি হত না। তার মানে এই নয় যে তীর্থ নিজের পরিবারে থেকে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাত। বরং অপূর্ব যদিবা রোজগারপাতির চেষ্টা করেছে মাঝেমধ্যে, তীর্থ ধার মাড়াত না সেসবের। তবু ওর মা কি নির্ভর করত না ছেলের ওপর? অবশ্যই করত! যেমন সব মা করে। অন্ধ নির্ভরতা।

অপূর্বর মাও আশা করে তার সেজ ছেলে খুব শীঘ্রই থিতু হয়ে সংসারে সচ্ছলতা আনবে। একদিন আড়ি পেতে মায়ের কথা শুনেছে অপূর্ব। মেজবউদি হয়তো অপূর্বর ভবঘুরে স্বভাব নিয়ে কোনও অনুযোগ করেছিল। উত্তরে মা বলছিল, চিন্তা কইরো না বউমা। অপু অর বাপের স্বভাব পাইছে। তিনিও ছিলেন ওই রকম। কলেজ পড়তে পড়তে বড়লোক বাপের

বাড়ি ছাইড়া গ্যালেন মামারবাড়ি, তারপর নায়েব, ইশকুল মাস্টারি, যজমানি কত কিছুই না করছেন। কখনওবা কাঠ বেকার। আমি যে কীভাবে সংসার টানছি, হেয় আমিই জানি। কিছু মানুষ ওই ধাতের হয়। খুঁটিতে বাঁধা যায় না। তার মানে এয়া নয় যে সংসারের প্রতি মমতা ছিল না ওঁর। খুব ছিল। পোলাপান গুলানরে হাঁকডাক বিশেষ না করলেও, খোঁজ নিতেন আমার কাছে।

বাবার অস্থির, অনিশ্চিত জীবনকেও মহিমামণ্ডিত করে রেখেছে মাঁ। ঠিক তেমনভাবেই মা আশা করে অপূর্ব একদিন থিতু হবেই।

তীর্থর জায়গায় যদি অপূর্ব ধরা পড়ত পুলিশের হাতে, মা বসে থাকত অপেক্ষায়। তখন কি তীর্থ যেত না মায়ের কাছে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে... ভাবতে ভাবতে অপূর্ব পৌঁছে গেছে তীর্থদের বাড়ির উঠোনে। কখন যে বেড়ার গেট খুলল, খেয়ালই নেই।

তীর্থদের উঠোনে দুটো আমগাছ, একটা জাম। অন্ধকার এক পরত বেশি এখানে। ভেতর বাড়ি থেকে কারওরই গলার আওয়াজ ভেসে আসছে না। মাটির দাওয়ায় বসানো একটা হ্যারিকেন। পলতে নামানো মৃদু আলো নিয়ে হ্যারিকেনটাও যেন পথ চেয়ে আছে তীর্থর।

দালানের সামনে যায় অপূর্ব। আজ আর তীর্থর নাম ধরে ডাকা যাবে না। কী বলে ডাকবে তাহলে? গলা ঝেড়ে নিয়ে দুবার 'মাসিমা, মাসিমা' বলে ডেকে ওঠে অপূর্ব। গলাটা নিজের কানেই যেন কেমন কেমন লাগে।

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। এবার তীর্থর বোনের নাম ধরে ডাক দেয়, রুমা, রুমা আছিস নাকি?

আধখোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে তীর্থর মেজদা, সুবলদা। খালি গা, পরনে লুঙ্গি। আবছায়ায় চিনতে পারে না অপূর্বকে। বলে, কে রে? আমি গো সুবলদা। বলে, এগিয়ে যায় অপূর্ব।

সুবলদা চিনেছে। মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোঁজ হয়ে। পরক্ষণেই মাসিমা আসেন চৌকাঠ ডিঙিয়ে, কে রে! কেডা?

আমি অপূর্ব।

অ অপু আইছিস। আয় আয়...

মাসিমার কথার মাঝে ঘরে ঢুকে যায় সুবলদা। দালানে বসতে যাবে অপূর্ব, দেখে, সুবলদা গায়ে জামা দিয়ে বোতাম লাগাতে লাগাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছে অপূর্বর এ-বাড়িতে আসাটা পছন্দ হয়নি সুবলদার। অন্ধকারে সুবলদাকে মিলিয়ে যেতে দেখল অপূর্ব। মাসিমাও সম্ভবত অপেক্ষা করছিলেন এই নিভৃত সময়টুকু পাওয়ার। চাপা গলায় জানতে চাইলেন, কোনও খোঁজ পাইলি তর বন্ধুর।

না মাসিমা। আমিও তো ছিলাম না মছলন্দপুরে। বড়দির বাড়ি গেছিলাম। ফিরে শুনি এই খবর। ভাবলাম, নিশ্চয়ই চলে আসবে দু-এক দিনের মধ্যে। আসছে না দেখে চিন্তা হচ্ছে। কিছু বলে গিয়েছিল আপনাকে? শেষের বাক্যটা খুবই সন্তর্পণে বলে অপূর্ব।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তীর্থর মা বলেন, নাঃ, কিছুই কয় নাই। কোনওদিনই কয় না। তুই বাড়ি ফিরছিস শুইনা সুবলরে কইলাম, অপুর কাছে একবার যা, ও-ই দিতে পারে তীর্থর খোঁজ। সুবল শুনল না। সে কয় কিনা, তুমি জানো না, ওরা দুজন বন্ধু হতে পারে, পার্টি করত আলাদা। —কী আশ্চর্যি কথা! দুইজনায় এত বন্ধুত্ব, পার্টি করে ভিন্ন! সুধাংশুবাবুও একই কথা কইয়া গেলেন। —একটু থামলেন তীর্থর মা। দম নিয়ে ফের বলেন, হ্যাঁ রে সত্যি, তীর্থ নকশাল পার্টি করত?

এতক্ষণ চোখ নামিয়ে বসেছিল অপূর্ব, প্রশ্ন শুনে চমকে তাকায় মাসিমার দিকে। তীর্থ যে নিষিদ্ধ পার্টি করছে, মাসিমা নিশ্চয়ই টের পেতেন। রাত জেগে বাড়িতে পোস্টার লিখত তীর্থ, উনি কি লক্ষ করেননি! হতেই পারে না। হয়তো তীর্থর নির্দেশে এবং নিরাপত্তার কথা ভেবে, সব কিছু জেনেও না জানার ভান করে আছেন।

অপূর্বর কাছে কোনও উত্তর না পেয়ে মাসিমা ফের বলতে শুরু করেন, তীর্থর লাইগা

আমি চিন্তা করি না। সব বাপ-মায়ের একটা কুসন্তান হয়, অরে আমি খরচের হাতে থুইয়া রাখছি। চিন্তা হয় মাইয়াডারে লইয়া।

কে, রুমা? জানতে চায় অপূর্ব।

না, কুন্তলার কথা কইছি। মাইয়াডা আমার কাছে আইসা কান্দে। কী বইলা যে সান্ত্বনা দেই...

মাসিমার কথা শুনে রীতিমতো ধন্দে পড়ে যায় অপূর্ব, অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে, বলা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না। অপূর্বর হয়ে হ্যারিকেনের আলোটাই দমকে দমকে উঠছে, তেল কমে গেছে ওটার। হতবাক হয়ে অপূর্ব ভাবে, কুন্তলা বলছে, মাসিমা কাঁদে একা একা। মাসিমা বলছে, কাঁদে কুন্তলা। —কে যে সত্যি বলছে বোঝা ভার। আশপাশের চেনা মানুষগুলোকে কেমন যেন অচেনা লাগে। সবাই ভীষণ রহস্যময়। কিছু না কিছু চেপে যাচ্ছে অপূর্বকে। বিশ্বাস করছে না। অপূর্ব এখন পরিচিত জনের কাছে সন্দেহভাজন। তীর্থর ফিরে আসার দিন যত পিছৰে, বাড়বে সন্দেহ। আর যদি তীর্থ না ফেরে....

দালান থেকে নেমে দাঁড়ায় অপূর্ব। তীর্থর মাকে বলে, চলি মাসিমা। জোরকদমে খোঁজখবর করে দেখি কোথায় যেতে পারে।

হ্যাঁ বাবা, তাই দ্যাখ। সুবলডা তো হাত ধুইয়া বইসা আছে। তুই তীর্থর কত বন্ধু ছিলি, আমি তো জানি। তুই আসছিলি না দেইখ্যা আমি ভাবছিলাম সব আশা শেষ। দুঃসংবাদটা দেওয়ানের মতো মনের জোর নাই তর। অহন তরে দেইখ্যা কী ভরসা যে পাইলাম...

মাসিমার কথা শেষ হওয়ার নয়। পিছন ফিরে উঠোন পার হতে থাকে অপুর্ব। আত্মগ্লানিতে ভরে আছে মন। অপূর্ব ভেবেছিল রাজনৈতিক অবস্থান পালটানোর জন্য আঘাত আসবে নিজের পার্টি থেকে, সেদিকে কোনও সাড়া নেই। অপূর্ব পুড়ছে স্বজন-পরিজনের মধ্যে। মছলন্দপুরে থাকা যে তার পক্ষে ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠবে সেটা ভালমতোই টের পাচ্ছে অপূর্ব। তাহলে কোথায় যাবে সে? কোনখানে!

তীর্থর কথা ভেবে রাগ হয়, কুত্তলার সঙ্গে যে ওর একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, একবারও বলেনি। হয়তো কুন্তলার কাছে হিরো হওয়ার জন্যই শেষ মুহূর্তে অপূর্বর থেকে অস্ত্র চেয়ে নেয়। তখন ডায়লগ মেরেছিল, অপূর্ব, তোর থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে পার্টির। আমার তো তেমন কিছুই দেওয়ার নেই। ঝুঁকিটা আমি নিই।

বোকার মতো কথাটা মেনে নিয়েছিল অপূর্ব, হয়তোবা কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল তখন। অপূর্বর থেকে পার্টির অনেক কিছু পাওয়ার আছে, বলতে তীর্থ নির্দেশ করেছিল অপূর্বর সরবতা'কে। পার্টির গোপন মিটিঙে এবং কর্মিসভায় অপূর্ব সব থেকে বেশি কথা বলে। কাজেকর্মে ভীষণ ডাকাবুকো। তীর্থ হচ্ছে নীরব কর্মী। শুধু থাকে নির্দেশের অপেক্ষায়। ওর যত কথা, প্রতিবাদ সব অপূর্বর সঙ্গেই। ওর আস্ফালন ছিল একগুঁয়ে, জেদি সাপের মতন।

'সাপ'-এর অনুষঙ্গে আচমকাই একটা ছবি ভেসে ওঠে অপূর্বর চোখে, আজ যখন কুন্তলা চলে যাচ্ছিল উদয় সংঘের সামনে থেকে, ওর এক বিনুনি ছোবল মারছিল ওর কোমরেই। ওই সাপ এবার থেকে খুঁজবে অপূর্বকে। বাড়বে আস্ফালন।

অন্ধকার রাস্তায় সন্তর্পণে পা ফেলে অপূর্ব। মছলন্দপুরে ফেরা তার বোধহয় ঠিক হল না।

॥ বাইশ ॥

মৃগাঙ্ক ফিরে এসেছেন নিজের কোয়ার্টারে, সঙ্গে অবশ্যই মেয়ে আর যমুনা। মিলের ডিউটি করছেন নিয়মিত। বলা যেতে পারে তাঁর জীবন কাটছে নির্বিঘ্নে। কেউ আর তাঁকে অনুসরণ করে না। মেয়েটাকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই কারও। একটু ধোঁয়াশা থাকলেও পরিচিতজন মেনে নিয়েছে মেয়েটা মৃগাঙ্কর। এর পিছনে সব থেকে বড় কারণ, মৃগাঙ্ক নেহাতই একজন তুচ্ছ সামাজিক জীব, ওঁকে জড়িয়ে কোনও কেচ্ছাই তেমন জমবে না।

মৃগাঙ্ককে সব থেকে অবাক করেছেন বড় সাহেব দীনেশ যাদব। যাঁর আউট হাউসে থাকেন মৃগাঙ্ক, ধরেই নিয়েছিলেন পুলিশের হুজ্জোতি দেখে বড় সাহেব হয়তো কোয়ার্টারের চাবিই দেবেন না। ঘটল উলটো ঘটনা। যমুনা মেয়েকে নিয়ে যেদিন বড় সাহেবের বাংলোর সামনে রিকশা থেকে নামলেন, খবর পেয়ে দীনেশ যাদব নিজে দৌড়ে এলেন। আইয়ে..., আইয়ে...., মৃগাঙ্কবাবু। হাম কাল হি আপ কা ঘর যানে বালে থে। ম্যায়নে শুনা ভাবী কি গোদ মে লছমি মাইয়া আয়ি হ্যায়।

লাজুক হেসে দীনেশ যাদবকে মেয়ের মুখ দেখায় যমুনা। যাদববাবু অনর্গল সম্ভাষণে যা বলে যেতে থাকেন, মোটামুটি এরকম, আমার খুব খারাপ লেগেছে লছমী মাইয়ার জন্ম অন্য কোথাও হয়েছে বলে। এ-বাড়িতে জন্ম হলে কত পুণ্য হত আমার।

বড় সাহেবের দুটো ছেলে। সম্ভবত একটি কন্যা সন্তানের আকাঙক্ষা প্রবল। সেটা কিছুটা মিটল বৃষ্টিকে পেয়ে। আর একটা স্বার্থও ছিল, পরের দিন হনুমান চালিসা পড়তে ডাকলেন মৃগাঙ্ককে। এই কদিন নিজে পাঠ করে ঠিক মন ভরছিল না।

দীনেশ যাদব খুবই ধর্মপ্রাণ মানুষ। পুলিশের যাতায়াতে খানিকটা ঘাবড়ে গেলেও, ধীরে ধীরে তাঁর ভক্তিভাবের জয় হয়েছে। মৃগাঙ্ককে একথা বলেও আশ্বস্ত করেছেন, আইন্দা পুলিশ আপ কো পকড়নে আয়া, ভাগিয়ে গা নেহি। মুঝ কো খবর কিজিয়ে গা। হাম কোর্ট তক যায়েঙ্গে।

অর্থাৎ মৃগাঙ্ক এখন পেয়েছেন জোরালো প্রটেকশন। মেয়েটা আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় উথালপাথাল করে দিয়েছিল জীবনযাপন। এখন সব শান্ত। বৃষ্টির চেহারায় এমন কিছু আছে সকলেই মোহিত হয়, ওকে পেয়ে শশাঙ্ক অনেক পালটে গেছে, কিছুতেই আসতে দিতে চাইছিল না এ-বাড়ি। এক প্রকার জোর করেই এসেছেন। মেয়েটার জন্য মৃগাঙ্কও খানিকটা বদলেছেন। এখন আর সন্ধে হলেই গলা শুকিয়ে যায় না। কোনওদিন খান, কোনওদিন না খেলেও চলে।

আজ যেমন ডিউটি থেকে ফিরে আর বেরোতে পারেননি। যমুনা মেয়েটাকে কোলে শুইয়ে দিয়েছে। মেয়েটার মাথা যে-হাঁটুতে সেই পা-টা নাচাচ্ছেন মৃগাঙ্ক। ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে। ঘুমের চটকা ভেঙে কেঁদে উঠছে মাঝে মাঝে।

মৃগাঙ্কর উলটোদিকের দেওয়ালে প্রমাণ সাইজের আয়না। সেখানে বিছানায় বসা নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন মৃগাঙ্ক, ভীষণ হাসি পাচ্ছে, সত্যি, কী বদল! এখন তো বসে থাকার কথা ছিল কানাইয়ার ঠেকে। —লছমি মাইয়া কি এল তাহলে! বাবাঃ, লক্ষ্মীপুজোর দিন যা খেল দেখাল। দুড়দাড় করে জ্বর বেড়ে গিয়ে দিল চোখ উলটে। শুকদেবদা এসে এক পুরিয়া ওষুধ দিতে আধঘণ্টার মধ্যে মেয়ে চাঙ্গা। ডাক্তার হো তো অ্যায়সা। সমস্তিপুরে শুকদেবদার জুড়ি মেলা ভার। লোকে বলে পাগলা। তা প্রতিভাধররা একটু পাগল হয়ই।

মেয়ে সুস্থ হতে শুকদেবদা বলেছিল, মেয়েটার 'ফিট' রোগ আছে। বেশ কবছর তোদের ভোগাবে।

কত বছর? জানতে চেয়েছিল যমুনা।

তা ধর গিয়ে পনেরো-ষোলো বছর বয়স অবধি। তারপর নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। শ্বশুরবাড়িতে খোঁটা শুনতে হবে না। বলে, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে শুরু করেছিল

শুকদেবদা। মৃগাঙ্কও হাসিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন, যমুনার চিন্তান্বিত মুখ দেখে চুপ করে যান। হাসি শেষ করে শুকদেবদা বলেছিল, আমার থেকে নিয়ে লিখে রাখবি। ওষুধের নামটা।

কেন? তুমিও সমস্তিপুরে আছ, আমিও আছি। মেয়ের এরকম হলেই তোমাকে ডেকে নিয়ে আসব। বলেছিলেন মৃগাঙ্ক।

উত্তর দিতে গিয়ে থম মেরে গিয়েছিল শুকদেবদা। বলে, ইদানীং ওষুধের নামটামগুলো বড্ড ভুলে যাই রে। তুই তো জানিস আমাদের বংশের ধাত। বাবাকে তো শেষ বয়সে দেখেছিস। পুরো ভুলো মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন।

সে বয়েস তোমার হয়নি শুকদেবদা। বলেই, একটা জরুরি ব্যাপার পরখ করতে গিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক, আচ্ছা শুকদেবদা, আমাদের বংশে বা যমুনাদের কারও 'ফিট' রোগ নেই, মেয়েটার কোথা থেকে এল? প্রশ্নটা করার মূল উদ্দেশ্য, মেয়েটা যে তাঁদের নয়, শুকদেবদার ডাক্তারি চোখ ধরে ফেলেনি তো?

উত্তর এসেছিল ঘোলাটে ধরনের। কিছু কিছু বংশগত রোগ দেখা দেয় বেশ কয়েক প্রজন্মের ব্যবধানে। তোরা শুধু ঠাকুর্দার বাবা পর্যন্ত তথ্য দিতে পারবি। তার আগের কিছুই জানিস না। অতএব ভেবে লাভ নেই। একটা জিনিস মনে রাখবি, প্রত্যেক শিশুই হচ্ছে এই পৃথিবীর অতিথি। ঘটনাচক্রে তোরা বাবা-মা। তোদের একমাত্র কর্তব্য শিশুটিকে ঠিকমতো লালনপালন করা। বলে, ওষুধের ব্যাগ হাতে সদরের দিকে হাঁটা দিয়েছিল শুকদেবদা। মৃগাঙ্ক বসেছিলেন 'অতিথি' কথাটা নিয়ে, জেনে-বুঝেই কি কথাটা বলল শুকদেবদা? অবশ্য ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও চলে। শুকদেবদা অন্য জগতের মানুষ। তার কথা বাস্তব জগতে তেমন গ্রাহ্য হয় না।—ভাবনায় ছেদ পড়ে। রান্নাঘর থেকে চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে যমুনা। এক হাতে শাড়িসুদ্ধু ধরা গরম দুধের বাটি, আর এক হাত মুখে। হাসি চাপছে যমুনা। কী হল, হাসছ কেন? জানতে চান মৃগাঙ্ক।

হাসতে হাসতে যমুনা বলেন, তোমাকে না দাদু মনে হচ্ছে। নাতনিকে কোলে নিয়ে বসে আছ।

আয়নাতে নিজের চেহারাটা আরও একবার দেখে নেন মৃগাঙ্ক। সখেদে বলেন, কী করব বল, মেয়েটা যে অনেক পরে এল।

বিছানায় এসে মেয়েকে নিজের কোলে নেন যমুনা। বলেন, বয়স তোমার এমন কিছু হয়নি। ওইসব ছাইপাঁশ গিলে চেহারার এমন হাল। তোমার অবিনাশদাকে দেখ, তোমার থেকে অন্তত বছর পাঁচেকের ছোট মনে হয়। নেশাভাঙ করেন না, , কী সুন্দর রেখেছেন চেহারাখানা।

নিখাদ সত্যির উত্তরে অজুহাত চলে না। চুপ করে থাকেন মৃগাঙ্ক। মেয়েকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে যমুনা বলে যায়, দু-চার দিন যখন না খেয়ে থাকতে পারছ, পুরোপুরি ছেড়েই দাও না বাপু। মেয়ে যখন বড় হবে, সেই বা কী ভাববে...

এই সময় একটা দার্শনিক উত্তর দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলেন না মৃগাঙ্ক দীর্ঘশ্বাস সহযোগে বলেই ফেললেন, আমার জীবনে যখনই একটু সুখ-শান্তি এসেছে, কোনও না কোনও ঘটনায় সব শান্তি চৌপাট হয়েছে। যেমন ধর, পায়ে গুলি লেগে খোঁড়া হওয়া। পর পর বাবা-মা মারা যাওয়া। অবিনাশদার সমস্তিপুর ছেড়ে চলে যাওয়া। শশাঙ্কর ব্যবহারে আমার বাড়ি ছাড়া... আরও কত কী! তাই আমি ঠিক করেছি, নেশা করে নিজেই এতোল-বেতোল থাকব, তাতে যদি আমার চারপাশের পরিবেশটা শান্ত থাকে। —কথাগুলো বলে নিজেরই কেমন সব গুলিয়ে গেল। যমুনা কি বুঝল কিছু? —যমুনার দিকে তাকান মৃগাঙ্ক, ঝিনুক ভর্তি দুধ মেয়ের মুখে ঢালতে ভুলে গিয়ে যমুনা হতবাক হয়ে দেখছে কর্তাকে। মৃগাঙ্কর দার্শনিকতায় হাঁ হয়ে গেছে সে।

এমন সময় বাইরের বারান্দা থেকে কে যেন ডাকে, মৃগাঙ্কদা! মৃগাঙ্কদা আছ নাকি? বন্ধ দরজার দিকে তাকান মৃগাঙ্ক, গলাটা অচেনা ঠেকে। সাড়া দেন না। চট করে দরজা খোলার রীতি এখন এ-বাড়ি থেকে উঠে গেছে। ফের দরজার ওপার থেকে ডাক আসে, ও মৃগাঙ্কদা,

আমি নিত্যানন্দ। দরজা খোল, দরকারি কথা আছে।

নাম শুনে একটু চমকেই ওঠেন মৃগাঙ্ক। নিত্যানন্দ মানে সেই ছেলে, রেলে কাজ করে, বলাইদার পরিচিত। যার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল বৃষ্টির মা আর তার স্বামী। ....দরজাটা খোলা কি ঠিক হবে? – এবার কড়া নাড়া শুরু হল। ঘরে কথাবার্তা চলছে, শুনতে পেয়েছে নিত্যানন্দ। তাই এত শিওর। —মৃগাঙ্ক যমুনার দিকে তাকান, যমুনা ইশারায় দরজা খুলতে বলে। ও তো বলবেই, সব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তো জানে না। কড়া নাড়া থামছেই না, তার মাঝে একটু যেন কাতর সুরে মৃগাঙ্কদা, মৃগাঙ্কদা বলে ডাক।

ব্যাজার মুখে দরজা খুলতে ওঠেন মৃগাঙ্ক, নিত্যানন্দর কী দরকার পড়ল কে জানে! ছিটকিনি নামিয়ে পাল্লা খুলতেই নিত্যানন্দর পাশে আর একজনকে দেখলেন মৃগাঙ্ক। চিনতেও পারলেন। আগে জানলে দরজা খুলতেন না কিছুতেই। পালাতেন খিড়কির দোর দিয়ে। ঢ্যাঙাপানা সেই লোক। বৃষ্টির মায়ের স্বামী। যাকে ফলো করে নিত্যানন্দর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন মৃগাঙ্ক আর বলাইদা।

মৃগাঙ্ক যে পালাতে পারেন, এরকমটা আন্দাজ করেই হয়তো লোকটা গা ঘেঁষে দাড়িয়েছে। পালাতে গেলেই খপ করে ধরবে হাত।

লোকটা হাত জোড় করে নমস্কার করে মৃগাঙ্ককে। বলে, আমার নাম শ্যামলচন্দ্র সান্যাল। নিতুদার বাড়িতে একবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মনে রেখেছেন কি না জানি না।

মৃগাঙ্ক আপদমস্তক দেখেন লোকটিকে। মনে মনে বলেন, বিলক্ষণ মনে আছে। তবে তোমার আগের চেহারায় কেমন একটা ভীরু, পলাক ভাব ছিল। এখন সেটা দেখা যাচ্ছে না।

মৃগাঙ্ককে চুপ থাকতে দেখে নিত্যানন্দ বলে ওঠে, শ্যামল আমার মাসতুতো ভাই। সেই যে তুমি আর বলাইদা গেলে আমার বাড়ি...

হাত তুলে ইশারায় মৃগাঙ্ক বললেন, বুঝেছি। মুখে জানতে চাইলেন, দরকারটা কী?

শ্যামল নামে লোকটা বলল, বলছি। আপনি যদি একটু বাইরে আসেন।

বাইরে যাওয়ার বদলে দুপা পিছিয়ে যান মৃগাঙ্ক। লোকটাকে প্রথম দেখেছিলেন কানাইয়ার ঠেকে, কথায় বাঙাল টান ছিল। এখন সেটাও উধাও। মানুষটার আচরণে বেশ সেয়ানা ভাব। মৃগাঙ্ককে কিছু বলতে হল না, ঘরের ভেতর থেকে যমুনা বলে উঠল, আপনারা ঘরে এসে বসুন। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

যমুনা আগ বাড়িয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলে না। মৃগাঙ্কর বাইরে যাওয়া নিয়ে যমুনাও ভয় পাচ্ছে। এক পা ঘরে ঢুকে আসে নিত্যানন্দ, যমুনাকে বলে, বউদি, আমরা এই সামনেটায় আছি। চিন্তার কিছু নেই।

অযথা কথা বাড়তে দিতে রাজি নন মৃগাঙ্ক, বেরিয়ে আসেন বাইরে।

বারান্দা পেরিয়ে এসে বাড়ির সামনের চাতালে দাঁড়ান তিনজন। কদিন বাদেই দেওয়ালি। হেমন্তর আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। চাঁদ মলিন। শ্যামল বলে, প্রথমে একটা ব্যাপারে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, নানান ঝামেলা দুর্বিপাক সত্ত্বেও আপনি মেয়েটাকে ঝেড়ে ফেলে দেননি। আগলে রেখেছেন।

এই প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার মৃগাঙ্ক নন, মেয়েটাকে গোরক্ষপুরের অনাথ আশ্রমে রেখে এসেছিলেন, যমুনা ফেরত নিয়ে আসে। — এসব কথা বলার সময় এখন নয়, আগে জানতে হবে লোকটা কী প্রয়োজনে এসেছে। শ্যামল ফের বলতে শুরু করেছে, আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি নিতুদার কাছে। আপনি ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন। সরকার থেকে ভাতা পান। আপনার মতো সৎ, খাঁটি লোক সমস্তিপুরে কম আছে।

বড্ড ভণিতা করছে লোকটা। মৃগাঙ্ক ধৈর্য হারান। শ্যামলকে মূল কথায় আনতে প্রসঙ্গ পালটান মৃগাঙ্ক। যত দূর শুনেছিলাম - আপনাকে, আপনার স্ত্রীকে সমস্তিপুরের পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল। ছাড়া পেলেন কী ভাবে?

খুব বড় কোনও কেস দিতে পারেনি। জামিনে ছাড়া পেয়েছি। কেসটাও টিকবে না। বলে, একটু সময় নেয় শ্যামল। তারপর বলে, আপনি আমাদের সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবরই

নিয়েছেন, আমি জানি। নেওয়াটাই স্বাভাবিক। আপনার অবগতির জন্য আর একটা কথাও জানাই, আর পাঁচজন অসহায় শরণার্থীর মতো আমরা এদেশে আসিনি। কলকাতায় আমাদের একজন প্রভাবশালী বড়লোক রিলেটিভ আছেন।

এই তথ্যটাও জানা মৃগাঙ্কর, চুপ করে থাকেন। বাধা দেন না শ্যামলের কথায়। সে বলে যায়, সেই রিলেটিভের জন্যই আজ আমি জামিনে ছাড়া পেয়ে আপনার সামনে। এবার আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।

কী উপকার? জানতে চেয়ে নিত্যানন্দর দিকে তাকান মৃগাঙ্ক, কেন যে নিত্যানন্দ এত চুপ করে আছে কে জানে! সে তো সমস্তিপুরের বাসিন্দা, জানে মৃগাঙ্কর ক্ষমতা। উপকারটা যদি সাধ্যের বাইরে হয়, তার তো কিছু বলা উচিত। নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিত্যানন্দ। শ্যামল ফের বলে, উপকার খুবই সামান্য, আমরা যেসব পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটির মিলিটারিদের এগেনস্টে কেস করেছি কলকাতার হাইকোর্টে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে দু-একবার সাক্ষী দিতে যেতে হবে সেখানে। থাকা-খাওয়ার খরচ সব আমাদের।

প্রথমটায় মৃগাঙ্কর মনে হল কথাগুলো ঠিক শুনলেন কি? শ্যামলের দিকে তাকাতে নিশ্চিত হলেন, ঠিকই শুনেছেন। শ্যামলের কণ্ঠস্বরে অনুনয় থাকলেও, চোখ দুটো ধারালো অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ। অর্থাৎ নিয়ে সে যাবেই।

বেশ কয়েকটা ঢোঁক গিলে মৃগাঙ্ক বলেন, কী দরকার ওসব ঝামেলায় যাওয়ার। আপনারা এখন মুক্ত। মেয়েটারও আর কোনও বিপদ নেই। আমিই মানুষ করব মেয়ের মতো। যা হয়ে গেছে, ভুলে যাওয়া যায় না।

শ্যামল প্রায় গর্জন করে ওঠে, না, যায় না। সমস্ত বৈধ কাগজপত্তর, ইমিগ্রেশন নিয়ে আমরা এদেশ আসছিলাম। পথে একটা গোলযোগে আমার স্ত্রী আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন সে প্রকৃত অর্থেই নিঃস্ব। সম্বল বলতে শুধুই সতীত্ব। একদল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে মিশে আমার স্ত্রী বর্ডার পার হতে গিয়েছিল, তখনই তার শেষ সম্বলটুকু লুটেপুটে খায় ঘৃণ্য কিছু সীমান্তরক্ষী। শ্মশানে ফেলে যাওয়া মালার মতো সে ফেরত আসে আমার কাছে। আমার স্ত্রীর জায়গায় যদি আপনার স্ত্রী হত ওই ঘটনার শিকার, আপনি পারতেন চুপচাপ বসে থাকতে?

মাথা ভোঁ ভোঁ করছে মৃগাঙ্কর, মনশ্চক্ষে একবার দেখেও নিলেন উশকোখুশকো চুল, আঁচল লোটাচ্ছে, ভয়ে, আতঙ্কে যমুনা প্রাণপণে দৌড়চ্ছে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে...

শ্যামলের কথা এখনও শেষ হয়নি। বলে চলেছে, আপনি আমার থেকে অনেক উদার। মেয়েটার জন্মসূত্র জেনে আমি ঘেন্নায় ফেলে দিয়েছি, আপনি সব কিছু জানা সত্ত্বেও তাকে মানুষ করবেন ঠিক করেছেন। আমার হয়ে আর একটু উপকার যদি করেন...

মাথাটা সামান্য ধাতস্থ হয়েছে মৃগাঙ্কর। বলেন, মেয়ে মানুষ হচ্ছে আমার স্ত্রীর আগ্রহে। ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

এতক্ষণে নিত্যানন্দ সরব হয়। উৎসাহের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, সেই ভাল। তুমি বউদির সঙ্গে আলোচনা করে নাও। আমরা আবার কাল আসব। —একটু থেমে নিতু ফের বলে, কথাটা তোমার আর বউদির মধ্যে রেখো। বাইরের কাউকে কিছু বলতে যেয়ো না।

ফিরে যাওয়ার আগে শ্যামল ওর হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরল মৃগাঙ্কর হাত। স্পর্শটা বড় আকুতিমাখা।

মৃগাঙ্কও ফিরলেন ঘরের দিকে। দরজার কাছে এসে দেখেন দাঁড়িয়ে আছে যমুনা। পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি বিছানায় ঘুমে কাতর। যমুনা যখন এখানে দাঁড়িয়ে, শুনেছে অনেক কথাই। তবু নিশ্চিত হতে মৃগাঙ্ক বলেন, শুনলে ওদের কথা?

শুনলাম।

কী করি বল তো? যাব?

যাবে। বলেন যমুনা।

মৃগাঙ্কর ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। ভেবেছিলেন স্ত্রীকে রাজি করাতে বেশ বেগ

পেতে হবে। আবার জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঠিকঠাক শুনেছ তো? ওরা বলছে বৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যেতে। সাক্ষী দিতে হবে হাইকোর্টে।

হ্যাঁ, সবটাই শুনেছি। তুমি যাবে। একটা নিরীহ, অসহায় বউকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে কিছু মানুষ, তোমরা পুরুষরা চুপচাপ বসে থাকবে! ঠিক কথাই তো বলেছেন উনি। ওই সব নোংরা লোকের... যমুনার কোনও কথাই আর কানে ঢুকছে না মৃগাঙ্কর, বদলে শুনতে পাচ্ছেন সেই শ্লোক, অবিনাশদার বাবা ব্রজজেঠু হামেশাই বলতেন,

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ।

নামৃতস্য হি পাপীয়ান ভার্যামালভ্য জীবতি ॥

কীচকের কাছে লাঞ্ছিত দ্রৌপদী ভীমকে বলছে, ওঠো, ওঠো ভীম, জীবিত ব্যক্তির ভার্যাকে লাঞ্ছিত করে কোনও পাপিষ্ঠ কি বেঁচে থাকতে পারে?

॥ তেইশ ॥

কিছু আনন্দানুভূতি এমন স্বার্থপর হয়, দরকারি কর্তব্য ভুলিয়ে ছাড়ে। অবিনাশের হয়েছে আজ তেমনই। অফিসে ঢোকার পর থেকে এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হলেন, ভুলে গেলেন ইলা অফিস ফেরত কী একটা, নাকি একাধিক জিনিস আনতে বলেছিল? কিছুতেই মনে পড়ছে না। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগের এক ঘণ্টা হুবহু মনে করতে পারছেন, শুধু কথাটাই গেলেন ভুলে। —বলেছিল নিশ্চিত। প্রথমে অফিস ব্যাগটা হাতে দিল, সেটা বগলে চাপলেন অবিনাশ। তারপর হাতে পানের খিলি দিল, মুখে পুরেছিলেন, তখনই জিনিসটা আনতে বলে ইলা। কী জিনিস? ওর আনতে বলার মধ্যে কি আবদারের ঢঙ ছিল? সেটুকুও মনে পড়ছে না।—পরে আর সবই মনে আছে, পানটায় আজ চুন বেশি ছিল বলে পানবোঁটার চুনটা জিভে দেননি। বাড়ির পাশের গেট দিয়ে বেরিয়ে বোঁটাসুদ্ধ চুন নর্দমায় ফেলেন। উলটোদিকের নতুন বাড়ির বউটি তখন বেরিয়ে এসেছিল। চোখাচোখি হতে সৌজন্যের হাসি হেসেছিল বউটা। বউটা খুবই অকপট, ইলার থেকে অ্যাডভান্সড। ওর কর্তাটিও অত্যন্ত ভদ্র, মিশুকে মানুষ। অবিনাশ ভাগ্যবান, সব থেকে নিকট প্রতিবেশী ভালই হয়েছে। অবিনাশের বাড়ি করার আগে থেকে পাশের জমিটা ভিত হয়ে পড়েছিল, আশঙ্কায় ছিলেন, কী জানি কেমন হবে পাশের বাড়ির লোক। দুশ্চিন্তা মিটেছে। সেনবাবু জমিটা ভিতসুদ্ধু কিনেছেন। বাড়িটাও করে ফেললেন খুব তাড়াতাড়ি। ভদ্রলোক ফুড কর্পোরেশনের আপার ডিভিশন ক্লার্ক। পদমর্যাদা, আর্থিক সংগতিতে অবিনাশের কাছাকাছি। অসম সংগতির প্রতিবেশী সহজে আপন হয় না। ওই দম্পতির একটা ব্যাপারই বড় আশ্চর্য করেছে অবিনাশকে, ওঁদের মেয়েটি বেশ কালো এবং বাবামায়ের মুখাবয়বের সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য নেই। স্বতন্ত্রভাবে অবশ্য মেয়েটি খুবই মিষ্টি দেখতে। বয়স বরুণের সমান। কেন জানি অবিনাশের মনে হয় মেয়েটিকে ওঁরা দত্তক নিয়েছেন। ধারণাটা হয়তো ভুল, কারণ মৃগাঙ্কর বউয়ের কোলে ওদের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে দেখলে মনে হবে ওদেরই মেয়ে। প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত খেলা, অত্যন্ত রহস্যজনক।... ভাবনা অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে। অবিনাশ ফিরে আসেন আগের চিন্তায়, কী আনতে বলেছিল ইলা? স্টেশনে আসার রাস্তায় মনে ছিল, ট্রেনে উঠেও মনে ছিল, গোলমাল পাকাল অফিসে ঢুকে। নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখেন টেবিলের ওপর বিশাল ফুলের তোড়া। প্রথমে মনে হয়েছিল কার জিনিস, কে রাখল ওখানে? সামনে গিয়ে দেখেন, ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র রাখা আছে। তুলে নিয়েছিলেন, মানপত্রটা তাঁকেই দেওয়া হয়েছে অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে। হেতু, অফিস নাটকের সফল প্রযোজনা। — অবিনাশের জীবনে এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। অন্য সব স্টাফেরা তখন মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, কেউবা সদ্য ঢুকেছে অফিসে, ভুলেও তাকাচ্ছে না অবিনাশের টেবিলের দিকে। অথচ গোটা ব্যাপারটার ব্যবস্থাপনা করেছে ওরাই।—যথেষ্ট কাঁচা অভিনয় করছিল কলিগরা। চেয়ারে বসে নিজের মনেই হেসে ফেলেন অবিনাশ। কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন মেশানো মুখ নিয়ে স্টাফেরা এক এক করে এসে ঘিরে ধরে তাঁকে।

আসল বিষয় হচ্ছে, অফিসের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল শনিবার। যেখানে অভিনীত হয়েছে অবিনাশের লেখা এবং নির্দেশিত নাটকটি। ছোট এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। আর সব কুশীলব অফিস কলিগরা। দুটি নারী চরিত্র ছিল, দুজন প্রফেশনাল অ্যাকট্রেসকে ভাড়া করতে হয়েছে।

শনিবার নাটক শেষে পর্দা পড়ার সময় প্রবল হাততালি শুনেই অবিনাশ বুঝেছিলেন, সার্থক হয়েছে প্রয়াস। তখনই জনে জনে এসে পিঠ চাপড়ে গেছে তাঁর। বাড়ি ফেরার তাড়ায় অফিস স্টাফেরা নিজেদের উচ্ছ্বাস জানাতে পারেনি, তারই বহিঃপ্রকাশ আজ এই ফুলের তোড়া, মানপত্র। এসবের মধ্যে লুকিয়ে আছে আর একটি উপরি পাওনা, যা অজানা কলিগদের কাছে। এই প্রথম যেন বিহারে বড় হওয়া অবিনাশকে পশ্চিমবঙ্গ আপন করে

নিল।

সহকর্মীরা বলছিল তাদের পরিবারের মানুষজন নাটক দেখে কী কী বলেছে, কতটা প্রশংসা করেছে। রায়দা তো আদিরসাত্মক মজাই করে বসলেন, বুঝলে চ্যাটার্জি অনেকদিন পর পেলাম।

কী পেলেন রায়দা? জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ।

অনেকদিন বাদ হল। ভেবেছিলাম আর বোধহয় হবেই না।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না দাদা।

আরে বাবা, আমার অভিনয় দেখে তোমার বউদির বহু দিনের পোষা অভিমান ভেঙে পড়ল বিছানায়। রায়দার কথায় মাথা নিচু করে নিয়েছিলেন অবিনাশ। অশ্লীল আলাপচারিতায় তিনি কোনওদিনই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। তিনি শ্লাঘা বোধ করছিলেন এই ভেবে, বৈচিত্র্যহীন প্রাত্যহিকতায় ক্লান্ত এবং ক্রমশ ছোট হয়ে আসা অসহিষ্ণু মনের সহকর্মীরা আজ তাঁরই জন্য অনাবিল আনন্দে উদ্বেল হয়েছে।

মন বড় হয়েছে তাঁর নিজেরও, ইলা এমন একটা কাজ করেছে, ঘোর অপছন্দ অবিনাশের। তবু বকাঝকা এখনও কিছু করেননি। পরে এক সময় ঠান্ডা মাথায় ইলাকে বোঝাবেন, শীলার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ঠিক করনি তুমি। স্নেহের বশে ওর অস্বাভাবিক বিয়েকে এভাবে মেনে নেওয়া উচিত হবে না। নিজের তো ক্ষতি করেইছে শীলা। ক্ষতিগ্রস্ত করল আগামী প্রজন্মকে। ওরকম অগভীর সংযমহীন মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই ভাল।

ইলা যে লুকিয়ে বোনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করবে, এরকম একটা আশঙ্কা বরাবরই ছিল অবিনাশের। ইলার চরিত্রে 'মা' ভাবটা প্রবল, কাউকে আশ্রয় দিতে পারলে সে যেন বর্তে যায়। সেখানে নিজের বোনকে কী করে অগ্রাহ্য করবে!

নাটকের দু-তিন দিন আগে ইলা এক্সট্রা দুটো কার্ড চেয়ে বলেছিল, পাড়ায় দুজন দেখতে যাবে। তখন সন্দেহ হয়নি অবিনাশের। এনে দিয়েছিলেন কার্ড। নাটক শেষ হওয়ার পর অনেকেই প্রশংসা করতে এসেছিল। তার মধ্যে একজন ছিল শীলার বর বিপুল। পরিচয় না দিয়ে খুব হ্যান্ডশেক করে গেল। বিপুলের ধারণা অবিনাশ তাকে চেনেন না। অবিনাশের বিয়ের সময় একবারই মিনিটের হিসেবে দেখা হয়েছিল, অত কী মনে আছে আর! কিন্তু আছে। কারণ শীলা বিপুলকে বিয়ে করেছে জেনে অবিনাশ আড়ালে থেকে বিপুলের চাকরি, গতিবিধি সব খুঁটিয়ে দেখে রেখেছিলেন। একথা ইলাও জানে না। জানলে, ভুলেও ওদের কার্ড দিত না। অবিনাশের দৃষ্টিশক্তির পরিচয় ইলার আছে। বিপুল যখন হ্যান্ডশেক করছিল, পলক তুলে অবিনাশ দেখেছিলেন, বেশ খানিকটা দূরে, দাঁড়িয়ে আছে শীলা। দৃষ্টিতে অবিনাশদাকে ছুঁয়ে আসার আকুতি। মুহূর্তে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন অবিনাশ। অভিনন্দনের বন্যা ধুয়ে দিয়ে গেল শীলার প্রসঙ্গ। সমস্তিপুর-মজফফরপুরের সমাজজীবনে এমন জমকালোভাবেই বিরাজ করতেন অবিনাশ। অনেকদিন পর ফিরে পেলেন সেই স্বাদ। আত্মতুষ্টির চোটে ভুলেই গেলেন ইলা কী আনতে বলেছিল আজ।

মানপত্র, ফুলের তোড়া রাখা আছে টেবিলের এক পাশে। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে অভিনন্দনপত্রে লেখা অক্ষরগুলোর ওপর। মানপত্রে সর্বদাই যা হয়ে থাকে, সব কিছুই বাড়াবাড়ি করে লেখা। তবু যেন কথাগুলো ছোঁয় হৃদয়ের গভীর প্রত্যন্ত।

অবিনাশের লেখা ও পরিচালনা করা নাটকটির নাম 'বাগানবাড়ি'। মানপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লেখা, এই 'বাগানবাড়ির মালি ও মালাকার শ্রীঅবিনাশ চট্টোপাধ্যায় আজকের নাটকের জগতে রক্তেরাঙা প্রত্যুষের উদীয়মান সবিতা। তাঁকে 'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং' উচ্চারণে প্রণতি জানাতে ইচ্ছা হয়।—এরকম ভাল বাংলায় অভিবাদনে ভরা গোটা মানপত্র। সব শেষে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা অনুবাদ করা, 'তাহার চেতনা বাঙ্ময় হোক তাহারি অন্তঃপুরে/ তাহারি রূপ হোক অমৃত ভালবাসা।

এই আতিশয্যে বড় কুণ্ঠা জাগে। নিভৃতে ঝঙ্কার তোলে শিরায় শিরায়। মনে পড়ে বাবার কথা, ভাগলপুর থেকে কলকাতায় এসে পশার জমাতে চেয়েছিলেন বাবা। উদ্দেশ্য একটাই,

বাঙালির ছেলে হয়ে বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে থাকব। উঠেছিলেন জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে।
জ্যাঠামশাই বেশিদিন থাকতে দিলেন না। উনি তখন কলকাতার অল্পবিস্তর নামী উকিল। তার থেকেও বেশি প্রভাব সাংস্কৃতিক মহলে। বড় বড় গাইয়ে, বাজিয়ে, লেখক, চিত্রপরিচালক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে আসেন। বাবার নম্র বিনয়ী স্বভাব এবং সকল বিষয়ে অল্প হলেও সঠিক জ্ঞান বিখ্যাত মানুষদের নজর কাড়ল। ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখলেন না জ্যাঠা। এ ছাড়া পেশাগত প্রতিযোগিতা তো ছিলই। বাবাকে আলাদা বাসা নিতে বলেন জ্যাঠা। অপমানিত বাবা অভিমানে পশ্চিমবঙ্গই ছেড়ে দিলেন। ভাগলপুরেও ফিরলেন না। সমস্তিপুরে নিজের মতো শুরু করলেন জীবন। তখনও বিবাহ করেননি বাবা। ভাগলপুরের বাড়িতে ঠাকুর্দা বেঁচে। উনিই বাবার জন্য পাত্রী পছন্দ করেন। বাবা বিয়ে করতে আসেন ভাগলপুরে। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে চলে যান সমস্তিপুর। তারপর থেকে পারিবারিক অনুষ্ঠান অথবা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ভাগলপুর যেতেন না। কলকাতা তো নয়ই। সমস্তিপুরেই জন্ম হয় অবিনাশের সব ভাইবোনের। তিন ভাইয়ের পর প্রথম মা মারা যেতে, আসেন দ্বিতীয় মা।
জ্যাঠামশাইয়ের নিরীহ গতানুগতিক ঈর্ষা অবিনাশদের বাঙালি হওয়া থেকে পিছিয়ে দিল অনেকটা। কলকাতায় এসে প্রথম প্রথম নিজেকে বড় বেমানান লাগত অবিনাশের ঠিক যেন তাল মেলাতে পারতেন না এখানকার আদবকায়দা, শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে। নাটক, সাহিত্য সব কিছুই এগিয়ে আছে। তবে সেটা প্রয়োগকৌশলে। সত্য কখনও বদলায় না। তা শাশ্বত। অবিনাশ নিজেকে মাজাঘষা করে কৌশলী হয়ে উঠেছেন। তারই পুরস্কার এই মানপত্র, ফুলের তোড়া। —এত আনন্দের সময় কেন যে মনে পড়ছে না ইলার কথাটা। মনটা বড় খুঁতখুঁত করছে।
আজ বাড়ি গিয়ে অফিসের সব কথা যখন বলবেন ইলাকে, খুশি হবে ভীষণই। এক ফাঁকে যখন জানতে চাইবে, আমার অমুক জিনিসটা এনেছ? —খুবই অস্বস্তিতে পড়ে যাবেন অবিনাশ। কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে নিজেকে নিয়ে একটা অহঙ্কার আছে তাঁর।
একনাগাড়ে ভেবে গেলে মনে পড়ার চান্স কম। অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করেন অবিনাশ। অফিসহলের মাঝখানে তাঁর টেবিল, দূরে তিনটে জানলার একটা দিয়ে শিমুলগাছের আড়ালে আকাশ দেখা যায়। বাকি দুটো জানলার অপর দিকে অন্য অফিসবাড়ি। আজ আকাশের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। পাতা কমছে শিমুলগাছের। শীত আসছে।
চ্যাটার্জিদা, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান আজ। রোজকার মতো ভিড় ট্রেনে ফিরলে আপনার ফুল, সম্মানপত্র ঠিকঠাক পৌঁছবে না বাড়িতে। কথাটা বলল পলাশ নন্দী। অবিনাশের উলটোদিকে বসে। কৃতজ্ঞতার মিশেল দেওয়া হাসি হাসেন অবিনাশ। পলাশ আবার বলে, ম্যানেজারবাবু আপনার ওপর খুব খুশ এখন। তাড়াতাড়ি গেলে কিছু বলবে না। আজ ফার্স্ট আওয়ারে একবার চেম্বারে যেতে হয়েছিল, তখন বলছিলেন, এবারে আমাদের নাটকটা যা হয়েছে না, ইজিলি যে-কোনও কম্পিটিশনে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।
এবারও মন্তব্যহীন সৌজন্যের হাসি হাসেন অবিনাশ। পলাশ নন্দীর পিছনের সিটটা অমিতাভর, এক মনে কাজ করছে সে। মানপত্রর কথাগুলো তারই, হাতের লেখাটাও। ছেলেটার এত গুণ জানা ছিল না। এমনিতে বড়লোকের ছেলে, চাকরিটা শখে করে। অফিসের এই নাটকে অভিনয় করতে এসেছিল, রিহার্সালের দ্বিতীয় দিনে বাদ দিয়ে দেন অবিনাশ। সেটা যত না খারাপ অভিনয়ের জন্য, তার থেকে বেশি বড়লোকের ছেলে এই অপরাধে। –এখন খারাপ লাগছে। ঘণ্টাখানেক আগে অমিতাভ এসেছিল টেবিলের সামনে। সসংকোচে বলে, চ্যাটার্জিদা, মানপত্রের লেখা, হাতের লেখা সব আমার করা। ভাল হয়েছে?
খুব ভাল হয়েছে। তবে আমার বোধহয় এতটা প্রশংসা প্রাপ্য নয়। বলেছিলেন অবিনাশ।
উত্তরে অমিতাভ আরও বিনয়ী হয়। বলে, এ কী বলছেন আপনি! এসব প্রশংসার যোগ্য আপনি। জানেন না কী নাটক নামিয়েছেন। মুখে মুখে ফিরছে নাটকের কথা। আর নিজের ওই ছোট্ট রোলটুকু আপনি দুর্দান্ত করেছেন। আমার মা-বোনেরা এসেছিল, বাড়ি ফিরে গিয়ে

আপনার রোলটার কথা বলছে বারবার। ফাংশানের দিন আপনি যখন নাটক শেষে মেকআপ মুছে বাইরে এলেন, মা-বোনেরা আপনাকে দেখে বিশ্বাস করতে পারেনি, বুড়োর রোলটা আপনিই করছেন! আপনি একটা ট্যালেন্ট চ্যাটার্জিদা। প্রতিভা। আমাদেরই দোষ আমরা প্রথমে.....

থাক থাক, হয়েছে। তুমি সব কিছু বাড়িয়ে দেখছ অমিতাভ। অফিস থিয়েটার নিয়ে এত বেশি করে ভাবার কিছু নেই। বলে, অমিতাভর উচ্ছ্বাসের মুখে বাঁধ দিয়েছিলেন অবিনাশ। মনে মনে বলেছেন, এ আর এমনকী দেখলে, এখনও আমার থেকে অনেক কিছু দেখার বাকি। আগে সমস্তিপুরের লোকেরা দেখেছে এবার দেখবে তোমরা।

আরও কী সব বলে, সামনে থেকে চলে গিয়েছিল অমিতাভ। অবিনাশ ডুবে গিয়েছিলেন নাটকের স্মৃতিতে। নিজের রোলটা অত্যন্ত যত্ন করে লিখেছিলেন অবিনাশ। ছোট অথচ ভীষণ অভিঘাত আনে মনে। চরিত্রটা হচ্ছে নায়িকার বাবার, জমিদার বংশের শেষ এবং নিঃস্ব পুরুষ ওই চরিত্রটি। সম্বল বলতে, চাকুরিরতা মেয়ে আর জমিদারবাড়ির এক কোনার দুটি ঘর। বাকিটা নিজেই বিক্রি করেছেন। সারা দিন দেশি মদ খেয়ে জমিদার বংশের পুরুষ ঘুরে বেড়ান। মেয়ে সামনে এলেই খুব কাশেন, মেয়ের কাছ থেকে টাকা চান ওষুধ কিনবেন বলে। সেই টাকায় মদ খান। —এরকম একটা ঘিনঘিনে জীবনযাপন করতে করতে, মেয়ে একটি সহৃদয় ছেলের প্রেমে পড়ে। পাছে মেয়েটি বিয়ে করে বাবাকে ফেলে চলে যায়, সেই ভয়ে বাবা মেয়ের প্রেমিকটির কাছে গিয়ে নিজের মেয়ের চরিত্র নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা বলে আসে। লাভ হয় না কিছুই। মেয়েটি তার প্রেমিককে এই সম্ভাবনার কথা আগেই বলে রেখেছিল। সে তার পিতাকে হাড়েহাড়ে চেনে। মিথ্যে কাশি, মদ খাওয়া সবই জানে। মেয়ের প্রেমিক ভীষণভাবে অপমানিত করে জমিদার বংশের শেষ পুরুষটিকে। মানুষটির আর কোথাও ফেরার জায়গা থাকে না, একমাত্র মদের দোকান ছাড়া। সেখানে বসে সে তার মাতাল বন্ধুকে 'কেশে কেশে' শোনায়, জানতে চায় অভিনয়ের মধ্যে ফাঁকটা কোথায়? মেয়ে কী করে ধরে ফেলল সব!

এই রোলে ক্ল্যাপ তো পড়বেই। করতালিতে মুখর হচ্ছিল গোটা হল। অবিনাশ জানতেন এমনটা হবে। খুব ভেবেচিন্তে চরিত্রটা সৃষ্টি করেছিলেন নিজের জন্য। যে মুগ্ধতা তিনি আদায় করেছেন অতগুলো মানুষের থেকে, সেটা তো এক ধরনের বশ্যতা। অবিনাশের স্থির বিশ্বাস বশ মানানোর এই গুণ তিনি পেয়েছেন পূর্বপুরুষদের থেকে। সেই পূর্বপুরুষ কারা, কত পিছনের? আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, খ্রিস্ট পূর্ব আনুমানিক তিন হাজারের কাছাকাছি, মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোনও অংশে, অথবা রুশ দেশের উরাল পর্বতমালার দক্ষিণের সমতলে আদি আর্য জাতির উৎপত্তি হয়। তারাই প্রথমে ঘোড়াকে পোষ মানাতে শেখে। তাদের মধ্যে যারা ভারতে এসে পৌঁছেছিল, অবিনাশের ধারণা, তাদের মধ্যে কেউ একজন অবিনাশদের বংশের প্রথম পুরুষ। বৈদিক যুগে এসে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাদের বংশে বর্ণভেদ প্রথা মানা হয়েছে। তাই অবিনাশদের বংশের রক্ত অনেকটাই বিশুদ্ধ। সেই কারণেই অজ্ঞাত সন্ন্যাসী ঠাকুর্দাকে শুনিয়েছিলেন ভবিষ্যদ্বাণী, এই বংশে জন্মাবে কোনও অবতার। অবিনাশের পিতাকে এক পিরবাবা একই কথা বলেন। পিরের বৃত্তান্ত বাবার কাছেই শুনেছেন অবিনাশ। গাজিপিরের সঙ্গে বাবার দেখা হয় বড়দারও জন্মের আগে। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর থেকে পদব্রজে পিরসাহেব আজমির রওনা দিয়েছিলেন। সমস্তিপুরের এক মসজিদে কিছুদিন বিশ্রাম নেন।

অধ্যাত্মবাদে আসক্ত অবিনাশের পিতা ব্রজসুন্দরের ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে-কোনও পরিমণ্ডলে নির্দ্বিধায় পৌঁছে যেতেন! কোনও মুসলমান মক্কেলের কাছে পিরসাহেবের কথা শুনে কোর্ট থেকে সোজা চলে যান মসজিদে। তখন ঘোর বিকেল। মসজিদের গায়ে হলুদ আলো। ভেতরটা ভীষণ নির্জন। চাতালে বসে থাকা ধর্মপ্রাণ মানুষের ছোট জটলা। কালো কোট-প্যান্ট পরা ব্রজসুন্দরকে দেখে সবাই বিস্ময়, সমীহ সহকারে উঠে দাঁড়াল। ব্রজসুন্দরের হল মুশকিল, চিনতে পারছেন না পিরসাহেবটি কোন জন। সবার পরনে

চেক লুঙ্গি, মাথায় টুপি। সন্ন্যাসীদের তবু ধরাচুড়ো দেখে চেনা যায়, এঁদের সে উপায় নেই। পিরবাবা মিশে গেছেন সকলের মধ্যে।

ওঁর নাম বলতে, সব থেকে অনুজ্জ্বল মানুষটি এসে দাঁড়ালেন সামনে। দৈহিক উচ্চতা তেমন কিছু নয়। চেহারাটিও বেশ দুবলা-পাতলা। বিশ্বাস হয় না ফরিদপুর থেকে হেঁটে এতদূর এসেছেন। ওরকম চেহারার কারণেই কিনা কে জানে ব্রজসুন্দরের পিরবাবাকে বড় আপনার জন মনে হল। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে অলঙ্ঘনীয় দুরত্ব থেকে যায়, এঁর ক্ষেত্রে রইল না।

কোট-প্যান্ট পরিহিত ব্রজসুন্দর গাজি পিরকে নিয়ে বসে পড়লেন মসজিদের চাতালে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল অধ্যাত্ম আলোচনা। হিন্দু শাস্ত্রে মোটামুটি দখল থাকা ব্রজসুন্দর লক্ষ করলেন সুফি সাধনার সঙ্গে তাঁদের বিরাট কোনও ফারাক নেই। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। হিন্দুশাস্ত্রে বিভিন্ন ধারার মতো সুফি সাধনার দুই ধারা। ফানা ও বাকা। ফানা হচ্ছে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হতে মাঝরাতে বিশেষ নামাজ পড়া। বাকা, উপাস্যের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ভাব বিনিময়। দ্বৈত লীলা। হিন্দুধর্মে অনেক মহাপুরুষের বেলায় এই ঘটনা একটু এদিক-ওদিক করে ঘটেছে। গাজি পির শুধু নিজের ধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে অনেক উদার প্রতিপন্ন করতে চাইছিলেন। হয়তো সেই কারণেই পিরসাহেবকে পরের দিন দুপুরে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন ব্রজসুন্দর। তাঁর ছোঁওয়াছুঁয়ির সংস্কার নেই এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

গাজি পির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। ব্রজসুন্দর একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে যান তাঁকে। তখন সমস্তিপুরের বিশাল বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা। বাবা, পিসি আর অবিনাশের মা বাড়ির বাসিন্দা। বাবার খেপামির সঙ্গে মা পরিচিত। লুঙ্গি, টুপি, দাড়ি শোভিত পিরসাহেবকে দেখে ততটা থমকালেন না। বাবাকে আড়ালে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কী খাবেন না খাবেন জেনেছ?

বাবা মারফত প্রশ্নটা পিরসাহেবের কাছে পৌঁছতে উনি বললেন, মায়ের হাতে যা রান্না হয়েছে আমায় দিন। কতদিন বাঙালি খানা খাইনি। সেই কবে ছেড়েছি ফরিদপুর। আর হয়তো ফেরাও হবে না।

ভাত, ডাল, শুক্তো, মাছ-টাছ খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন পির সাহেব। হাতমুখ ধুয়ে বারান্দাতেই চাদর পেতে শুয়ে পড়লেন। ব্রজসুন্দর খুবই হতাশ। ঐশী নিদর্শনের উদ্দেশে পিরসাহেবের সঙ্গ করছেন, গাজি পিরের মধ্যে সেরকম কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ক্লান্ত পথিকের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন পিরসাহেব। মাথার কাছে বসে রইলেন ব্রজসুন্দর।

আধঘণ্টাও হয়নি, শুয়ে থাকা পিরসাহেবের শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখ বোজা অবস্থাতে ছটফট করছেন। অবস্থাগতিক দেখে ব্রজসুন্দর ঘাবড়ে গেছেন। হঠাৎই উঠে বসলেন গাজি পির। চোখে ভয়, বিহ্বলতার ঘোর। ব্রজসুন্দর প্রবল উৎকণ্ঠায় জানতে চাইলেন, কী হয়েছে আপনার? এরকম করছেন কেন?

গাজি পির শুকনো গলায় বললেন, এক ভয়ানক খোয়াব দেখলাম। জীবনে এরকম আশ্চর্য খোয়াব আমি কখনও দেখিনি।

কী স্বপ্ন পিরসাহেব? জানতে চাইলেন বাবা। গাজি পির বললেন, দেখলাম আকাশপথে ভাসছি। নীচে পৃথিবী। সারা পৃথিবী চকচক করছে। এক গোরস্তানে নেমে এলাম। চারপাশে অনেক কবর। একটা কবর চাঁদ-রঙে রাঙানো। জ্বলজ্বল করছে, অথচ কী মোলায়েম! তাকাতে কষ্ট হচ্ছে না। কবরটা দেখেই বোঝা যায়, ওটাতে হাত দেওয়া মানা। খোয়াবের মানুষ আমি। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ছুঁয়ে ফেললাম কবরটাকে। তারপর কী মারাত্মক ঝাঁকুনি আর অসম্ভব আলো। আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম।

এই স্বপ্নের মানে কী পিরসাহেব? অধীর আগ্রহে জানতে চেয়েছিলেন বাবা। গাজি পির অস্থির কণ্ঠস্বরে বলেন, এর মানে ঠিক কী, আমিও জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি তোমার এই ভিটে এক পবিত্র স্থান। এখানে শয়ন করে রোমাঞ্চকর অলৌকিক অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হলাম। আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম সেই জ্যোতির্ময় অনাদি অনন্ত স্থান ও কালের প্রান্তসীমায়। ওই পথ ধরেই নেমে আসেন ফেরেস্তারা।

হাঁ করে গাজি পিরের কথা শুনে যাচ্ছিলেন বাবা। পিরসাহেবের দিব্য দর্শনে তাঁর কী সুবিধে হল, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে দেন পিরসাহেব। বলেন, বাবা, তোমার বংশে কোনও অলৌকিক শক্তিধর পুরুষের জন্মধারণ নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তুমি প্রস্তুত হও।

পিরসাহেবের থরথরানি তখন ব্রজসুন্দরের শরীরে। উনি বলছেন, এই একই কথা এক সন্ন্যাসী আমার বাবাকে বলেছিলেন....সেই শক্তিধর পুরুষ কবে আসবেন, কী করে চিনব আমরা?

ব্রজসুন্দরের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভিটেতে চুম্বন করে পিরসাহেব বলেন, 'নফস' মানে শুক্র, যা রোখা কঠিন। সংযম শিক্ষার জন্য জন্ম হয়েছে নবির। তোমাকে দুটো দোয়া বলে যাই। পারলে লিখে রাখ।

লিখে রেখেছিলেন বাবা। সহবাসের দোয়া 'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জানিনাশ শাইত্বনা ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বানা মা রাফতানা।'

বীর্যপাত হওয়ার সময়কার দোয়া : (জিভ না নেড়ে মনে মনে পড়তে হবে) 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু লা-তাজ আল লিশ শাইত্বানি ফীমা রাযাকতানা নাসীবা।'

হেমন্তকাল। সন্ধে নামার একটু আগেই গাজি পির হেঁটে যান মসজিদের উদ্দেশে। সেদিন চাঁদ ওঠার পর সমস্তিপুরের অলিগলি রাস্তা যেন পিরসাহেবের স্বপ্নের মতো চকচকে হয়ে উঠেছিল। বাবার বর্ণনা এতটাই প্রাঞ্জল ছিল, অবিনাশ আজও সেই জ্যোৎস্নালোকিত সমস্তিপুরকে দেখতে পান। সন্তানকামনায় দোয়া দুটির ব্যবহার বাবা করেছিলেন কিনা জানা নেই অবিনাশের। বাবার হাতের লেখায় গাজি পিরের দোয়া দুটি এখন অবিনাশের সংগ্রহে। তিনিও ব্যবহার করেননি। বলা ভাল মনে পড়েনি। কেন পড়েনি? প্রার্থনা দুটি নিজের ধর্মের নয় বলে? তবু সেই অবতার পুরুষের প্রতীক্ষা আজও করেন অবিনাশ। সন্ন্যাসী ঠাকুর্দাকে বলেছিলেন, অবতারের আবির্ভাব লগ্ন যত এগিয়ে আসবে, নানান অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখা দেবে বংশের পুরুষদের মধ্যে। নাটকের দিন সেরকমই কিছু ঘটেছিল সম্ভবত। —এই বিশ্বাসটি এত গোপন, অবিনাশ নিজেও নিজেকে কথাটি সব সময় স্মরণ করান না। চ্যাটার্জিদা, আপনাকে কেউ খুঁজছেন মনে হচ্ছে।

সামনের সিটে বসা পলাশ বলল কথাটা। অবিনাশ মুখ তোলেন। পলাশ চোখের ইশারায় কাচের পার্টিশনের ওপারে কাস্টমারদের দেখায়। অত মানুষের মধ্যে চেনা কোনও মানুষকে দেখতে পান না অবিনাশ। পলাশকে জিজ্ঞেস করেন, কে! কে খুঁজছে! পলাশ বলে, আমি ঠিক লক্ষ করিনি। চার নম্বর কাউন্টারে কেউ একজন এসে আপনার নাম করল। রক্ষিত ওখান থেকে আমায় বলল, চ্যাটার্জিদার ভিজিটার আছে। ভেতরে পাঠাব না বাইরে বসবে।

সামান্য বিরক্ত হন অবিনাশ, ভিজিটারের নামটা জিজ্ঞেস করতে কী হয়েছিল! আজকাল সব ব্যাঙ্কগুলোতে এরকম সরকারি ঢিলেঢালা ভাব দেখা যাচ্ছে। এ সবই চাকরির ক্ষেত্রে অতি নিশ্চয়তার ফল। আর এই ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করার জন্য অবিনাশদের ইউনিয়ন কত কাঠখড়ই না পুড়িয়েছেন।

সিট ছেড়ে উঠে পড়েছেন অবিনাশ। বাইরে গিয়ে দেখতে হবে কে এসেছে দেখা করতে। আর একবার চোখ বোলান ক্লায়েন্টদের ভিড়ে, চার নম্বর কাউন্টারে দৃষ্টি যেতে দেখেন, ঝুঁকে থাকা একটা মানুষ সোজা হল, ছাড়িয়ে গেল সবার মাথা। মানুষটি হাত নাড়ছেন অবিনাশকে দেখে। খুব চেনা। ও চেহারা ভোলার উপায় নেই, প্রবাল সামন্ত। আশ্চর্য, আনন্দ, বিস্ময়—মিশ্র অনুভূতি নিয়ে হাসেন অবিনাশ। হাতের ইশারায় প্রবাল সামন্তকে ভেতরে ঢুকে আসার গেট দেখিয়ে দেন।

টেবিলের সামনে এসে সহাস্যে শেকহ্যান্ড করেন সামন্ত। তারপর বসেন উলটোদিকের চেয়ারে।

অবিনাশের বিস্ময় এখনও কাটেনি। বলেন, আপনি হঠাৎ আমার অফিসে!

সামন্ত হাসছেন, হাসি দিয়েই যেন বলছেন, কেমন চমকে দিলাম!

অবিনাশ জানতে চান, আবার বদলি নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়?

না না, অত ভাগ্য করে আমি জন্মাইনি। বলেন, সামন্ত।

তাহলে কি ছুটিতে এলেন?

তাও না। এসেছি কাজে। বলুন তো কী কাজ?

অবিনাশ ভাবেন, ভারী আবদার তো, ওঁর কী কাজ আমি কী করে জানব। আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন, এই অভিব্যক্তি ধরে রেখে নির্বাক থাকেন অবিনাশ।

সামন্ত একটু অপেক্ষা করেন। চেয়ারে ভাল করে ঠেস দিয়ে বলেন, প্রপার ওয়েতে চিন্তা করলে আপনি কিন্তু পারতেন বলতে, কেন এসেছি কলকাতায়।

লোকটার জয়ী হওয়ার বড্ড ঝোঁক, আজকের দিনটায় পরাজিত হতে মন চাইছে না অবিনাশের। বিনয়ের সঙ্গে বলেন, আমায় আর একটু ভাবতে দিন।

ওকে, নো প্রবলেম। টেক ইয়োর ওন টাইম। বলে, অফিসের চারপাশে চোখ বোলাতে থাকেন সামন্ত। দ্রুত ভাবতে থাকেন অবিনাশ, কেন সামন্ত কলকাতায়। বলছেন, কারণটা আমি আন্দাজ করতে পারি। কারণটা কী?... ভাবতে ভাবতে অন্য ভাবনা ঢুকে পড়ে মাথায়, আমি কি আমার ব্রাঞ্চের ঠিকানা বলেছিলাম প্রবাল সামন্তকে? বোধহয় না। লোকটা সিবিআই-এর লোক, আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা ঠিক হবে না... একটু যেন নার্ভাস লাগতে শুরু করে অবিনাশের।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে সামন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন অবিনাশের মুখে। বলেন, পারলেন না? আমি বলে দিচ্ছি। যে নকশাল ছেলেটাকে ধরেছিলাম সমস্তিপুরে, তার কেস চলছে হাইকোর্টে। কাগজপত্তর নিয়ে আমাকে তো আসতে হবেই।

এটা গো হারা নয়, এতটা আন্দাজ করা সত্যিই কঠিন। মাঝে কত ঘটনা ঘটে গেছে। পরাজয় মেনে নিয়ে হাসি হাসি মুখ করে থাকেন অবিনাশ। সামন্ত একবার বলেছিলেন বটে, নকশাল ছেলেটাকে চালান করা হয়েছে কলকাতায়। কোর্টে কেস উঠবে... এত সাদা পথে নকশাল আন্দোলন রোখার চেষ্টা আজকাল শোনা যায় না। সামন্ত লোকটা কি তার মানে ভাল লোক? বিরল পুলিশ অফিসার! অবশ্য পুলিশকে পুরো দোষ দিয়ে কী লাভ, চালিত করে তো প্রশাসন।

কী হল, কী ভাবছেন?

সামন্তর ডাকে মনোজগৎ থেকে বেরিয়ে আসেন অবিনাশ। বলেন, না না, তেমন কিছু না!

আমি জানি, আপনি কী ভাবছেন।

সামন্তর কথায় অবিনাশের ভ্রূ-জোড়া সন্নিবিষ্ট হয়। ফের সামন্তই বলেন, ভাবছেন, আপনার অফিসের ঠিকানা কোথা থেকে পেলাম? আপনি তো আমায় ঠিকানা বলেননি!

বলিনি বুঝি? বলেন অবিনাশ। কথার সুরে সামান্য খোঁচা।

ডিফেন্সে যান সামন্ত। বলেন, বলেননি মানে প্রসঙ্গ আসেনি তাই। —একটু হেসে সামন্ত বলেন, কেমন পৌঁছে গেলাম বলুন!

আপনারা, পুলিশরা সবই পারেন। হাসি মুখে উত্তর দেন অবিনাশ।

আমি কিন্তু এখন আর ঠিক পুলিশ নই। ছিলাম, প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

'সে তো হবেই' কথাটা মনে মনে বলেন অবিনাশ।

সামন্ত এবার ঝুঁকে আসেন। টেবিলে কনুই রেখে বলেন, আমি কি আর একটা স্টান্ট মারার অনুমতি পেতে পারি?

সামন্তর ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলেন অবিনাশ। বলেন, আমি কিন্তু মৃগাঙ্কর কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার খবর জানি। গোড়াতেই আপনাকে থ্যাঙ্কস দেওয়া উচিত ছিল। সরি। এখন...

অবিনাশের কথা চাপা দিয়ে সামন্ত বলে ওঠেন, দুর মশাই, রাখুন আপনার থ্যাঙ্কস। ও আমি চাকরিজীবনে অনেক পেয়েছি, গালাগালও কিছু কম খাইনি। আমার স্টান্টটা হচ্ছে,

কাল আপনার শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় ঘুরে এলাম। মছলন্দপুর, দক্ষিণ চাতরা।

সত্যি চমকে দেওয়ার মতোই কথা বটে, ভদ্রলোক কেন গিয়েছিলেন মছলন্দপুর? জানলেনই বা কী করে অবিনাশের শ্বশুরবাড়ি মছলন্দপুরে! বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বসে আছেন অবিনাশ।

স্টান্টটা মেরে প্রবাল সামন্ত যে খুব খুশি হয়েছেন তা নয়, মুখটা বেশ সিরিয়াস। ওই অভিব্যক্তি নিয়ে বলেন, আপনার শ্বশুরবাড়ি যে মছলন্দপুরে, জানতে পারি আপনার বন্ধু মৃগাঙ্কর সঙ্গে গল্প করতে করতে। আপনি হয়তো জানেন না, যে-নকশাল ছেলেটাকে আমরা ধরেছি তারও বাড়ি মছলন্দপুরে এবং দক্ষিণ চাতরায়।

তাই নাকি? 'অবাক হওয়ার ভান করেন অবিনাশ। তিনি জানেন। ছোটভাই রজত খবর নিয়ে এসে বলেছিল, ছেলেটার নাম তীর্থঙ্কর। বাড়ি বউদির বাপেরবাড়ির পাড়ায়। কথাটা তখন গুরুত্ব দেননি। এখন দিচ্ছেন। সামন্ত মছলন্দপুর ঘুরে যখন তাঁর কাছে এসেছেন, নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও কারণ আছে। অজানা আশঙ্কায় একটু যেন গুটিয়ে যান অবিনাশ। ইতিমধ্যে সামন্ত বুকপকেট থেকে কী যেন বার করতে করতে বলেন, তীর্থঙ্কর, মানে সেই ছেলেটা আপনার শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় থাকলেও, আপনি তাকে চেনেন না। চিনলে সেদিন সমস্তিপুর স্টেশনেই বলতেন। আমি এখন যেটা জানতে চাইছি, ও-পাড়ার কিছু ছেলেকে তো চেনেন। ওর বন্ধুবান্ধবদের...

পকেট থেকে একটা গ্রুপ ফটো বার করে অবিনাশের হাতে দেন সামন্ত।

অবিনাশ খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন, একটা কলেজ বা স্কুলবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এবং বসে গোটা দশ-বারো ছেলে। একটা ছেলের মাথার চারপাশে পেনসিল দিয়ে গোল করা। অবধারিত তীর্থঙ্কর। সমস্তিপুর স্টেশনে একবারই দেখেছেন, সেই মুখের সঙ্গে ছবির কোনও মিল নেই। — সামন্ত বলে যাচ্ছেন, দেখুন তো এই ছেলেগুলোর মধ্যে আর কাউকে আপনি চেনেন কি না?

সামন্তর কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, অবিনাশ ছবির মধ্যে দেখতে পান অপূর্বকে। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তীর্থঙ্করের সামনে স্টাইল নিয়ে বসে আছে অপূর্ব।

আর কাউকে চেনার কোনও প্রয়োজন নেই। শঙ্কিত মুখ তুলে সামন্তর দিকে তাকান অবিনাশ। সামন্তও এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। কী ক্ষুরধার চাউনি! জিজ্ঞেস করেন, পারলেন চিনতে, আর কোনও ছেলেকে?

নির্বাক থেকে অবিনাশ শুধু মাথা নাড়েন। একটু সময় নিয়ে বলেন, আসলে শ্বশুরবাড়িতে আমার খুব একটা যাওয়া হয়ে ওঠে না। গেলেও ঘণ্টা দু-তিনের জন্য। পাড়ার কারও সঙ্গেই বিশেষ পরিচয় নেই।

ফটোগ্রাফটা হাত থেকে টুক করে তুলে নিয়ে ফের বুকপকেটে ঢোকান সামন্ত। বলেন, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কীসের নিশ্চিন্ততা? ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন অবিনাশ।

সামন্ত বলেন, এই ছবির মধ্যে তীর্থঙ্কর ছাড়া আরও দু-চারজন ছেলে নকশালদের সঙ্গে যুক্ত। খুব তাড়াতাড়ি তাদের অ্যারেস্ট করব আমরা। তখন যদি আবার কোনও রিকোয়েস্ট নিয়ে আসেন, তাই ছবিটা দেখানো...

চেয়ারের তলায় যেন সাপ হেলেদুলে যাচ্ছে, ভয়ে এরকমটাই নিস্পন্দ হয়ে আছেন অবিনাশ। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন অপূর্বকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করে ফেলেছেন সামন্ত। অবিনাশের কাছে আসার কারণ আরও বিস্তৃত খবর নেওয়া।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন সামন্ত। একটু যেন হতাশ লাগছে। হতাশার কারণে চাপা আক্রোশটা এখন অনেকটাই প্রকাশ্য। আক্রোশ অবশ্যই নকশালদের বিরুদ্ধে। চেষ্টাকৃত হেসে সামন্ত বলেন, আজ তাহলে চলি। এই খেপে বোধহয় আর দেখা হবে না। দুদিন পরই ফিরছি আপনার দেশে।

অবিনাশও চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন। বলেন, পরেরবার যখন আসবেন, খবর দেবেন,

আমি আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসব।——চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই। অফিসহল ছেড়ে অবিনাশ, সামন্ত এখন করিডোর ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। বিল্ডিং শেষে দূরে আলোকিত রাস্তা। আর একটু পরেই ওই রাস্তায় হারিয়ে যাবেন সামন্ত। হাতছাড়া হয়ে যাবে অপূর্বকে বাঁচানোর সুযোগ। অবিনাশের কি এখন বলা উচিত, সামন্তবাবু, ওই গ্রুপ ছবির মধ্যে একমাত্র একজনকে আমি চিনি, অপূর্ব, আমার শ্যালক। সে নকশাল দলে নেই। আমি শিওর।... এতটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল, সামন্ত সব খবরাখবর এবং নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। অবিনাশের কথাগুলো এখন অত্যন্ত দুর্বল, মেকি শোনাবে। তা ছাড়া সামন্ত তখন বলতে পারেন, আপনি প্রথমে কেন চেপে গেলেন? কেন আড়াল করার চেষ্টা করলেন শ্যালককে? —কী উত্তর দেবেন, অবিনাশ? এদিকে ইলা যদি জানে, অপূর্বকে বাঁচানোর এত বড় সুযোগ পেয়েও সদ্ব্যবহার করতে পারেননি অবিনাশ, সে সারা জীবন দায়ী করে যাবে স্বামীকে।... কী যে করেন অবিনাশ! করিডোর ফুরিয়ে এল। আচমকা সামন্তর হাত দুটো ধরে নেন অবিনাশ। বলার ইচ্ছে ছিল, আমাকে মাফ করবেন, একটা মিথ্যে বলেছি আপনাকে..... বলতে পারলেন না। আজ তাঁর বড় গৌরবের দিন। অফিসের কেউ যদি তাঁকে এরকম কাতর অনুরোধ করা অবস্থায় দেখে নেয়, কী ভাববে! — সামন্তর হাত ধরে রেখে অবিনাশ বলেন, সমস্তিপুর গিয়ে মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমরা ভালই আছি। কুশলটা যেন আমাদের বাড়িতে দিয়ে দেয়।

হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে করুণার চোখে অবিনাশের দিকে তাকান সামন্ত। হঠাৎ ঘুরে গিয়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে যান।

মিনিট দশেক হয়ে গেল অবিনাশ ফিরে এসেছেন নিজের সিটে। কাজ করার ভান করে পেন, লেজার নিয়ে বসেছেন, একটা আঁচড়ও এখন অবধি কাটতে পারেননি। পলাশ মাঝে জিজ্ঞেস করেছে, লোকটা কে দাদা? খুব রাফ-টাফ দেখতে। আপনার রিলেটিভ?

এমনভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন অবিনাশ, হ্যাঁ-না দুটো মানেই করা যায়। তারপর ডুবে গিয়েছিলেন অপূর্বর ভাবনায়। অপূর্ব যে নকশাল হয়ে যেতে পারে, এমন একটা আভাস ওর কথাবার্তায় পাওয়া যাচ্ছিল। অপূর্বর মনোভাব বদলানোর জন্য তেমন কোনও উদ্যোগ নেননি অবিনাশ। নিজের ভাই নয় বলে? কিন্তু অপূর্বর যদি কিছু হয়ে যায়, ইলাকে সামলানো মুশকিল হয়ে যাবে। আলটিমেটলি সাফার করতেই হবে অবিনাশকে। আর একটু আগে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল... একটি নারীকণ্ঠ এ-টেবিল ও-টেবিলে কথা, হাসি ছুড়ে যাচ্ছে। গলাটা চেনা-চেনা। মুখ তোলেন অবিনাশ, দেখেন, পাপিয়া হাসতে হাসতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে।

খুবই কষ্ট করে ঠোঁট দুটো ফাঁক করলেন অবিনাশ। পাপিয়া তাঁর নাটকে ভাড়া করা অভিনেত্রী। পেমেন্ট নিতে এসেছে সম্ভবত।

পাপিয়া সামনে এসে দাঁড়াতে, অবিনাশ বলেন, পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়েছে?

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে পাপিয়া বলে, হ্যাঁ, সেটা সেরে নিয়েছি। আপনার কাছে এলাম একটা বিশেষ প্রয়োজনে।

কী প্রয়োজন? জানতে চান অবিনাশ।

আপনি কি একদিন একটু সময় দিতে পারবেন? এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

ভদ্রলোকটি কে?

প্রফেশনাল থিয়েটারের মালিক। আপনার নাটকটার গল্প তাঁকে বলেছি। উনি খুব উৎসাহিত হয়েছেন। নাটকটা প্রফেশনাল স্টেজে করতে চান।

তাতে আমার লাভ? জানতে চান অবিনাশ!

আপনি টাকা পাবেন। আমার লাভ নায়িকার রোলটা পাব।

কত টাকা দেবেন উনি?

আপনি একবার বসুন তাঁর সঙ্গে। তখনই সব কথা হয়ে যাবে। গল্পটা একটু রদবদল

করতে হতে পারে।

কেন বদলাতে হবে?

এমনি কিছু না। মেন গল্প একই থাকবে। বুঝতেই তো পারছেন। টিকিট কিনে নাটক দেখবে লোক। একটু-আধটু নাচগান হয়তো ঢোকানো হবে। তবে সেটা আপনার পারমিশন নিয়ে।

নাচ মানে তো ক্যাবারে, নাকি?

অবিনাশের প্রশ্নে মাথা নিচু করে নেয় পাপিয়া। এই কদিনে অবিনাশদার সঙ্গে মিশে পাপিয়া একটা বিষয় বুঝতে পেরেছিল, মানুষটা খুঁতখুঁতে, কাজপাগল হলেও, শোভনতার সীমা সবসময় মেনে চলে। নিপাট ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়। হ্যাঁ, এটা ঠিক, থিয়েটারের মালিক অবিনাশদার নাটকে কিছু নোংরা নাচ-গান ঢোকাবে। এমনটাই রেওয়াজ। তাতে যদি অবিনাশদা রাজি থাকে তো ভাল, না হলে তো কোনও কথাই নেই। শুধু পাপিয়ার একটা ভাল চরিত্র হাতছাড়া হবে। এই তো সোজাসাপটা ব্যাপার। কিন্তু অবিনাশদা প্রশ্নটা এমন ঘেন্নার সঙ্গে ছুড়ে দিল, খুবই খারাপ লাগছে পাপিয়ার।

মিটিংটা কোথায় হবে? অনেকক্ষণ পর জানতে চান অবিনাশ।

বেশ অবাক এবং কিছুটা আশা নিয়ে মুখ তোলে পাপিয়া। বলে, আপনার অফিসে তো হবে না, কাজের জায়গা। মালিকের অফিসে হতে পারে, নয়তো আমার বাড়িতে।

তোমার বাড়িটা যেন কোথায়?

বউবাজারে। ফকির চক্রবর্তী লেন। আপনাকে বলেছি আগে, ভুলে গেছেন।

কী একটু ভেবে নিয়ে অবিনাশ অন্যমনস্ক গলায় বলেন, তোমাদের ওখানে পি বি চ্যাটার্জি সরণি নামে একটা রাস্তা আছে না?

হ্যাঁ, আছে তো। আমাদের পাড়ার পিছনের গলি। আপনার কোনও রিলেটিভ থাকে নাকি?

দুপাশে মাথা নাড়েন অবিনাশ। তারপর বলেন, পি বি চ্যাটার্জির পুরো নামটা জানো? কে ছিলেন উনি?

ঠোঁট উলটে পাপিয়া বলে, পুরো নামটা ঠিক বলতে পারব না। স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন হয়তো। তবে আপনি যদি ওঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, ওই গলির ভেতর একটা লাইব্রেরি আছে, ওখানে গেলেই সব জানতে পারবেন। ওই বাড়িতেই নাকি পি বি চ্যাটার্জি শেষজীবনটা কাটিয়েছেন।

অবিনাশ আশ্বস্ত হন, উদ্দেশ্যহীন প্রশ্নে একটা সঠিক তথ্য অন্তত জানা গেল। পাপিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। বলে, আজ তা হলে চলি অবিনাশদা। আপনি কবে আসছেন আমার বাড়িতে?

দেখি, সময় করে একদিন যাব। তবে নাটকটা বেচার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। পাপিয়া আর কোনও অনুরোধ করে না। থমমারা মুখ নিয়ে ঘুরে যায়। অবিনাশ ডাকেন, শোনো পাপিয়া!

মুখ ফেরাতে পাপিয়া দেখে, অবিনাশদা টেবিলে রাখা ফুলের তোড়াটা তার জন্য তুলে ধরেছেন।

একটু পিছিয়ে যায় পাপিয়া। বলে, এটা তো আপনার জন্য।

অবিনাশ হাসেন। বলেন, তোমরা প্রাণঢেলে অভিনয় করলে, ফুল পেলাম আমি। আর তুমি তো ব্রিলিয়ান্ট অ্যাক্টিং করেছ। এটা আমি তোমাকে দিলাম। পাপিয়া না করতে পারে না। ফুলের তোড়াটা কাঁখে নেয়। যেমন করে শিশু নেয় মা। বলে, চলি।

এস। বলে, অবিনাশ বাঁধানো মানপত্রটা নিজের ফোলিও ব্যাগে ঢোকানোর চেষ্টা করেন। নিজের নাম লেখা না থাকলে এটাও দিয়ে দিতেন কাউকে। তাঁর জীবনে এখন ঘোর বিপদ, এ সময় আহ্লাদ মানায় না। আজ না হয় কাল, অপূর্ব ধরা পড়বেই। ছোটখাটো নকশাল কর্মীর ধরা পড়ার অর্থ সবাই জানে। শোক সহ্য করতে পারবে না ইলা।... কিছুতেই ব্যাগে ঢুকতে

চাইছে না মানপত্র। এই শংসাপত্র, বংশ পরিচিতি, কোনও কিছুই বাঁচাতে পারবে না অপূর্বকে।

দিন, ফ্রেমটা খবরের কাগজে বেঁধে দি। পলাশ সিট ছেড়ে উঠে এসেছে। বাঁধানো মানপত্রটা পলাশের হাতে দিয়ে, দূরের জানলার দিকে তাকান অবিনাশ। বিকেলের আলো বড্ড তাড়াতাড়ি ঝিমিয়ে গেছে। আরও বেশি খাঁ-খাঁ লাগছে শিমুলগাছটা। এবার কি শীত তাড়াতাড়ি আসছে?... আচমকা অবিনাশের মনে পড়ে যায়, ইলা শীতের ক্রিম আনতে বলেছিল।

॥ চব্বিশ ॥

ফার্স্ট পিরিয়ডের পরই স্কুল ছুটি হয়ে গেল শীলার। স্কুল সেক্রেটারির মা মারা গেছেন গতকাল। স্কুলের জমিটা দান করেছিলেন উনি। আজ যখন ছুটির ঘণ্টা দিচ্ছিল বিমলা, শীলার মনে হচ্ছিল, অদৃশ্য শব্দটা বুঝি সেক্রেটারির মা শান্তা দেবীর শেষবিদায়ের ঘটনা। স্কুলের সামনের ফাঁকা মাঠটা দিয়ে উনি চলে গেলেন এইমাত্র।

ভদ্রমহিলাকে কোনওদিন দেখেনি শীলা। অনেক গল্প শুনেছে। উনি ছিলেন জমিদার বাড়ির বউ। লেখাপড়া জানতেন না। বিয়ে হয়ে গেল। ততদিনে জমিদারি প্রথা উঠে গেছে, স্বামী ইংরেজ সরকারের চাকরি নিয়ে থাকেন চট্টগ্রামে। কলকাতায় বিয়ে করতে এসেছেন। ফুলশয্যার দিন স্ত্রীকে বললেন, তুমি যদি একটু পড়াশুনো করে আসতে ভাল হত। তোমাকে তো এখনই চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে পারছি না। চিঠি লিখতে পারতে। আমার লেখা চিঠি অন্য কাউকে পড়াতে যেতে হত না।

শান্তা দেবীর তো মাথায় হাত, লেখাপড়া না করার মাশুল যে তাঁকে এভাবে দিতে হবে ভাবতে পারেননি। স্বামীকে পেয়েও যেন ঠিক পাওয়া হল না। অসহায় কণ্ঠে কর্তাকে বলেছিলেন, আপনি যে-কটা দিন ছুটিতে আছেন লেখাপড়াটা শিখিয়ে দিন। কর্তা বললেন, আমার যে মোটে এক মাসের ছুটি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কতটুকু

আর শেখাতে পারব।

শান্তা দেবী দমলেন না। কর্তাকে জোর করে রাজি করালেন পড়াতে। বলতে গেলে সেই রাত থেকেই শুরু হল অক্ষরজ্ঞান। তখনকার দিনে স্বামীর সঙ্গে দেখা হত শুধু রাতে। বাকি সময়টা কর্তা পরিবারের সম্পত্তি।

বিয়ের পর মধুর রাতগুলোয় শুকনো পড়ালেখা চলত ভোররাত অবধি। কখনওবা ফুটে উঠত দিনের আলো। অসীম সাধনায় শান্তা দেবী এক মাসের মধ্যে একটা গোটা চিঠি লেখার ক্ষমতা অর্জন করে ফেললেন। কর্তা তো অবাক! তারপর থেকে তাঁদের বিরহের দিনগুলো ভরাট হত পত্রালাপে। —শান্তা দেবীর কাহিনী শোনার পর থেকে মনে খুব বল পেয়েছে শীলা। একই সঙ্গে ভাল লেগেছে ওঁদের মধুর দাম্পত্য।

শান্তা দেবী পরে আরও পড়াশোনা করেন। সেই সময়কার পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি করেছেন কিছু। স্বামীর মৃত্যুর পর স্মৃতিরক্ষার্থে এই জমিটা দান করেন মেয়েদের স্কুল করার জন্য। বেঁচেছিলেন প্রায় বিরানব্বই বছর বয়স অবধি। চলে গেলেন কাল। রয়ে গেল স্কুলটা। শোভনলাল বালিকা বিদ্যালয়। কর্তার নাম অমর করে শোধ করলেন ছাত্রীর ঋণ।

তখনকার দিনে ভালবাসা, জেদ, মর্যাদা, দান সমস্ত কিছুই ছিল খাঁটি, স্পষ্ট। এখন সব ধোঁয়াশায় ভরা। কোনও অভাব নেই, তবু শীলা সংসার ফেলে চাকরি করতে বেরিয়েছে, সে শুধু ভালবাসার অভাবের জন্যই। নিজের স্বার্থেই চাকরিটা নিয়েছে শীলা। এর মধ্যে কোনও মহান ব্যাপার নেই। তার সিদ্ধান্তে যেমন কেউ বাধা দেয়নি, উৎসাহও দেয়নি। দিদি না, বিপুলও না। চাকরি করতে এসে আরও একা হয়ে গেছে শীলা।

প্রথম মাইনে পেয়ে বিপুলের জন্য একটা শার্ট কিনেছিল, নেওয়ার সময় হাসি মুখে নিলেও, একদিনের জন্যও সে শার্ট পরেনি বিপুল। সে যে কী চায়, কিছুই বুঝতে পারে না শীলা। ভালবাসা তো কবেই উধাও হয়েছে, শারীরিক কারণেও শীলাকে আর প্রয়োজন পড়ে না বিপুলের। তবু বিপুল রোজ বাড়ি ফেরে সময়মতো। ছেলেকে পড়ায়, পৃথক শোয়, শীলার সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না। এমন একদিন আসবে, বিপুল দু-একদিন ফিরবে না। থেকে যাবে ওদের পুরনো বাড়িতে। বাবা-মায়ের কাছে। ও-বাড়িতে থেকে যাওয়াটা বাড়বে। শীলা ছেলেকে নিয়ে পড়ে থাকবে আলাদা।

আবার উলটোটাও হতে পারে, শীলারই একদিন ইচ্ছে করল না বাড়ি ফিরতে। যেমন আজই ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ পেয়ে যাওয়া ছুটিটা কাটাতে মন চাইছে অন্য কোথাও। যাবে

কোথায়? শীলার যাওয়ার জায়গা প্রায় নেই। এক হতে পারে, অনেকদিন মায়ের মন্দিরে যায়নি। দক্ষিণেশ্বরটা ঘুরে এলে হয়। কিন্তু একা একা কেমন যেন লাগে। যদি চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! তা হলে কি একবার দেবপাড়ায় দিদির বাড়ি যাবে? যাওয়া খুব সোজা, তিন নম্বর বাসে মিনিট কুড়ি-পঁচিশের পথ। অবিনাশদা অফিস থেকে ফেরার আগেই ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে।

দিদির বাড়িতে আজ পর্যন্ত যায়নি শীলা। খুব ইচ্ছে করে দেখতে কেমন গুছিয়ে সংসার করছে দিদি। অংশু বরুণকেও দেখতে ইচ্ছে করে। একবারই মাত্র দেখেছিল, তখন ওরা খুব ছোট ছোট। শীলার অনুরোধে দিদি একবারই ওদের বরানগর বাড়িতে এনেছিল। তাও মাসি বলে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। দিদি বলেছিল, কষ্ট পাস না শীলা, ওরা তো বড় হচ্ছে, বাবার কাছে গিয়ে যদি এ-বাড়ির গল্প করে, তোর অবিনাশদার বুঝতে কিছুই বাকি থাকবে না। আমার লুকিয়েচুরিয়ে আসাটাও বন্ধ হবে।

মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য দুই ফুটফুটে বোনপোকে পেয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল শীলা, ওইটুকু সময়ে ওদের আদর করে খুব। পুচকে দুটো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল, মায়ের মতো দেখতে এই মহিলাটি কে?

শীলার বাবা প্রসন্ন চক্রবর্তীর ডালে একটি ফুল বড় পরিপূর্ণভাবে ফুটেছে, বড় মেয়ে ইলা। বাবা দিদির ভরা সংসার দেখে যেতে পারেননি। এর জন্য দায়ী শীলা। মাসির ছেলেকে বিয়ে করা, বাবা সহ্য করতে পারলেন না। শীলা নিশ্চিত বাবার অভিশাপে তার আজ এই অবস্থা।

মা, দাদারা, সমস্ত আত্মীয়স্বজন শীলার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও, দিদি এখনও যোগাযোগ রাখে। কেন রাখে, কিছুটা যেন আন্দাজ করতে পারে শীলা। দিদি মনে করে শীলার আত্মত্যাগে অবিনাশদাকে সহজে পেয়েছে সে। ধারণাটি ভুল। শীলা খুব ভাল করেই জানত, অবিনাশদার মনোযোগ সর্বতোভাবে দিদির দিকে। অনেকবার সেই মনোযোগ কাড়তে চেয়েছে শীলা, পারেনি। রাগ হত খুব। হিংসে হত দিদির ওপর। আগ বাড়িয়ে নিজেকে সঁপে দিতে ইচ্ছে করত অবিনাশদার কাছে। অবিনাশদার শরীর ঘিরে অদ্ভুত এক আভা বের হত। লোভ সামলানো মুশকিল হয়ে যেত শীলার। বিচ্ছিরি কোনও ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে, এই ভয়ে শীলা চলে যায় দূরে। মজফফরপুর থেকে কলকাতা।

অবিনাশদার আভা ততদিনে উশকে দিয়েছে শীলার ডানা। আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য শীলা তখন উন্মুখ। মাসির ছেলে বিপুলদা ছিল অন্তর্মুখী ঠান্ডা টাইপের। ওদের বাড়িতে থাকতে এসে শীলাই বিপুলদার শরীরে আঁচ লাগায়।

আগুন ধার করা হয়েছিল অবিনাশদার থেকে। অবিনাশদার অজান্তে। আগুন নিজের উৎপত্তিস্থল প্রথম পোড়ায়। কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখে না। শীলা ছাড়া কেউ জানল না, তার বিপথগামিতার জন্য কে আসলে দায়ী।

সুকিয়া স্ট্রিটে মাসিদের পুরনো বাড়ির আনাচেকানাচে ঘাপটি মেরে ছিল বহু প্রাচীন অন্ধকার। সেইসব অন্ধকারে বিপুলদাকে নিয়ে গেছে শীলা, বড়লোকের আড়ষ্ট ছেলের জড়তা ভাঙিয়েছে। প্রথম নারীশরীরের স্বাদ পেয়ে বিপুলদা তখন ঘোরের মধ্যে। সময়ের জ্ঞান করত না, দিবা-রাত পেতে চাইত শীলাকে। শীলাদের প্রেম আসে কামের হাত ধরে।— দুজনের হাবভাবে মাসি বোধহয় কিছু টের পেয়ে থাকবে, হঠাৎই ছেলের বিয়ে দিতে তোড়জোড় শুরু করল। বিপুলদাও কোনও আপত্তি জানায় না। ভেবে রেখেছিল এটাই দস্তুর, প্রত্যেক মানুষেরই কিছু অবৈধ সম্পর্ক থাকে।

ফুঁসে উঠেছিল শীলা। বলেছিল, তুমি যদি অন্য কোথাও বিয়ে কর, আমি সব ফাঁস করে গলায় দড়ি দেব।

হল! বশ মানে বিপুলদা। তারপর থেকে শীলার সব কথাই শুনে এসেছে। হঠাৎ যে কী হল!

শেষ যেদিন শীলার উশকানিতে উপগত হয়েছিল বিপুল, চরম অবস্থার আগেই নিভে যায়। শীলা জিজ্ঞেস করেছিল, কী হল তোমার!

বুঝতে পারছি না। বলে, দু আঙুলে কপাল টিপে সরে গিয়েছিল বিপুল। তারপর চিত হয়ে শুয়ে নির্নিমেষে তাকিয়েছিল সিলিংয়ের দিকে।

বিপুলের মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে এসেছিল শীলা। ঝাঁঝিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কী ভাবছ বল দিকিনি? কার কথা মনে পড়ল হঠাৎ?

কপাল থেকে আঙুল সরিয়ে বিপুল বলেছিল, ছেলের কথা। দিন দিন কেমন জানি বোকা হয়ে যাচ্ছে। এক পড়া বারবার বোঝাতে হয়।

রাগে ফেটে পড়েছিল শীলা, দিন-রাত খালি ছেলে, ছেলে আর ছেলে। আর কারও যেন বাচ্চাকাচ্চা হয় না। আমি জানি, ছেলের দোহাই দিয়ে তুমি অন্য কথা আড়াল করছ।

বিষাদ হাসি হেসে সরে গিয়েছিল বিপুল। শীলার সঙ্গে তর্কে যায়নি। তারপর থেকেই শীলা বিপুলের ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। এখনও পর্যন্ত বিপুলের এই হঠাৎ পরিবর্তনের কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটা কি কোনও মানসিক রোগ? বাকি জীবনটা কি পাগলের সঙ্গে কাটাতে হবে?

ভয় হয় শীলার। মাঝে মাঝে ভীষণ নার্ভাস লাগে। বিপুলের সমস্ত আচার-আচরণে সন্ধানী দৃষ্টি বোলায়, কোনও অসংগতি দেখা দিচ্ছে কি?

অবিনাশদার নাটকের দিন বারবার বারণ করা সত্ত্বেও বিপুল হাত মেলাতে গেল অবিনাশদার সঙ্গে। শীলা বলেছিল, অবিনাশদা ভীষণ চালাক। ঠিক চিনে নেবে তোমায়। আমাদের কার্ড দেওয়ার জন্য দিদি খাবে বকুনি।

বিপুল কানে নিল না কথা। বলল, সেই কবে ইলার বিয়ের সময় দেখেছিলেন আমাকে। এখন চিনতে পারবেন না। এরকম একজন গুণী মানুষকে ছোঁয়ার লোভ কি সামলানো যায়! আজকের নাটক দেখে আমি সত্যিই টের পেলাম, ওঁর ক্ষমতা। অবিনাশদার সম্বন্ধে যা যা বল তুমি, মোটেই বাড়িয়ে বল না।

প্রকৃত অর্থে অনেক কমিয়ে বলে শীলা। পাছে বিপুলের মনে অন্য কোনও সন্দেহ দানা বাঁধে। সেদিন দেখা গেল অবিনাশদার ব্যক্তিত্বে আপ্লুত হয়ে পড়েছে বিপুল। ওরা যখন হ্যান্ডশেক করছিল, দূরে দাঁড়িয়ে শীলা মনে মনে অবিনাশদাকে বলেছে, আমার কর্তাটিকে একটু লক্ষ কর তো, অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে কি?

এক পলক চোখাচোখি হয়েছিল অবিনাশদার সঙ্গে, অত ভিড়ের মধ্যে উদ্ধার করতে পারেনি শীলাকে। না পেরে ভালই হয়েছে। দিদির সঙ্গে সম্পর্কটা ছিন্ন হত শীলার।

অবিনাশদার শরীর থেকে সেদিনও বেরোচ্ছিল আভা। এত বছরের ব্যবধানে সামান্যও নিস্তেজ হয়নি সেই আলো। রঙ্গনা হলে যত সময় ছিল শীলা, উঁকিঝুকি মেরে দেখে গেছে অবিনাশদাকে, দিদি দুই ছেলেকে নিয়ে বসেছিল একদম সামনের সারিতে। এত ভিতু একবারও পিছন ফিরে দেখেনি শীলারা এসেছে কি না। দিদিকেও সেদিন দেখাচ্ছিল বড় সুন্দর। ও কি আবার মা হবে? — জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি, নাটক শেষ হতেই চলে গিয়েছিল গ্রিনরুমে।

সেদিন অবিনাশদার দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল শীলার, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে থেকে মনে হচ্ছিল খালি পিছিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের গতিতে। টানা হুইশেল বাজছে কানে। মজফফরপুর থেকে কলকাতা অনেক দূর। কী হল শীলা, একা একা বসে আছ! বাড়ি যাবে না?

বড়দির ডাকে সংবিৎ ফেরে শীলার। টিচার্স রুম ফাঁকা। বড়দি এতক্ষণ নিজের ঘরে ছিলেন। অপ্রতিভতা কাটিয়ে শীলা বলে, চলুন এক সঙ্গে ফিরি।

আমার এখনও অনেক দেরি হবে বেরোতে। বেশ কিছু কাজ বাকি পড়ে আছে। বলেন বড়দি।

অগত্যা উঠতেই হয় শীলাকে। পিছনে ফিরে আলমারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে বড়দি ফের বলেন, ছেলের তো মর্নিং স্কুল, নাকি!

হ্যাঁ।

সে নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরে এসেছে? কে নিয়ে আসে? স্কুলবাস দিয়ে যায়?

ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে শীলা বলে, ওকে দেখার জন্য একটা কাজের মেয়ে রেখেছি।

কাজের মেয়ে দিয়ে ছেলে মানুষ করা যায় না। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও দিকিনি। সেই কখন ছুটি হয়ে গেছে। তোমার দেখছি আমার মতো অবস্থা। কাজের নেশা পেয়ে বসেছে। লক্ষণ ভাল নয়। মেয়েদের সংসারেই বেশি মানায়।

বড়দির সঙ্গে তর্কে গিয়ে লাভ নেই। শীলার ভাল চেয়ে কথাটা বলেছেন। নিজে কাজপাগল মানুষ। বিয়ে-থা করা হয়ে ওঠেনি। মনে মনে হয়তো সুখী সংসারের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে আসে শীলা। সামনের ফাঁকা মাঠটায় পড়ে আছে অলস রোদ। বিমলা আসে, শীলাদি, তোমার কাছে পাঁচটা টাকা হবে? পরশু শোধ করে দেব। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়ে দুটো টাকা বার করে শীলা। বিমলাকে বলে, এটা রাখ। শোধ দিতে হবে না।

টাকা দুটো হাতে নিয়ে আধা-নমস্কারের ভঙ্গি করে চলে যায় বিমলা। প্রত্যেক স্টাফের কাছে এভাবে টাকা চায় সে। কেউ ওকে ধার দেয় না। জানে, শোধ দিতে পারবে না কখনও। যা চায়, তার থেকে কিছুটা কম করে ওকে একেবারে দিয়ে দেওয়া হয়। রেওয়াজটা স্কুলে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে জেনেছে শীলা। বিমলাও ব্যাপারটা জানে। তবু শোধের প্রতিশ্রুতি দিতে ভোলে না। আসলে চাকরি করে তো, সরাসরি হাত পাততে মর্যাদায় লাগে।

বিমলার স্বামী দশ বছর হল বিছানায় শোয়া। পঙ্গু স্বামীর অনেক খরচ। মাইনের এই কটা টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারে না। মুখে স্থায়ী উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘোরে বিমলা। দুটো ছেলে আছে ওদের। তাদের লেখাপড়ার খরচ... অচল স্বামীর জন্য কেন এত করে বিমলা। সিঁদুর অক্ষয় করার মতো পিছিয়ে পড়া বিশ্বাস তার নেই। যথেষ্ট শহুরে সে। লোকটাকে ভালবাসে সে। কেন বাসে, জানতে ইচ্ছে হয়।... স্কুল কম্পাউন্ড পেরিয়ে শীলা এখন রাস্তায়। এখান থেকে মিনিট দশেক হেঁটে গেলে বি. টি. রোড। যাবে নাকি একবার দিদির বাড়িতে? দিদিকে তেমন প্রয়োজন নেই, অবিনাশদার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত। বিপুলের হঠাৎ পরিবর্তন নিয়ে কিছুটা আলোকপাত অবশ্যই করতে পারত অবিনাশদা। বিমলা যেভাবে স্বামীকে মেনে নিয়েছে, শীলা কেন পারছে না! বিপুলের উপেক্ষাই কি এর প্রধান কারণ? উপেক্ষা তো অবিনাশদাও করে। তা হলে কেন তার কাছে যেতে চাইছে শীলা? নাটকের দিন দেখা হওয়ার পর থেকে ঘুরে-ফিরে অবিনাশদার কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে সামনে গিয়ে দুদণ্ড বসি, তাতেই মনটা অনেক শান্ত হবে। উপেক্ষা অগ্রাহ্য করতে পারাই ভালবাসা, নাকি উলটোটা... বুঝতে পারে না শীলা। ভালবাসার মানে তার কাছে এখন অস্পষ্ট। বিপুলের প্রতি ভালবাসা এসেছিল শরীরের পথ ধরে। অবিনাশদা তাকে কোনওদিন কামনা-উন্মুখ স্পর্শ করেনি, তবু কেন ভালবাসা রয়ে গেল? শীলার মনের মধ্যে কি এক স্বৈরিণীর বাস! অনেক দেরি করে হলেও, তার অস্তিত্ব টের পেয়েছে বিপুল। তাই ঘুরিয়ে নিয়েছে মুখ।... ভাবতে ভাবতে শীলা খেয়াল করে, সে বেশ জোরে হাঁটছে। কোথায় যাবে সে, দিদির বাড়ি, নাকি নিজের বাড়ি? রাস্তা একটাই। বি. টি. রোডে ওঠার আগে বাঁদিকে একটা গলি গেছে। ওটাই বাড়ি ফেরার রাস্তা।

ইদানীং প্রায় রোজই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ছে বিপুল। শেষ দু ঘণ্টা অফিসে একদম মন টিকছে না। বাইরের রোদে হলুদ ছোপ ধরলেই আঁকুপাকু করে উঠছে ভেতরটা। ইমিডিয়েট বসকে একটা মিথ্যে বলা আছে, বাবার শরীরটা বেশ খারাপ যাচ্ছে, এক মাস কেয়ারে রাখতে বলেছে ডাক্তার। বস অমিতাভ গুহ বিষয়টা সিরিয়াসলি নিয়েছেন। আন্তরিক উদ্বেগ নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অনুমতি দিয়েছেন বিপুলকে। বস জানেন বিপুলের দুটো বাড়ি, পরামর্শ দিয়েছেন, অনেকদিন তো হল মান-অভিমান, এবার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকুন।

অর্থপূর্ণ অসহায় হাসি হেসেছে বিপুল। ভাবটা এমন, আমার তো ইচ্ছে হয়, বউ মানতে চায় না।

অনুচ্চারিত হলেও, মানেটা বোঝেন বস। স্ত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপানো যে প্রত্যেক পুরুষের প্রিয় অবসর বিনোদন।

ওই দু ঘণ্টা কলকাতার রাস্তায় ঘোরে বিপুল, সিনেমা হলের সামনে গিয়ে হোর্ডিং দেখে, ভিখিরি দেখে রাস্তার, ভ্রাম্যমাণ দেহপসারিণীকে দেখে খুঁটিয়ে। কল্পনা করার চেষ্টা করে, এই মেয়েটির সঙ্গে যদি আমি কামকলায় লিপ্ত হই, নিজেকে কতক্ষণ ধরে রাখতে পারব?—শীলার সঙ্গে শেষ শরীর খেলার অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। কিছুতেই নিজেকে প্রতিস্থাপন করতে পারছিল না সে। মন চলে যাচ্ছিল স্রোতের বিপরীতে। এরকমটা যে একদিন হবে বিপুল টের পাচ্ছিল, বছর খানেক ধরে শীলার শরীরের প্রতি কোনও আগ্রহ জাগছিল না। কেন এই অনীহা জানে না বিপুল। হতে পারে, তারা একে অপরের কাছে অতি ব্যবহৃত, ভীষণ চেনা। কিন্তু অনাগ্রহটা শুধু বিপুলের তৈরি হল কেন? শীলার কোনও অনীহা নেই। প্রশ্নটা নিয়ে অনেক ভেবেছে বিপুল। এ বিষয়ে একটা চালু তত্ত্ব আছে, পুরুষরা বহুগামী, মেয়েরা নয়। তবে ব্যতিক্রম আছে।

ব্যতিক্রম কতটা কেউ সঠিকভাবে বলেননি। তা ছাড়া তত্ত্বটার মধ্যে কোথাও যেন একটা ফাঁক দেখতে পায় বিপুল, প্রবক্তাদের কাছে কেউ কি কোনওদিন নিজের সেক্সপ্লেজারের কথা সঠিকভাবে এক্সপ্রেস করে উঠতে পেরেছে! সম্ভব নয়। যৌন তৃপ্তির ভাষা আজও অনাবিষ্কৃত।

বিপুলের ধারণা সামাজিক অবদমনে মেয়েরা বাধ্যত একগামী। প্রত্যেক মেয়ের কল্পপ্রেমিক আছে। অবদমন যত বাড়ে কল্পপ্রেমিক প্রাণ পায়। শারীরিক মিলনের সময় মেয়েরা চোখ বন্ধ রেখে স্বামীর জায়গায় প্রেমিকটিকে স্থাপন করে।

শীলার কল্পপ্রেমিকটির নাম জানা নেই বিপুলের। জানার চেষ্টা করেও লাভ নেই, মেয়েরা কিছুতেই স্বামীর কাছে তার অস্তিত্ব স্বীকার করবে না।

অবিনাশদা হলেও হতে পারেন শীলার কল্পনার পুরুষ। কথায় কথায় তাঁর প্রসঙ্গ এলেই শীলা নিজের মুগ্ধতা চেপে রাখতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য এ নিয়ে কোনও ঈর্ষা বোধ করে না বিপুল। তার প্রথম কারণ, অবিনাশদার এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই। দ্বিতীয়ত, অবিনাশদার ব্যক্তিত্বে বিপুলও মুগ্ধ। জীবনে তিন-চারবার দেখেছে অবিনাশদাকে, প্রতিবারই মনে হয়েছে আদর্শ পুরুষ বলতে একেই বোঝায়। দাপট এবং উদারতার কী অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বিপুলের চরিত্রে এটাই গণ্ডগোল, অবিনাশদাকে ঈর্ষা করার বদলে শ্রদ্ধা করে সে। এটা কম পৌরুষের লক্ষণ।

বিপুলের পুরুষত্ব যে কম, বিভিন্ন দিক বিচার করলে, অনায়াসে বোঝা যায়। বিপুলের কোনও কল্পনার প্রেমিকা নেই। নারীদের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করে না সে। এক এক সময় বিকর্ষণ ঘটে। রাস্তায় অতি সাজের বেশ্যাকে দেখলে মনে হয়, কলকাতার প্রাচীন কোনও বাড়িকে সদ্য চুনকাম করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে ঢুকলে সেই এক ভ্যাপসা গন্ধ।

উচ্চশিক্ষিত ডিগনিফায়েড মেয়ে দেখলে মনে হয়, বিছানায় এরা আসলে কাগজের মতো, কোনও রং নেই শুধু কালো কালো অক্ষর।

চটক-সুন্দরী হাসিখুশি মেয়ে দেখলে কেন জানি মনে হয়, মেয়েটার শরীরের গভীরে ভীষণ অসুখ। কোনওদিন সারবে না। মেয়েটা জানে। তাই হাসি-ঠাট্টায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখে।... আপন মস্তিষ্কপ্রসূত এই ধারণাগুলোকে বিশ্বাস করে বিপুল, বলা যেতে পারে, বিশ্বাস করতে ভালবাসে। এ বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনায় যেতে চায় না।

ছোট থেকেই সে তার নিজস্ব ভাবনার জগতে থাকতে ভালবাসে। এই জগতে প্রায় জোর করে ঢুকে পড়েছিল শীলা। অনেক কটা বছর লাগল শীলাকে বাইরে ফেলে দিতে। এখন বেশ হালকা লাগে বিপুলের। অফিস থেকে আগেভাগে বেরিয়ে নানান জায়গায় ঘোরে। ময়দানে খেলা দেখতে চলে যায়, কোনওদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গলা ফাটায়, মোহনবাগানের

খেলা থাকলে হয়ে যায় তাদের সমর্থক।

ক্লায়েন্টদের থেকে দুটো ক্লাবের মেম্বার কার্ড জোগাড় করে রেখেছে বিপুল। দু ক্লাবের হয়ে গলা ফাটানোর এভরি রাইট আছে তার, কেননা মা বাঙাল, বাবা এ-দেশীয়। মাঝেমধ্যে একটা বাসনা উঁকি মারে মনে, যেদিন দুই প্রধান দলের ম্যাচ থাকবে, কোনও এক দলের সবুজ গ্যালারিতে বসে অপর দলের হয়ে চেঁচাবে। —ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে যাবে সেদিন। এ-ঘটনা তার চোখের সামনে একদিন ঘটেছে, খেলা ছিল এরিয়ান আর মোহনবাগানের। লোকটা বসেছিল মোহনবাগান মেম্বারদের মধ্যে। এরিয়ান একটা গোল পুরে দিতেই লোকটা দু হাত তুলে নেচে ফেলল। নির্ঘাত ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার, কেননা এরিয়ান হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের ছোট ভাই। লোকটার মাথায় পড়তে লাগল তুমুল চাঁটি। —ঘটনাটা মনে পড়লে এখনও হাসি পায় বিপুলের। মনে মনে লোকটার জায়গায় নিজেকে বসায়, অজস্র চপেটাঘাতে নিজের ভাবনাবলয়টা যদি ফাটে, বেশ হয়।

খেলা দেখা ছাড়া প্রায়ই একা একা সিনেমা দেখে বিপুল, পর্দার নায়িকার লাস্যে কৌতুক বোধ করে, যতই নাচাগানা, ইশারা কর না কেন, তুমি একমাত্রিক পর্দা বই তো নয়, মৃত তেজপাতার মতো ঝাঁঝও নেই তোমার শরীরে। নাইট শো শেষ হলে, শূন্য অন্ধকার হলে, সাদা পরদার ওপর হেঁটে যাবে টিকটিকি।

চারপাশটা বড় মেকি লাগে বিপুলের। স্বাদবৈচিত্র্যহীন। জীবনের অনিবার্য উত্তাপ সে পেয়েছিল নিজের রক্তের সম্পর্কের মধ্যে। শীলা তার মাসির মেয়ে, ঠাঁই নিতে এসেছিল তাদের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। প্রথম প্রথম খুনসুটির নামে অহেতুক গা ছোঁয়াছুঁয়ি। সাহস বাড়তে থাকে। চোখে আশ্চর্য বিদ্যুৎ জ্বেলে শীলা ঢুকে যেত বাথরুমে, দরজায় ছিটকিনি লাগাত না।

বিশাল বাড়িতে মা-বাবা যে তখন কোথায়, কোন ঘরে... বাড়ি জুড়ে চড়াইয়ের কিচকিচ... সম্মোহিতের মতো বিপুল পৌঁছে যেত অপার নগ্ন সৌন্দর্যের সামনে। শরীর চেনাত শীলা। শান্ত জলে ফুটে ওঠা পদ্মর মতন স্তনযুগল। নাভিতে চাঁদের অস্পষ্ট গহ্বর। নাভির পরেই নদীর অববাহিকা। কলাগাছের মতো মসৃণ উরু, শরীর জুড়ে ভিজে চুম্বক গন্ধ। কখনও ঘোর ভেঙে বিপুল বলে উঠত, আমরা খুব অন্যায় করছি শীলা। সম্পর্কে আমরা ভাই-বোন।

তাতে কী হয়েছে! কেউ তো জানতে পারছে না। তা ছাড়া নিজের মায়ের পেটের তো নয়। তোমাদের বাড়িতে আছি, খাচ্ছি, পরছি, তোমাকে একটু আরাম দিতে ইচ্ছে করে না।

শীলার যুক্তির ভুল-ঠিক বিচার করার ক্ষমতা বিপুলের ছিল না। আশ্বাস বলতে একটাই, ব্যাপারটা গোপন থাকছে।

থাকল না। বেশ দেরি করে হলেও, মা বোধহয় কোনওভাবে টের পেয়েছিল। মাবাবা দুজনেই শান্ত স্বভাবের ভাল মানুষ। শীলা বা বিপুলকে বকাঝকা, ভর্ৎসনা কিছুই করল না। পাত্রী দেখতে লাগল ছেলের জন্য। বেঁকে বসল শীলা, আত্মহত্যার হুমকি দিল।

বিপুলের মতো সদাত্রস্ত ছেলের পক্ষে যা ওভারডোজ। শীলার কাছে সারেন্ডার করল বিপুল। তারপর যা যা করার শীলাই করিয়েছে, কালীঘাটে বিয়ে, আলাদা বাসা ভাড়া, সায়কের জন্ম...

শীলার কোনও দোষ নেই। সে তার শরীরের শুদ্ধতা বজায় রেখেছে। মা- বাবার রাগ অন্যায্য নয়, ছেলের অনাচার মেনে নিতে পারেনি। হিসেবমতো বিপুল ডবল অপরাধী।

শীলার ঠেলাতেই মাসে একবার মা-বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াত বিপুল, আধো কুশল বিনিময়, কিছুটা নির্বাক উপস্থিতি দিয়ে, ঘাড় নিচু করে ফিরে আসত বাড়ি। চলে যাচ্ছিল এভাবেই। হঠাৎ একদিন অফিসের আড্ডায় উঠে এল গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ, শুভময় সেদিন অসবর্ণ বিয়ের পক্ষে যুক্তি সাজাচ্ছিল, ওর বক্তব্য সংকর বিবাহ ভবিষ্যৎ সমাজকে সুদৃঢ় করবে। জাতিভেদ মেনে বিয়ে এক্ষুনি উঠিয়ে দেওয়া উচিত। ক্রসবিট-এর সন্তান সবসময় উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়।

একটু দূরে নিজের চেয়ারে বসে আড্ডায় কান রেখেছিল বিপুল। শুভময়ের কথাটা তাকে

রীতিমতো ভয় পাইয়ে দেয়। তক্ষুনি আলোচনায় ঢোকা যাবে না, অফিসের অনেকেই জানে বিপুল বিয়ে করেছে মাসির মেয়েকে। কীভাবে জানি কথাটা চাউর গেছে। যদিও বিপুলকে মনে রেখে আলোচনাটা হচ্ছিল না। কথায় কথায় চলে এসেছিল প্রসঙ্গ। বিপুল যদি আড্ডায় ঢোকে সমগ্র আলোচনাটার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবে সে।

দাঁত চেপে ছুটি অবধি অপেক্ষা করল বিপুল। অফিস থেকে বেরোনোর সময় শুভময়ের পিছন ধরল। শুভময় ছেলেটা ভাল। যুক্তি, বুদ্ধি সমেত ঠান্ডা মাথার মানুষ। শুভময়ও জানে বিপুলের বিয়ের বৃত্তান্ত।

এটা-সেটা বলতে বলতে দুই বন্ধু হেঁটে যাচ্ছিল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। এর ফাঁকে খুবই সন্তর্পণে বিপুল কথাটা তোলে, হ্যাঁ রে শুভময়, তুই যে তখন বললি, সংকর বিয়ে খুবই জরুরি, কিন্তু আমি তো বিয়ে করেছি....

বিপুলের উৎকণ্ঠা তুচ্ছ করে হেসেছিল শুভময়। কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, ধুর, ওসব তত্ত্ব আমি আড্ডা জমানোর জন্য বলি। এর বিপরীত যুক্তিও আমার কাছে আছে।

যেমন? জানতে চেয়েছিল বিপুল।

শুভময় বলে, যুগ যুগ ধরে আমাদের রক্তে এত ধরনের মিশ্রণ হয়েছে, ক্রসবিট তত্ত্ব আর খাটে না।

তবু, যদি খুব ক্লোজ আত্মীয়র মধ্যে বিয়ে হয়?

বায়োলজিকাল কিছু প্রবলেম হলেও হতে পারে। রক্তের গ্রুপ-টুপ নিয়ে জটিল সব ব্যাপার। তেমন বুঝলে ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে নিস।

আর ছেলেটা, ওর কিছু হবে না তো? ভয় পাওয়া গলায় জানতে চেয়েছিল বিপুল। শুভময় হেসে ফেলে। বলে, তোর মাথায় তা হলে এই চিন্তা ঢুকেছিল। ঝেড়ে ফেল। তোর ছেলে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তেমন কোনও গণ্ডগোল থাকলে আগেই টের পেতিস। কত বয়স হল যেন ওর?

ন বছর। শুকনো গলায় বলেছিল বিপুল।

শুভময়ের আশ্বাসে ভয় কিছুটা কেটেছিল। কিন্তু ছেলের ওপর একটু বেশি নজর রাখা শুরু করল বিপুল। সায়কের প্রতিটি আচার-আচরণ লক্ষ করত খুঁটিয়ে। ওর বয়সি ছেলেদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে কি মেধা, শারীরিক ক্ষমতা, উচ্ছ্বাস প্রকাশে?

এমন সময় রেজাল্ট ভীষণভাবে খারাপ করে বসল সায়ক। বিপুল নিশ্চিত হল, এই সেই রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে করার কুফল। ধারণাটা কাউকে বলতে পারল না সে। নিজের ভাবনাবলয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল কথাটা। অসহায়ভাবে চেষ্টা শুরু করল ছেলের মেধা বাড়ানোর। অফিস থেকে অনেক আগেই ফিরে আসত বাড়ি। শীলার নানান প্রশ্নে জেরবার হয়ে অফিসের পর কলকাতার রাস্তায় দু ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ি ঢোকে এখন। এসে পড়াতে বসে যায় ছেলেকে। বুঝতে পারে, ছেলে কতটা পিছিয়ে আছে। বিশাল একটা গ্যাপ। মেক-আপ করা যাবে কি?

বেশ কিছুদিন হল শীলার পাশে শুতে গেলে আবছা নিজের মায়ের গন্ধ পায় বিপুল মাসির মেয়ে তো, তাই।

আজ মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল বিপুল। বাবার শরীর খারাপের ছুতো দিয়ে রোজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোয়, মনে অশুভ সম্ভাবনা ঘোরাফেরা করে, যদি সত্যি হয়ে যায় মিথ্যেটা। বাড়ি গিয়ে দেখল, সদরে তালা ঝুলছে। ধক্ করে উঠেছিল বুক। বাবা-মা তাকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেল। নাকি সত্যিই দুজনের কেউ একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, গেছে ডাক্তারের কাছে অথবা হাসপাতালে? একমাত্র সন্তানকে মন থেকে এমনভাবে বাতিল করেছে, অফিসে ফোন করার প্রয়োজন বোধ করেনি!

দিন শেষের হলুদ আলো তখন বন্ধ দরজায়। প্রবল দুশ্চিন্তায় মাথা ভারী হয়ে আসছিল বিপুলের। এত বড় বাড়িতে বুড়োবুড়ি একা থাকে, যে-কোনও সময় কিছু হয়ে গেলে দেখার কেউ নেই। বিপুল বাবাকে কতবার বলেছে, কিছুটা অংশ ভাড়া দাও।

রাজি হয়নি বাবা। বলেছে, পাড়ার লোকে চর্চা করবে।

কী চর্চা?

তোমার বাড়ি থাকতেও ভাড়াবাড়িতে থাকো। আমি বাইরের লোককে ভাড়া দিলাম এই বাড়ি। ব্যাপারটা বড় চোখে লাগার মতো।

কথা বাড়ায়নি বিপুল, বাবার পরের কথাগুলো তার বিরুদ্ধে যেত। —আজ কিন্তু মনে হচ্ছিল মান-অভিমান বড় কোনও ক্ষতি না করে দেয়। এমনিতেই অপরাধবোধে কুঁকড়ে থাকে বিপুল।

পাড়ার শুনশান গলি, তালাবন্ধ দরজার ওপর হলুদ আলো কেমন যেন ছমছম করছিল।

সদরের দুপাশে বেঞ্চ টাইপ বাঁধানো লাল রক, বসে পড়েছিল বিপুল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো কুকুর জুটে গেল সামনে। ওরা সম্ভবত বিপুলকে চেনে না, পাড়া ছাড়ার পর জন্মেছে। তবে চেঁচামেচি না করে, বিপুলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। বাক্‌শক্তি থাকলে হয়তো বলে দিত কোথায় গেছে বাড়ির মালিক। —এভাবে বেশ কিছুটা সময় যাওয়ার পর পাশের বাড়ির জয়া কাকিমা দৌড়তে দৌড়তে এল, আরেঃ, কখন এসেছিস তুই? বাড়ি বন্ধ দেখে আমার কাছে যাবি তো!

মা-বাবা কোথায় কাকিমা? উদ্বেগ চেপে জানতে চেয়েছিল বিপুল।

কাকিমা কোমর থেকে চাবিগোছা বার করে বিপুলের হাতে দেয়। বলে, বেলুড় মঠে গেছে। এই হল মায়ের মন! যাওয়ার সময় দিদি আমার হাতে চাবিগোছা দিয়ে বলল, বিপুলটা অনেকদিন আসেনি, হঠাৎ এসে যেতে পারে, দোর খুলে দিয়ো।

চাবি কাকিমার হাতে ফেরত দিয়েছিল বিপুল, বলেছিল, মাকে বোলো কাল আবার আসব।

চল। সে কী, অফিস থেকে তেতেপুড়ে এলি, একটু চা-জল খাবি না! চল, আমার বাড়ি।

বিপুল মাথা নেড়ে মিথ্যে বলেছিল, একটু আগেই নেড়ার দোকানে চা খেয়েছি।

সদরের সামনে থেকে চলে আসার সময় পুরো বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়েছিল বিপুল, মনে হয়েছিল, এই সেই অন্ধ কুয়ো, যার ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়েও আমি ঠিক বেরোতে পারিনি। এই বাড়ি গ্রাস করে রেখেছে আমার অস্তিত্ব। অপ্রয়োজনীয় বিশাল জায়গা জুড়ে বাড়ি, অতিরিক্ত নির্জনতার মধ্যে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ওভার-প্রোটেকশন। আসলে ফসকা গেরো। যৌনতার স্বাদ এ- বাড়িতেই, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে। বাইরের বাতাস সেভাবে হৃদয় ছুঁতে পারেনি বিপুলের।

নিজেদের গাড়ি চেপে স্কুল-কলেজ গেছে। একদিন কলেজ ফেরত দেখল, বাড়ির দেওয়ালে মাও সে তুঙ-এর ছবি। স্টেনসিলে ছাপা। লেখা আছে, বিপ্লবের শত্রু শ্রেণিশত্রুকে খতম করো/ চিনের চেয়ারম্যান আমাদেরও চেয়ারম্যান। —লাল রঙে লেখা ছিল কথাগুলো। বিপুলের মনে হয়েছিল, এই প্রথম তার অন্ধকূপে কারা যেন আঁচড় কেটে গেল। ছেলেগুলোর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব।

দু-চারবার রাতেরবেলা পাড়া-গলিতে ওদের পায়ের শব্দ পেয়েছে বিপুল, পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। বিকম পাস করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা জুতে দিল নিজের বন্ধুর কোম্পানিতে। বেকার জীবনটাও জানা হল না বিপুলের। — নিরাপদ, সুরক্ষিত অবস্থায় থাকতে থাকতে হাঁফ ধরে যায়, বাবা-মা সুস্থ আছে জানার পর বন্ধ বাড়িটা দেখে আজ ভালই লাগছিল বিপুলের। মনে হচ্ছিল, কুয়োর বাইরে চলে এসেছে। বাড়িটা যেন চিরকাল বন্ধই থাকে।

বাড়ির সামনে থেকে ফিরে আসার সময় বিপুল যেন শুনতে পাচ্ছিল অবরুদ্ধ নিজের কিশোরবেলার ডাক, কোথায় যাচ্ছ বিপুল? কোথায়....

অন্য দিনের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছিল। শীলা স্কুল থেকে ফেরেনি। ছেলে ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে। কাজের মেয়ে লতা মামাবাবুকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করেছিল, চা করে দিই?

বাসে আসার সময় মাথাটা ধরে গিয়েছিল বিপুলের, চা খেয়ে খানিক উপশম হল।

আধঘণ্টা হয়ে গেল বিছানায় শুয়ে আছে সে। ঘর অন্ধকার। ফ্যান চলছে ফুল স্পিডে। শীলার ফিরতে এত দেরি হয়?—সায়ককে তুলে পড়াতে বসলে হত, শীলা ফিরলে বসা যাবে। চিন্তা হচ্ছে শীলার জন্য। রোজই এত দেরি হয় কি না, লতাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। ইচ্ছে করছে না, লতা হয়ে কথাটা পৌঁছবে শীলার কানে, উৎকণ্ঠা অনুদিত হবে না। শীলা ভাববে, নেহাত কৌতূহল অথবা সন্দেহ করে খোঁজ নিয়েছে বিপুল।

হাত চলে গেছে কপালে। নিজেই নিজের মাথা টিপছে বিপুল।

মামাবাবু, আমি টিপে দেব? চাইনিজ বামটা নিয়ে আসি?

চোখ খুলে লতাকে একবার দেখে বিপুল, হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

মৌনতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে লতা ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার খুলে বাম নিয়ে আসে। বিপুলের শরীরের ওপর ঝুঁকে কপালে ওষুধটা লাগাতে যেতে, বিপুল চাইনিজ বামের ঝাঁঝালো গন্ধের আগে লতার শরীরের কামগন্ধ পায়। মেয়েটি উদ্ভিন্নযৌবনা... মালিশের হাত লতার ভাল। সেটা সম্ভবত নিজেও জানে, বিনা সংশয়ে জানতে চায়, আরাম পাচ্ছেন?

চোখ বন্ধ অবস্থায় ঘাড় হেলায় বিপুল। লতার আঙুল কপাল ছেড়ে, মুখ ডিঙিয়ে নেমে আসছে কাঁধে, বুকে। আসার ভঙ্গি অনায়াস। সত্যিই খুব আয়েস বোধ করছে বিপুল। আরাম ছুঁয়ে ক্রমশ কাম জাগ্রত হচ্ছে। বিপুল বুঝতে পারে লতার আঙুল কামনা আদায়ে অভিজ্ঞ।... সতর্ক হওয়ার আগেই বিপুল টের পায়, ইন্দ্রিয় তার অবাধ্য হয়ে পড়ছে। প্রায় মুখের কাছে বুক এনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে লতা। বিপুলের লুঙ্গির দিকে তাকিয়ে লতা হাসছে।

কান-মাথা গরম হয়ে পুড়ে যাচ্ছে বিপুলের, অনেকদিন পর, অনেকদিন পর.... লতার বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছে বিপুল, যতটা কিশোরী দেখায় মেয়েটিকে, ততটা নয়। কী অসম্ভব ঝাঁঝালো কামগন্ধ মেয়েটার শরীরে। রক্তের সম্পর্কের নয় বলেই এত তেজ, গন্ধময়।

লতার উশকানিতে বিপুল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছে বিপুল। জানে, বিভ্রম, তবু পাচ্ছে শুনতে। পাহাড়ের কোলে বুদ্ধ মন্দির থেকে ভেসে আসছে পবিত্র ধ্বনি। বিপুলকে পাপ থেকে নিরস্ত করতে চাইছে। বিপুলও সংযত হতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। পারছে না, হেরে যাচ্ছে... এক সময় ওই ঘণ্টাধ্বনি কলিংবেলের শব্দে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ছিটকে সরে যায় লতা। অস্ফুটে বলে, মাইমা এল বোধহয়।

বিপুল নিশ্চিত, এটা শীলার বেল টেপার শব্দ। অধঃপতনে নিয়ে যাওয়ার অধিকার শীলা এত সহজে ছাড়বে না।

দরজা খুলতে গেছে লতা। নিজেকে লুকোতে উপুড় হয়ে শোয় বিপুল। কী রে, এত দেরি হল কেন খুলতে? চৌকাঠ থেকেই লতাকে জিজ্ঞেস করে শীলা। অপ্রতিভতা কাটিয়ে লতা চটজলদি উত্তর দেয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

ভ্রূ কুঁচকে যায় শীলার, খর চোখে তাকায় লতার দিকে, মেয়েটার চোখেমুখে ঘুমের রেশ মাত্র নেই। চেহারায় কেমন একটা উদগ্র অবিন্যস্ত ভাব। —অন্যমনস্ক হয়ে চটি জোড়া খুলতে যায় শীলা, ভারী জুতোর সঙ্গে ঠেকা লাগে। অবাক হয়ে মেঝের দিকে তাকায়, বিপুলের শু্য! বিস্মিত কণ্ঠে লতার কাছে জানতে চায়, তোর মামাবাবু ফিরে এসেছে?

মাথা নিচু রেখে লতা বলে, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ফিরেছেন। মাথা ধরেছিল, চা দিয়েছি। এত কিছু জানতে চায়নি শীলা, কিছু একটা চাপা দেওয়ার জন্য বেশি কথা বলছে কি লতা? চোখে চোখ রাখছে না কেন? ফ্রকটা কি একটু বেশি ঘাঁটা, চুল অগোছালো, সমুদ্রতটে ঝড়ের পর ঝাউগাছ যেমন নুয়ে যায়, তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লতা! আচমকা বুকটা ফাঁকা হয়ে যায় শীলার। চটি ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে। ঘরময় চাইনিজ বামের গন্ধ

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে শীলা দেখে, বিপুল উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। গুটিয়ে আছে পিঠের গেঞ্জি। লুঙ্গি থেকে বেরিয়ে পুরুষ্ট পা। —ওর দিকে তাকিয়ে নিজের সর্বনাশটা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় শীলা। —অনাচারের ঘিনঘিনে গরম ভাপ উঠে আসছে বিপুলের ভঙ্গি থেকে। চোখ, মুখ জ্বলে যাচ্ছে শীলার। হায় হায় করে উঠছে বুক। হতাশ দৃষ্টি বোলায় ঘরের

চারপাশে। সায়ককে খোঁজে। নেই। হয়তো পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। এ-ঘরের অন্ধকার কোণে প্রেতিনীর মতো দাঁড়িয়ে আছে লতা। বিড়ালের মতো জ্বলছে ডাইনির চোখ... কী করবে ভেবে পায় না শীলা। কোনও প্রমাণ নেই। কিছুই বলা যাবে না এদের। অথচ এই ঘরের বাতাস বলে দিচ্ছে সব। বাতাসের ভাষা বোঝার ক্ষমতা ঈশ্বর একমাত্র মেয়েদেরই দিয়েছেন।

ঘর থেকে হনহন করে বেরিয়ে যায় শীলা। বারান্দায় গ্রিলের সামনে দাঁড়ায়। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার। কেন গেল দেবপাড়ায়? তার দেরির জন্য এত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল। দিদির বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। রাসতলা স্টপেজ থেকে ফিরে এসেছে। ভীষণ সম্মানে লাগছিল, দিদির কাছে যাওয়া মানে তো হেরে যাওয়া নিজের কাছে। তারপর যদি অবিনাশদার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, তার এতদিনকার জেদ মিশে যেত ধুলোয়।

আর একবার ঘুরে দাঁড়াতে চেয়ে রাসতলা স্টপেজে নেমে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাড়ি ফেরার বাস ধরে। এইটুকু সময় ব্যয়ে ক্ষতি হয়ে গেল অনেকটা!

ফের দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় শীলা, নাঃ, মেয়েটাকে আজই, এক্ষুনি তাড়াতে হবে। — পা বাড়াতে গিয়ে একটু থামে শীলা, নিজের বাড়িটাই কেমন যেন অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে প্রথমবার ঢুকছে। যে দ্বিধা, সংশয়ে একদিন মজফফরপুরের মামার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল, তার বছর কয়েক পর সুকিয়া স্ট্রিটে মাসির বাড়ির সামনে, আজ মনে হচ্ছে একই আড়ষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নতুন বাড়ির দোরগোড়ায়। উদ্বাস্তুর মতো।

॥ পঁচিশ ॥

ক্যানিং স্ট্রিটের খেলনার দোকানটা আজ ফের খুঁজে পাচ্ছেন না অবিনাশ। হপ্তাখানেক আগে এসেছিলেন। অবিনাশের মেজ শালা সুখেন দোকানটায় কাজ করে।

এমনিতে প্রয়োজন পড়ে না আসার। অপূর্বকে দেখা করতে বলার জন্য এসেছিলেন আগের দিন। ঠিকানা সুখেন দিয়ে রেখেছিল, সেদিনও দোকানটা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হয়।

এখানকার দোকানগুলো সব এক রকম দেখতে। খেলনাপাতি বাইরে যা ঝুলছে, একই টাইপের। কত ধরনের খেলনা, কাদের ছেলেরা খেলে এসব! অবিনাশ নিজের ছেলে দুটোকে জীবনে যে-কটা খেলনা কিনে দিয়েছেন, হাতে গুনে বলা যায়। ছেলেদের বায়না নেই তেমন।

ফুটপাতের এক দোকানিকে সুখেনদের দোকানের নাম্বারটা বললেন অবিনাশ। জানতে চাইলেন, দোকানটা কোথায়।

দোকানি হাত তুলে দেখিয়ে দিল। এবার এক চান্সে চিনতে পারলেন অবিনাশ। ক্যানিং স্ট্রিটের গোলকধাঁধা হঠাৎ কেটে গেল যেন।

দোকানের সামনে এসে দেখেন, প্রচুর ভিড় কাউন্টারে। সুখেনের মারোয়াড়ি মালিক ক্যাশবাক্স আগলে তাকিয়ায় হেলান গদিতে বসে আছে। সুখেন ছাড়াও আর একটা কর্মচারী ছোটাছুটি করে কাস্টমার সামলাচ্ছে। দুজনের মধ্যে সুখেন যে পুরনো, দক্ষ কর্মচারী, কাজের ধরন দেখেই বোঝা যায়।

এখন যে ভিড়টা হয়েছে, অফিসফেরত বাবুদের ভিড়। ছেলেমেয়ে অথবা কারও জন্মদিন উপলক্ষে উপহার কিনতে এসেছে। এই ভিড় সামলানো খুব ঝামেলার কাজ, আগের দিন এসে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন অবিনাশ। সুখেন সেদিন তাঁকে দেখতে পাওয়ার আধঘণ্টা পর কাউন্টার ছেড়ে বেরোতে পারে।

আজ কতক্ষণ লাগবে কে জানে! সুখেন বলছিল, দুপুরের পর মোটামুটি ফাঁকা থাকে। পাইকারি খরিদ্দার সওদা করে ততক্ষণে ফিরে যায় শহরের অন্য প্রান্তে, মফস্বলে।

বিকেলে আসার উপায় নেই অবিনাশের, অফিসে তখন পিক-আওয়ার। হাওড়া স্টেশনে ফেরার পথে দেখা করে যাচ্ছেন অবিনাশ। কিন্তু ভিড়ের পিছনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে, রাত হয়ে যাবে।

সুখেনের চোখে পড়ার জন্য ভিড় ঠেলে এগোলেন অবিনাশ। ঘাড়ে, মাথায় হাওয়াপুতুল ঝুলছে। থামে টাঙানো ডলপুতুল, প্লাস্টিকের জোকার, খেলনা বন্দুক। বিচ্ছিরি একটা ধাক্কা খেয়ে অবিনাশ পড়লেন জোকারের গায়ে, পুতুল জোকার সহসা খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল।

রীতিমতো অপ্রস্তুত হলেন অবিনাশ, একই সঙ্গে লক্ষ করলেন, আওয়াজের ফলে অনেকেই তাঁর দিকে তাকিয়েছে, সুখেনও।

হাতের ইশারায় সুখেন বলে, একটু অপেক্ষা কর, এক্ষুনি আসছি।

সুখেনকে এ ধরনের দোকানে দেখে খারাপ লাগে। টিপিকাল চাকর-বাকরের মতো আছে, খাটছে গাধার মতন। বোতাম আলগা শার্টের ফাঁক দিয়ে ধবধবে পৈতে দেখা যাচ্ছে। রোজ কাচে বোধহয়। ওটাকে এখন ক'গাছা সুতো ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়ান অবিনাশ। সুখেনকে দেখলে শ্বশুরমশাইয়ের চেহারাটা চোখে ভাসে, বাবার মতোই লম্বা-চওড়া, ফরসা সুখেন। তফাত শুধু বাজখাঁই গলা আর তাগড়াই গোঁফের। ও দুটোই শ্বশুরমশাইয়ের পার্সোনালিটি অনেকটা বাড়িয়ে দিত। তুলনায় সুখেন হচ্ছে সুদর্শন পাকা বীজকলা মাত্র। ব্রাহ্মণের বদনাম। তবে এটাও ঠিক উচ্চবংশের গুমোর

নিয়ে সুখেন যদি বসে থাকত মছলন্দপুরের সংসার চলত না। —একটা ব্যাপার মনে পড়তে, মুখে আপনা-আপনি হাসি খেলে যায় অবিনাশের, শ্বশুরমশাইয়ের ব্যক্তিত্ব একজনের সামনে একদম নস্যাৎ হয়ে যেত। তিনি হচ্ছেন অবিনাশের পিতা। হাইট মাত্র পাঁচ দুই কি তিন, গায়ের রং শ্যামলা। কীর্তনীয়াদের মতো ঘাড় অবধি চুল, কপালে সব সময় চন্দনের টিকা।

ছ ফুটের ওপর শ্বশুরমশাই বাবাকে যমের মতো ভয় পেতেন। কথা বলার সময় গলার স্বর পালটে যেত। গাম্ভীর্যের আড়াল থেকে বাবা মাঝে মাঝে শ্বশুরমশাইয়ের পিছনে লাগতেন। যেমন, বেয়াইমশাই, আপনি কিন্তু খুব সেয়ানা লোক!

সঙ্গে সঙ্গে জোড়হাত করে শ্বশুরমশাই জানতে চাইলেন, ক্যান, আমার অপরাধটা কী?

আমার ছেলেকে গৃহশিক্ষক রেখে, বিনা পণে দিব্যি পার করলেন একটা মেয়ে, নিজে তো বিয়ের সময় পণ নিতে ছাড়েননি। সরকারি কনট্রাক্টারের ছেলে বলে কথা!

বাবার কথা শুনে জিভ কেটে, কান ছুঁয়ে শ্বশুরমশাই বলতে লাগলেন, আপনে হয়তো! শোনছেন, বাবার লগে পটত না আমার। মামার আশ্রয়ে থাকতাম। সে-বাড়ির অবস্থা ভাল না। তবে মামা-মামির মন ছিল খুব উদার। তাগো দুর সম্পর্কের এক গরিব আত্মীয়কে কন্যাদায় থিকা বাঁচাইতে আমারে পাত্র হিসাবে সঁইপা দেন।

কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছেন। তখনকার দিনে পণ ছাড়া বিয়েই হত না।

শ্বশুরমশাই উত্তর দিলেন, ওই নামমাত্র। দু-চারখান তৈজসপত্র, শয্যা, সামান্য কিছু গয়না। আর কুড়ি টাকা নগদ

তখনকার দিনে খারাপ কিছু না। তুলনায় মেয়েকে পার করলেন ফাঁকি দিয়ে। বিচারটা ঠিক হল না।

বাবার কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলেন প্রসন্ন চক্রবর্তী, অসহায় চোখে খুঁজতে লাগলেন জামাই অবিনাশকে। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অবিনাশ হাসি চেপে ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন। বাবার রসিকতার ধরন তাঁর জানা।

আর একবার শ্বশুরমশাইকে নস্যির নেশা ধরাবেন বলে উঠেপড়ে লেগেছিলেন বাবা। নিরুপায় হয়ে শ্বশুরমশাই নিতেন, ঠিক সহ্য হত না। হেঁচেকেশে একসা। কিছু বলতেও পারতেন না বেয়াইমশাইকে।

সেই প্রসন্ন চক্রবর্তীকে মছলন্দপুরের বাড়িতে চেনা যেত না, কী দাপট। ছোটখাটো চেহারার বাবার সামনে শ্বশুরমশাইয়ের গুটিয়ে থাকা নিয়ে অনেক ভেবেছেন অবিনাশ, শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, পিতা ব্রজসুন্দরের চেহারা আর্যদের মতো না হলেও, রক্তে ছিল বিশুদ্ধ আর্য প্রভাব। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

ইস্, অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম তোমাকে।

সুখেনের গলা শুনে ঘাড় ফেরান অবিনাশ। এই কদিনে শীত পড়েছে বেশ। সুখেন তবু ঘামছে। ফের বলে, কী করব বল, খদ্দের আমি ছাড়া মাল নিতে চায় না। মনে মনে হাসেন অবিনাশ, কত অল্পতেই কৃতার্থ বোধ করছে সুখেন। জীবনের কাছে তার চাহিদা সামান্য। নাকি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে?

চল, ওই দোকানটায় চা খাওয়া যাক। হাত তুলে উলটোদিকের ফুটপাতের চা-দোকান দেখায় সুখেন।

রাস্তা পার হয়ে দুজনে দোকানের সামনে দাঁড়াল। সসপ্যানে চা ফুটছে। পুরোটাই দুধের চা। ছোট এলাচ দেওয়া থাকে। ফুটন্ত চায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে অবিনাশ বলেন, অপূর্ব তো এল না! তুমি বলেছ ওকে?

বলেছি। তোমার কাছে যায়নি যখন, ধরে নাও চাকরি করার ইচ্ছে নেই। খানিকটা হতাশার সঙ্গে কথাগুলো বলে সুখেন।

অবিনাশ সাজাতে থাকেন পরের কথা। প্রবাল সামন্ত অফিসে ঘুরে যাওয়ার পর অবিনাশ মরিয়া হয়ে অপূর্বর জন্য চাকরি খুঁজতে লেগেছিলেন। যেভাবে হোক অপূর্বকে মছলন্দপুর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। পুলিশ একবার যখন নাগাল পেয়েছে ওর, ফাঁসিয়ে ছাড়বে। অপূর্ব

নকশাল হয়ে গেছে, পুলিশ খুঁজছে, একথা ইলা বা অন্য কাউকে বলতে পারেননি অবিনাশ। চেষ্টাচরিত্র করে চাকরি একটা জোগাড় হয়েছে। অফিসের অমিতাভর ফ্যামিলি বিজনেস, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে।

অমিতাভ ওর বাবাকে বলে ম্যানেজ করেছে চাকরিটা। অ্যাকাউন্টসের কাজ। মাইনে ভদ্রস্থ। ফ্যাক্টরিটা বেহালায়, থাকতে হবে অফিস কোয়ার্টারে। এত ভাল অফার, তবু কেন উৎসাহ দেখাচ্ছে না অপূর্ব!

চা-দোকানের ফরমাশ খাটা ছেলেটা দুজনকে ভাঁড়ে চা দিয়ে যায়। চুমুক মেরে অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, তুমি সব গুছিয়ে বলেছিলে তো? কী চাকরি, কত মাইনে?

বলেছি।

শুনে কী বলল?

বলেছিল, ঠিক আছে, দেখা করে নেব জামাইবাবুর সঙ্গে। কিন্তু কোথায় কী, সারা দিন টো-টো করে ঘুরছে। ও আসলে বুঝতেই পারে না, চাকরিটা ওর জন্য এবং সংসারের পক্ষে কতটা দরকার।

সারা দিন কোথায় ঘোরে? কী করে? জানতে চান অবিনাশ।

খুবই বিরক্তির সঙ্গে সুখেন বলে, কী আবার, পার্টি। মাঝে কিছু মাস ক্ষান্ত দিয়েছিল। তোমাদের বাড়িতেও ছিল বেশ কদিন। মছলন্দপুর ফিরে আবার সুধাংশু জ্যাঠার সঙ্গে ভিড়ে গেছে।

অবাক এবং আশ্বস্ত দুটোই হন অবিনাশ। সুধাংশুবাবুকে চেনেন তিনি। ডাকাবুকো সি পি এম লিডার। নানান জায়গায় সি পি এম কর্মী-নেতারা যেখানে লুকিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সুধাংশুবাবু নিজের এলাকাটা দুর্গ বানিয়ে রেখেছেন। সেই দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে অপূর্ব। কীভাবে নিল? সুধাংশুবাবু কি ওর নকশাল পরিচয় জানেন না! পরে যখন জানবেন কী অবস্থা হবে অপূর্বর। পুলিশ, কংগ্রেস পার্টি, ওর নিজের পার্টি, সি পি এম... কেউ অপূর্বকে ছেড়ে দেবে না। —যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে যায় অবিনাশের, দ্রোণের পরামর্শ মতো কর্ণ পিছন থেকে গিয়ে অভিমন্যুর ধনু ভেঙে চুরমার করল। পিছন থেকে আক্রমণ যুদ্ধের নিয়ম নয়। দ্রোণ সেনাপতি হওয়ার পর কৌরবদের এ ধরনের ঘৃণ্য যুদ্ধে নামিয়েছিলেন। এই সময় কংগ্রেসের অনেক লিডারের মধ্যে দ্রোণের ছায়া পাওয়া যায়। অভিমন্যুর অশ্ব ও সারথিকে মারল কৃতবর্মা, পার্শ্বরক্ষককে বধ করল কৃপাচার্য। দ্রোণ এক বাণে অভিমন্যুর তলোয়ার ভেঙে দিলেন। নিরস্ত্র অভিমন্যু রথের চাকা তুলে নিয়ে দাঁড়ালেন রুখে। যেন সুদর্শনচক্র হাতে আর এক শ্রীকৃষ্ণ!

ওই দৃশ্য দেখে ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল শত্রুপক্ষ। ঘোর কাটতে বন্য ব্যাধের মতো নিরস্ত্র অভিমন্যুকে ঘিরে ধরল সকলে...

তুমি আমি ভেবে কী করব বল!

সুখেনের কথায় নিজের মধ্যে ফেরেন অবিনাশ। সুখেন বলে যায়, কিছু মানুষ থাকে, চিরকালই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে যায়। আমাদের অপূর্বটা সেরকমই, তুমি হাতে ধরে দিচ্ছ চাকরি, সে দেখা করছে না! সবই আমাদের কপাল।

শূন্য ভাঁড় ছুড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সুখেন। অবিনাশ সান্ত্বনার সুরে বলেন, তুমি আর একবার ওকে বলো। যদি না শোনে, আমি না হয় যাব মছলন্দপুরে। সুখেনের কোনও বিকার নেই। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। অবিনাশ ভাবছেন এবার বিদায় নেওয়া যাক, ঠিক তখনই সজল চোখ তুলে অবিনাশের দুটো হাত ধরে নেয় সুখেন। বলে, এটাও ঠিক, ঈশ্বর সবেতেই ফাঁকি দেননি। তোমার মতো জামাই দিয়েছেন আমাদের। কজনের কপালে এরকম হয়। তুমি আমাদের কথা যতটা দরদ দিয়ে ভাব...

সুখেনকে থামাতে ওর কাঁধে হাত রাখেন অবিনাশ। বলেন, সন্ধে গড়িয়ে যাচ্ছে, আমি এগোই, তোমার বোন চিন্তা করবে।

ঢোঁক গিলে নিজেকে সামলায় সুখেন। অবিনাশের হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ, তুমি এস

যত বেলা হবে ট্রেনে ভিড় বাড়বে। অপুকে আমি ফের বোঝাব, দেখি কী করে। তোমায় কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না। কী কথা হল আমি বাড়িতে গিয়ে বলে আসব।

কষ্ট আমার কিছু হয় না। তোমাদের দোকান আমার অফিসের পথেই পড়ে। তবে দেবপাড়ায় যদি আস, ভালই লাগবে। ইলাও খুশি হবে। চলি। বলে, ঘুরে যান অবিনাশ। ক্যানিং স্ট্রিটের গলিতে এখন গিজগিজ করছে ভিড়। দুপা এগিয়েছেন, পিছু ডাকে সুখেন, অবিনাশ, একটা কথা... ঘুরে দাঁড়ান অবিনাশ। কপালে ভ্রূকুটি। সুখেন বলে, আর একটু অপেক্ষা করবে ভাই, অংশু বরুণের জন্য চাইনিজ চেকার আর ব্যাগাডুলি বেঁধে রেখেছি, নিয়ে যাবে? বরুণটাকে কথা দিয়েছিলাম।

না। তুমি তো আসছই, তখন নিয়ে এস।

'যথা আজ্ঞা' টাইপের ঘাড় হেলায় সুখেন। মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা শুরু করেন অবিনাশ। তিনি আর একবারও পিছন ফিরে তাকাবেন না। জানেন, সুখেন তাঁর অদৃশ্য হওয়া অবধি করুণ চোখে তাকিয়ে থাকবে। নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ওই মলিন চেহারা অবিনাশকে মাপে ছোট করে দেয়। ইলাকেও। মনেই হয় না ইলা ওদের বাড়ির মেয়ে। অবিনাশের একটা ব্যাপারে গভীর আশঙ্কা আছে, তাঁর দুই সন্তানের ওপর মামারবাড়ির প্রভাব খুব বেশি পড়বে না তো? আর একজন তো পৃথিবীর আলো দেখার জন্য খুব দাপাদাপি করছে ইলার পেটে। ইলার এখন ছ মাস।

ইচ্ছে ছিল ক্যানিং স্ট্রিট থেকে হাওড়া হেঁটেই চলে যাবেন, ব্রাবোর্ন রোডে এসে ফাঁকা দোতলা বাস দেখে লোভ সামলাতে পারলেন না অবিনাশ, লাফিয়ে উঠে পড়লেন। অবশ্যই পিছনের দরজায়, যেখান দিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় দোতলায়। বাসটা মোটামুটি ফাঁকা ছিল। একদম সামনের সারির একটা সিট পেয়েছেন। দোতলা

বাসের জানলা দিয়ে কলকাতাকে অন্য রকম লাগে। সামান্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটে যেন।

দোতলা বাস আর ট্রাম কলকাতায় আসার উপরি পাওনা। যৌবনে এই দুটো যান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অবিনাশ, এখন উশুল করে নিতে ইচ্ছে করে। সমস্তিপুরের মতো কলকাতাতে ঘোড়ার গাড়ি আছে বটে, বড্ড শৌখিন, ঘোড়াগুলোর তেজ নেই। হাওয়া খেতে বেরোনোর মুড। রুক্ষ জলহাওয়া ছাড়া ঘোড়ার তেজ ঠিক প্রকাশ পায় না। কলকাতার বাতাসে ভিজে ভাব।

ব্রাবোর্ন রোড ঘুরে বাসটা হাওড়া ব্রিজের দিকে এগোতেই গঙ্গা থেকে উঠে আসা ঠান্ডা হাওয়া দোতলা বাসের জানলা দিয়ে ঢুকে এল। বুক চেরা সোয়েটারের বোতামগুলো লাগিয়ে নিলেন অবিনাশ।

প্রথম যখন কলকাতায় থাকতে এলেন, শীত মালুম হত না। গায়ে সোয়েটার চাপানোর আগেই শীতকাল পালাত। সমস্তিপুরে কনকনে শীতের দিন কাটিয়েছেন অবিনাশ। দু-তিন বছর হল কলকাতার শীতটাকে বেশ বোধ করতে পারছেন। এখানকার অধিবাসী হয়ে গেছেন অনেকটাই।

ব্রিজের ওপর উঠে পড়েছে বাস। বাতাসে ঝড়ের মহলা। আবছা অন্ধকার নদীর ওপর টিমটিমে আলো বুকে নিয়ে ডিঙি দুলছে। ফেলে আসা কলকাতা পরেছে আলোর গয়না। — বড় মনোরম লাগল এই যাত্রাপথটুকু। অফিসে কে যেন সেদিন বলছিল, ব্রাবোর্ন রোডের ওপর ফ্লাইওভার হবে। তখন এই পথটুকু কেমন দেখতে লাগবে কে জানে। বম্বেতে বেশ কয়েকটা ফ্লাইওভার দেখেছেন অবিনাশ, শহরটাকে বেড়ি পরানো হয়েছে মনে হয়।

বাস থেকে নেমে হাওড়া স্টেশনে ঢুকলেন অবিনাশ। রোজকার মতো দূরপাল্লার টিকিট কাউন্টারের দিকে চোখ বোলালেন, যদি সমস্তিপুরের কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। এসেছিল কলকাতায়, বাড়ি ফিরছে। কোনও কোনও সময় এক-দুজনকে এভাবে পেয়েছেন, আজ পেলেন না। তবু চোখ আটকে গেল চেনা একটা দৃশ্যে, কিছু ভদ্রসজ্জন মানুষ কুপন, কৌটো হাতে চাঁদা সংগ্রহ করছে লাইনে দাঁড়ানো মানুষের থেকে। অবিনাশ শেষ যেবার সমস্তিপুরের টিকিট রিজার্ভ করতে এসেছিলেন, এইভাবেই এরা চাঁদা তুলছিল চোখের হাসপাতালের

জন্য। বাঁকুড়ার সোনামুখিতে এদের হাসপাতাল তৈরি হবে। সেই সন্ন্যাসীকে আজ দেখা যাচ্ছে না। যিনি এই উদ্যোগের প্রধান। যাঁর আশ্রম লাগোয়া হাসপাতালের কাজ হচ্ছে।

সন্ন্যাসী সেদিন জবরদস্ত প্রভাব ফেলেছিলেন অবিনাশের মনে। হাতে, কাঁধে লটবহর নিয়ে ব্যতিব্যস্ত অবিনাশ লাইন ধরে এগোচ্ছিলেন, সন্ন্যাসী এসে বলেন, জিনিসপত্তরগুলো তুমি কাউন্টারের নীচে রাখতে পারতে, চোখের সামনে থাকত, টিকিটও কাটা হয়ে যেত। চোখ থাকতেও ব্যবহার করছ না। বয়ে নিয়ে চলেছ সমস্যা। সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না ইন্দ্রিয়সমূহের। আমাকে যদি বিশ্বাস হয় মালপত্তর রাখতে পার আমার জিম্মায়।

রেখেছিলেন অবিনাশ। সন্ন্যাসীর কথাগুলো তাঁকে আমুল নাড়িয়ে দিয়েছিল। উনি ঘুরিয়ে অবিনাশকে পঙ্গু প্রতিপন্ন করেছিলেন। পঙ্গুত্ব অস্বীকার করতে, সে রাতে হিসেবে গোলমাল করে ফেলেন অবিনাশ। যার ফলে ইলা এখন গর্ভবতী।

সেই সন্ন্যাসীকে আজ দেখা যাচ্ছে না কেন? পায়ে পায়ে টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোন অবিনাশ।

সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বয়স্ক এক সেবক, চেহারায় বড় চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার ছাপ, অবিনাশকে একটা কুপন কিনতে অনুরোধ করেন। কুপনে নির্দিষ্ট কয়েনের ছবি দেওয়া। ছবির তলায় আবছাভাবে ফুটে আছে অন্ধ শিশুর মুখ। এই মুখটাই বড় আকারে চাঁদার কৌটোয় মারা। আগের দিন দেখে ভীষণ রাগ হয়েছিল অবিনাশের, এরকম মর্মান্তিক ছবি দিয়ে মানুষের সেন্টিমেন্টকে খুঁচিয়ে তোলার কোনও মানে হয় না। আজ কিন্তু সেরকম কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। ছবিটাকে কেমন যেন খুব চেনা, আপনার মনে হচ্ছে। এরকমটা হওয়ার মানে?

ঝনাত-ঝনাত শব্দে সংবিৎ ফেরে অবিনাশের, বয়স্ক মানুষটি কুপন বিক্রির আশা ছেড়ে কৌটো নাড়াচ্ছেন। বিনয়ী হেসে অবিনাশ বলেন, দিচ্ছি। আপনাদের সেই স্বামীজি কোথায়? দেখছি না আজ!

উনি সন্ধ্যা করছেন। এক্ষুনি এসে যাবেন।

সন্ধ্যা করছেন মানে, আহ্নিক?

হ্যা, তবে প্ল্যাটফর্মে বসে আহ্নিক করা তো সম্ভব নয়। জপ করে নিচ্ছেন।

কোথায় বসেছেন?

ওই যে। বলে, আঙুল তোলেন সেবক।

আঙুল বরাবর তাকিয়ে অবিনাশ অবাক, দেওয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে চোখ বুজে ধ্যান করছেন সন্ন্যাসী। তাঁর দুপাশে উলোঝুলো হতদরিদ্র প্ল্যাটফর্মবাসীর সংসার। আজব মানুষ তো! অবিনাশের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে নির্দেশ দিলেও ওই নোংরার মধ্যে, ভিখারিগুলোর পাশে বসতে পারবেন না।

ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি? শিষ্যর কাছে জানতে চান অবিনাশ।

কেন বলবেন না, নিশ্চয়ই বলবেন। জপ শেষ হোক। বলে, আর একবার ঝনাত করে কৌটো নাড়েন ভদ্রলোক।

অবিনাশ বলেন, আপনাদের দু টাকার কুপন দিন দুটো। খুশি হয়ে কুপন কাটতে থাকেন ভদ্রলোক। অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের স্বামীজির নাম কী?

শ্রীশ্রীঅখিলানন্দ ব্রহ্মচারী।

খুবই ভক্তিভরে শ্রদ্ধার সঙ্গে নামটি উচ্চারণ করেন ভদ্রলোক। টাকা দিয়ে কুপন নিতে নিতে অবিনাশ জানতে চান, আপনারা সবাই ওঁর শিষ্য নিশ্চয়ই

শিষ্য তো বটেই। তবে মন্ত্রশিষ্য নই। এখানে যাঁরা দান সংগ্রহ করছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজন মন্ত্রশিষ্য আছেন। স্বামীজি সহজে কাউকে 'নাম' দেন না। মানুষের সেবা, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য সঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারলে বীজমন্ত্র দেন।

এই কথাটা শুনে বেশ কৌতুক বোধ করেন অবিনাশ, ভক্ত পরিমণ্ডল সুদৃঢ় করতে আকর্ষণীয় প্ল্যান সাজিয়েছেন স্বামীজি। তাঁর পরিকল্পনায় যদি সত্যিই ভাগ্যহত মানুষের

উপকার হয়, তা হলে অবশ্য কিছু বলার নেই।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা 'বীজমন্ত্র' প্রত্যাশী ভদ্রলোককে খানিক বিব্রত করতে ইচ্ছে করে অবিনাশের। বলে ওঠেন, সেবা, ঈশ্বরভক্তি প্রমাণের জন্য আপনাদের কোনও পরীক্ষা দিতে হয় নাকি?

প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কটাক্ষ ধরতে পারলেন না ভদ্রলোক। সিরিয়াসলি উত্তর দিলেন, না না, সেরকম কিছু না। আমরা কাজ করে যাব, স্বামীজি হঠাৎই একদিন ডেকে নেবেন কাউকে। আমরা সেই ডাকের অপেক্ষায় ঈশ্বরকে স্মরণে রেখে মন দিয়ে সেবা করে যাই।

মনে মনে স্বামীজির তারিফ করেন অবিনাশ। মানুষটি যথেষ্ট বুদ্ধি করে সংগঠনটি চালাচ্ছেন। পরিকল্পনার মধ্যে একটু ঝুঁকিও আছে, শিষ্যদের মধ্যে কাজিয়া লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে ঝুঁকি ছাড়া বড় কাজ কবে সম্ভব হয়েছে? স্বামীজির প্রতি বিষম কৌতূহল বোধ করেন অবিনাশ, মানুষটিকে আর একটু জানা গেলে ভাল হত। এই যে প্ল্যাটফর্মে বসে ধ্যান করছেন, এটাও তো এক ধরনের চমক, শিষ্যদের কাছে নিজেকে অন্য রকমভাবে উপস্থাপিত করা।

জপ শেষ করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন স্বামীজি। অবিনাশের পাশের ভদ্রলোকটি বলেন, যান, গিয়ে আলাপ করুন। আমাদের গুরুজি খুবই সদালাপী।

আলাপ আমার সঙ্গে একবার হয়েছে। দেখি আজ চিনতে পারেন কিনা? বলে, সন্ন্যাসীর উদ্দেশে এগিয়ে যান অবিনাশ।

আসন পাট করে কাথঝোলায় রাখলেন অখিলানন্দ। পরনে আগেরবারের মতো সাদা ফতুয়া, ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা। ধবধবে চুল, দাড়ি পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মানুষটি কেন যে গেরুয়া পরেন না, জটাজুট রাখেন না, কে জানে! ওগুলো থাকলে বেশ একটা পরিপূর্ণ সন্ন্যাসী ভাব থাকে।

অবিনাশকে দেখে অখিলানন্দ হাসছেন। প্রণাম করব কি করব না, ভাবতে ভাবতে অবিনাশ মুখে হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন?

কেন চিনব না, তুমি তো পুরুলিয়ার মুকুল দে।

অবিনাশের রীতিমতো ধাক্কা লাগল, কী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একদম ভুল চিনলেন সন্ন্যাসী। শুধরে দিতে অবিনাশ বলেন, আপনার একটু ভুল হল। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এইখানে, এই হাওড়া স্টেশনে

অখিলানন্দর মুখে অপ্রস্তুত ভাব। সেটা লুকোনোর কোনও চেষ্টা না করে বললেন, কিছু মনে কোরো না, বয়স হচ্ছে তো, নাম, মুখ আজকাল বড্ড গুলিয়ে যায়।

সন্ন্যাসীর দ্রুত সমর্পণে বেশ মজাই পান অবিনাশ, এইসব মানুষ কত ভেলকি-টেলকি দেখান, দেখাতে না পারলে বিব্রত হন। এই মানুষটির সেদিকে কোনও আগ্রহ নেই মনে হচ্ছে।

সন্ন্যাসীকে আশ্বস্ত করতে অবিনাশ বলেন, আপনার দোষ নেই, আমাকে দেখেছিলেন মিনিট পনেরোর মতো। দু-চারটে কথাও হয়েছিল। অনেকদিন আগেকার কথা, সব কি মনে রাখা যায়। সর্বত্র কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয় আপনার....

কথায় কান না দিয়ে অখিলানন্দ ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে শুরু করেছেন। একটু পরে বলেন, কতদিন আগে দেখা হয়েছিল বল তো?

মাস ছয়েক হবে। দেশের বাড়ি যাব বলে টিকিট রিজার্ভ করতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। সঙ্গে অনেক মালপত্তর...

অবিনাশকে কথা শেষ করতে দিলেন না অখিলানন্দ, উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, মনে পড়েছে। তুমি বিহারের কোনও এক জায়গার টিকিট কাটতে এসেছিলে। সঙ্গে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের পেটি ছিল। তোমার বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। কী, ঠিক বলেছি না?

অবিনাশ হাসেন। সন্ন্যাসী আগের দিন একই ভুল করেছিলেন, দাদার জায়গায় ভেবেছিলেন বাবা করেন ডাক্তারি। আজ আর শুধরে দেন না অবিনাশ। বলেন, ঠিকই ধরেছেন। আপনার স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট সবল।

আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটে ওঠে স্বামীজির মুখে। মানুষটির ভাব-বৈলক্ষণ্য সাধারণ মানুষের মতোই, বিশিষ্টতা কোথায়? আছে নিশ্চয়ই। নইলে এত ভক্ত জোটে! অবিনাশও তো ভুলতে পারেননি প্রথম সাক্ষাতের কথা।

তুমি সম্ভবত সেদিন তোমার নামটি বলনি। কী নাম তোমার? জানতে চান স্বামীজি।

অবিনাশ নাম বলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের হাসপাতালের কত দূর? একটু যেন নিরাশ হয়ে অখিলানন্দ বলেন, চলেছে কাজ। তবে খুব ধীর গতিতে। আসলে ডোনেশনের নব্বই ভাগ আসে কলকাতা থেকে, কলকাতার যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষজন খুব অস্থির হয়ে আছে। দান-ধ্যানের কথা মাথায় থাকছে না তাদের।

স্বামীজির ধারণাটা সম্পূর্ণরূপে ঠিক নয়, অবিনাশ লক্ষ করেছেন। কলকাতার বাইরে যারা থাকে শহরটার সম্বন্ধে এরকম একটা ধারণা করে ফেলে। কাগজে, রেডিয়োতে ফলাও করে ছাপা হয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ। তাই যদি হত অবিনাশরা রোজ অফিস যেতে পারতেন না। আজ পর্যন্ত অবিনাশের চোখের সামনে একটা বোমাও পড়েনি, খুন হয়নি কেউ। এত গণ্ডগোলের মধ্যেও একটা স্বাভাবিক জীবনধারা কিন্তু চলছে। একই সঙ্গে এটাও ঠিক, অস্থির পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শহরতলির মানুষ বহির্জগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অনেকটা। — ভাবনাটা গুছিয়ে বলতে যাবেন অবিনাশ, এক শিষ্য এসে দাড়ায়। স্বামীজির উদ্দেশে বলে, বাবা, আমাদের এদিককার কালেকশন শেষ। এখন গেটের দিকে যাচ্ছি। আপনি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন?

না গো গৌতম, এবার তো আমাকে এগোতে হয়। দিবাকর অপেক্ষা করে বসে আছে।

শিষ্য ঝপ করে একটা প্রণাম করে স্বামীজিকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, ঠিক আছে আপনি তাহলে এগোন। কবে দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে?

ওই, যেমন তুমি আস সোনামুখিতে। সামনের শনিবার।

ঘাড় হেলিয়ে শিষ্য বলে, আচ্ছা। সেদিনই আমি সব হিসেবপত্তর নিয়ে যাব।

ব্যস্ত পায়ে ফিরে যায় শিষ্য। বোঝা যায়, এরা প্রকৃত কর্মী। গুরুকে দেখে আদিখ্যেতা করে সময় নষ্ট করে না।

তুমি যেন এদিকে কোথায় থাক? অবিনাশকে জিজ্ঞেস করেন সন্ন্যাসী।

মেন লাইনে। তিনটে স্টেশন পরেই, দেবপাড়ায়।

ভালই হল। আমি তোমার আগের স্টেশনে নামব। বালি। চলো এক সঙ্গে যাওয়া যাক। অবিনাশ খুশি হন। আরও কিছুক্ষণ স্বামীজির সঙ্গে কথা বলা যাবে। মানুষটি বড়ই ইন্টারেস্টিং। ট্রেনের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকেন দুজনে। অবিনাশ জানতে চান, বালিতে কোথায় যাবেন?

আমার এক শিষ্যর বাড়ি। চৈতলপাড়ায়। আজ রাতটা ও-বাড়িতেই কাটাব। কাল ফিরব বাঁকুড়ায়।

আপনার আশ্রম সোনামুখিতে?

হ্যাঁ। এসো না একদিন সময় করে।

উত্তরে হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না অবিনাশ। তবে তাঁর যাওয়ার একটা চোরা আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।

ট্রেনে ওঠা অবধি দুজনেই ছিলেন চুপচাপ। সিট পাওয়া গেল। বসলেন পাশাপাশি। অবিনাশের মাথায় বেশ কটা প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে। ভাবছেন, জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কিনা। ভোঁ দিয়ে ট্রেন ছাড়তে একটা প্রশ্ন করেই ফেললেন অবিনাশ, আচ্ছা, আপনি যে তখন নোংরা প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে জপ করছিলেন, সেটা কি টাইম মেনটেন করার জন্য?

স্মিত হাসেন অখিলানন্দ। ট্রেনের আওয়াজ এড়াতে ঝুঁকে আসেন কানের কাছে। বলেন,

ধার্মিক মুসলমান দেখেছ, যেখানে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ঠিক আদায় করে নেয়। আমি ওদের থেকে ব্যাপারটা ধার করেছি। দিনে চারবার জপ করি আমি, সঙ্গে আসন, শিশিতে নদীর জল থাকে। চারপাশে ছিটিয়ে বসে যাই ধ্যান করতে। নামাজ পড়ার আগে মুসলমানদের ওজু করার মতো।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন অখিলানন্দ। অবিনাশ ততটা সহজ থাকতে পারলেন না। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তাঁর, এই প্রথম কোনও হিন্দু সন্ন্যাসীকে অবলীলায় মুসলমান ধর্মের ধার স্বীকার করতে দেখলেন।

খানিক নীরব থেকে স্বামীজি নিজের থেকেই বলতে শুরু করেন, দিনে বারচারেক ধ্যান করা ভাল। মনটা ভারহীন, আয়ত্তে থাকে। ব্রাহ্মণ সন্তান তুমি সকালে উঠে গায়ত্রী, জপ কর তো?

মাথা নাড়েন অবিনাশ। বলেন, কার ধ্যান করছি, তাঁকে ভাল করে না বুঝে ডাকাটা কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন লাগে।

আমিও কি তাকে বুঝি নাকি? ডাকতে হয় বলেই ডাকি।

স্বামীজির কথায় আর এক চোট অবাক হন অবিনাশ। বলেন, আপনার ইষ্টকে আপনি জানেন না, জপ করে যাচ্ছেন কাকে ভেবে?

খানিকক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন অখিলানন্দ। ফের অবিনাশের কানের কাছে ঝুঁকে বললেন, এসব জটিল, ভারী প্রশ্নগুলোর উত্তর ট্রেনে বসে এইটুকু সময়ের মধ্যে দেওয়া যায় না। তোমাকে একদিন আমার কাছে বসতে হবে। আমি বুঝতে পারছি তোমার মন বড়ই উতলা হয়েছে। এক কাজ কর, তোমার ঠিকানাটা দিয়ে রাখ তো! এরপর যখন আসব বালি, তোমার দেবপাড়ার বাড়িতে ঘুরে যাব।

অবিনাশ অফিস-ব্যাগ খুলে প্যাড-পেন বার করেন, ঠিকানা লিখতে লিখতে বলেন, আপনি কি ঈশ্বরের জন্য উতলার কথা বলছেন? যেমনটা পরম ভক্তদের প্রথম স্টেজে হয়?

অবিনাশের প্রশ্নের আড়ালে সূক্ষ্ম শ্লেষ ছিল। গায়ে মাখলেন না স্বামীজি। বললেন, আমি বুঝেছি, তুমি গড় মানুষের মতো নয়। একটা সুখী সংসারের কর্তা হওয়া সত্ত্বেও তোমার মন উচাটন বাইরের জগতের প্রতি। তুমি প্রতিনিয়ত খুঁজছ।

কী? ঠিকানার চিরকুট হাতে দিয়ে জানতে চান অবিনাশ। অখিলানন্দ যত্ন করে চিরকুটটা ঝোলায় রাখেন। বলেন, মানে।

কীসের মানে?

জীবনের। জীবনের অর্থ খুঁজছ তুমি। সজ্ঞানে হোক অথবা অজ্ঞানে, বেছেছ ভুল রাস্তা। কোনওদিনই পৌঁছতে পারবে না তোমার গন্তব্যে। স্বামীজি কি নিরর্থক হেঁয়ালি করছে, নাকি সত্যিই কোনও নির্দেশ আছে কথাগুলোর মধ্যে, বুঝে উঠতে পারেন না অবিনাশ। স্বামীজিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারছেন না। মানুষটি যে প্রখর মেধার অধিকারী, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইতিমধ্যে দুটো স্টেশন পার হয়ে গেছে। পরের স্টেশন বালি। স্বামীজি নামবেন। কমপার্টমেন্টের বেশির ভাগ জানলা বন্ধ করে দিয়েছে প্যাসেঞ্জাররা। যে দু-একটি খোলা আছে হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। অখিলানন্দর সঙ্গে কোনও শীতবস্ত্র আছে কিনা, কে জানে। বালি স্টেশনে নেবে চৈতলপাড়া অনেকটা রাস্তা। ওঁর ঠান্ডা লাগবে।

গাড়ির গতি কমছে। অবিনাশ স্বামীজিকে বলেন, আপনার স্টেশন এসে গেল।

ও হ্যাঁ, তাই তো। বলে, উঠে দাঁড়ালেন অখিলানন্দ। ক্ষমাসুন্দর হেসে বললেন, তুমি খেয়াল না করিয়ে দিলে পার হয়ে যেতাম।

কেন জানি অবিনাশের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আমি কি আপনার সঙ্গে নামব? এগিয়ে দেব চৈতলপাড়া? আমার কোনও অসুবিধে হবে না। বাসে করে মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে যেতে পারব বাড়ি।

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অখিলানন্দ বলেন, না না। তুমি আবার কষ্ট করবে

কেন। আমি দিবাকরের বাড়ি আগেও গেছি। ঠিক চলে যেতে পারব।

স্বামীজিকে অনুসরণ করে অবিনাশও দরজার দিকে এগোন। বলেন, আমি আপনার সঙ্গে যেতাম নিজের স্বার্থে। আপনার মতো মানুষের সঙ্গে যতটা সময় কাটানো যায়, ততই উপকৃত হওয়া যায়।

ট্রেনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন দুজনে। বাইরে অন্ধকার। হাওয়ায় চুল-দাড়ি উড়ছে স্বামীজির, অপরূপ লাগছে। এককালে যে বলিষ্ঠ রূপবান মানুষ ছিলেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। অখিলানন্দ বলেন, তোমাকে নিয়ে যাওয়াই যায় দিবাকরের বাড়ি। কিন্তু ওরা এমন বাড়াবাড়ি করে, তোমার খারাপ লাগবে।

বাড়াবাড়ি বলতে? জানতে চান অবিনাশ।

ওই যেমন হয়, পা ধোওয়াবে, খড়ম পরিয়ে খুলে রাখবে স্মৃতিস্মারক হিসেবে। পাথরের থালায় খেতে দেবে। সব সময় এমন নজর রাখবে আমি যেন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। তোমার মতো যুক্তিবাদী মানুষের এসব ঠিক সহ্য হবে না। তুমি হচ্ছ উঁচু মার্গের সাধক।

অবিনাশ বিষম ধন্ধে পড়ে গেছেন। অখিলানন্দ ব্রহ্মচারীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। মানুষটা কি জ্ঞানপাপী, নাকি সত্যিই জ্ঞানী?

ট্রেন থেমেছে। প্ল্যাটফর্মে নামতে নামতে স্বামীজি বলেন, বর্ধমান স্টেশনে নেমে বাসে করে যেতে হবে সোনামুখি। যে-কাউকে বলবে, দেখিয়ে দেবে আশ্রম। হাসপাতালের কাজও দেখতে পাবে। দু-তিন দিনের ছুটি নিয়ে চলে এসো। অনেক গল্প করা যাবে।

অবিনাশের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, যাব।

ট্রেন ভোঁ দিয়েছে। অখিলানন্দ ঘুরে হাত নাড়তে যাবেন, কারা যেন তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল। ভক্তবৃন্দ নিশ্চয়ই। অপেক্ষা করছিল প্ল্যাটফর্মে।

ট্রেন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। অবিনাশ তাকিয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মের দিকে। ভক্তবৃন্দ স্বামীজিকে ঘিরে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, জয়, জয়, অখিলানন্দ মহারাজ কি জয়। জয় ব্রহ্মচারীজি কি...

হাত তুলে সকলকে আশীর্বাদ করছেন অখিলানন্দ। হেসে ফেলেন অবিনাশ, স্বামীজি এখন যা করছেন, পুরোটাই অভিনয়। মানুষটার আসল পরিচয় অবিনাশ কিছুটা হলেও পেয়েছেন।

চলন্ত ট্রেনের দরজা থেকে সরে আসেন অবিনাশ। পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে চাঁদা কুপন দুটো বার করেন। আশ্রমের অ্যাড্রেস নিশ্চয়ই ডিটেলে দেওয়া আছে।

কুপনগুলো হাতে নিয়ে চমকে ওঠেন অবিনাশ, কয়েনের ছাপের নীচে যে আবছা অন্ধ শিশুমুখ, তাকে যেন চিনতে পারেন। মৃগাঙ্কর মেয়ে! হ্যাঁ অবিকল। অবিনাশের মনে পড়ে, প্রবাল সামন্তর অফিসে প্রথম যেদিন যমুনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, , বাচ্চাটার ঘুমন্ত মুখ দেখে ভীষণ চেনা-চেনা লেগেছিল। কারণ সমস্তিপুরে যাওয়ার আগে এই কুপন আর একবার নিয়েছিলেন অবিনাশ। তখন থেকেই অন্ধ শিশুমুখ মনের গভীরে ছাপ ফেলে রেখেছে। কিন্তু কোথায় কুপনে ছাপা একরঙা নীলচে শিশুমুখ আর কোথায় মৃগাঙ্কর কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। কেন এত মিলে যাচ্ছে দুটো মুখ! এ কীসের ইঙ্গিত? চলন্ত ট্রেনের বাইরে, অন্ধকারে তাকিয়ে থাকেন অবিনাশ, উত্তর পান না।

॥ ছাব্বিশ ॥

কাজ না থাকলে বিভাবতীর বড্ড পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। গতকাল থেকে বাড়ি হাউলা হয়ে আছে। সুখেনের বউ পুতুলকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি থাকতে গেছে কদিন। চা মুড়ি খেয়ে ভোর থাকতেই সুখেন বেরিয়ে যায় কাজে। অপূর্বর বাড়িতে থাকা না-থাকা প্রায় এক। খেতে, শুতে আসার কোনও ঠিক নেই। আজ এল তো কাল এল না। প্রায়ই ওর ভাত বাসি হয়, ফেলা যায়। বাড়িতে এখন থাকার মধ্যে ছোট ছেলে সিধু আর বিভাবতী। সিধুও কিছুক্ষণ হল ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেছে। ভাত, আলুভাতে ঘি দিয়ে, সকাল থেকে এতটুকুই রান্না করতে পেরেছেন। সিধু সোনামুখ করে ওই খেয়েই ইস্কুলে গেল। ওর কোনও বায়না নেই। অনেক দেরিতে জন্মেছে তো! ও বোধহয় মনে মনে টের পায়, ওর জন্মটা অযাচিত।

বিভাবতীর বেশ মনে আছে, ইলার প্রথম সন্তান ধারণের খবর যখন এল মছলন্দপুরে, কর্তা বলেছিল, নিয়া আসি মাইয়াটারে। বাপের ঘরে আঁতুড় হওয়া রীতি। সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়েছিলেন বিভাবতী। কর্তা বলেছিল, তোমার অসুবিধাটা কী কও তো?

সমস্যা তো আপনে বাধাইছেন।

বুঝতে একটু সময় নিয়ে ইলার বাবা বাড়ি কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল। লজ্জায় রাঙা হয়েছিলেন বিভাবতী।

অংশু জন্মানোর দু মাস আগে সিধু জন্মায়। ছেলে কোলে নাতির মুখ দেখতে হবে বলে, অংশুকে দেখতে সমস্তিপুর যাননি বিভাবতী। ইলার বাবা সব দেখেশুনে এসে গল্প করেছিল। এ-ঘটনাও বলেন, বেয়াইমশাই নাকি মজা করে কর্তাকে 'নতুন বাবা, নতুন বাবা' বলে হাঁকডাক শুরু করেছিলেন। কর্তা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন খুবই। তবে অবিনাশের বাবার প্রতি রাগ করেননি। ওঁকে খুবই শ্রদ্ধা, সমীহ করতেন ইলার বাবা।

কর্তা দেহ রাখার চারদিন পর ইলা এসেছিল অবিনাশ আর ছেলেকে নিয়ে। তখনই প্রথম নাতির মুখ দেখেন বিভাবতী। ইলাও দেখে তার ছোট্ট ভাইকে। শীলা আজ অবধি দেখল না। সিধুকে বলা হয়নি, তার আর একটা দিদি আছে।

বরাবরই সিধুকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছে ইলা। লজ্জার কারণে রাজি হননি বিভাবতী। দেবপাড়ায় ইলার পড়শিরা যখন দেখবে মামা-ভাগ্নে এক বয়সি, বিভাবতীর কথা ভেবে হাসাহাসি করবে। তার থেকে সিধু যেমন আছে তেমনই থাক।

এক এক সময় মনে হয়, দেরিতে সিধুর জন্ম হয়ে ভালই হয়েছে। এখন তো সিধুই তাঁর শেষ বয়সের একমাত্র সঙ্গী। সুখেন, অপূর্ব তো মাকে মুখ তুলে দেখেও না দিনমানে। খাবার বেড়ে দিলে খেয়ে চলে যায়। আর ছেলেরা অচ্ছেদ্দা করলে যা হয়, সুখেনের বউ পাত্তা দেয় না শাশুড়িকে। ওদের মেয়েটাই যা একটু আঁকড়ায় ঠাকুমাকে। শীত পড়ছে। এতক্ষণ বড় ঘরে বসে খাটের তলা থেকে পোর্টম্যান বার করে ঘাঁটছিলেন বিভাবতী। পুতুলটার জন্য সোয়েটার দরকার। সুখেন মেয়ের জন্য এনে দিয়েছে একটা, সেটা পরেই মামার বাড়ি গেছে মেয়ে। তবে সে জিনিস রংবাহারি, জাড় আটকায় না তেমন।

সিধুর একটা ছোটবেলার ভুটানি সোয়েটার ছিল। যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন বিভাবতী, এখন পেলেন না। মনে পড়ছে না, হয়তো ইলার ছোট ছেলের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার শীত পড়ার যা বহর, মোটা সোয়েটার না হলে মেয়েটা কষ্ট পাবে। বউমাও হয়েছে তেমন। উল বুনতে পর্যন্ত পারে না। যা কিছু দরকার বাজার থেকে কিনে আন। আরে, বাজারে কি হাতে তৈরি করার মতো খাঁটি জিনিস পাওয়া যায়?

পোর্টম্যান বন্ধ করে খাটের নীচে ঠেলে দেন বিভাবতী। দেওয়ালে টাঙানো দম দেওয়া ঘড়িটার দিকে তাকান, কর্তার শখের ঘড়ি। এত লম্বা ছিলেন, মেঝেতে দাঁড়িয়েই দম দিতেন ঘড়িতে। এখন দম দেন বিভাবতী। একটা চেয়ারের ওপর উঠতে হয়। ঘড়ির টিকটিক শব্দটা সুখেনের বাবার খড়ম পায়ে পায়চারির আওয়াজের সঙ্গে মেলে। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে বারোটা

বাজে। ডাল, তরকারি কিছু একটা করতে হবে। অপূর্ব যদি খেতে আসে। ভাতে ভাত মুখে রুচবে না। এমনিতে কিছু বলবে না, অতৃপ্তির খাওয়া পাত দেখলেই বোঝা যাবে। কোন মায়ের সেটা ভাল লাগে!

বড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন বিভাবতী। মাঝে সরু চাতাল। ওপারে হেঁশেল। তার পাশে ছিল গোশালা। কর্তা চলে যাওয়ার পর থেকে গরু পোষা হয়নি। গোয়াল ভেঙে টিনের চালের বাথরুম-পায়খানা করেছে সুখেন। তাতে বউমার একটা বালা গেছে। বাথরুমে ঢুকলে বউমা সহজে বেরোতে চায় না। বিভাবতী স্নান সারেন বাড়ির সামনের ছোট্ট পুকুরে। পুকুরটাকে অনেক সতর্কতায় ডোবা হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বিভাবতী। বর্ষার পরে এক বিঘত করে চারাপোনা হয়েছিল পুকুরে। সিধু ছিপ ফেলে ধরে দিয়েছে। হঠাৎ পাতে মাছ পেয়ে আশ্চর্য হয়েছে সুখেন। বলেছে, কে কিনে আনল, অপূর্ব?

সব কিছু কিনতে লাগে নাকি রে। পুকুর, জমি-জমা তাইলে কীসের লইগা! মায়ের কথা শুনে হেসেছে সুখেন, তুমি ডোবাটারে আর পুকুর কইও না। লোকে হাসব।

হাসে হাসুক। এ-পাড়ার কোন পুকুর আমার ডোবার মতন পরিষ্কার রে?

ডান হাতি পুকুরটার দিকে তাকান বিভাবতী, শীত পড়ে জল যেন একটু টেনে গেছে। শীত যেমন দুঃখের, সুখেরও। এই যে এখন মিঠে রোদটি এলিয়ে আছে ভিটেতে, বাতাস বইছে মৃদু, পাতা খসে পড়ছে অবিরত, এর মধ্যেই ছুঁয়ে আসছে মনখারাপ করা স্মৃতির সুবাস। খেজুর রস জ্বাল দেওয়ার গন্ধ।

মছলন্দপুরে তাঁর বাড়ির এক মাইলের মধ্যে কোনও গুড় তৈরির বাইন নেই। তবু যে কেন প্রত্যেক বছরই গন্ধটা পান। যত বয়স হচ্ছে গন্ধটা যেন বেশি বেশি করে পাচ্ছেন।

আজ যখন সিধু ইস্কুল বেরোচ্ছিল বিভাবতী বলে দেন, দেখিস তো আশপাশে কোনও বাড়িতে রস জ্বালের উনান বসাইছে না কি? বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে, বইখাতা বগলে নিয়ে ইস্কুলে গেছে সিধু। ফেরার সময় নিশ্চয়ই গ্রামের এদিক-ওদিক ঘুরে দেখবে।

খানসামার বাড়ির পাশেই ছিল নব বাগদির বাড়ি। বড় বড় মাটির উনানে বিরাট মাটির খোলা চাপানো থাকত। ঠিলির সব রস খোলায় ঢেলে, শুকনো আশশ্যাওড়া, ভাঁট, কালিকাশিন্দা, খেজুরগাছের পাতা জ্বালিয়ে রস জ্বাল দিত নব।

শুকনো আগাছা আর রসের গন্ধে দুপুরটা কেমন যেন বিষাদময় অথচ সুরভিত হয়ে উঠত।

আগুনের উত্তাপে রস ঈষৎ ঘন এবং লালচে হয়ে উঠলেই নব কিছুটা তুলে রাখত মা ঠাকরুন অর্থাৎ বিভাবতীর জন্য। ওই রসটাকে বলা হত তাতরসা। খুব সুন্দর পায়েস হয়। বাড়ির লোক খুব তৃপ্তি করে খেত।

মছলন্দপুর আসার পর সেই তাতরসার আর খোঁজ পাননি বিভাবতী। কিন্তু গন্ধটা আজও পান, শীত পড়লেই।

হেঁশেলে অনেকক্ষণ ঢুকে এসেছেন। কাঠের জ্বাল দিয়ে ডাল চাপিয়েছেন উঠোনে। এমন সময় কে যেন ডাকে, মা! ওমা!

চাপা ভয় পাওয়া গলা, চেনা-চেনা মনে হলেও চিনতে পারছেন না বিভাবতী। আবার ডাকে, মা, ওমা! মা!

কুবপাখির ডাকের মতো দুপুর ঘনিয়ে দেওয়া ডাক। উনুনের ধোঁয়া দু হাতে উড়িয়ে সিঁড়ি থেকে উঠে আসেন বিভাবতী। কে ডাকে এই অসময়?

হেঁশেলের দোর থেকে এক পা বাড়িয়ে থমকে গেছেন বিভাবতী। এ কাকে তিনি দেখছেন! চোখের ভুল নয়তো? শীলা। তাঁর অহর্নিশির জাগ্রত শোক। বুকের ভেতরটা হঠাৎ মরুভূমির মতো ধু-ধু করে ওঠে। কতদিন পর ছোট মেয়েকে দেখছেন।

বাড়িতে কেউ নেই জেনেও, বিভাবতী ত্রস্ত চোখ বোলান চারপাশে। শীলা এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে, ওর ঠোঁটে মরা হাসি।

বিভাবতীকে প্রণাম করে শীলা বলে, বাড়ির আর সবাই কোথায়?

ক্যান, তাগো লগে বুঝি তোমার খুব দরকার? অসহায়ভাবে ঝগড়ার চেষ্টা করেন বিভাবতী।

শীলা বলে, তাদেরকে দেখার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

পায়ে কেমন যেন বল হারিয়ে যায়। শীলা কি এবার বলবে, জন্ম দিয়ে কী করে ভুলে আছ আমাকে। হেঁশেল লাগোয়া মাটির দাওয়ায় বসে পড়েন বিভাবতী। শীলা এসে বসে পাশে। ইতিমধ্যে বিভাবতীর দেখা হয়ে গেছে, মেয়েটার সঙ্গে বড়সড় কোনও ব্যাগ নেই। কাঁধে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। তার মানে সংসার ছেড়ে আসেনি।

কপালে হাত রেখে মাটির দিকে চেয়ে আছেন বিভাবতী। ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে, যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে অপূর্ব, শীলাকে দেখে কী কাণ্ড ঘটাবে কে জানে! মেয়েটা হঠাৎ এল কেন, তাও বুঝতে পারছেন না। ইলা তো বলেছিল ওরা সুখে আছে।

ভিটের চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে শীলা বলে, আমি এ-বাড়িতে প্রথম এলাম।

হ, চিনলি ক্যামনে? জানতে চান বিভাবতী।

দিদির কাছ থেকে ঠিকানা নেওয়া ছিল।

আইলি হঠাৎ কী মনে কইরা?

এমনি। ভাবলাম, যদি আর কোনওদিন দেখা না হয়!

এ-কথার দুটো মানে হয়, দুটো সম্ভাবনা। সহজটাই ধরতে পারলেন বিভাবতী। বললেন, স্বপন পাইছিস বুঝি, আমি মইরা গেছি?

মাথা নাড়ে শীলা। ভ্যানিটি ব্যাগ দাওয়ায় রেখে উঠে দাঁড়ায়। শাড়ি কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বলে, যাই হাতমুখ ধুই। তোমাদের কলতলা কোথায়?

মেয়েকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে আঙুল তুলে কলপাড় দেখান বিভাবতী। চটি ছেড়ে এগিয়ে যায় শীলা। চেহারা একটু ভারী হলেও, ছোট মেয়ের রংটা আরও পুড়ে গেছে। অনেকটা পাটালি গুড়ের মতন। বাতাসে কি তা হলে মেয়ের গন্ধই পাচ্ছিলেন বিভাবতী? — এসব ভেবে এখন লাভ নেই। মেয়েটা যখন দুপুরে এসেছে, দুমুঠো খাইয়ে ছাড়তে হবে। এদিকে রান্না বলতে তেমন কিছু হয়নি।

দাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বিভাবতী, হেঁটে যান নিজের হাতে লাগানো শিমের টালের দিকে। গাছ ঝেঁপে শিম ফলেছে, ওই দু-চারটে ফেলে দেবেন ডালে।

চোখেমুখে জল দিতে গিয়ে কিছুটা খেয়েও ফেলল শীলা। কী মিষ্টি!

এ-বাড়িতে পা দিয়ে মনটা ভরে গেছে শীলার। আগে কখনও আসেনি। দিদির মুখে বর্ণনা শুনেছে। দিদি সব সময় এ-সংসারের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে, স্বাভাবিকভাবেই শীলা ধরে নিয়েছিল মছলন্দপুরের ভিটে রুখু-সুখু, অভাব মেশানো। ছবিটা ঠিক তার উলটো। এত গাছপালা, পুকুর, পরিচ্ছন্ন দাওয়া, চাতাল দেখে মন থিতু হয়েছে শীলার খানসামার বাড়ির মতোই মা যেখানে পেরেছে সবজি চাষ দিয়েছে। বাড়ির চালে লাউ কুমড়ো সবই আছে, শুধু কোথাও শীলার জন্য এতটুকু প্রতীক্ষা নেই। — শাড়িতে মুখ মুছতে মুছতে দাওয়ায় ফিরে আসে শীলা। কোঁচরে শিম নিয়ে বাগান থেকে উঠে আসছে মা। সামনে এসে বলে, হেঁশেলে আইয়া বস। অপু এখনি চইলা আইতে পারে।

অপু কি আমাকে দেখলে তাড়িয়ে দেবে? মাকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে শীলা।

বিভাবতী বলেন, জানি না। তেনাগো মর্জি। তবে তোমাকে না তাড়াইনের তো কোনও কারণ দেখি না। বংশের মুখে তো চুনকালি লেইপা দিছ।

শীলা কোনও উত্তর দেয় না। সিঁড়ি টেনে বসে পড়ে। মা শিম কটা কেটে ধুয়ে ফুটন্ত ডালে দেয়। উনুনে ঢোকানো জ্বলন্ত কাঠটা দেয় ঘুরিয়ে। বলে, দুমুঠা খাইয়া যাস।

আপত্তি করে না শীলা। মায়ের হেঁশেলে কোনও জানলা নেই, ছোট ছোট ফুটো, মা কিছুক্ষণ অন্তর ফুটোর দিকে তাকাচ্ছে, বোধহয় লক্ষ রাখছে অপু ফিরল কি না। বাড়িতে

ঝগড়া-টগড়া কিছু করছস নাকি? জানতে চায় মা। ফুটো দিয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে মাথা নাড়ে শীলা।

আজ আইসা ভালই করছ। বউমা পুতুলরে লইয়া বাপের বাড়ি গেছে। থাকলে অনেক জবাবদিহি করতে হইত।

শীলা চুপ করে থাকে। এখানে আসার আগে মনে মনে অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল শীলা। পাকশালা পর্যন্ত ঢুকে আসতে পারবে কল্পনাও করেনি। জানত, দোরগোড়া থেকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দেবে বাড়ির লোক। তবু সে এসেছে মাকে একবার দেখতে। এসে উপকার হয়েছে। মা এতটুকু পালটায়নি। চারপাশটা রেখেছে সজল, সজীব। মাথা থেকে খারাপ ইচ্ছেটা উধাও হচ্ছে শীলার। ইচ্ছেটা চেপে বসেছিল সেদিন বিকেলেই, যেদিন বাড়ি ফিরে লতা বিপুলকে দেখেছিল অগোছালো। বারবার নিজেকে বুঝিয়েছে, এ আমার অযথা সন্দেহ। মন মানেনি। দ্বিতীয়বার ঘরে ঢুকে বিছানায় বসেছিল শীলা। বিপুল তখনও ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। চাদরের ওপর চোখ বুলিয়ে অনাচারের চিহ্ন খুঁজছিল শীলা, পেয়েও যায়, বালিশের পাশে লতার রোলগোল্ডের বালা আর হেয়ার ব্যান্ড। দেখেই মাথায় আগুন চড়ে গিয়েছিল শীলার। জিনিস দুটো হাতে নিয়ে চিৎকার করে লতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ দুটো এখানে কেন?

লতা বিড়বিড় করে কী বলছিল, বোঝা যায়নি। ওর হয়ে উত্তরটা দেয় বিপুল। হঠাৎ উঠে বসে ঠান্ডা গলায় বলে, লতা আমার মাথা টিপে দিচ্ছিল, বালাটা বারবার মুখে ঠেকতে, আমিই ওকে খুলে রাখতে বলেছি।

শীলা আর কিছু না বলে, কান্না সামলাতে ঢুকে গিয়েছিল বাথরুমে। তখনই মাথায় চাপে খারাপ ইচ্ছেটা, জীবনটা শেষ করে দিতে হবে।

কদিন ভীষণ চুপচাপ কাটাল শীলা। স্কুল গেল, কলিগদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ছেলেটাও মায়া জাগাতে পারছিল না মনে। লতাকে তাড়াতে হয়নি। নিজেই কাজে আসা বন্ধ করেছে। পরের দিনই বয়স্ক কাজের মহিলা নিয়ে এসেছে বিপুল। শীলার মাথা থেকে ইচ্ছেটা যায়নি।

স্কুল ফেরত সে গেছে বরানগর রেলস্টেশনে, স্থির চোখে তাকিয়ে থেকেছে রেললাইনের দিকে, যেন আমৃত্যু বন্ধুত্ব পাতাতে এসেছে। বালি ব্রিজ থেকে দেখেছে নদী। ঠিক করে উঠতে পারেনি সুইসাইডটা কোথায় করবে।

সংসারের কোনও কাজেই মন নেই। কাজের মাসিটি ভাল। সেই রান্না করছে। ঠাকুরকে সন্ধে দেখানো বন্ধ করেছে শীলা, এসব যে বিপুলের চোখ এড়িয়ে গেছে, তা নয়। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করছে না। ছেলেটার দিকে নজর দিচ্ছে বেশি করে।

শরীর থেকে সংসারের বাকল খসে যাচ্ছে শীলার। ক্রমশ আত্মহননেচ্ছায় আচ্ছন্ন হচ্ছিল সে। মনের এই অবস্থাটা ঠুলি লাগানো ঘোড়ার মতো, সামনের টুকুই শুধু দেখা যায়, দুপাশ অন্ধকার। এই নাছোড় বিষাদের মধ্যে কখন যে একবার মাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, কে জানে! মরে যাওয়ার আগে জন্মদাত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে আসা, যে প্রসববেদনা আমার জন্য সহ্য করেছ, মান রাখতে পারলাম না।

মায়ের কাছে এসে চোখের ঠুলি যেন সরে গেল। এ-ভিটের চারপাশে অনেক আলোবাতাস। বাবার শরীরহীন উপস্থিতি। এ-ভিটের অনেক গাছপালা নিশ্চয়ই বাবার হাতে লাগানো। রোদ পিঠে নিয়ে দাওয়ায় বসে তেল মাখতেন বাবা। হাঁকডাক করতেন। হাঁস মুরগি গরু ছিল নির্ঘাৎ। গৃহপালিত পশুপাখি নিয়ে বড়সড় সংসার পছন্দ করতেন বাবা। শেষ বয়সে এখানে শান্তিতেই কাটাচ্ছিলেন, শান্তি সংক্ষিপ্ত করে দেয় শীলা।

আইলি যখন, পোলাডারে সাথে লইয়া আসতে পারতিস। আমি অরে চোখের দেখাও দেখি নাই।

মায়ের কথায় সংবিৎ ফেরে শীলার। কী বলবে, ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকে। উনুন থেকে ডালের হাঁড়ি নামিয়ে চুলোয় কড়া চাপায় মা। ফোড়ন দেবে ডালে। হাঁড়িতে হাতা

ডুবিয়ে সেদ্ধ শিম তুলে থালায় রাখে। এইসব থালা, হাঁড়ি, কড়া, খুন্তির কোনও কোনওটা নিশ্চয়ই খানসামার বাড়ির। মা সঙ্গে রেখেছে এতদিন। মা মরে গেলে এদের কেউ চিনতে পারবে না। বাসনগুলো মিশে যাবে এদেশের বাসনের সঙ্গে। অনেকটা শীলাদের মতো।

মায়ের পিছনের দেওয়ালে ঠেস দেওয়া ভাপা পিঠের সরা, মা কি এখনও আঁকশি পিঠে করে, খানসামায় যেমন করত?

ফোড়নের গন্ধে ভরে গেল পাকশালা। কী ভীষণ চেনা গন্ধ! মা বলে ওঠে, স্নান করবি তো যা, বাথরুমে জল ধরা আছে। তর বাপের আমলে ছিল না বাথরুম। হালে সুখেন করাইছে। বউমার শখ।

না মা, বেলায় আর চান করব না। তুমি খেতে দিয়ে দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে। বলে শীলা।

হ্যাঁ, তাই দেই। অপুডা আর আইবে না মনে হইতাছে।

মায়ের কথা শেষ হতেই, জেঠিমা, জেঠিমা, ডাক দিয়ে একটা মেয়ে রান্নাঘরে এসে ঢোকে। শীলা অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয় দেওয়ালের দিকে। মেয়েটাও আর কোনও কথা বলছে না। সে বোধহয় হোঁচট খেয়েছে শীলাকে দেখে।

কী রে কুন্তলা? মা বলে।

অপুদা বাড়ি আছে?

না রে। সে তো আজ খাইতেই আইল না দুপুরে। কোথায় যে যায়!

মেয়েটার দিক থেকে কোনও উত্তর নেই। শীলা ভাবে, চলে গেল বোধহয়। এত তাড়াতাড়ি! মুখ ঘোরাতে গিয়ে শীলা আটকে যায় মেয়েটার সন্ধানী দৃষ্টিতে। মেয়েটা হাঁ করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

পরিস্থিতি সামাল দেয় মা। মেয়েটিকে বলে, কী দ্যাখতাছিস? একদম ইলার মতন দ্যাখতে, না?

বিস্ময়ের ঘোর নিয়েই মেয়েটা ঘাড় হেলায়। মা ফের বলে, আমার বোনের মেয়ে। কলকাতায় থাকে।

মেয়েটা অস্ফুটে 'ও, আচ্ছা' বলে, হেঁশেল থেকে বেরোতে যায়।

মা বলে, অপু আইলে কিছু বলব?

অ্যাঁ, হ্যাঁ, বলবেন, আমি এসেছিলাম। বলে, ব্যস্ত পায়ে চলে যায় মেয়েটা। শীলা আশ্চর্য হয়ে তাকায় মায়ের দিকে। কী দারুণ অভিনয় করল!

শীলার অবাক দৃষ্টির সামনে হাসিতে ভেঙে পড়ে মা। আগে যেমন হাসত, কপালে কবজি ঠেকিয়ে। হেঁশেলের মাটির কালচে মেঝেতে মায়ের হাসি মুক্তোর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাসি শেষ হলে শীলা জানতে চায়, মেয়েটা কে গো?

কুন্তলা। কাছেই থাকে। আগে বউমার কাছে আইত। অহন বউমা না থাকলেও আসে। অপূর্বর লইগা।

অপূর্বর সঙ্গে ভালবাসা আছে বুঝি? চিলতে হেসে জানতে চায় শীলা।

বিভাবতী বলেন, না না, অপু অরে দেখলেই পলায় যায়।

তবু আসে কেন?

কে জানে! আইজকালকার ছেমড়া ছেমড়িগো আমি ঠিক বুঝি না। বলে, শীলার সামনে থালা রাখেন বিভাবতী।

শীলা বলে, তুমি খাবে না?

না, আর আট্টু দেইখা লই, অপু যদি আইয়া পড়ে।

পরিপাটি করে ভাত বেড়ে দিল মা। শীলা হাপুস-হুপুস করে খায়। মা পাখার বাতাস করে। কাঁচা পেঁয়াজটায় তেমন ঝাঁঝ নেই, তবু চোখে জল আসে শীলার। বাগান থেকে ভেসে আসে পাখির সুরেলা ডাক। পুকুরে ঘাই মারে বড় কোনও মাছ৷

খাওয়া শেষ হতে শকড়ি নিয়ে কলতলায় ধুতে যায় শীলা। মা বলে, হাতমুখ ধুয়ে ঘরে

আয়।
হেঁশেলে বাসন তুলে, শিকল দেয় শীলা। এমনভাবে কাজগুলো করে, যেন অনেকবার এসেছে এখানে।
ফালি চাতাল পার হয়ে বসত বাড়িতে যায় শীলা। ঘরটা বেশ বড়সড়। চারধারে চোখ বোলায় শীলা। প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখে। তার অতি নিকটজনেরা এই ঘরে থাকে। দেওয়ালের একটা ফ্রেমে চোখ আটকে যায়। বাঁধানো সম্মানপত্র। লেখা আছে, কী দিয়ে তোমাকে অভিনন্দিত করি/ভাষা খুঁজে ফিরি তারি/ তোমার শেখানো ভাষা দুই চারি/নয়নের জলে লিখি—পড়া শেষ হতেই মা পিছন থেকে বলে ওঠে, তর বাপেরে দিয়া ছিল খানসামা ইস্কুলের ছাত্ররা। যখন আমরা এপারে আইলাম।
খাটের ওপর পুঁটুলি রেখে কী যেন খুঁজছে মা। জিনিসটা বোধহয় পেল। এগিয়ে আসে শীলার কাছে। মায়ের হাতে ছোট্ট একটা গয়নার বাক্স। শীলার হাতে দিয়ে বলে, এটা দাদুভাইয়ের তরে।
কী এটা? বলে, শীলা নিজেই বাক্সটা খুলে ফেলে। ছোট্ট একটা সোনার আংটি। মা বলে যায়, শেষ দু জোড়া কানের ছিল। সেইডা ভাঙইয়া গড়াইছি। সব নাতি-নাতনি কিছু না কিছু আমার থেইকা পাইছে। তর পোলাডা পায় নাই। ভাবছিলাম, ইলার হাত দিয়া পাঠায়া দিমু। ভালই হইল তুই আইয়া পড়লি। দাদুভাইয়েরে আজই এডা পরায় দিস। আমি ইলার কাছে যাইলে তর বাড়ি যামু। দাদুভায়ের মুখটা বড় দেখতে ইচ্ছে করে।
চোখ জ্বালা করছে শীলার। কিছুতেই কাঁদা যাবে না মায়ের সামনে। মা বুঝতে পারবে মেয়ে সুখী হয়নি, কষ্টে আছে।
আংটিসুদ্ধু হাতের মুঠো বন্ধ করে নেয় শীলা। যেন জীবনটাকে ফের মুষ্টিবদ্ধ করল সে।

হাসিখুশি মেয়ের হঠাৎ কান্নার মতো এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেল। ইছামতীর চড়ায় ফের ফুটে উঠল অপরূপ রঙিন বিকেল।
এখানে নৌকা সারাই হয়। পাড়ের ওপর পর পর চারটে নৌকা। যার একটার গলুইয়ের ভেতর বসেছিল তীর্থ আর অপূর্ব। গলুইয়ের ছেঁদা দিয়ে জল ঢুকে অপূর্বর জামা ভিজিয়েছে। তীর্থ বলে তুই আমার জামাটা পরে নে।
তুই কী পরবি?
তোর জামাটা শুকিয়ে পরে নেব।
ততক্ষণ খালি গায়ে থাকবি!
তাতে কী হয়েছে, আমায় তো কোথাও যেতে হচ্ছে না।
অপূর্ব ভাবে, সেটা ঠিক। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে তীর্থ এক মাস হল এখানে লুকিয়ে আছে। খাওয়া-দাওয়া করছে মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে। পুলিশের তৎপরতা কমলে তীর্থ বাড়ি ফিরবে। অপূর্ব ছাড়া তীর্থর এই আস্তানার কথা কেউ জানে না। মাঝিমাল্লারা জানে তীর্থ এসেছে বাংলাদেশ থেকে। কিছুদিন থেকে ফিরে যাবে। মাঝিদের সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছে তীর্থ।
অপূর্ব রোজ দুপুরে তীর্থর সঙ্গে দেখা করতে আসে। গল্পগাছা করে ফিরে যায় সন্ধের আগেই। এখান থেকে অপুর্বদের গ্রাম প্রায় চার মাইল পথ। পুরো রাস্তাটাই আলোহীন। নিজেদের দক্ষিণ চাতরার অন্ধকার ছাড়া আর কোনও জায়গার আঁধারকে বিশ্বাস করে না অপূর্ব। বিপদ তার জন্য সব সময় ওঁত পেতে আছে।
তীর্থর শার্টটা গায় গলিয়ে নেয় অপূর্ব। ওর জামায় সব সময় বারুদ-বারুদ গন্ধ। কেন, কে জানে। বোমা-বন্দুক তো অনেকদিন ছেড়েছে।
বৃষ্টি পড়ে নদীর পাড় এখন চিটচিটে। প্যান্টটা একটু গুটিয়ে নিয়ে চটি জোড়া হাতে নেয় অপূর্ব। তীর্থকে বলে, চলি, কাল আবার আসব।
হাসিমুখে ঘাড় হেলায় তীর্থ। নৌকা থেকে লাফিয়ে পাড়ে নামে অপূর্ব। হাঁটতে থাকে

বসতের দিকে। বাতাসে এখনও বৃষ্টির ভেজা ভাব। মেঘ ভেসে চলেছে ভিন দেশে ওপার বাংলায়।

নদীর পাড় ছেড়ে অনেকটা চলে এসেছে অপূর্ব। পিছনে ফিরে তীর্থর আস্তানাটা দেখতে যায়। তখনই চোখে পড়ে বেশ খানিকটা দূরে চার যমদূত! রাইফেলধারী চারটে পুলিশ! এতক্ষণ বেড়াল-পায়ে ফলো করে আসছিল। বুক ধড়াস করে ওঠে অপূর্বর। যদিও অপূর্বর থেকে ওদের দূরত্ব অনেকটা। তবু বন্দুকের নিশানার মধ্যে তো বটেই। —হাঁটার স্পিড বাড়িয়েছে অপূর্ব। আশপাশে কোনও আড়াল নেই যে লুকোবে। আর একবার পিছন ফেরে অপূর্ব, পুলিশগুলো হেঁটে আসছে জোরে। কেন তাকে ফলো করছে পুলিশ? তার অপরাধের কথা তো পুলিশের জানা নেই! নিজেদের এলাকায় দিব্যি বুক উঁচিয়ে ঘুরছে সে। পুলিশ তো আসেনি অ্যারেস্ট করতে! তা হলে কেন হঠাৎ... বিদ্যুচ্চমকের মতো অপূর্বর খেয়াল হয়, সে পরে আছে তীর্থর জামা। পুলিশ তাকে তীর্থ ভেবেই ফলো করছে।

হাঁটার মধ্যে লুকিয়ে দৌড় ঢুকিয়ে দেয় অপূর্ব। পিছন ফিরে দেখতে সাহস হয় না। কানে এসে পৌঁছচ্ছে পুলিশের বুটের আবছা ধপধপ আওয়াজ। ওরা কি দৌড় শুরু করল? ভীষণ ভয় পেয়ে অপূর্বও দৌড়তে থাকে। কিন্তু এগোতে পারে না বিশেষ। কাদায় পা আটকে যাচ্ছে। মাটি থেকে পা ছাড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়তে থাকে অপূর্ব। পিছন থেকে ওরা বলে ওঠে, হল্ট, হল্ট...

থামার কোনও প্রশ্ন নেই। অপূর্ব যে তীর্থ নয়, ভুল ভাঙানোর সময় নেই এখন। কোনও এক সময়ের ট্রেনিং অনুযায়ী এঁকেবেঁকে দৌড়তে থাকে সে। কাদার জন্য মুভমেন্ট এত স্লো হচ্ছে, অনায়াসে টার্গেটে ফুঁড়ে দেবে পুলিশ। কেন যে মরতে তীর্থর জামাটা পরতে গেল... অবশেষে কান ফাটানো ধাতব শব্দ। ছিটকে পড়ল অপূর্ব। মুখ দিয়ে একটা শব্দই বেরোল, মাগো! — চোখে অন্ধকার নেমে আসার আগে, আর একবার পলক তোলার মরিয়া চেষ্টা করতে, অপূর্ব দেখে, সে উঠে বসেছে অচেনা বিছানায়। ঘাড় ফিরিয়ে কুন্তলাকে দেখতে পায়। খাট থেকে একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে আছে। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসে অপূর্ব। এটা কুন্তলাদের বাড়ি।

কুন্তলা তার দিকে চেয়ে বসে আছে ঠায়। অপূর্ব বলে, তুই কখন থেকে বসে আছিস?

অনেকক্ষণ। তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর থেকে।

কেন?

কোনও উত্তর দেয় না কুন্তলা। চোখ সরিয়ে নিয়েছে জানলার দিকে। বাড়ির বাইরে এখন ঝিমিয়ে পড়া বিকেল। কুন্তলার আচার-ব্যবহার ইদানীং কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। পারম্পর্যহীন। ইচ্ছে হলে কথার উত্তর দেয়, না হলে চুপ করে থাকে। অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা হাঁটে। তীর্থর ফিরতে যত দেরি হচ্ছে, অন্যমনস্কতা বাড়ছে কুন্তলার। পোশাকআশাকেও যেন ছাপ পড়ছে তার।

কুন্তলাকে এড়িয়ে যাওয়া যেত, যদি না সে বারবার ফিরে আসত অপূর্বর কাছে। পথঘাটে, বাড়িতে যখন-তখন চলে আসে। বিশেষ কোনও কথা বলে না। এমনি এমনি বসে থাকে। বলবেই বা আর কী, তীর্থর সব ঘটনা কুন্তলাকে জানিয়ে দিয়েছে অপূর্ব। লুকিয়ে লাভ হত না। তীর্থ কুণ্ডলাকে বলে গিয়েছিল, পার্টির নির্দেশে সে আর অপূর্ব প্রবাল সামন্তকে খুন করতে যাচ্ছে। —এরপর কুন্তলার কাছে আর কিছু গোপন করার কোনও মানে হয় না। অপূর্বদের স্কোয়াডের সব কমরেড গা ঢাকা দিয়েছে। এখন অবধি কেউ যোগাযোগ করেনি অপূর্বর সঙ্গে, ফেরত চায়নি অস্ত্র। একমাত্র কুন্তলাই অপূর্বর ব্যর্থ অভিযানের কথা জানে। কুন্তলা জলজ্যান্ত সাক্ষী। মনে করলেই পুলিশকে বলে অপূর্বকে ধরিয়ে দিতে পারে। ততদিন অবধি ধরাবে না, যতদিন না তীর্থর মৃত্যুর খবর ওর কাছে আসে। সমস্ত কিছু শোনার পরও কুন্তলা আশা করে আছে তীর্থ ঠিক ফিরে আসবে। অপূর্ব তত আশাবাদী নয়, বিশেষ করে সময় যত যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে ফেরার সম্ভাবনা।

অপূর্বর এক এক সময় সন্দেহ হয়, কুন্তলার অটল প্রতীক্ষার কারণ হয়তো অপূর্বর প্রতি

অবিশ্বাস। তীর্থর ব্যাপারে যা যা বলেছে অপূর্ব, কুন্তলা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। ওর ধারণা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অপূর্ব গোপন করেছে। সেই কারণেই মনে হয় ঘুমন্ত অপূর্বর দিকে তাকিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। ঘুমের ঘোরে অপূর্ব যদি চেপে রাখা কথা বলে ফেলে। —ভাবনাটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে? বোধহয় না, একজন ঘুমন্ত মানুষের দিকে কীসের প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে মানুষ?

কুন্তলা সেই যে মুখ ঘুরিয়েছে জানলার দিকে, একই ভঙ্গিতে বসে আছে। অপূর্ব ডাক দেয়, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়িতে বিকেলে চা হয় না?

মুখ ফেরায় কুন্তলা। ঠোঁটের কোণে ক্লান্তি মাখানো হাসি। এইটুকু হাসতেও যেন ওর কত কষ্ট হচ্ছে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে, দাঁড়াও নিয়ে আসি।

কুন্তলা ঘর ছেড়ে চলে যেতে, অপূর্ব সদ্য দেখা স্বপ্নটাকে মনে করার চেষ্টা করে, কোনও হোঁচট ছাড়াই হুবহু উদ্ধার করে নিজের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত। দিনেরবেলা দেখা স্বপ্ন বলেই বোধহয় এত স্পষ্ট, টাটকা। স্বপ্ন মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কুন্তলা যতই চেয়ে থাকুক ঘুমের দিকে, নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুন্তলাকে একটু বেশি পাত্তা দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কারণটা অবশ্যই, সেই অপরাধবোধ। কেন শেষ মুহূর্তে তীর্থর কথায় রাজি হয়ে গেল অপূর্ব? প্রবাল সামন্তকে খুন করার কথা ছিল তার। তীর্থ গিয়েছিল অপূর্বকে গার্ড দিতে। —এত খুঁটিনাটি কুন্তলাকে বলেনি অপূর্ব। বরং বলেছে, পার্টির নির্দেশ ছিল দুজনেই অ্যাটেম্পট নেবে এক সঙ্গে। যে সফল হয়। কথামতো ঝাঁপিয়ে ছিল দুজনেই। তীর্থ ধরা পড়ে যায়। অপূর্ব পালিয়ে আসে বুদ্ধি করে। —এই মিথ্যাচরণ শোধরাতে কোনওদিনই ফিরে আসবে না তীর্থ। কোনওদিন জিজ্ঞেস করবে না, অপূর্ব, তুই এদের বাড়িতে কী করছিস? — তারপর যখন জানবে, আজ দুপুরে কুন্তলাদের বাড়ি খেয়েছে, ভীষণ অবাক হয়ে যাবে।

দুপুরে কুন্তলাদের বাড়ি খাওয়ার ঘটনাটা আকস্মিক। আজ যখন চানখাওয়া করতে নিজেদের বাড়ি ঢুকছিল অপূর্ব, দেখে, বেড়ার গেট খুলে বেরিয়ে আসছে কুন্তলা। মুখোমুখি হতে কুন্তলা বলে, এত বেলা করে ফিরলে, জেঠিমা চিন্তা করছে।

দায়সারা হেসে গেটের দিকে এগিয়েছিল অপূর্ব, কুন্তলা বলে, তোমার কে এক মাসির মেয়ে এসেছে দেখলাম।

মাসির মেয়ে! ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল অপূর্ব।

হ্যাঁ, কলকাতায় থাকে। ইলাদির চেহারার সঙ্গে খুব মিল। আমি তো প্রথমে ইলাদিই ভেবেছিলাম। তবে রংটা ময়লা।

গেট খুলেও বাড়ি ঢোকে না অপূর্ব, বুঝতে অসুবিধে হয়নি ছোড়দি এসেছে। বাড়িতে বউদি নেই, সেই সুযোগে মা কি ছোড়দিকে আনল? মায়ের সঙ্গে তার মানে ছোড়দির যোগাযোগ আছে। অপূর্বকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখে না মা, জানে, এসব তুচ্ছ সাংসারিক বিষয়ে মাথা গলাবে না অপূর্ব। মায়ের অনুমান ঠিক। কিন্তু অপূর্ব চায় না ছোড়দিকে ফেস করতে, নানান সাংসারিক সেন্টিমেন্টাল ইস্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে সে।

বাড়ির দিকে পিছন ফিরে হাঁটা দিয়েছিল অপূর্ব, কুন্তলা পিছু ডাকে, এ কী, তুমি চললে কোথায়! খাবে না বাড়িতে?

না।

কেন?

কারণ আছে নিশ্চয়ই।

মাসতুতো দিদির সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া? সহজ আন্দাজে জানতে চায় কুন্তলা।

ধরে নে তাই।

তাহলে তুমি ভাত খাবে কোথায়? এত বেলা হল, খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব... বাইরে কোথাও খেয়ে নেব। বলে, জোর কদমে হাঁটা লাগিয়েছিল অপূর্ব। কুন্তলা দৌড়ে এসে হাত ধরে। বলে, আমাদের বাড়িতে খাবে চলো।

তা হয় না।

কেন হয় না? বাড়িতে আমি আর মা। বাবা কোন সকালে খেয়েদেয়ে কলকাতায় চলে গেছে। আমাদের এখনও খাওয়া হয়নি। তুমি চলো, দিব্যি তিনজনের হয়ে যাবে। কুন্তলা এমনভাবে ধরে পড়ল, না এসে পারল না অপূর্ব। শুধু খাওয়া নয়, কুন্তলাদের কুয়োর ঠান্ডা জলে স্নানটাও সেরে নিয়েছে।

কুন্তলাদের উঠোনের পরেই তীর্থদের বাড়ি, কান পেতে রেখেছিল অপূর্ব, ও-বাড়ির কোনও কথাবার্তা আসছিল না কানে। এমনকী তীর্থর ভাইপো ছোট্ট অন্তুর গলাও পাওয়া যাচ্ছিল না। পুরো বাড়িটা যেন বোবা হয়ে গেছে। শুধু একটা কাক ডেকে যাচ্ছিল ওদের জামগাছে বসে।

কুন্তলার মা খুব যত্ন করে খাইয়েছে। ঘুরিয়ে একবারও জানতে চায়নি, কেন অপূর্ব বাড়িতে না খেয়ে এখানে খাচ্ছে। কুন্তলা আড়ালে মাকে কিছু বুঝিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই। খেতে বসে খারাপই লাগছিল অপুর্বর, ভাত নেওয়ার জন্য সাধাসাধি করছিল কুন্তলার মা। ওই ভাতটুকু তো নিজেদের ভাগ থেকেই তুলে দেওয়া। মাসিমা হয়তো দুপুরে চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দেবে। —কেন এই আত্মত্যাগ করছে এরা! অপূর্ব তো ওদের জন্য কিছু করেনি। এখনও অপূর্বদের মতো গাঁ-ঘরে শত অভাবের মধ্যেও এই ধরনের মা-মাসিমারা আছে। শহরের মহিলাদের মতো কাঠ-কাঠ হয়ে যায়নি।

খেয়েদেয়ে উঠতেই কুন্তলা বলেছিল, তুমি ওঘরে চলে যাও বিছানা ঝেড়ে রেখেছি।

সেই যে বিছানায় এসে শুয়েছে অপূর্ব, এক স্বপ্নে বিকেল গড়িয়ে সন্ধের মুখে। ছোড়দির কথা খেয়াল হয়। ও কি এতক্ষণে ফিরে গেছে ট্রেন ধরে, নাকি থাকবে আজ রাতটা? মেজদা চটে যাবে ভীষণ। বাবার পছন্দ-অপছন্দগুলোকে ভগবানের ইচ্ছের মতো মানে দাদা। অপূর্বর সেরকম কোনও আনুগত্য নেই। ছোড়দিকে সে এড়িয়ে যায় অন্য একটা কারণে। ছোড়দির জেদ, সমাজের প্রতি 'ডোন্ট কেয়ার' ভাবটাকে শ্রদ্ধা করে সে। ঘটনাটাকে ছোড়দির পার্সোনাল রেভলিউশন বলে গণ্য করে। ছোড়দির সঙ্গে দেখা করা মানে, নিজেদের সংসারের অস্বাচ্ছন্দ্যর সঙ্গী করে নেওয়া। কিন্তু ছোড়দি কেন যোগাযোগ রাখছে? আজই কি প্রথম এল, নাকি আগেও এসেছে? ছোড়দি বোধহয় বসে আছে স্টেশনে, ছটার আগে কোনও লোকাল নেই, অপূর্ব কি যাবে একবার? কত কতদিন দেখেনি। —বিছানা থেকে নেমে পড়তে যাচ্ছিল অপূর্ব, ঘরে ঢোকে কুন্তলা। হাতে চায়ের কাপ-ডিশ।

চায়ের সঙ্গে বিস্কুটও দিয়েছে, ফেরত দিয়ে অপূর্ব কাপটা নেয়। সামনের চেয়ারটায় একই ভঙ্গিতে বসেছে কুন্তলা, মুখে কথা নেই। চেয়ে আছে শুধু। চাউনিটাও ভাষাহীন। —ইদানীং ওর উপস্থিতিটা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে অপূর্বর কাছে। এর একটা শেষ দরকার।

কাপে চুমুক মেরে অপূর্ব বলে, বিকেলের দিকে একটু পরিপাটি হস না কেন? সামনে যেন ফাইনাল পরীক্ষা, এমন চেহারা করে রেখেছিস!

কী হবে সাজগোজ করে, কোন সিনেমা থিয়েটারে যাচ্ছি আমি! এলানো গলায় বলে কুন্তলা।

যেতে তো পারিস। একটু ঘোরাফেরা করলে মনটা ভাল থাকে। সারা দিন বসে বসে চিন্তা করলে কি তীর্থ ফিরে আসবে?

উত্তরে ম্লান হাসে কুন্তলা। চা শেষ করে কুন্তলার হাতে কাপ ফেরত দেয় অপূর্ব। খাট থেকে নেমে আসে। বলে, মাসিমা কোথায় রে?

কেন?

চলে যাচ্ছি, বলে যাই।

তুমি এখন কোথায় যাবে, বাড়ি?

উত্তর দিতে একটু সময় নেয় অপূর্ব, আবছাভাবে হলেও, একটু আগে মনে মনে একটা গন্তব্য ঠিক করেছে, ইছামতীর ধারে একবার যাবে। স্বপ্নে যে জায়গাটা দেখেছিল।

কী হল, বললে না কোথায় যাবে? ফের জানতে চায় কুন্তলা।

অপূর্ব বলে, দেখি, কোনও ঠিক নেই।

আমি যাব তোমার সঙ্গে?

কুন্তলার কথায় কপালে ভাঁজ পড়ে অপূর্বর। না বোঝার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে কুন্তলার দিকে।

বুঝতে সুবিধের জন্য কুন্তলা বলে, এই তো তুমি বললে কোথাও বেরোই না। চল, তোমার সঙ্গে যাব।

একটু ইতস্তত করে অপূর্ব, কুন্তলা কি ঘুরিয়ে অন্য কিছু বলতে চাইছে? কটাক্ষ! কুন্তলাকে এড়ানোর তাগিদে অপূর্ব বলে, আমি এখন যাব সেই ইছামতীর ধারে। চার মাইল পথ। পারবি যেতে?

কেন পারব না। কলেজ থেকে বন্ধুরা মিলে অনেকবার গেছি। দারুণ জায়গা! তুমি একটু দাঁড়াও এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। বলে, ঘর ছেড়ে যাচ্ছিল কুন্তলা।

অপূর্ব শেষ চেষ্টা চালায়, কিন্তু তোর টিউশনি! আজ পড়াতে যাওয়া নেই?

একদিন না গেলে কিছু হবে না।

এ তো মহা ফ্যাচাংয়ে পড়া গেল, কেন যে মরতে সাজতে বলেছিল কুন্তলাকে! শেষেরও পরে মরিয়া চেষ্টা করে অপূর্ব, চারঘাট হয়ে যেতে হবে ইছামতী। সন্ধে হয়ে এল, ফেরার সময় পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে পথঘাট...

তাতে কী হয়েছে, তুমি তো থাকবে সঙ্গে। আমি একটা টর্চ নিয়ে নিচ্ছি। বলে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় কুন্তলা।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অপূর্ব। মেয়েটা তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। কেড়ে নেবে সমস্ত অবসর। অদ্ভুত এক বিনম্র নজরদারি। শেষমেশ কুন্তলার জন্যই বাধ্য হয়ে অপূর্বকে মছলন্দপুর ছাড়তে হবে। মেজদার কথামতো নিতে হবে জামাইবাবুর দেওয়া চাকরি।

মিনিটখানেকের মধ্যে প্রসাধন সেরে কুন্তলা ফিরে এল। কিছুটা চাপল্য ফিরে এসেছে চোখেমুখে। বিশেষ ভ্রূভঙ্গি করে বলল, তুমি এগিয়ে যাও, মণ্ডলদের ধানগোলার কাছে দাঁড়িও। টিউশনি বাড়ি যাচ্ছি বলে বেরোচ্ছি আমি।

এই গোপনীয়তা ঠিক পছন্দ হয় না অপূর্বর। বলে, এত লুকোছাপার কী আছে! মাসিমা কি বারণ করবেন আমার সঙ্গে যেতে?

বারণ হয়তো করবে না, একগাদা প্রশ্ন করবে। সব কথার উত্তর দিতে ভাল লাগে না। কথা শেষ করেই গলা তোলে কুন্তলা, মা, অপূর্বদা চলে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অপূর্ব। শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে হেঁশেল থেকে উঠে আসেন মাসিমা। বলেন, এস বাবা, যেদিন মনে করবে এরকম চলে আসবে খেতে। তোমরা তো আমার ছেলের মতো। তীর্থ কতদিন আমার কাছে এসে খেয়েছে।

বিনয় আর কৃতজ্ঞতা মেশানো যান্ত্রিক হাসি হেসে অপূর্ব নেমে আসে কুন্তলাদের দাওয়া থেকে। বিকেলের আলো নিঃশেষ হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি।

মণ্ডলদের ধানগোলার কাছে এসে অপুর্ব বুঝতে পারে, শুধু মাকে নয়, পাড়ার লোকেদেরও এড়াতে চেয়েছে কুন্তলা। মণ্ডলদের বাড়িটাই পাড়ার শেষ বাড়ি। এর পর দুপাশে মাঠ, খেতজমি নিয়ে মাটির রাস্তা গেছে অন্য গ্রামে। এরকম তিনটে গ্রাম পার করে ইছামতী। যেতে আসতে রাত হয়ে যাবে। ডিসিশনটা ঠিক হল না। সঙ্গে আবার জুটে গেল কুন্তলা। —হঠাৎ একটা কথা মাথায় আসে, এখান থেকে পালিয়ে গেলে কেমন হয়! তলিয়ে ভাবতে গিয়ে সিদ্ধান্ত পালটায় অপূর্ব। কুন্তলা তাকে এখানে না পেয়ে, ভাবতে পারে এগিয়ে গেছে অপূর্ব। সেও এগোতে থাকবে। এগোতে এগোতে নিভে যাবে দিনের আলো।

নাঃ, পালাবার পথ নেই। অপূর্ব মন দেয় মণ্ডলদের উঠোনে। আমলকি কেটে শুকোতে দিয়েছে বাড়ির লোক। দুটো শালিখ আমলকির চাকা ঠোঁটে তুলে ফের মাথা ঝাঁকিয়ে ফেলে

দিচ্ছে। আমলকির কষা স্বাদে বিভ্রান্ত হচ্ছে শালিখ দুটোর বিকেল। যেমনটা অপূর্বও বিভ্রান্ত এখন।

সোজা রাস্তায় না এসে হঠাৎ মাঠ থেকে উঠে এল কুন্তলা। শর্ট রুটে এসেছে। বলল, চলো।

ওরা হাঁটছে। একটার পর একটা গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছে। আলোর রং এখন মেটে সিঁদুর। গৃহস্থের চালে, বাগানের ফসলের ওপর ছুঁয়ে আছে সেই রং। বাতাসে ভেসে আসছে মানুষজনের অস্পষ্ট কথোপকথন। কুন্তলা অনেক কথা বলছে, পাড়ায় থাকতে বলে না। কথাগুলো খুবই মামুলি, স্কুল-কলেজজীবনের গল্প। অপূর্ব খেয়াল করছে, তীর্থর কথা একবারও তুলছে না কুন্তলা। তুলবে পরে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই শুরু করবে ওদের প্রেমের প্যানপ্যানে স্মৃতি। শুনতেই হবে অপূর্বকে। কতদিন কে জানে!

ইতিমধ্যে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেছে কুন্তলা, মাসতুতো দিদিকে এড়িয়ে গেলে কেন?

এমনি। আমার ঠিক পছন্দ হয় না। বলে, পাশ কাটিয়ে ছিল অপূর্ব।

ফের প্রশ্ন, অপছন্দের কারণ?

সে অনেক কথা। বলে, প্রসঙ্গ চাপা দিয়েছে অপূর্ব। কুন্তলা ফিরে গেছে অন্য গল্পে। মাঝেমধ্যে জিজ্ঞেস করছে তুমি এত চুপচাপ কেন? আমি সঙ্গে আছি, খারাপ লাগছে? অপূর্ব শুধু হেসেছে। মাঠ গড়িয়ে ভেসে আসছে ঘুঘুর ডাক। কানে ঢুকে বসছে নির্জনতা। কুন্তলার গলার আওয়াজও মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছে। দিনশেষে আলো নিভছে খুব ধীর লয়ে। অনেকদিন পর একটা প্রলম্বিত বিকেল দেখছে অপূর্ব।

এক সময় আশেপাশের বসত উধাও হয়ে গেল। চারপাশে বিস্তীর্ণ চষা জমি। হাওয়ার গন্ধ গেল পালটে। আর একটু হাঁটতেই অপূর্বরা পৌঁছে গেল নদীর চরায়। নদী অবশ্য এখান থেকে অনেক দূর।

কুন্তলা উচ্ছ্বসিত। বলে, উঃ, কী দারুণ। কতদিন পর এলাম।

অপূর্ব ততটা খুশি হয়নি। স্বপ্নে দেখা নৌকো এখানে নেই। বাকি সব একই রকম। নদীর ওপারে কেওটখালির শ্মশান। এখন কোনও চিতা জ্বলছে না। বড় বড় গাছ শ্মশানভূমি ঘিরে আছে।

একটা ঢালু মতো জায়গায় বসে পড়েছে কুন্তলা। অপূর্বকে ডাকে, চলে এস এখানে। অনিচ্ছার পদক্ষেপে অপূর্ব গিয়ে বসে। মাটিতে বালির মিশেল। দিনের তাপ এখনও কিছুটা ধরে রেখেছে মাটি। স্বপ্নের কাদামাটির সঙ্গে কোনও মিল নেই।

সূর্য ডুবে গেছে। নদীর বুকে ভুল করে ফেলে গেছে সামান্য অস্তরাগ। যেন সিঁদুর, বহুদিন নিরুদ্দেশ স্বামীর ফেরার আশায় স্ত্রী যেমন পরে থাকে।

ভীষণ নির্জন হয়ে আসছে চারপাশ, পাখিরা তড়িঘড়ি ফিরছে বাসায়। কখনও কখনও ডেকে উঠছে চরাচর কাঁপিয়ে। নদীর বুকে একটা ডিঙিও নেই। জায়গাটা যে এত নিরালা, মানুষহীন হবে আন্দাজ করতে পারেনি অপূর্ব। ফাঁকা ভাবটা যেন চাপ হয়ে বসছে বুকে। চাপটা হালকা করতে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ধরায়। অনেকক্ষণ পর কথা বলে ওঠে কুন্তলা, আমি না এলে তুমি একা একা এখানে এসে বসে থাকতে?

অপূর্ব কোনও উত্তর দেয় না। সিগারেটে লম্বা করে টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে। তোমার ভয় করে না?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে কুন্তলার দিকে তাকায় অপূর্ব। বিষয়টা পরিষ্কার করতে কুন্তলা ফের বলে, তুমি তো বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ, আগের পার্টির কমরেডরা তোমাকে একলা পেলে ছেড়ে দেবে ভেবেছ। তীর্থদা বলত, পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা মানেই মৃত্যু।

ভেতর ভেতর ভীষণ চমকে ওঠে অপূর্ব। মুহূর্তে একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে, কুন্তলা কি সশস্ত্র? তাকে খুন করার জন্যই কি কুন্তলা এখানে এসেছে? আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে অলকেশদা বিমলদারা কুন্তলাকে নির্দেশ দিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক অপূর্বকে খুন করতে।

অপূর্ব টের পায় কপালে তার ঘাম জমছে। এখন বুঝতে পারছে কেন কুন্তলা তার সঙ্গে পাড়ার মধ্যে দিয়ে আসতে চায়নি। দাঁড়াতে বলেছিল গ্রামের শেষ সীমায়। আসলে কোনও সাক্ষী রাখতে চায় না কুন্তলা। ওয়ান শটার নাকি রিভলবার, কী আছে কুন্তলার কাছে? এক্ষুনি কি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া উচিত?

চোখের পাতা পড়ার মতো অন্ধকার নামছে চারপাশে। অপূর্বর মাথায় আর একটা মারাত্মক উপায় খেলে যায়, কুন্তলাকে খুন করে এখানে ফেলে গেলে কেমন হয়! কোনও সাক্ষী নেই, কেউ জানতেও পারবে না। কুন্তলার বেঁচে থাকা অপূর্বর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। অপূর্বদের অভিযানের পুরোটাই জানে কুন্তলা। পুলিশ, কংগ্রেস, সি পি এম, নকশাল যার কাছেই মুখ খুলবে কুন্তলা, অপূর্বর বাঁচা কঠিন হয়ে যাবে।

কুন্তলার দিকে তাকিয়ে মনে মনে মাটিতে থাবা ঘষতে থাকে অপূর্ব। এক্ষুনি ঝাপিয়ে পড়বে। পারছে না এই কারণে যে, কুন্তলা ভীষণ নির্বিকার। অপূর্বকে খুন করার কোনও প্রস্তুতিই নিচ্ছে না। তা হলে কি অপূর্বর আশঙ্কা অমূলক?

মাটিতে আঁক কাটতে কাটতে কুন্তলা বলে, তীর্থদা ফিরে এলে আমাকে শেষ করে দেবে।

অবাক হয় অপূর্ব। জানতে চায়, কেন?

যেসব কথা আমাকে বলতে বারণ করেছিল সব তোমায় বলে দিয়েছি। আমাকে একদম খেয়ে ফেলবে।

খুবই সতর্কতার সঙ্গে একটা প্রশ্ন তোলে অপূর্ব, তোরা তো একে অপরকে ভালবাসিস, খেয়ে ফেলার কথা আসছে কেন?

তীর্থদা ভালবাসার মানে বোঝে না। ওর ধ্যানজ্ঞান শুধু পার্টি। ভালবাসতেই দেবে না কাউকে।

শেষ বাক্যটা কুয়াশাচ্ছন্ন লাগে। অপূর্ব বলে, ঠিক বুঝলাম না।

অপূর্বর চোখে চোখ রাখে কুন্তলা। তাকিয়ে থাকে ঠায়। অন্ধকার এত ঘন হয়েছে, পড়া যায় না কুন্তলার মুখ। আকাশে উঠে পড়েছে কিছু তারা। কৃষ্ণপক্ষের ফালি চাঁদের আলোয় তেমন জোর নেই। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে লক্ষ্য স্থির করছে কুন্তলা। অস্ত্র নিশ্চয়ই ওর কোমরে গোঁজা। একটা হাত মাটিতে, অন্যটা হাঁটুর ওপর। অপূর্বও ভেতর ভেতর প্রস্তুত হয়। হাতের অবস্থান বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলার কাছ থেকে কেড়ে নেবে অস্ত্র। সেটা দিয়েই...

চকিতে ঘটে গেল সেই ঘটনা, যেমনটা করবে ঠিক করেছিল অপূর্ব। কুন্তলা হাত তুলতেই ওকে মাটিতে শুইয়ে কোমরের কাছে ব্লাউজের তলায় অস্ত্র খোঁজে অপূর্ব। পায় না। আশ্চর্য লাগে, অনুমান ভুল! নিজেকে কুন্তলার থেকে সরিয়ে নিতে গিয়ে অপূর্ব টের পায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে কাঁকড়ার দাড়ায়। ঘন কামার্ত গলায় কুন্তলা বলছে, আমি তোমাকে ভালবাসি অপূর্বদা। অনেক আগে থেকেই। নিজে জানাতে লজ্জা করত, তীর্থদাকে বলেছিলাম আমার হয়ে বলতে, রাজি হয়নি। বলেছে, আমাদের পার্টিতে প্রেমট্রেমের কোনও স্থান নেই।

অপূর্ব নিশ্চিত, এসবই ছলনা, মিথ্যে কথা। তবু কুন্তলার অমোঘ আশ্লেষে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে সে। ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠছে কুন্তলা। অপূর্বর হাত টেনে নিয়ে চেনাচ্ছে অজানা উপত্যকা, যমজ ধবল টিলা, নাভির নীচে নদীর ঢালু চরা। কুন্তলার কামনার কাছে হেরে যাচ্ছে অপূর্বর ন্যায়বোধ। মনে পড়ে যাচ্ছে আর একটা মেয়ের কথা, দীপালি, অংশু বরুণের দিদিমণি। নিরাপদ নির্জনতা পেলে সে বোধহয় এতটাই সাহসী হয়ে উঠত।

কুন্তলা এখন সাহসের মাত্রা ছাড়িয়েছে, নিজেকে প্রায় নিরাবরণ করেছে অপূর্বর সামনে। আবছা অন্ধকারে চেয়ে আছে শঙ্খের মতো দুই স্তন। গভীর নির্জন নাভি। একটু আগে যে মেয়েটাকে খুন করবে ভেবেছিল অপূর্ব, অজস্র চুমু দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। শিহরিত কুন্তলার গ্রীবা ছিলাটান। আঁকড়ে ধরছে বালিমাটি। মুঠো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়। অসহ্য আরামে কুন্তলা ফের জাপটে ধরে অপূর্বকে। তারপর নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে সমস্তটাই। এই রতিক্রিয়ায় অসহায়ের মতো ভালবাসা খোঁজে অপূর্ব। কুন্তলার নৈপুণ্য দেখে টের পেতে

অসুবিধে হয় না সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা তার আছে। তা কি তীর্থর সঙ্গেই? তীর্থ কি এটাকে ভালবাসা ভেবে ভুল করেছিল? কুন্তলা এখন যেভাবে নিজেকে তুলে দিয়েছে অপূর্বর কাছে, এটাই বা ভালবাসার থেকে কম কোথায়? এই অন্ধ সমর্পণেরও তো একটা মূল্য আছে...

দ্বন্দ্বে অবশ অপূর্বকে জাগিয়ে রাখে কুন্তলা। ঘূর্ণিঝড় পাক খেতে থাকে চরার ওইটুকু অংশে। কুন্তলার শীৎকারে লজ্জা পায় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। খণ্ড মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকে। আরও অন্ধকার হয়ে যায় চরাচর। শ্বাসের শব্দে কথা বলে দুজনে। দুজনেই হাতড়ায় প্রেম।

এক সময় সব শেষ হয়। বালির চরায় উঠে বসে অপূর্ব। একটু পরে নিজেকে গুছিয়ে কুন্তলা। নদীর ওপারে কেওটখালির শ্মশানে চিতা জ্বলছে। আবছা গ্রামরেখা। দুজনেই চেয়ে থাকে শ্মশানের আগুনের দিকে।

চিতা নেভার আগেই ওরা গ্রামের পথ ধরে। পরস্পর কোনও কথা বলে না। শোক পালন! কিছুক্ষণ আগে তীর্থকে চিতায় শুইয়ে এসেছে!

॥ সাতাশ ॥

ভোর ছটা। রোজকার মতো হাতে ফুলের সাজি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বরুণ। ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। আলোর দেখা নেই। মন্দিরা কি আজ যাবে ফুল তুলতে? ওর মা হয়তো ছাড়বে না। বরুণের মাও ছাড়ত না, ভাগ্যিস মায়ের একটা মেয়ে হয়েছে, মানে বরুণের বোন। মা এখন বাড়ির কোনও কাজ করে না, ভাঁড়ারঘরে বোনকে নিয়ে থাকে। দিদিমা এসেছে মামাবাড়ি থেকে। রান্নবান্না যা কিছু দিদিমাই করছে। বরুণের দিদিমার মতো ভাল মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। কখনও রাগ করে না, বকে না, পিঠ বাড়িয়ে দিলে অনেকক্ষণ ধরে সুড়সুড়ি দেয়। দাদা আর বরুণ যখন যা বায়না করে দিদিমার ক্ষমতায় কুলোলে মিটিয়ে দেয়। না পারলে বাবাকে বলে। বরুণের থেকে এক হাত লম্বা দিদিমার কথা বাবাও ফেলতে পারে না।

এবার দিদিমা না এলে খুব সমস্যায় পড়তে হত।

বোন আনতে মা গেল হাসপাতালে। বরুণের তো চিন্তার একশেষ, তাদের দুই ভাইকে কে দেখবে? খেতে দেবে কে? তারপর জামাকাপড় বার করে দেওয়া, চুল আঁচড়ে দেওয়া, সন্ধ্যাদির মা মালতীমাসি মায়ের শরীর খারাপ থাকলে রান্নাবান্না করে ঠিকই, তবে মালতীমাসিকে তেমন বিশ্বাস করতে পারে না বরুণ। ভীষণ রাগী, সন্ধ্যাদিকে কুয়োপাড়ে ফেলে মারে। মা এসে বাঁচায়। মা না থাকলে মালতীমাসি যদি রাগের চোটে বরুণদেরও মারতে শুরু করে দেয়! বাবা থাকবে অফিসে, কে বাঁচাবে? বরুণের সব চিন্তার অবসান হল দিদিমা এসে যাওয়ার পর। মায়ের খুব পেটের যন্ত্রণা হচ্ছিল। মালতীমাসির কাছে বরুণদের রেখে বাবা মাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজমামা দিদিমাকে দিয়ে গেল। মছলন্দপুর থেকে মেজমামা কী করে জানতে পারল মা হাসপাতালে যাবে, বরুণরা পড়বে মুশকিলে? –বড়দের অনেক ব্যাপারই বরুণ বোঝে না। প্রচুর প্রশ্ন ঘোরে মাথায়। মা ছাড়া সেসব প্রশ্ন কাউকে করা যায় না। ঠিকঠাক উত্তর দেয় না কেউ। হয় বকে অথবা হাসে। মা একমাত্র বরুণের প্রিয় মানুষ, বোনকে পেয়ে মা একটু যেন দুরে চলে গেছে। ভাঁড়ারঘরে আলাদা শোয়। বরুণ চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ালে ইশারায় ডাকে, মাথা নাড়ে বরুণ, বলে, বাবা এ-ঘরে ঢুকতে বারণ করেছে।

মা বলে, কিছু হবে না। আয় না। দেখ না বোনটাকে। তোকে ডাকছে।

মিথ্যে মিথ্যে বলে মা। বরুণ কাছে গিয়ে দেখেছে, বোন কাউকেই চেনে না। খালি ঘুমোয় আর মায়ের দুধ খায়।

বরুণ মাকে একটা কথাই বারবার জিজ্ঞাসা করে, তুমি কবে এ-ঘর থেকে বেরোবে? মা হাসে। বলে, তোর বোনটা একটু বড় হয়ে যাক। কদিন পরেই বেরোব। দিদিমা তো আছে তোদের অসুবিধে কী?

অসুবিধে একটাই, রান্নাঘরের উঁচু তাকে দিদিমা হাত পায় না, বরুণকে দিয়ে বাবা দাদাকে ডেকে পাঠায় বারবার। বাকি সব ব্যাপারে দিদিমা খুব ভাল। তবু মা না থাকলে কি হয়!

এই কদিনে বোন একটুও বড় হয়নি। খুব মন দিয়ে লক্ষ রাখছে বরুণ। আজ আট দিন। বিকেলবেলা আটকড়াই-বাটকড়াই হবে। আটজন ছেলে মিলে একটা কুলো ধরে কঞ্চি দিয়ে পেটাবে জোরসে। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে, আটকড়াই বাটকড়াই ছেলে... না, না—বোন তো, বলবে, মেয়ে আছে ভাল?

কুলো না ফাটা অবধি এরকম চলবে। তবে দীপুর হাতে যা জোর চারবার মেরেই কুলো ফাটিয়ে দেয়। ভাঙা কুলো ছুড়ে দেওয়া হবে বাড়ির চালে। তারপর কুলো ফাটানো আটজনকে ছোট ছোট চুপড়ি দেওয়া হবে, তাতে থাকবে খই, মুড়কি, বাতাসা, সন্দেশ, আর চার আনা পয়সা। ওই সিকিটা নিয়েই যত চিন্তা বরুণের। কী করবে পয়সাটা নিয়ে? কী কিনে খাবে? একটা জিনিস মাথায় এসেছে, চার আনায় আটটা ফুচকা হয়। মা কখনও ফুচকা

খেতে দেয় না। বলে, ঝোলটা নাকি বাসি জলে তেঁতুলগোলা। বাসি জল বলেই অত টেস্ট। বরুণ দু-একবার বন্ধুদের পয়সায় লুকিয়ে খেয়েছে। আজ সেইসব বন্ধুদের খাওয়াবে না। খাওয়াবে মন্দিরাকে। পাড়ার বাইরে গিয়ে। যাতে না কেউ দেখে ফেলে। —এইসব ভাবছে আর মন্দিরাদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বরুণ। অন্য দিন মন্দিরা হাতে ফুলের সাজি নিয়ে অপেক্ষা করে বরুণের জন্য। আজ যেন গোটা বাড়িটাই ঘুমোচ্ছে। ডাকতে হবে নাকি রে বাবা!

যা কুয়াশা হয়েছে, মন্দিরারা টের পায়নি ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বেড়ার গেটের পর বন্ধ দরজা। কড়া নাড়তে হবে। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। যদি কাকিমা এসে বকে, এখনও রাত ফুরোয়নি মন্দিরাকে ডাকতে চলে এলে!

পাড়ার বড়দের মধ্যে শুধুমাত্র মন্দিরার মা-বাবা 'তুমি' করে কথা বলে। ওই 'তুমি' ডাকটার জন্যই ওঁরা যেন দূরের মানুষ। একটু সমঝে চলে বরুণ। কাকিমার বকুনির উত্তরে বলতে পারবে না, আমি তো বেলাতেই ফুল তুলতে বেরোতাম পাড়ার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে। মন্দিরা একদিন বলল, আমরা দুজন আরও ভোরে বেরোব। অনেক ফুল পাব। ওর কথাতেই... নাঃ, এসব ভেবে লাভ নেই। এত কথা বরুণ বলতে পারবে না। তার থেকে একা একাই যাওয়া ভাল। মন্দিরাদের গেট থেকে সরে এসে হাঁটতে যাবে বরুণ, কেমন যেন বুক ছমছম করে। দু হাতের বেশি দেখা যাচ্ছে না। সব ধোঁয়া ধোঁয়া। তাহলে কি ফিরে যাবে বাড়ি? এদিকে ফুল না পেয়ে বাবা খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। মা ভাঁড়ারঘরে যাওয়ার পর থেকে বাবা ঠাকুরঘরে পুজো করে। যত ফুল পায় বাবা, খুশি হয়। পুজো তো তেমন কিছু করে না, চোখ বুজে একটু ধ্যান। ঠাকুরের সিংহাসন সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজায়। মায়ের থেকেও ভাল। কথাটা মাকে বলেছে বরুণ। একথাও বলেছে, চল না চুপি চুপি দেখে আসবে।

ও-ঘর ছেড়ে বেরোনো বারণ মায়ের। কপালে হাত ঠেকিয়ে মা বলেছে, তোর বাবার তাহলে মতি হল! তোর ঠাকুর্দাও খুব ঈশ্বরভক্ত ছিলেন।

ঠাকুর্দাকে কে ফুল তুলে দিত?

উনি নিজেই তুলতেন। সমস্তিপুরের বাড়ির বাগানে তো অনেক ফুল। মায়ের কথা শুনে মনে মনে সমস্তিপুরের বাড়ির বাগানে চলে গিয়েছিল বরুণ। সত্যি, সেখানে প্রচুর ফুল। এখানকার মতো লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফুল তুলতে হয় না। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে বরুণ, সামনে ঠিক চার হাত করে পরিষ্কার হচ্ছে। এমন সময় পিছন থেকে ভাঙা গলায় ডাক, অ্যাই বরুণ, দাঁড়া না। আমি আসছি।

ঘুরে দাঁড়ায় বরুণ, কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে মন্দিরাদের গেট। মন্দিরা গেট খোলার জন্য তাড়াহুড়ো করছে। কাকিমা ওকে উলের টুপি পরাচ্ছে।

বরুণ গেটের কাছে যায়। কাকিমার মুখ থমথমে, সেটা রাগে না এক্ষুনি ঘুম ভেঙেছে বলে, বুঝতে পারে না। মন্দিরাকে রেডি করে কাকিমা বলে, বরুণ, খুব সাবধানে, নালা দেখে রাস্তা হাঁটবে। যা অন্ধকার হয়ে আছে চারপাশ! গাছে উঠে ফুল পাড়বে না। সমস্ত গাছের ডাল এখন হিমে ভিজে আছে। মন্দিরাকে কত বারণ করলাম যেতে, কিছুতেই শুনল না।

বরুণকে কোনও দোষ দিচ্ছেন না কাকিমা, তবু নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে বরুণের। এত অন্ধকারে না বেরোলেই ভাল হত। মা বোনকে নিয়ে আলাদা ঘরে আছে তাই, নয়তো মাও বরুণকে বেরোতে দিত না। হঠাৎই ছোট্ট বোনটার ওপর রাগ হয়ে গেল বরুণের।

চ রে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বলে হাঁটা লাগায় মন্দিরা।

বরুণ আলগোছে কাকিমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মন্দিরার সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

রোজ যেখানে এসে বরুণের হাত ধরে মন্দিরা, আজ তার অনেক আগেই ধরল। হাঁটছে ধীরে ধীরে, কাকিমা সাবধান করে দিয়েছে। বরুণ বলে, তুই বুঝি খুব জেদ করছিলি ফুল তুলতে যাবি বলে?

মন্দিরা কোনও উত্তর না দিয়ে বরুণের দিকে তাকায়। ওর চোখের কোল এখনও ভিজে।

কান্নাকাটি করেছে বোধহয়। কথা ঘুরিয়ে বরুণ বলে, তুই না এলে আমি বেশি করে ফুল তুলে তোদের বাড়িতে দিতাম।

বরুণকে আবার ঘুরে দেখে মন্দিরা। এবার ফিচেলের মতো হাসতে থাকে। বরুণ অবাক হয়ে বলে, হাসছিস কেন?

হাসতে হাসতেই মন্দিরা বলে, তোকে এভাবে কে চাদর পরিয়ে দিয়েছে রে? কার চাদর?

বরুণ বুঝতে পারে না 'চাদর' নিয়ে হাসার কী আছে! তাড়াহুড়োতে দিদিমা বরুণের সোয়েটার খুঁজে পায়নি। নিজের গা থেকে র‍্যাপার খুলে বরুণকে পরিয়ে দিয়েছে। মাথায় ঢাকা দিয়ে এত সুন্দর করে ঘাড়ের পিছনে গিঁট বেঁধেছে, মাথা নাড়া দিলেও খুলছে না। চাদরটা খুব নরম, মাখনের মতো।

চাদরটা খারাপ? মন্দিরার কাছে জানতে চায় বরুণ।

চাদরটা ভাল। কিন্তু এইটুকু ছেলে কখনও এসব পরে! আর পরেছে কেমন করে, একদম গাঁইয়া লাগছে। বলে, ফের হাসতে থাকে মন্দিরা। এখন যেন বরুণ বুঝতে পারে, কেন বুলবুলি, শ্যামলীরা মন্দিরাকে 'পাকা মেয়ে' বলে। অন্যকে বোকা বানিয়ে খুব মজা পায় মন্দিরা। —চাদরটা এক্ষুনি খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে বরুণের, সাহস হচ্ছে না। যা শীত! রাগের চোটে ঘোমটা খুলে ফেলে বরুণ। মন্দিরা বলে, এই তো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে!

ঠান্ডায় কান কটকট করছে বরুণের, চাদরের তলায় কেঁপে উঠছে শরীর, দাঁত চেপে সহ্য করছে। মাথা সে কিছুতেই ঢাকা দেবে না। হারবে না মন্দিরার কাছে।

আঁকাবাঁকা গলি, কখনও খানিকটা বড় রাস্তা ধরে বরুণরা চলেছে বিশ্বাসপিসিমার বাড়ি। তারপর যাবে ভালদাদুর বাগানে। এই দুই বাড়িতে ফুল তোলে বরুণরা। ওবাড়ির কেউ বকে না। ওরা বরুণদের আত্মীয়।

ভালদাদুর বাগানে ফুল তোলার একটা নিয়ম আছে, গাছতলায় পড়ে থাকা ফুলগুলো শুধু তোলা যাবে। গাছে ওঠা যাবে না, নাড়ানো যাবে না। গাছে বুড়ো ব্রহ্মদত্যি থাকেন, কুপিত হবেন।

বরুণ একদিন সাহসে ভর করে ভালদাদুর টগরগাছ নাড়িয়েছিল। ব্রহ্মদত্যির কোনও সাড়া নেই। অনেক ফুল ঝরে পড়েছিল গাছতলায়। বরুণ মন্দিরা মজাসে ফুল তুলে ফিরেছিল বাড়ি।

পরের দিন সন্ধেবেলা ভালদাদু বাবার সঙ্গে গল্প করতে এসে বরুণকে ডেকে পাঠাল। বরুণ ততক্ষণে সকালের কথা ভুলে গেছে। ভাল মনেই বাবার ইজিচেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভালদাদু বলল, কাল রাতে টগরগাছের ব্রহ্মদত্যি খুব কান্নাকাটি করছিল রে, তোরা নিশ্চয়ই গাছ নাড়িয়েছিলি! বেচারা ভোরের দিকেই যা একটু ঘুমোয়।

বরুণ বুঝতে পারছিল ভালদাদু বানিয়ে বলছে, আসলে দেখে নিয়েছে বরুণকে গাছ নাড়াতে। বাবার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল বরুণ, এই বুঝি বাবা ধমকে উঠবে। বাবা ধমকাল ঠিকই, তবে বরুণকে নয়, ভালদাদুকে। বলল, কেন মিছিমিছি বাচ্চাদের ভয় দেখাও, উচিত কথাটা বুঝিয়ে বলতে পার না।

মায়ের মেখে দেওয়া মুড়িতে খাবলা মেরে ভালদাদু হাসতে হাসতে বলে, নাতিপুতিদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করি, তুইও না!

দাদুর কথায় কান না দিয়ে, বাবা বরুণকে বলে, ফুল গাছে থাকলেই ভাল লাগে, সুন্দর দেখায়। মাটিতে ঝরে পড়া ফুলই শুধু নিয়ে আসবি।

ঘাড় হেলিয়ে বাবা দাদুর সামনে থেকে পালিয়ে এসেছিল বরুণ। তারপর থেকে আর কোনওদিন ভালদাদুর গাছে হাত দেয়নি। মাটিতে যা পড়ে থাকে তাই শুধু তুলে নেয়। বিশ্বাসপিসিমা এর ঠিক উলটো। বলে, গাছে উঠে পড়। যত ফুল পাড়বি, ঝেঁপে ফুল আসবে গাছে। ফুল তো দেবতার পায়ে দেওয়ার জন্যই ফোটে। ফুল পেড়ে খানিকটা পিসিমাকে দিতে হয়। একটা বুড়ি কাজের লোক নিয়ে বিশ্বাসপিসিমা একা থাকে বাড়িতে। বিরাট বাড়ি, বিশাল বাগান। পিসিমার স্বামী মারা গেছেন, দুই ছেলে থাকে বিদেশে।

পুরনো বাগান, বাড়ি ঘিরে উঁচু পাঁচিল, লোহার গেট। বরুণ মন্দিরা ছাড়া পিসিমার বাড়িতে আর কেউ ফুল তুলতে ঢুকতে পারে না। বাগানটা পুরো জঙ্গল। বাগানে কত ধরনের ফুলের গাছ। জবা, গাঁদা, টগর, শিউলি, মাধবীলতা... ভালদাদুর বাগানের বাহার বেশি, ফুল কম।

বিশ্বাসপিসিমার বাগানেরও একটা গল্প আছে, তবে সেটা ভয়ের নয়। ভালদাদুর কাছে ব্রহ্মদত্যির কথা শুনে বরুণ পিসিমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ গো পিসি, তোমার বাগানে ভূত, প্রেত, চোর, ডাকাত কিছু নেই? যা জঙ্গল মতন!

না, না। সেসব আমার বাগানে ঘেঁষতে পারবে না। আমি দিনরাত কড়া নজর রাখি। তবে কি না চাঁদনি রাতে যে চারটে পরি আসে তাদের তাড়াতে পারি না।

পরি! চমকিত হয়ে এক সঙ্গে বলে উঠেছিল বরুণ মন্দিরা।

মিটিমিটি হাসছিল পিসিমা। একটু পরে বলেছিল, কাউকে আবার বলিস না যেন, বাইরের লোক উঁকিঝুঁকি মারলে ওরা আর আসবে না। –আমাকে ভয় পায় না, জানে বুড়ি মানুষ, কোনওদিন কোনও ক্ষতি করিনি ওদের।

ব্রহ্মদত্যির মতো পরিকে অবিশ্বাস করতে পারছিল না বরুণ। তার কারণ হয়তো পিসিমার বাগানটার চেহারা। ঝোপঝাড় অগোছালো হলেও, ছোট একটা পুষ্করিণী আছে, বাঁধানো ঘাট। যদিও ঘাটের সিঁড়ি ভাঙাচোরা। আর আছে পদ্মফুলওলা ফোয়ারা। এখন অবশ্য বিকল। ফোয়ারা ঘিরে সিমেন্টের রং ওঠা মাছ। দুটো মূর্তিও আছে বেদিতে বসানো, একটা মেয়ের অন্যটা বাচ্চা ছেলের। ছেলেটা বই পড়ছে, পাথরের বই। পাতা ওলটায় না। অনেকদিন ধরে ছেলেটা একই পাতা পড়ে যাচ্ছে। বাচ্চা ছেলেটা বোধহয় কোনওদিন জ্যান্ত ছিল, পড়াশোনা করত না বলে কেউ অভিশাপ দিয়েছে। বাচ্চাটা পিসিমার এক ছেলে নয়তো? – ভাবনাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেয় বরুণ। পড়াশোনায় সেও একটু-আধটু ফাঁকি মারে ওতে কিছু এসে যায় না। যাই হোক, ওই ধরনের বাগান যে পরিরা পছন্দ করবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। বরুণের ইচ্ছে আছে কোনও এক পূর্ণিমার রাতে চুপিচুপি চলে আসবে বিশ্বাসপিসিমার বাড়ি মন্দিরাকে সঙ্গে নেবে না। আগে নিজের চোখে দেখে মন্দিরাকে অন্য দিন দেখাবে।

হ্যাঁ রে বরুণ, পিসিমার বাড়িটা কোথায় গেল?

মন্দিরার ডাকে ভাবনা কাটে, কুয়াশা একই রকম, বাড়িগুলো ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কুয়াশার মধ্যে থেকে কদাচিৎ একটা-দুটো চাদর মোড়া লোক বেরিয়ে এসে হেঁটে যাচ্ছে বরুণদের পাশ দিয়ে। এ তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল! কুয়াশা কি আজ কাটবে না?

আর একটু হাঁটতেই ওরা পৌঁছে গেল পিসিমার বাড়ির গেটে। এবার গেটে চারবার টোকা মারলে পিসিমার বুড়ি কাজের মানুষটা এসে খুলে দেবে, মুখ তুলে দেখবেও না বরুণদের। বুড়ি জানে এ-বাড়িতে শুধু বরুণদেরই ফুল তোলার অনুমতি আছে। কিন্তু আজ যা অন্ধকার হয়ে আছে! বুড়ির ঘুম ভেঙেছে কি?

চারের জায়গায় ছবার গেটে টোকা মারে বরুণ। গেট খোলার কোনও নাম নেই। মন্দিরা বলে, কী হল রে, ঘুম থেকে ওঠেনি নাকি?

ঠোঁট ওলটায় বরুণ। ফের চারবার টোকা মারে গেটে। এবার খুলে যায়। বাগানে ঢোকে দুজনে। কাজের বুড়ি পিছন ফিরে দুপাশে দুলতে দুলতে হেঁটে যাচ্ছে ভেতর বাড়ির দিকে। বাগানটা আজ দারুণ দেখতে লাগছে, কুয়াশা জড়ানো গাছগুলোর কিছুটা দেখা যায়, কিছুটা যায় না। ফুলগুলো কুয়াশা থেকে বেরিয়ে হাসছে। বাগান জুড়ে ছড়িয়ে আছে কী সুন্দর গন্ধ।

বুক ভরে গন্ধ নেয় দুজনে। অন্য দিনের চেয়ে বাগানটা আজ বড় চুপচাপ। কোনও পাখি ডাকছে না। ওরাও হয়তো দিনের আলো দেখতে না পেয়ে থমকে আছে।

আজ ফুল তুলতে ইচ্ছে করছে না বরুণের, বাগানটায় ঘুরে বেড়াতে মন চাইছে। বাগানের রূপ দেখে মন্দিরাও থতমত। কুয়াশার মধ্যে বসে পাথরের ছেলেটা এখনও বই পড়ছে। কুয়াশা গড়িয়ে নামছে পুকুরের জলে। এমন সময় বরুণ দেখতে পায় ভাঙা ঘাটের বেদিতে সাদা মতো কে যেন আধশোয়া!

চমকে উঠে মন্দিরার হাত ধরে ফেলে বরুণ। চাপা গলায় বলে ওঠে, ওই দ্যাখ!

মন্দিরা ভেবে পায় না কী দেখবে, ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে, বাতাস একটুও না কাঁপিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল সে। কী অপরূপ দেখতে! পলক ফেলতে ভুলে গেছে বরুণ। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে তার। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

মন্দিরা বলে, কী হল, কী দেখতে বললি? এরকম করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

পরি! পরি দেখলাম। বলে, আঙুল তুলে পুকুরঘাট দেখায় বরুণ। ভীষণ উৎসাহিত হয়ে মন্দিরা বলে, সত্যি? গুল মারছিস না তো?

ঘোর এখনও কাটেনি বরুণের, সেই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। মন্দিরা জানতে চায়, কেমন দেখতে! দেখলি?

দারুণ সুন্দর! কী ফরসা। সাদা শাড়ি, ধবধবে ডানা....

বরুণের কথা শেষ হয়নি। মাটিতে সাজি আছড়ে ফেলে হাঁটা দিল মন্দিরা। বরুণ হকচকিয়ে গিয়ে দৌড়ে যায় মন্দিরার পাশে। জানতে চায়, কী হল তোর?

মন্দিরা গোঁজ হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বরুণ ওর হাতটা ধরে দাঁড় করায়। ফের জিজ্ঞেস করে, বলবি তো কী হল?

কান্না চাপা অভিমানে মন্দিরা বলে, তুই একা একা দেখলি কেন? আমায় কেন আগে ডেকে দেখালি না?

বরুণ বলে, আমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল যে! চিন্তা করিস না, আর একদিন দেখাব।

তোর জন্য কি সে রোজ রোজ এসে বসে থাকবে? রাগের সুরে বলে মন্দিরা।

রোজ কেন, পূর্ণিমার রাতে তারা আসে। আবার যেদিন কুয়াশা পড়বে, দিন বোঝা যাবে না, ভোর ভোর তোকে নিয়ে চলে আসব।

বরুণের সান্ত্বনায় কাজ হয়। রাগ যেন একটু ভাঙে মন্দিরার। বলে, ঠিক আছে, ততদিন পর্যন্ত তুই কাউকে বলতে পারবি না 'পরি' দেখেছিস।

কেন? বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চায় বরুণ।

মন্দিরা বলে, তুই আমি এক ক্লাসে পড়ি, তুই কেন আগে দেখে নিবি? তা ছাড়া আমি স্বচক্ষে না দেখা অবধি তোকে বিশ্বাস করব কেন? কী করে বুঝব তুই সত্যি কথা বলছিস!

দ্রুত কয়েকটা কথা ভেবে নেয় বরুণ, কথা চেপে রাখতে তার কোনও অসুবিধে হয় না। অনেক কথাই সে বন্ধুদের বলে না। কিছু কিছু মন্দিরাকে বলে। আজ যেমন বলে দিল। আর একটা ব্যাপার এখনও মন্দিরার মাথায় আসেনি, হিসেবমতো মন্দিরা বরুণের থেকে ছ মাসের বড়। নিজের মা আর মন্দিরার মা এই নিয়ে একদিন আলোচনা করছিল, বরুণ মন্দিরা দুজনেই সেটা শুনেছে। বরুণকে নাকি বয়স বাড়িয়ে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তির সময় ক্লাস ওয়ানের বয়স হয়নি। এখন যদি মন্দিরার মনে পড়ে যায় বয়সে সে বড় আরও ঝগড়া করবে। তার থেকে ওর কথা মেনে নেওয়া ভাল। বরুণ বলে, ঠিক আছে, কাউকে বলব না। এখন চল ফুল তুলি।

টগরগাছে উঠতে গিয়ে দুবার পা স্লিপ খেয়ে গেল। মন্দিরা বলল, ছেড়ে দে, মাটিতে যা পড়ে আছে কুড়িয়ে নিই।

মাটিতে আজ অজস্র ফুল। পুকুরধারে লাল গাঁদা, কলা ফুল তো আছেই, আজ মনে হচ্ছে ভালদাদুর বাড়ি যেতে হবে না। সাজি ভরে যাবে।

শিউলি, টগর, চাঁপা কুড়িয়ে নিতে নিতে বরুণের বারবার পরিটার কথা মনে পড়ে যায়, ইস্, আর একটু আগে যদি দেখতে পেত, মুখটা ভাল করে দেখাই হল না। মুখটা কি মন্দিরার থেকেও ভাল?

ফুল তুলতে তুলতে চারপাশ পরিষ্কার হয়ে এল। পাখিরা ডাকছে। সাজি ভর্তি ফুল নিয়ে বরুণরা চলল ভেতর বাড়িতে, পিসিমাকে ভাগ দিতে হবে।

চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে পাথর বসানো লম্বা বারান্দা, পিসিমা হেঁটে আসছিল। বরুণদের দেখে অবাক! বলে, সে কী রে আজকেও তোরা এসেছিস! রাস্তাঘাট দেখা যাচ্ছিল?

বরুণ মন্দিরা ভোরের ফুলের মতোই হাসে। বরুণ বলে, তোমার সাজি নিয়ে এস, আজ অনেক ফুল পড়েছিল।

পড়বে না, সারা রাতের হিমের ভার বইতে পারে নাকি! বলে, পিসিমা সাজি আনতে বাড়ির ভেতর যায়। বরুণ তাকায় মন্দিরার দিকে, মেজাজ বোঝার চেষ্টা করে, গলা নামিয়ে বলে, পিসিমাকে বলব কথাটা?

একটু ভেবে নিয়ে মন্দিরা বলে, বল, কিন্তু আর কাউকে না।

ঠিক আছে। বলে, বরুণ তাকিয়ে থাকে পিসিমার ফেরার রাস্তায়। হতেও তো পারে, সে ভুল দেখেছে। পিসিমার যেহেতু বাড়ি, রহস্যের কিনারা করতে পারবে পিসিমাই। পিতলের সাজি নিয়ে আসে পিসিমা। এ-বাড়ির সব কিছুই পুরনো দিনের, অন্য রকম। বিশ্বাসপিসিমা বলে যাচ্ছে, তোরা এসেছিস, সরলা আমায় বলেইনি। এখন ওর ঘরে গিয়ে দেখি, অকাতরে ঘুমোচ্ছে। —কী একটু ভেবে নিয়ে পিসিমা ফের বলে, হ্যাঁ রে, সরলাই গেট খুলে দিয়েছিল তো? নাকি খোলা ছিল সারারাত!

না, না। সরলামাসিই খুলে দিয়েছে। বলে, বরুণ। সবে ভাবছে, ওই কথাটা তুলবে, তার আগেই মন্দিরা বলে বসে, পিসিমণি, বরুণ আজ দেখেছে।

কী রে? অবাক হয়ে জানতে চায় পিসিমা।

গর্হিত কাজ করে ফেলেছে, এই ভঙ্গিতে বরুণ বলে, পরি। দেখলাম পুকুরঘাটে। আমরা এসেছি টের পেয়ে তক্ষুনি উড়ে গেল।

সর্বনাশ করেছে। বলে, কপাল চাপড়ায় পিসিমা। বরুণের ভ্রূ কুঁচকে গেছে। মন্দিরা ভয়ে, বিস্ময়ে জানতে চায় সর্বনাশ কেন?

পিসিমা বলে, ছেলেদের 'পরি' দেখা খুব খারাপ। অন্য মেয়ে পছন্দই হবে না। তাহলে বিয়ে হবে কেমন করে বরুণের?

ঠাট্টা ধরতে পেরে বরুণ হেসে ফেলে। বলে, ধ্যাত, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। বরুণের গাল ধরে আদর করে পিসিমা। মন্দিরার মাথার চুল ঘেঁটে দেয়। বলে, ইস্, চুল তো একদম ভিজে গেছে। দাঁড়া গামছা নিয়ে আসি।

না, থাক। বাড়ি গিয়ে মুছে নেব। বলে, বরুণের হাত ধরে টান মারে মন্দিরা, সিঁড়ি ধরে নেমে আসে ওরা। পিসিমা পিছন থেকে বলে, আজ বিকেলবেলা তোদের বাড়ি যাব বরুণ। মাকে বলিস।

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় হেলায় বরুণ। বিশ্বাসপিসিমা আটকড়াই-বাটকড়াই দেখতে আসবে। গেট পার হওয়ার আগে পুকুরঘাটটা চট করে একবার দেখে নেয় বরুণ।

কুয়াশা উধাও। রাস্তায় এখন লোকজন দেখা যাচ্ছে। জল এসেছে টাইম কলে, চালাবাড়ি থেকে মুরগি ডেকে উঠল। পাশ দিয়ে খবরের কাগজওলা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে সাঁসাঁ। দুধের ফাঁকা বোতল নিয়ে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে চাদারমোড়া বুড়ো দাদু। দোকানে খালি বোতল জমা দিয়ে ভরা বোতল নেবে। রেডিয়োতে ভজন হচ্ছে। —সকাল হয়ে গেছে পুরোপুরি। বড় রাস্তা ছেড়ে বরুণরা সরু গলিতে ঢোকে। বরুণদের পাড়ায় ঢোকার এটাই শর্টকাট রাস্তা। গলির ধার দিয়ে হাঁটছিল বরুণ। মন্দিরা বলে, জানিস বরুণ, আমার ছোটকাকা ভীষণ বড়লোক, কলকাতার আলিপুরে থাকে।

জেনে কী হবে বরুণের, বড়লোক ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল লাগে না। তারা সব যেন অন্য ধাতের মানুষ। মন্দিরা ফের বলে, তোর বিশ্বাসপিসিমার বাড়ির থেকেও বড় বাড়ি ছোটকাকার।

বাগান আছে? গম্ভীরভাবে জানতে চায় বরুণ।

থাকবে না! কী সুন্দর বাগান! কত ফুল। মালি দেখাশোনা করে। ফোয়ারাও আছে। মন্দিরার কথা শুনে বরুণ মনে মনে বলে, 'পরির কথাটা বাদ থাকে কেন, ওটাও বলে দাও।

আন্দাজ মেলে না বরুণের। মন্দিরা বলে, বাগানে একটা ময়ূর আছে, খাঁচায় পোরা। এতক্ষণে আগ্রহ জন্মায় বরুণের। অবাক চোখে তাকায় মন্দিরার দিকে, মিথ্যে বলছে না তো!

তোকে একদিন কাকার বাড়ি নিয়ে যাব, বুঝলি। বড়দের ঢঙে বলে মন্দিরা। যেন একা একা কলকাতায় যায়।

মন্দিরার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে সাজি সামলে হাঁটতে থাকে বরুণ। একটুক্ষণ পর মন্দিরার হাসির শব্দ শোনে বরুণ। অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে। ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ফিচেল হাসি হাসছে মন্দিরা।

হাসছিস কেন? জানতে চায় বরুণ।

তোকে একটা কথা বলব, কাউকে বলবি না বল।

কী কথা?

হাসি চেপে মন্দিরা বলে, আমার কাকিমা না কাকার থেকে এক বছরের বড়।

ধ্যাত। বউ কখনও বড় হয় নাকি! অবিশ্বাসী সুরে বলে বরুণ। ফিসফিসে গলায় মন্দিরা বলে, হয়। কাকাদের ভালবাসা করে বিয়ে। বড়রা বলাবলি করে আমি শুনে নিয়েছি।

বরুণ অকুলপাথারে পড়েছে, মন্দিরার কথাগুলোর ঠিকঠাক মানে বুঝতে পারছে না। মন্দিরা আবার হাসছে, হাসতে হাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। খেয়ালই নেই ওর সাজি থেকে পড়ে যাচ্ছে ফুল।

অবিনাশের মেজাজটা আজ ভাল নেই। ইলার মন রাখতে অফিস ডুব মেরেছেন। কন্যার বয়স হল আটদিন। আজ বাড়িতে একটি লোকাচার আছে। এই অনুষ্ঠানে অবিনাশের কোনও রোল নেই। তবু ইলার অনুরোধে থাকতে হল।

আটকৌড়িয়া বোধহয় মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত সব থেকে লঘুচালের উৎসব, ধর্মের থেকে মজা বেশি।

এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না অবিনাশ। দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে বাইরের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। চোখ বুজে একটু ঝিমিয়ে নেবেন সে উপায় নেই। ইতিমধ্যেই প্রতিবেশীরা যাতায়াত শুরু করেছে।

ইজিচেয়ারে বসে একটা বহু পুরনো চিঠি পড়ছেন অবিনাশ। চারদিন হল চিঠিটা উদ্ধার করেছেন। এই নিয়ে বারপাঁচেক পড়া হয়ে গেল। আট পাতার চিঠি। হলুদ খড়খড়ে ভাঁজ খাওয়া কাগজ। চিঠির বয়স প্রায় সত্তর বছর। হাতের লেখাটি ভাল। কোনও কোনও জায়গায় কালি ধেবড়ে গেছে। বোঝা যায় খাগের কলমে লেখা। চিঠিটি একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বলা যেতে পারে। অবিনাশের বড়ঠাকুমার লেখা চিঠি, লিখছেন বড়ঠাকুর্দা পুলিনবিহারীকে। যাঁর নামে রাস্তা আছে বউবাজারে। প্রথমে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, পরে কংগ্রেসের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ।

পুলিনবিহারীর স্ত্রী বিয়ের কয়েকটা বছর পরেই মারা যান। অবিনাশদের বংশে কমলিনী দেবীকে কেউ মনে রাখেনি। পুলিনবিহারী ভাগলপুরের বাড়ি থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকলেও, স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

এই চিঠিটা পড়ে অবিনাশ বুঝতে পারছেন কমলিনী দেবী ঠাকুর্দার থেকে কিছু কম ছিলেন না। বিস্তারিত সম্বোধন সেরে চিঠি শুরু হচ্ছে এইভাবে, তোমার প্রেরিত পত্রে অনেক জিজ্ঞাস্য ছিল। একই সঙ্গে উত্তর চাহিয়াছ সত্বর। ফলে গত পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। আমায় মার্জনা করিবে। আজ তোমার বিশেষ জিজ্ঞাসার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি। এ-গ্রামে মেয়েদের দলে স্বদেশি আন্দোলনের কতটা প্রভাব জানিতে চাহিয়াছ। এই প্রশ্নের উত্তর দুই-এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। সখিতে সখিতে মুখোমুখি হইলে আমরা ‘বন্দেমাতরম' বলে সম্ভাষণ করি। কয়দিন পূর্বে নদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় গুপ্তদের মাধবীর সহিত দেখা হইল। সে বাপের বাড়ি আসিয়াছে। স্বামীর চাকরির স্থল বরিশালে,

মাধবী সেখানেই থাকে। স্বামী একজন ডেপুটি।

মাধুর সহিত চোখাচোখি হইবার মাত্র সে হাসিয়া অধোবদন হইয়া বলিল, 'বন্দেমাতরম'।

তাই শুনিয়া আমার সঙ্গী-সাথী পাড়ার বউরা হাসিলে, আমি বলিলাম, সে কী লো, তুই পথেঘাটে 'বন্দেমাতরম' বলিতেছিস! তোর স্বামী না ডেপুটি। তাঁহার চাকরি থাকিবে তো? মাধু ফুঁসিয়া উঠিয়া বলিল, আমি তো আর সরকারের গোলাম নই। ইহা ছাড়া তিনি সরকারের চাকরি করেন বলিয়া কি মাকে সম্মান করিবেন না। শুনিয়া আমার প্রাণমন জুড়াইয়া গেল।

এখানকার আদালতে একটি স্বদেশি মামলা হইয়া গিয়াছে। ফৌজদারির আসামি হইয়াছিল অল্পবয়সি গুটি চারেক ছেলে। গ্রামের মেয়েরা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের মামলার খরচ জোগাড় করিয়াছি। একটি মেয়ের হাতে টাকা না থাকাতে কানের মাকড়ি সমর্পণ করিল আমার হাতে। বলিল, এটা বিক্রয় করিয়া খরচ চালাও।

পুরুষদের ধারণা স্বদেশি আন্দোলনে তাহাদের ভূমিকা মেয়েদের থেকে বেশি। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, নিশ্চয়ই প্রমাণ হইয়াছে, ধারণাটি ভ্রান্ত।

আমাদের সুবিধা এই যে, পুলিশের রেগুলেশন লাঠির সীমানার বাইরে মেয়েদের কার্যক্ষেত্র।

আমাদের এই আন্দোলন যাহারা দমন করিতে আসিবে, অতিথি সৎকারের জন্য খিল, মুড়ো ঝাঁটা তুলিয়া রাখিয়াছি। আমাদের এইসব অস্ত্র জানিবে দধীচিমুনির এক একটি অস্থি...

চিঠিটা পড়তে পড়তে সত্তর বছরের পুরনো উত্তাপ টের পান অবিনাশ। অক্ষরগুলোর ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন কমলিনী দেবীর গ্রাম। তেজস্বিনী কত নারী সে গ্রামে! দেশমাতৃকার স্বাবলম্বী, সুযোগ্য সন্তান। তারা গর্বিত এই দেশে জন্মে। —আপাতসরল এই আবেগের গভীরে লুকিয়ে আছে আপন অস্তিত্ববোধ। গোটা দেশ, মানুষ আমারই অস্তিত্বের ব্যাপ্তি। এই বোধটাই স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমশ লুপ্ত হতে হতে এখন প্রায় বিলীন। দেশের মানুষ এখন ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। কমলিনী দেবীর উত্তরসুরীরা এখন সংসারের গণ্ডিতে বন্দি। স্বাধীনতা কি ছোট ছোট কড়া পরিয়ে দিল মানুষের হাতে? প্রকৃত স্বাধীনতা তা হলে কী, কেমন হওয়া উচিত? –এসব প্রশ্ন মাথায় এলেই তোলপাড় করে মন। মনে হয় নিজের থেকে জ্ঞানী মানুষকে পেলে ভাল হত। বড় অভাব সেই মানুষের। আশেপাশে তেমন কাউকে চোখে পড়ে না।

নিজের পরিচিতি নিয়ে আজকাল বড় অসন্তুষ্টিতে ভোগেন অবিনাশ। প্রায় পঁয়তাল্লিশ হতে চলল, এতটা বছর পার করে তাঁর পরিচয় এখন বেতনভোগী একজন ভৃত্য, একজনের স্বামী, তিন সন্তানের পিতা এবং সজ্জন এক নাগরিক।

দেশ এবং দশের জন্য কিছু করা তো দূরে থাক, একান্নবর্তী পরিবার থেকে তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসিত। পশ্চিমবঙ্গে এসেও নিজস্ব কোনও পরিমণ্ডল তৈরি করতে পারেননি। বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকেন না। রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর অস্বচ্ছ। অফিসের অ্যানুয়াল ফাংশানে নাটক করান, বছর ঘোরার আগেই সেই স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যায় সবার কাছে। কাউকে যদি কোনও অনুগ্রহ করতে যান, পাত্তা দেয় না সে। যেমন, অপূর্ব। চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন, সুখেনকে দিয়ে সে বলে পাঠিয়েছে, আর কতবার বাসস্থান পালটাব। সত্যিই যদি কোনওদিন মছলন্দপুর ছাড়ার পরিস্থিতি হয় জামাইবাবু তো আছেই।

অপূর্বর কপালটা এমন, চাকরিটা কিন্তু এখনও আছে। অমিতাভ প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, কী হল অবিনাশদা, আপনার শালা তো এখনও এল না। পোস্টটা কিন্তু খালি রাখা হয়েছে।

অবিনাশের বুঝতে অসুবিধে হয় না, পোস্টটা বাবাকে বলে ক্রিয়েট করেছে অমিতাভ। সামনের বারের নাটকে ওর একটা চরিত্র চাই-ই চাই। চাকরি-চাকরি করে হেদিয়ে যাচ্ছে মানুষ, এদিকে কত সহজ শর্তে একটা পোস্ট খালি পড়ে আছে।

একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন অবিনাশ, প্রবাল সামন্ত এখনও কেন অ্যারেস্ট করছে না অপূর্বকে। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে কি?

এক এক সময় ইচ্ছে হচ্ছে মছলন্দপুর গিয়ে অপূর্বর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। প্রবাল

সামন্তর তদন্ত সম্বন্ধে বলবেন সবিস্তারে। তাতে অন্য অসুবিধে দেখা দিতে পারে, অযথা ভীত হয়ে পড়বে অপূর্ব। সে হয়তো আদপে নকশাল পার্টি করে না। সামন্ত একথা বলেননি, গ্রুপ ছবির সব ছেলেই নকশাল। অবিনাশ নিজে থেকে ধরে নিয়েছেন অপূর্ব সামন্তর টার্গেট। মিছিমিছি ছেলেটাকে ব্যতিব্যস্ত করা হবে। অপূর্ব যখন থাকতে চাইছে নিজের এলাকায়, নিরাপদ বোধ করছে নিশ্চয়ই। কারও জন্য কিছু করার অতিরিক্ত তাগিদে অনর্থক দুশ্চিন্তায় আছেন অবিনাশ। এই তাগিদটা কি নিজেরই অস্তিত্ব জানান দেওয়ার অভিপ্রায় নয়?

পরোপকার করতে গিয়ে কদিন আগে ভীষণভাবে অপমানিত হয়েছেন, স্বভাব যায়নি। যদিও ওই ঘটনার সূত্রে এই চিঠি পাওয়া। হয়েছিল কী, অফিসের নাটকটা প্রফেশনাল স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল পাপিয়া। ক্যারেকটারটা খুব মনে ধরেছে তার। বহুবার প্রোডিউসারের সঙ্গে অবিনাশকে বসানোর চেষ্টা করেছে। এড়িয়ে গেছেন অবিনাশ। মেয়ে জন্মানোর পরের দিন অফিস জয়েন করেছেন, পাপিয়া এসে হাজির, দিন না অবিনাশদা নাটকটা। দলের সবাইকে বলেছি গল্প, সকলেই ইন্টারেস্টেড। প্রোডিউসারের আপত্তি নেই ইনভেস্ট করতে। ভালই টাকা পাবেন আপনি। চলুন না প্রোডিউসারের কাছে।

মেয়ে হওয়ার পর মনটা এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতিতে অস্থির ছিল। মনের অবস্থা বদলাতে চেয়ে রাজি হয়ে গেলেন পাপিয়ার সঙ্গে যেতে।

অফিস থেকে দুপুর দুপুর বেরিয়ে চিৎপুরের এক বাড়িতে পৌঁছলেন। প্রোডিউসারের স্যুটিং-শার্টিং আর মশলার ব্যবসা। বাড়ির একতলায় গদি। দু-তিনতলায় থাকে পরিবার।

আক্ষরিক অর্থেই যোগেশ আগরওয়াল বসেছিলেন মেঝেয় পাতা গদির ওপর। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। ফরসা টকটকে গায়ের রং। মুখে পান। গলায় সোনার মোটা চেন। পাপিয়া পরিচয় করিয়ে দিতে শশব্যস্ত হয়ে আপ্যায়ন জানালেন। মিনিট খানেকের মধ্যে দুধসর্বস্ব চা চলে এল। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে যোগেশ শুরু করলেন কথা, দেখেন চ্যাটার্জিবাবু, পাপিয়া যখন বলিয়েছে আপনার থিয়েটার বঢ়িয়া আছে, আমি বিসওয়াস করে লিয়েছি। পাপিয়া ইতনা আসানি সে কুছু ভাল বলে না। বহুত নাখারা করে। একটু পজ নিয়ে পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হেসেছিলেন যোগেশ। দৃষ্টিতে মিঠে ধমক এনে পাপিয়াও হেসেছিল। তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় আস্তরণের নীচে ওদের সম্পর্কের আসল রূপটা। অস্বস্তি বোধ করছিলেন অবিনাশ। আর একটা কথা খেয়াল করে বিরক্ত হচ্ছিলেন, পাপিয়া বলেছিল, নাটকের গল্প শুনে প্রোডিউসার ইন্টারেস্টেড হয়েছেন। যা বোঝা যাচ্ছে যোগেশ কিছুই শোনেননি। টাকা ঢালছেন পাপিয়ার মুখ চেয়ে। কিন্তু এত পুরু গদিতে বসা ব্যবসাদার কি এতটাই বোকা হয়? বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য অবিনাশ বলেছিলেন, পাপিয়ার তো জাজমেন্টে ভুল হতে পারে। আপনি টাকা ঢালবেন, গল্পটা শুনে নেবেন না। তা ছাড়া ব্যবসাটা আপনি পাপিয়ার থেকে ভাল বোঝেন নিশ্চয়ই।

যোগেশ এমনভাবে হাসছিলেন, সামনে যেন অবুঝ বালক বসে আছে। ঠোঁটের কোণে পানের রস বেরিয়ে আসছিল। পিকদানি তুলে মুখ হালকা করে, যোগেশ বলেছিলেন, হামি আর্টের কুছু বুঝি না। মশলা, কাপড়া বুঝি। থিয়েটার মেরা মেন বিজনেস নেহি, শখ। ইসমে তো কুছ খরচা করনা হি পড়তা হ্যায়।

শুনে যথেষ্ট খারাপ লাগছিল অবিনাশের। ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি উঠে আসেন। তাঁর মেধা, শিল্পবোধ একজন কী অবজ্ঞায় কিনতে চাইছে। মূল উদ্দেশ্য একটি নারীর মন রাখা। সমুচিত শিক্ষা দিতে আর একটু বসে রইলেন অবিনাশ। বললেন, পাপিয়া বলছিল, নাটকটা কমার্শিয়ালাইজ করতে কিছু রদবদল করতে হবে। বদলটা না শুনে আমি কী করে নাটকটা বিক্রি করব। নাট্যকার হিসেবে তো আমার নামটাই থাকবে।

থাকবে না। আপকা নাম ভি সাথ মে বেচে দিন। থোড়া আলগ সে রুপিয়া লে লিজিয়ে গা।

নাট্যকার হিসেবে তা হলে কার নাম দেওয়া হবে? কৌতুকস্বরে জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ।

উসব আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। হামার নাম ভি লিখা হতে পারে। হাসি সামলাতে পারেননি অবিনাশ। বলেছিলেন, আপনার লেখা যখন, গল্পটা তো জেনে রাখা উচিত। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে!

কই কুছু জিজ্ঞেস করবে না। সব জানতে হ্যায় মেরা আসলি কাম ক্যায়া হ্যায়। ফির ভি আপনি বলুন। ছোটা করে বলবেন। মেরা পাস টাইম বহুত কম।

যোগেশ আগরওয়াল যে ব্যস্ত বিজনেসম্যান ততক্ষণে বুঝে গেছেন অবিনাশ। তাঁর পার্সোনালিটিও কিছু কম নয়। বহু লোক ঘরে ঢুকছে, কিছু বলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকছে খানিকক্ষণ। হতাশ হয়ে চলে যাচ্ছে। আলোচনার মাঝে কেউ কোনও কথা বলছে না। ইতিমধ্যে বারচারেক ফোন এসেছে। প্রতিবারই ফোন তুলে যোগেশ অপর প্রান্তকে বলেছেন, বিশ মিনিট বাদ কিজিয়ে।

সেই বিশ মিনিট পূরণ হতে মিনিট তিনেক মতো বাকি। অবিনাশ খুবই সংক্ষেপে নাটকের গল্পটা বলতে শুরু করেছিলেন। চোখ বুজে নিবিষ্টভাবে কাহিনীটা শুনলেন যোগেশ। অবিনাশের বলা শেষ হওয়ার পরও যোগেশ একই ভঙ্গিতে বসেছিলেন। অবিনাশের সন্দেহ হয়, ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়তো। পাপিয়ার দিকে তাকাতে, সে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ ঘুমোননি, এটাই ওঁর চিন্তা করার ভঙ্গি।

এক সময় চোখ খুললেন যোগেশ। হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন। চোখে-মুখে বিজ্ঞজনোচিত ভাব। এক বুক শ্বাস ছেড়ে বললেন, বঢ়িয়া হ্যায়। বহুত আচ্ছা। ইয়ে কাহানি মে আপ হি কা নাম রহনা চাহিয়ে। আগর মেরা নাম পে ইয়ে থিয়েটার চলেগা তো মেরা পরদাদা স্বরগ সে উত্তর আয়েঙ্গে। ডাটেঙ্গে মুঝকো। সব কিছু খরিদা নেহি যাতা হ্যায় না। শ্রদ্ধা করনা চাহিয়ে। বাস্, খালি এক কাম আপ কর দিজিয়ে। উসমে জম যায়গা ইয়ে থিয়েটার।

কেয়া করনা হ্যায়? সবিনয়ে জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ।

যোগেশ বলেন, আপকা হিরোইন জো হ্যায়, একবার রেপ করবা দিজিয়ে। একদম হিট হো যায়গা প্লে।

কান-মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছিল অবিনাশের। আলাপচারিতায় যে মজা উপভোগ করছিলেন, নিমেষে সেটা উধাও হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ গদি ছেড়ে উঠে অবিনাশ বলেছিলেন, নমস্তে যোগেশজি, ফজুল বাত করনে কে লিয়ে মেরা পাস ভি টাইম নেহি হ্যায়। ম্যায় আশা করতা হুঁ দোবারা আপ সে ভেট নেহি হো।

দরজার দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন অবিনাশ। পিছন থেকে যোগেশ আগরওয়াল বলে যাচ্ছিলেন, আরে বাবু আপ তো গুস্সা কর বৈঠে। ম্যায় সাধারণ আদমি হুঁ, যো বোলনা নেহি চাহিয়ে....

অবিনাশ ততক্ষণে রাস্তায়। গুম হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, খেয়াল হয় পাশেপাশে হাঁটছে পাপিয়া। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল ওর ওপর। কোনওক্রমে সংযত রেখেছিলেন নিজেকে। বেশ খানিকটা সময় অবিনাশকে থিতোতে দিয়ে পাপিয়া বলেছিল, আমার জন্যই আপনাকে আজ এত অপমানিত হতে হল। এই লোকগুলোই এরকম।

এদের কাছে তা হলে আস কেন? রাগের গলায় জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ। কী করব, এরাই তো আমাদের কাজ দেয়। আমার সংসারটা চালাতে হয় থিয়েটারে অ্যাক্টিং করে।

পাপিয়ার অসহায়তায় দ্রবীভূত হয়েছিলেন অবিনাশ। খানিক আগে মনে হচ্ছিল তাঁর লেখাটাই ধর্ষিত হচ্ছে। পাপিয়ার অবস্থা তার থেকেও করুণ।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে হাওড়ার বাস ধরবেন ঠিক করেছিলেন অবিনাশ। পাপিয়া কাতর অনুরোধ করে, চলুন না আমার বাড়ি তো কাছেই। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। আজ নয়, আর একদিন আসব। বলে, এড়িয়ে যাচ্ছিলেন অবিনাশ।

হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে পাপিয়া বলে ওঠে, আপনি পি বি সরণির কথা বলছিলেন

না? জানতে চাইলেন পুলিনবিহারীর বাড়িটা কোথায়? চলুন, আজ দেখাতে পারি। আমাদের বাড়ির পিছনেই গলিটা। পুলিনবিহারীর বাড়িটা তো লাইব্রেরি হয়েছে। ওটাও দেখে আসতে পারেন।

বড়ঠাকুর্দার নাম শুনে কিছুক্ষণ আগের গ্লানিমাক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গেলেন অবিনাশ। পুলিনবিহারীর বাড়িটা অনেকদিন ধরেই দেখার ইচ্ছে ছিল তাঁর, সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলেন না। রাজি হয়ে গিয়েছিলেন পাপিয়ার বাড়িতে চা খেতে।

ফকির চক্রবর্তী লেনে পাপিয়াদের বাড়িটা খুবই জরাজীর্ণ। তিনতলা শরিকি বাড়ি। পাপিয়ারা থাকে একতলায়। বৃদ্ধার বলিরেখার মতো ফাটা উঠোন পার হয়ে উঠেছিলেন বারান্দায়। বাঁদিকে রান্নাঘর। সেখানে একটি পুরুষ মানুষ সম্ভবত রুটি বেলছে। চৌকাঠের এপারে বসে আছে এক কিশোর। উৎসুক চোখে রুটি করা দেখছে।

অবিনাশদের পায়ের শব্দে ছেলেটি একবার ঘুরে তাকিয়েছিল, পরক্ষণেই মন দেয় রান্নাঘরে। অবিনাশের মনোযোগ ছেলেটির প্রতি দেখে, পাপিয়া বলেছিল, আমার ছেলে, ওই একটাই।

অবিনাশ অবাক হয়েছিলেন, মা ফিরেছে, ছেলের কোনও হেলদোল নেই!

চলুন, চলুন। ভেতরে বসবেন চলুন। বলে, ডেকে নিয়েছিল পাপিয়া।

আলাদা বসবার ঘর নেই। শোওয়ার ঘরে বিছানায় বসতে দিয়ে পাপিয়া বসেছিল চেয়ার টেনে। একটা বিশেষ কৌতূহল প্রথমেই মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন অবিনাশ, রান্নাঘরে যাকে দেখলাম, সে কে?

আমার কর্তা। বাড়তি হেসে উত্তর দিয়েছিল পাপিয়া।

কী করছে ওখানে?

জলখাবার আর রাতের রুটিগুলো করে রাখছে।

তাকে করতে হচ্ছে কেন? বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ।

কী করবে, আমার ফেরার তো কোনও ঠিক নেই। কাজ গুছিয়ে রাখে।

স্ত্রী থাকতে রান্নাঘরে পুরুষ মানুষের উপস্থিতি ঠিক মেনে নিতে পারেন না অবিনাশ। জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার হাজব্যান্ড কী করেন?

তেমন ফিক্সড কিছু না। স্টিল আলমারি, লোহার ভল্ট এসব তৈরি করতে জানে।

কখনও কাজ থাকে, প্রায় সময়ই না। তখন সংসারের দিকটা লক্ষ রাখে। —একটু থেমে প্রসঙ্গ ঘোরায় পাপিয়া। বলে, দাঁড়ান আপনার জন্য চা নিয়ে আসি। গরম রুটি-তরকারি খাবেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে 'না' করে দেন অবিনাশ। পাপিয়া চলে গেলে ঘরটায় চোখ বোলান, হতশ্রী অবস্থা। ফাটা, নোনা ধরা দেওয়াল, মেঝে জায়গায় জায়গায় ফেঁপে উঠেছে। একটা ঘরে সংসারের যাবতীয় জিনিস। রং-চটা আলমারি, মা কালীর পুরনো ক্যালেন্ডার, কারও আলতা পায়ের ছাপ ফ্রেমে বাঁধানো। দু-চারটে ধূসর সাদা-কালো ছবিও ফ্রেম বন্দি হয়ে আছে। যার মধ্যে একটা অবশ্যই পাপিয়ার বিয়ের পরে সদ্য তোলা ছবি। বরের সঙ্গে স্টুডিয়োতে। —ঘরটার মধ্যে এত দীনতা সত্ত্বেও পরিপাটি রাখার আন্তরিক চেষ্টা রয়েছে। রুচিটা নিশ্চয়ই পাপিয়ার বরের। সংসারটা মূলত সে দেখাশোনা করে। আন্দাজ করা যায় বড় বংশের ছেলে, ছবির চেহারাটা বেশ নায়কোচিত। ভাগ্যতাড়িত হয়ে আজ এই অবস্থা।

পাপিয়া চা নিয়ে এল। কাপ-ডিশ বেশ শৌখিন। বোঝা যায় এ-বাড়িতে ভদ্রলোকের যাতায়াত আছে। পাপিয়া বলল, চা-টা আমার বর বানিয়েছে। দেখুন তো হয়েছে কেমন?

চায়ে চুমুক মেরে অবিনাশ টের পেয়েছিলেন, পাতা বেশ দামি। বলেছিলেন, বাঃ, খুব সুন্দর চা। তা তোমার কর্তাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।

হ্যাঁ, দাঁড়ান। ডেকে নিয়ে আসছি। বলে, ঘরের বাইরে গিয়েছিল পাপিয়া। অবিনাশ ফের দেওয়ালে টাঙানো পাপিয়াদের জয়েন্ট ছবির দিকে তাকান। বর আগে কেমন দেখতে ছিল, এখন কেমন হয়েছে। মেলাতে হবে। ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে মানুষ কি বংশমর্যাদার

নির্যাসটুকু হারিয়ে ফেলে?

একটা টিকটিকি শিকারির সতর্কতায় ফোটোটার দিকে এগোচ্ছিল। যেন নিয়তি। অবিনাশের দিকে ঘাড় ফিরিয়েছিল টিকটিকি। টিক টিক করে বলে উঠেছিল, এখানেও কাহিনী খুঁজতে শুরু করেছ অবিনাশ, বাস্তবটা সহ্য হচ্ছে না?

মাথা ঝাঁকিয়ে বিভ্রম দূর করেছিলেন অবিনাশ।

খানিক পরেই কর্তাকে নিয়ে ঘরে এসেছিল পাপিয়া। লুঙ্গি আর রং-জ্বলা শার্ট লোকটার পরনে। দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, বাবার গা লেপটে আছে রোগা কালো ছেলে। বরুণের বয়সি হয়তো। পাপিয়া আলাপ করিয়ে দিয়েছিল বরের সঙ্গে। লোকটার নাম প্রসুন, পাপিয়ার ছেলের নাম সজল। আলাপ পর্বে লোকটা এমন ভাবভঙ্গি করছিল, যেন পরের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। যে-পুরুষমানুষের ব্যক্তিত্ব নিজের বাড়িতেও এত ন্যুব্জ থাকে, তাকে ক্লীব ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। হয়তো এই অপদার্থটার জন্যই পাপিয়াকে যোগেশ আগরওয়াল টাইপের লোকের সামনে বারবার যেতে হয়।

প্রসূন বেশি সময় থাকল না ঘরে। পাপিয়াকে বলল, আমি ছেলেকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি?

পাপিয়া তক্ষুনি রাজি। ঝট করে ছেলেকে একটা জামা পরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে তৈরি করে দিল।

আপনারা কথা বলুন। আমি একটু ঘুরে আসছি। বলে, বেরিয়ে গেল প্রসূন। তার পরে পাপিয়া যা করল, খুবই অস্বস্তিকর, দৃষ্টিকটু। দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ভ্রূ কুঁচকে অবিনাশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, দরজা বন্ধ করলে কেন?

এই সময়টা বড্ড মশা ঢোকে ঘরে। দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে হয় সন্ধেবেলা। বলে, চেয়ারে নয়, বিছানায় এসে বসেছিল পাপিয়া। বসার ভঙ্গিটা গা ছাড়া। বুকের আঁচল আলগা। পাপিয়ার স্তনের যে আবছা উদ্ভাস দেখা যাচ্ছিল, তাতে দারিদ্রের কোনও ছায়া নেই। কী করে সতেজ রয়েছে এমন।

ক্ষণিকের জন্য প্রবৃত্তি বশ করেছিল অবিনাশের মন, পাপিয়ার বুকের ওপর নিবদ্ধ ছিল দৃষ্টি, চাউনিটা চোখ দিয়ে তুলে নিতে নিতে পাপিয়া বলেছিল, আপনার হিরোইন তো কল্পনার, রেপড হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি? আমি বাঁচব একটা ভাল রোল পেয়ে। আর নাটকটা যদি লেগে যায়, কেল্লা ফতে।

বিছানায় বসে মেঝের দিকে তাকিয়েছিলেন অবিনাশ। পাপিয়া নাটকটার আশা ছাড়েনি। অবিনাশই বা এত জেদ করে আছেন কেন? নিজের সৃষ্টির ওপর মায়া? কী এমন মহান সৃষ্টি, কলিগরা, তাদের স্বজন বান্ধবরা ছাড়া কেউ জানেই না নাটকটার কথা। এমন কিছু উঁচু মানের রচনা নয়। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীর মতো উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অজিতেশের নাটক দেখেছেন অবিনাশ। কিছু রচনা মৌলিক, কিছু অনুবাদ। নাটকের প্রয়োগ অসাধারণ। অবিনাশের নাটক সেখানে শত শত মাইল পিছিয়ে। সেই পিছিয়ে থাকা সৃষ্টি যদি কোনও অভাবী মেয়ের কাজে লাগে, সেটাও তো একটা সার্থকতা.... ভাবনার মাঝে পাপিয়া হঠাৎ অবিনাশের হাত ধরেছিল। স্পর্শে আকুতি। ঘুরে তাকিয়েছিলেন পাপিয়ার দিকে। বুকের আঁচল পুরোটাই খসে গেছে। পাপিয়া বলছে, আপনি আমার মুখ চেয়ে নাটকটা দিয়ে দিন। যোগেশবাবুর যা মুড দেখলাম নাটকটা ওঁরও পছন্দ হয়েছে। টাকা ঢালতে দ্বিধা করবে না। কত নাট্যকার ওঁর কাছে লেখা নিয়ে ঘুরঘুর করে। উনি পাত্তা দেন না। লোকটা পাক্কা বিজনেসম্যান। কোন জিনিসের কী দর, খুব ভাল বোঝেন।

পাপিয়ার স্তন গিরিবর্জ্যের গহীন ইশারা বলছিল, দর ছাড়াও, কিছু ফাউ দিতে প্রস্তুত পাপিয়া। সেই জন্যেই দোর বন্ধ হয়েছে, জানলার পরদা আছে টানা। ইলার গর্ভধারণের কারণে দীর্ঘদিন যৌন উপবাসে আছেন অবিনাশ। পদস্খলন হতেই পারে, কঠিন সংযমে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। বিবাহর পবিত্র বিশ্বস্ততার চুক্তিতে তিনি বিশ্বাসী। ইলাকে বিয়ে করার পর কখনও ভিন্ন নারীর প্রতি গমন করেননি অবিনাশ। সুযোগই তৈরি হতে দেননি। ইলার সঙ্গে

আলাপ হওয়ার আগে একবারই অধঃপতন হয়েছিল তাঁর। সে কথা মনে পড়লে আজও গা ঘিনঘিন করে। সেবার ইউনিয়ন কনফারেন্সে গিয়েছিলেন বম্বে। হোটেলে অপরিসর ঘরে তাঁর রুমমেট ছিল সুরেশ শর্মা। সুরেশ তরল প্রকৃতির ছেলে, কিন্তু ভিতু। সে যে এমন কাণ্ড করে বসবে অবিনাশ কল্পনাতেও আনতে পারেননি। —এক রাতে রুমের দরজায় টুকটুক আওয়াজ। একই বেডে শুয়েছিলেন দুই বন্ধু। অবিনাশকে ডিঙিয়ে দরজা খুলতে যেতে যেতে সুরেশ বলল, আ গয়ি।

কৌন? বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ। ততক্ষণে দরজা খুলে ফেলেছে সুরেশ। ঘরে ঢুকে এসেছে একটি মেয়ে। সুরেশ আলো জ্বালতে যাচ্ছিল, মানা করে মেয়েটি। ওই অন্ধকারে নারীশরীরের আকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অবিনাশ রীতিমতো হতভম্ব। নিজের সাহসিকতায় গদগদ সুরেশ বলে, অবিনাশ, তু পহলে লে। ব্রাহ্মণ হ্যায় না। ম্যায় প্রসাদী লুঙ্গা।

ততক্ষণে অবিনাশ বুঝে গেছেন, মেয়েটিকে দিনের বেলায় কন্ট্রাক্ট করে রেখেছিল সুরেশ। অবিনাশকে কিছু জানায়নি। পাছে আপত্তি করেন।

মেয়েটি বিছানায় বসতে এলে, ভীষণ ক্ষেপে যান অবিনাশ। চাপা গর্জনে সুরেশকে বলে ওঠেন, আভি নিকাল ঘর সে। যো করনা হ্যায়, বাহার মে যা কে কর

ক্যায়া বলতা হ্যায় ইয়ার। বাহার যায়গা তো দালাল লোগ পিটাই করেগা মেরে কো। রুপিয়া তো দেনাহি পড়েগা। বলে, ভাবতে একটু সময় নিয়েছিল সুরেশ। উপায় বার করে নিজেই। বলে, এক কাম করতে হ্যায়, লেড়কি কো লেকর ম্যায় নীচে লেট যাতা হুঁ। তু য্যায়সা হ্যায় বিস্তর পে, ওয়সাহি রহ। বাহার যানা তেরে লিয়ে ভি ঠিক নেহি রহেগা। বম্বে কা রাত বহুত খতরনাক হোতা হ্যায়।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই বহাল হল। বেড থেকে চাদর টেনে মেঝেয় মেয়েটাকে নিয়ে শুল সুরেশ।

ঘেন্নায় বালিশে মুখ গুঁজে শুলেন অবিনাশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার থেকে উঠে আসতে লাগল সঙ্গমকালীন চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ, অশ্রুত কামার্ত শব্দ। ঘেন্না সরে গিয়ে উত্তপ্ত হয়েছিলেন অবিনাশ। হোটেলের ঘরের বাতাসে তখন প্রবল উশকানি। সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ছিল না অবিনাশের, শরীরের চাহিদায় কৌতূহল ছিল দুর্নিবার। ওই পরিবেশে ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলেন। সুরেশ উঠে এল বিছানায়। বলেছিল, যা, অ্যায়সা কভি নেহি মিলেগা।

সেই প্রথম ঘৃণ্য অন্ধকারে নেমেছিলেন অবিনাশ। মেয়েটি যেন প্রস্তুত ছিল ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অপমানিত হয়েছিল, শোধ নিচ্ছিল তার। অনভিজ্ঞ অবিনাশকে কিছু করতে হয়নি, যা কিছু করে নিচ্ছিল অন্ধকার নারীমূর্তি। যার চোখ, নাক, মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু স্পর্শ দিয়ে চেনা যাচ্ছিল শরীর। মেয়েটার নাম জানেন না অবিনাশ, ভাষাও না। সাক্ষাৎ অন্ধকার উঠে এসেছিল তাঁর ওপরে। অন্ধ প্রকৃতি বিপরীত বিহারে মথিত করছিল পুরুষের কামলিঙ্গাকে। সমস্ত গরল বার করে আনবে সে।

যে মেয়েটাকে নোংরা ভেবেছিলেন, সে নিক্ষেপ করে গেল কাদায়। সেই কাদার ছিটে আজও মন থেকে ধুতে পারেননি অবিনাশ। তাঁর কেন জানি মনে হয়, সেই ঘটনার পর থেকেই তিনি খুব সাধারণ হয়ে গেছেন। ব্রাহ্মণ তেজের প্রকাশ আর তেমন জোরালোভাবে দেখা দিল না। বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়লেন তিনি। সেই অবতার পুরুষের আবির্ভাব পিছিয়ে গেল। হয়তো এসবই সংস্কার। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না। জীবনে একবার মানুষ থেকে পশু হয়ে গিয়েছিলেন অবিনাশ। আর কে না জানে পশুজন্ম থেকে মানুষ হতে কত যুগ লাগে!

পাপিয়ার মধ্যে সেই বম্বের মেয়েটাকেই দেখতে পাচ্ছিলেন অবিনাশ। অনেক অনুনয়-বিনয় করছিল পাপিয়া, কথার মাঝে উঠে পড়েন অবিনাশ। বলেন, ভেবে দেখি, কী করা যায়।

বন্ধ দরজা খুলে অবিনাশ জিজ্ঞেস করেছিলেন, লাইব্রেরি বাড়িটা একবার আমায় দেখিয়ে দাও।

চলুন না, আমি নিয়ে যাচ্ছি। বলে উঠেছিল পাপিয়া।

না, দরকার নেই। তুমি শুধু লোকেশানটা বলে দাও, আমি চলে যেতে পারব। জায়গাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে পাপিয়া বলেছিল, একটা ছোট্ট উপকার করবেন আমার?

কী?

কুড়িটা টাকা ধার দেবেন? সংসারে খুব টানাটানি চলছে। টাকা হাতে এলেই আপনাকে অফিসে গিয়ে দিয়ে আসব।

ঠোঁটের কোণে একটা হতাশ হাসি চলে এসেছিল অবিনাশের। আর একবার পাপিয়ার ঘরে চোখ বোলান, সেই যে অফিসে নিজের ফুলের তোড়াটা ভাল অভিনয়ের জন্য পাপিয়াকে দিয়েছিলেন, তার অবশিষ্টাংশও ঘরে নেই। কী করে থাকবে, ফুল যে বড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। দারিদ্র তাজা থাকে যুগব্যাপী।

কুড়ির জায়গায় তিরিশটা টাকা পাপিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন অবিনাশ। একটুও দ্বিধা হয়নি।

পাপিয়াদের পাড়াটা খুব জটিল। ভুল গলিতে ঢুকে পড়লে নিষিদ্ধ পাড়া। সোনাগাছি। টাকাটা দিয়ে কি পাপিয়াদের বাড়িটাকেও নিষিদ্ধ পাড়ায় ঢুকিয়ে দিলেন অবিনাশ? ভাবনাটা আবেগের, বাস্তবটা কঠোর। লাইব্রেরিটা খোঁজার সময় একটা ব্যাপারেই সতর্ক ছিলেন অবিনাশ, ঘটনাচক্রে ব্যর্থ ভল্টমেকার মানে পাপিয়ার স্বামীর সঙ্গে যেন দেখা না হয়ে যায়। নিজের কাজে লোকটা এতই অপারঙ্গম, স্ত্রীকেও সুরক্ষিত রাখতে পারেনি। পাপিয়া যদি টাকাগুলো স্বামীর হাতে তুলে দেয়, লোকটা অবিনাশ সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করবে।

লাইব্রেরি বাড়িটা গৃহস্থবাড়িগুলোর সঙ্গে এমনভাবে মিশে ছিল লোকেট করা যাচ্ছিল না। অস্পষ্ট একটা সাইন বোর্ড দেখে উদ্ধার করলেন। বোর্ডে লেখা, পুলিনবিহারী স্মৃতি পাঠাগার।

দোতলা বাড়ি। একতলায় লাইব্রেরি। চল্লিশ ওয়াটের বাল্ব পুরনো হতে হতে কুড়ি ওয়াটের হয়ে জ্বলছে। হলুদ মলিন আলোয় একা বসে আছে লাইব্রেরিয়ান। কোনও রিডার নেই।

দূর থেকে লাইব্রেরিয়ানকে দেখে মনে হয়েছিল বয়োবৃদ্ধ। কাছে গিয়ে দেখা গেল পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবক। খুবই রোগা। চোখে মোটা কাচের চশমা।

যেচে আলাপ করেছিলেন অবিনাশ। ছেলেটির নাম তন্ময়। সে আদপে লাইব্রেরিয়ান নয়। পুলিনবিহারীর ট্রাস্টি পাড়ার বেকার যুবককে লাইব্রেরি দেখাশোনার কাজ দিয়েছে। তন্ময় পড়াশোনা নিয়ে থাকতে ভালবাসে। তার একটাই আক্ষেপ, পাড়ার বাসিন্দাদের লাইব্রেরি আসার কোনও ঝোঁক নেই। অঢেল অবসরে তন্ময় পুলিনবিহারীকে নিয়ে গবেষণা করছে। সে যখন জানল, অবিনাশ পুলিনবিহারীর নাতি, উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল মোটা কাচের আড়ালে থাকা মণি।

বড়ঠাকুর্দা থাকতেন দোতলায়। তাঁর ব্যবহৃত আসবাব, কাগজপত্র এখনও আছে। হয়তো তন্ময়ের জন্যই তা আপাতত সুরক্ষিত।

অবিনাশকে দোতলায় নিয়ে গেল তন্ময়। দরজার তালা খুলতেই স্পষ্ট একটা আপন গন্ধ পেলেন অবিনাশ। চৌকাঠে প্রণাম করে ঘরে ঢুকলেন। কেন জানি মনে হচ্ছিল মাথায় কেউ হাত রাখল।

পুলিনবিহারীর ফুলসাইজ ছবি, আসবাব, বই, ছড়ি, জুতো... ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন অবিনাশ। ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। আলে-কালে হয়তো পরিষ্কার হয়। মৃত্যুর এতদিন পরেও, ঘর জুড়ে বড়ঠাকুর্দার না থাকাটা বড় প্রকট। একটা অদ্ভুত শূন্যস্থান। নিঃসন্তান এবং পরিবার থেকে দূরে থাকা পুলিনবিহারী নিশ্চয়ই আশা করেননি, তাঁর কোনও বংশধর এখানে আসবে। একটু হলেও ভরাট হবে শূন্যতা। অবিনাশ কিন্তু কল্পনা করেন তাঁর না থাকাটায় কোনও এক উজ্জ্বল উত্তরপুরুষ এসে দাঁড়াবে। সবাই ধন্য ধন্য করবে তাকে। খোঁজ নেবে

কোন বংশোদ্ভূত এই জাতক। পাতা খোলা হবে অতীতের, চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হবেন অবিনাশ, তাঁর ভাইয়েরা, বাবা, ঠাকুর্দা, বড়ঠাকুর্দাও উপস্থিত হবেন। মানুষজন বলবে, দ্যাখো, জাতকের বংশগৌরব দ্যাখো! এই জন্যেই... ভাবনার রেশ টেনে তন্ময়কে প্রশ্ন করেছিলেন অবিনাশ, পুলিনবিহারীর স্ত্রীর কোনও ছবি নেই কেন?

সেটাই আমাদের আক্ষেপ। আজ পর্যন্ত কমলিনী দেবীর কোনও ছবি জোগাড় করতে পারিনি আমরা। আছে নাকি আপনার সংগ্রহে? যথেষ্ট উদগ্রীব হয়ে জানতে চেয়েছিল তন্ময়। অবিনাশ হতাশ করেন। তবে কথা দিয়েছেন, আত্মীয়স্বজনের ভেতর খোঁজ করে দেখবেন পাওয়া যায় কিনা।

তন্ময় বলেছিল, আত্মীয় পরিধি ছাড়াও খোঁজ করে দেখবেন তো! গ্রুপ ফটো হলেও চলবে। আর্টিস্ট দিয়ে ছবি আলাদা করে নিতে পারব। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কমলিনী দেবী একজন অসামান্যা মহিলা ছিলেন। আদর্শ জাতীয়তাবাদী। উনি যদি স্বল্পায়ু না হতেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল উপস্থিতি হত তাঁর। স্কুল-কলেজ কোনওদিন যাননি। পড়াশোনা যা কিছু করেছেন বাড়িতে বসে। ওঁর লেখা চিঠি দেখলে আপনি ‘হাঁ হয়ে যাবেন। কী দারুণ ভাষা।

আছে নাকি এই লাইব্রেরিতে? কৌতূহলী হয়েছিলেন অবিনাশ।

তন্ময় বলেছিল, আছে। দুটো মাত্র চিঠি। চিঠি দুটো পড়ে আন্দাজ করা যায়, পুলিনবিহারী যখন পোস্টিং নিয়ে বাইরে বাইরে থাকতেন এবং ভাবছিলেন কবে ইস্তফা দেবেন ইংরেজদের গোলামি থেকে, সেই সময় কমলিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর ঘন ঘন চিঠি চালাচালি হত। সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার যাবতীয় মনোবল পুলিনবিহারী আহরণ করতেন স্ত্রীর থেকে। আমাদের দুর্ভাগ্য বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই কমলিনী দেবী মারা যান। আপনার দাদু তাঁকে এতটাই ভালবাসতেন পরে আর দার পরিগ্রহ করেননি।

চিঠিগুলো একবার দেখা যেতে পারে? অনুনয়ের সুরে বলেছিলেন অবিনাশ। তন্ময় বলে, নিশ্চয়ই, সব কিছু দেখানোর জন্যই তো আপনাকে ওপরে নিয়ে এসেছি। কাঠের আলমারি থেকে চিঠি বার করতে করতে তন্ময় বলে, আরও চিঠি নিশ্চয়ই ছিল, কোথায়, কীভাবে নষ্ট হয়েছে কে জানে!

হলুদ হয়ে যাওয়া দুটো চিঠি, এক একটা আট-দশ পাতার, অবিনাশের হাতে দিয়ে তন্ময় বলে, আপনি এখানে বসেই পড়ে নিতে পারেন।

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বড়ঠাকুর্দার টেবিলচেয়ারে বসে চিঠি দুটো পড়তে শুরু করেছিলেন অবিনাশ। কণ্ঠস্বর সমেত উঠে আসছিলেন বড়ঠাকুমা। কী এক্সপ্রেসিভ। কত আধুনিক। এখনকার মহিলারা কি তাহলে পিছিয়ে পড়ল? নাকি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে? যদিও দেশের প্রধানমন্ত্রী এখন একজন মহিলা। মন্ত্রিত্ব অর্জন করেছেন সহজ সিঁড়ি বেয়ে। পারিবারিক সূত্রে। তিনি নিশ্চয়ই জানেন এক সময় ভারতবর্ষের গণ্ডগ্রামে কত শত তেজস্বিনী, দেশহিতব্রতী মহিলা মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতেন। প্রধানমন্ত্রী যখন একা হন, তাঁদের কথা কি ভাবেন? নিজের সহজ প্রাপ্তিতে কুণ্ঠিত হন?

চিঠি পড়া শেষ করে একটা অন্যায় আবদার করে বসেন অবিনাশ। তন্ময়কে বলেন, আমাকে কি একটা চিঠি দেওয়া যাবে, মিসেসকে দেখাতে পারি। খুব তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়ে যাব। আমার মিসেস একটু অসুস্থ নয়তো এখানেই নিয়ে আসতাম।

অবিনাশ ভাবতে পারেননি এক কথায় রাজি হয়ে যাবে তন্ময়। বলেছিল, ঠিক আছে, একটা চিঠি নিয়ে যান। আর ফটোর খোঁজটা করবেন কিন্তু।

অবিনাশকে দোতলায় ছেড়ে লাইব্রেরিতে নেমে গিয়েছিল তন্ময়। প্রায় আধঘণ্টাটাক একা একা ঘরটায় ঘুরলেন অবিনাশ। পুলিনবিহারীর ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। বড়ঠাকুর্দাকে কোনওদিন দেখেননি অবিনাশ। তবু অনেক কাল্পনিক কথোপকথন হল।

ভুলে গেলেন পাপিয়ার প্রসঙ্গ। ঝরঝরে মাথায় নেমে এলেন নীচে। দু-তিনজন বয়স্ক রিডার টেবিল-চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় নিয়মিত আসেন।

অবিনাশকে দেখে নিজের চেয়ার থেকে উঠে আসে তন্ময়। বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কথা কেটে অবিনাশ বলেন, জানি, আমি সত্যিই পুলিনবিহারীর আত্মীয় তার প্রমাণ কি? চিঠি বেহাত হয়ে যাচ্ছে না তো।

দুর মশাই, আমি সেটা বলছি না। কার দরকার পড়েছে ওই চিঠি চুরি করবে! সেই গুরুত্বটুকু জনগণ দিতে রাজি নয়। আমি জানতে চাইছি অন্য কথা, আপনি মানে পুলিনবিহারীর ভাইয়ের নাতি, লাইব্রেরিতে এসেছিলেন, ট্রাস্টি বডিতে জানাতে পারি? তক্ষুনি 'না' করে দিয়েছিলেন অবিনাশ। বলেছিলেন, আমি চাই না এই পরিচিতিটা প্রকাশ্যে আসুক। ট্রাস্টি নানান প্রয়োজনে আমাকে ডাকবে, সময় দিতে পারব না। তার থেকে বরং আমিই আমার সময়মতো আসব।

তন্ময়কে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এসেছেন অবিনাশ। বলেছেন, অ্যাড্রেস রইল। শুধু তুমি যোগাযোগ রেখো, কাউকে দিয়ো না।

তন্ময় বুদ্ধিমান। বলেছিল, আড়ালে থাকতে চান। লাইব্রেরির জন্য যদি কিছু করেন, ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে করবেন।

হেসে সায় দিয়েছিলেন অবিনাশ। বাড়িতে এসে অনেকবার চিঠিটা পড়া হয়ে গেল, ইলাকে এখনও দেখাতে পারেননি। শাশুড়িমা না থাকলে ঢুকে যেতেন আঁতুড়ে। গল্প করতেন ইলার সঙ্গে। মেয়েটাকে ভাল করে দেখা হয়নি, নিশ্চয়ই ইলার মতো দেখতে হবে। গায়ের রং খুব ফরসা, মাথায় একরাশ কালো কোঁচকানো চুল। হাসপাতালেই স্পষ্ট, করে একঝলক দেখেছিলেন। নার্স এনে দেখিয়েছিল। বাকি সময় আড়চোখে। ডেলিভারির পর আরও দুদিন হাসপাতালে ছিল ইলা। অবিনাশ অফিস ফেরত দুদিনই গেছেন। ওয়ার্ডের বাইরে থেকে হাত নেড়েছেন ইলাকে। ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতে তাঁর বড় অস্বস্তি লাগে।

হাসপাতাল থেকে ইলা মেয়ে কোলে এসেছে গাড়িতে। অফিস কলিগ অমিতাভর বাড়ির গাড়ি। সঙ্গে অমিতাভও ছিল, কলিগের উপস্থিতিতে মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা যায় না। আদিখ্যেতা মনে হবে।

অল্প দেখার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে মেয়েটা এখন জ্বলজ্বল করছে অবিনাশের মানসপটে। কখনও তুলনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে গোলাপি আভায় উদ্ভাসিত স্থলপদ্মের সঙ্গে, কখনওবা ভোরের শুকতারা...

ইজিচেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে চোখ আধবোজা অবস্থায় ছিলেন অবিনাশ। হাতে বড়ঠাকুমার চিঠি। কে যেন ঘরে ঢুকল। সোজা হয়ে বসলেন অবিনাশ। বিশ্বাস দিদি এসেছে। জিজ্ঞেস করল, কী, শরীর খারাপ নাকি?

হেসে মাথা নাড়েন অবিনাশ। বলেন, ওই একটু ভাতঘুম মারছিলাম।

সোফায় গুছিয়ে বসে বিশ্বাসদিদি। হঠাৎ এ-ঘরে কেন এল বুঝতে পারেন না অবিনাশ। সচরাচর আলাদা করে কথা বলতে আসে না। ইলার সঙ্গেই তার যত আলাপ। তার মানে বিশেষ কোনও দরকারে এসেছে।

চিঠিটা টেবিলে রাখতে ওঠেন অবিনাশ। এই দিদিটি খুবই দূর সম্পর্কের, দেবপাড়ায় আসার পর সম্পর্কটা উদ্ধার হয়। ভালমামার বড় ভাইয়ের মেয়ে। ভালমামাই নিজের মামা নয় অবিনাশের। বাংলায় আসার পর এই আত্মীয়রাই বড় নিজের করে নিয়েছিল। তা না হলে খুবই মুশকিলে পড়ে যেতেন অবিনাশ। হয়তো ফিরে যেতে হত সমস্তিপুর। চিঠি তুলে রেখে ইজিচেয়ারে এসে বসলেন অবিনাশ। হাসি হাসি মুখ করে বিশ্বাসদিদিকে বললেন, কী ব্যাপার গো বাইরের হইচই ছেড়ে তুমি এখানে চলে এলে! হাসি ফেরত দিয়ে বিশ্বাসদিদি বলে, এখনও পাড়ার লোকজন সব আসেনি আমিই চলে এসেছি তাড়াতাড়ি। ভাবলাম একটু দেখা করে যাই তোমার সঙ্গে। তুমি তো আর যাও না। অত বড় বাড়িতে একা পড়ে থাকি।

এটা ভনিতা, ভালভাবেই টের পাচ্ছেন অবিনাশ। বিশ্বাসদিদি অভিজাত, শিক্ষিত পরিবারের বউ। এখন স্বামীহারা, শ্বশুরবাড়ির মর্যাদাটা ধরে রেখেছে। এমন কিছু বলতে এসেছে, প্রসঙ্গ

উত্থাপনে দ্বিধা হচ্ছে।

তুমি কি কিছু বলবে? সরাসরি জানতে চান অবিনাশ।

না, মানে... বলে, তোতলায় বিশ্বাসদিদি।

বলতে যখন এসেছ, বলেই ফেলো। পেটে কথা চেপে রেখো না।

না, বলছিলাম কি, ইলার মনে একটা ধারণা হয়েছে, তুমি নাকি মেয়ে হওয়াতে খুশি হওনি।

নড়েচড়ে বসেন অবিনাশ। এ ধরনের কথা তাঁর কাছে একদমই অপ্রত্যাশিত ছিল। অবাক কণ্ঠে অবিনাশ জানতে চান, ইলা তোমায় বলেছে একথা?

হ্যাঁ। একই সঙ্গে বলে দিয়েছে, আমি যেন তোমাকে এসব ব্যাপারে কিছু না বলি। কিন্তু আমার মনে হল বলাটা উচিত। মেয়ে হওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়া ঠিক নয়। দু ছেলের পরে মেয়ে হওয়া মানে তো ঘরে লক্ষ্মী আসা।

গুম মেরে গেলেন অবিনাশ। ইলার ওপর রাগ হচ্ছে। যদি এরকম কোনও ধারণা হয়েই থাকে সামনে এসে কেন জিজ্ঞেস করল না? তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে তো কোনও আবছায়া নেই। বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার করে নিতে অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, কী দেখে ইলা বুঝল মেয়ে হওয়াতে খুশি হইনি আমি?

তুমি নাকি মেয়ের দিকে ঘুরেও দেখছ না, খোঁজখবর করছ না ইলার। আগের দুটো ছেলের বেলায় এরকম তো করনি। দেশের বাড়িতে নাকি একটা চিঠি লিখে কর্তব্য সেরেছ, টেলিগ্রাম পর্যন্ত করনি। আজকাল পোস্টাফিসের যা ব্যাপার এঁরা হয়তো এক মাস বাদে খবর পাবেন।

গুমসানি ভাবটা কাটে। মনে মনে হাসেন অবিনাশ, ইলাকে কী করে বোঝাবেন, অংশু বরুণের সময় শাশুড়ি আঁতুড় আগলে ছিলেন না। তখন বউদি, মালবিকা ছিল। জামাই মাত্রই শাশুড়িকে এড়িয়ে চলে। আর তৃতীয় সন্তানের খবর কেউই টেলিগ্রাম করে জানায় না।— গলা ঝেড়ে অবিনাশ বলেন, ইলাকে বল, ওসব আজেবাজে চিন্তা মাথা থেকে তাড়াতে। মেয়ে হওয়াতে আমি মোটেই কোনও দুঃখ পাইনি।

কথাটা বলে ইজিচেয়ার থেকে উঠলেন অবিনাশ। এই ভঙ্গিটাতে বলা হল, এখন তুমি আসতে পার।

জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন অবিনাশ। বাড়ির সরু প্যাসেজ দিয়ে একদঙ্গল ছেলে দৌড়ে গেল। সবাই জমা হচ্ছে কুয়োর পাড়ে। ওখানেই হবে আটকৌড়িয়া।

বিশ্বাসদিদি কিন্তু উঠছে না। আরও কিছু বলার বাকি আছে? আগের সূত্র ধরেই কথা টানে বিশ্বাসদিদি। বলে, মেয়ে হতে যদি খুশিই হলে, ডাক্তারের কথা শুনলে না কেন?

ডাক্তারের কথা।

অবাক হয়ে বিশ্বাসদিদির দিকে ঘাড় ফেরান অবিনাশ। অন্য দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসদি বলে, ইলার অপারেশন।

অদৃশ্য চড়ের মতো কথাটা এসে গালে লাগে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেন অবিনাশ। জানলার বাইরে বিকেলটা কেমন যেন রংখলা লাগে। সম্পর্কের এত গোপন কথা বিশ্বাসদির সঙ্গে আলোচনা করেছে ইলা। এই ইলাকে যেন চিনতে পারেন না অবিনাশ। ঘটনা হয়েছিল কী, ইলাকে যেদিন ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালে, সরকারি ডাক্তার কর্তব্যমতো অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন, এই সন্তানের পর ইলার লাইগেশন করিয়ে নেওয়া ভাল। রাজি হননি অবিনাশ। সরকারের তো এখন প্রধান কাজ জন্মনিয়ন্ত্রণ। সবার ক্ষেত্রে কি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা ঠিক? সরকারের দোষ ধরেও লাভ নেই, কোটি কোটি নারীর মধ্যে কারা যে রত্নগর্ভা আন্দাজ করা অসম্ভব। তাই নির্বিশেষে বন্ধ্যাত্বকরণ চলছে। নষ্ট হচ্ছে সেই উজ্জ্বল উত্তরসুরীর আসার সম্ভাবনা। মানুষের কল্যাণে যার জন্ম নির্দিষ্ট ছিল।

ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়ে যাওয়ার আগে ইলা বলেছিল, অপারেশনের ব্যাপারে তুমি রাজি হয়ে গেলে পারতে। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। ইলার কথাকে তরল করে

দিতে ইঙ্গিতপূর্ণ হেসেছিলেন অবিনাশ। বলেছিলেন, বন্ধ্যা জমি হচ্ছে চাষির দুর্ভাগ্য।

ইলাকে ভোলানো যায়নি। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, খালি কথার মারপ্যাঁচ। তোমার সব ব্যাপার আমি বুঝি। বাবা হতে তো কষ্ট হয় না কোনও। একটু থেমে স্বগতোক্তির ঢঙে ইলা বলতে থাকে। আমি ডাক্তারবাবুকে বলে, করিয়ে নেব অপারেশন। পরে কিছু শুনতে চাই না।

প্রমাদ গুনেছিলেন অবিনাশ। সত্যি সত্যি ইলা না এসব করে বসে। সামাল দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, এই ধরনের সিদ্ধান্ত বোধহয় তোমার একার কথায় নেবে না ডাক্তার। রাজি হতে হবে দুজনকেই। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে রাখব।

বলেননি অবিনাশ। ডেলিভারির পর জ্ঞান ফিরতে ইলা নিশ্চয়ই নার্সদের কাছে খবর নিয়েছে। সব কিছু জানার পরেও অবিনাশকে এখনও কিছু বলেনি। হয়তো বলবে না কোনওদিনই। অভিমান করে থাকবে। এই সামান্য কারণেই কি বিস্তর দূরত্ব হয়ে গেল ইলার সঙ্গে?

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ কথাটা সে আমার মতো দূর আত্মীয়কে বলতে গেল কেন? – একটু থেমে বিশ্বাসদি বলে, আর কাকে বলবে, মনের কথা বলার মতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এখানে কে আছে?

কোনও জবাব দেন না অবিনাশ। মন জুড়ে একটা তেতো ভাব ছড়িয়ে পড়ছে, ইলা তাঁকে ততটা নিজের ভাবে না আর। ভাবার কথাও না, ইলার প্রসবযন্ত্রণার কষ্টকে তিনি গুরুত্ব দিতে চাননি। পথ চেয়ে আছেন অবতারের, যিনি জন্ম নেবেন ইলার গর্ভে।

জানলার গরাদ ধরে এমনভাবে দাঁড়ান অবিনাশ, যেন নিজের অলীক আকাঙ্ক্ষার ঘরে বন্দি।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছে বিশ্বাসদি। বলে, যা কথা হল তোমার আমার মধ্যে ইলাকে কিছু বোলো না। সে আমাকে বিশ্বাস করে বলেই কথাগুলো বলেছে। দরজার দিকে হেঁটে যাচ্ছিল বিশ্বাসদি, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, ও ভাল কথা। তোমার বরুণের কাণ্ড শুনেছ?

কী কাণ্ড? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চান অবিনাশ।

তেমন কিছু না, তোমার ছেলের কল্পনাশক্তি খুবই জোরালো। আজ ভোরে আমার বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিল, চোখের ভুলে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে, আমার বাগানে চারটে পরি আসে, গল্পের ছলে মজা করে বলেছিলাম, গল্পটা ওর মাথায় গেঁথে গেছে, সত্যিকারের পরি দেখতে পেয়েছে।

কী দেখতে পেয়েছে? জানতে চান অবিনাশ। যদিও তিনি 'পরি' শব্দটা শুনেছেন, ঠিক শুনলেন কিনা ঝালিয়ে নিতে চান।

বিশ্বাসদি বরুণের ‘পরি’ দেখতে পাওয়াটা সবিস্তারে বলতে থাকে। চোখ বড় হতে থাকে অবিনাশের।

বিশ্বাসদির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অবিনাশ। আটকৌড়িয়ার ছড়া ভেসে আসে কুয়োতলা থেকে, কুলো পেটানোর আওয়াজ আর সমন্বরে, আটকড়াই বাটকড়াই মেয়ে আছে ভাল?

উত্তরে ইলার গলা পাওয়া গেল না। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার সংকোচে গলার জোর কমে গেছে। কেন অশিক্ষিতের মতো ইলা মনে করছে, মেয়ে হওয়ার জন্য ও একাই দায়ী। বিজ্ঞানের মিনিমাম জ্ঞানটুকু নেই। সংস্কারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে নিজেকে।

কুয়োতলায় এসে কচিকাচাদের কুলো পেটানো দেখছেন অবিনাশ। ওই ছেলেদের দলে বরুণকে দেখতে না পেয়ে অবাক হন। অংশু থাকবে না, সে বড় হয়ে গেছে। বরুণটা কোথায় গেল?

চাপা উদ্বেগে চারপাশে চোখ বোলান অবিনাশ। একটুক্ষণের খোঁজায় পেয়ে যান, আটকৌড়িয়ার দল থেকে একটু দূরে পাশের বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা ধরে আছে বরুণের একটা হাত। দুজনেই তফাত রেখে দেখছে কুলো পেটানো আট

কিশোরকে।

আপাত নিষ্পাপ দৃশ্যটার মধ্যে কোথাও একটা অসংগতি দেখতে পান অবিনাশ। বরুণ বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে আছে কেন? মন্দিরার সঙ্গে কি ওর বেশি বন্ধুত্ব? কখন হল! মেয়েটাই নিশ্চয়ই বন্ধুদের থেকে আলাদা করেছে বরুণকে। করবে না কেন, বরুণের চেহারায় এখনই যা দীপ্তি যে-কারও চোখ এক পলকের জন্য হলেও থামতে বাধ্য। কালো মেয়েটা এখন থেকেই লক্ষ্য স্থির করেছে। গ্রহণের ছায়ার মতো গ্রাস করবে বরুণের প্রভা। ছেলেটা কিছুদিন আগেও আমগাছতলায় খেলনাবাটি নিয়ে নিজের মতো খেলত। একটু বড় হতে মাতল পাড়ার ওর বয়সি বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের থেকেও বরুণকে আলাদা করে দিচ্ছে মন্দিরা। ওদের পদবি সেন। বৈদ্য। আবার নাও হতে পারে, বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সেন পদবি পাওয়া যায়। আবার কোথায় যেন পড়েছিলেন, সেন, ভদ্র, শূর, আরও কী সব পদবির জৈন ধর্মের সংস্রব আছে। খুবই ঘোলাটে ব্যাপার। বরুণকে এসব থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। ইলাকেও নজর রাখতে... চিন্তার মাঝপথে অবিনাশ টের পান একটু বেশিই ভেবে ফেলছেন। ওদের নিয়ে এখনই ভাবার সময় আসেনি।

কুলো ভেঙে ফেলেছে আট কিশোর। দুমড়ে মুচড়ে কুলোটা তুলে দিল চালের ওপর। যেন অবিনাশের দুশ্চিন্তাটাই ছুড়ে ফেলা হল।

শাশুড়িমা সব কটা বাচ্চাকে ডাকছেন। বরুণ মন্দিরা এগিয়ে এল। অবিনাশ অপেক্ষা করলেন, বরুণের খই-মুড়কির চুপড়ি নেওয়া অবধি। তারপর ডাকলেন, বরুণ আমার সঙ্গে একটু এসো।

বরুণ ঘাবড়ে গেছে, বাবা তাকে তুমি বলে ডাকছে কেন! মন্দিরার দিকে একবার তাকায়, ওর চোখেও অবাক ভাব।

কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন অবিনাশ। পিছন ফিরে ডাকেন, কী হল, এসো! তখনই চোখে পড়ে চুপড়ি নিয়ে কালো মেয়েটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ওর হাতে দেবঅর্ঘ্য।

বরুণকে নিয়ে বাইরের ঘরে এলেন অবিনাশ। নিজে বসলেন ইজিচেয়ারে, বরুণকে বসতে বললেন সোফায়। ঘরে আবছায়া। বরুণের দিকে ঝুঁকে পড়ে অবিনাশ জানতে চাইলেন, ভোরবেলা বিশ্বাসপিসিমার বাড়িতে তুমি কী দেখেছ?

বরুণ তো অবাক, একথা বাবা জানল কী করে! পরক্ষণেই ধরতে পারে, বলেছে বিশ্বাসপিসিমাই। ভীষণ অবিশ্বাসী তো!

কী হল, বল কী দেখেছ?

বরুণের কেমন যেন ভয় ভয় করছে, সে যা দেখেছে, সেটা হয়তো দেখা উচিত হয়নি। কেন যে অত ভোরে উঠতে গেল!

আমি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি বরুণ।

বাবা তুইতে নামতেই বরুণের মুখে কথা ফোটে, পরি দেখেছি।

ভাল করে দেখেছিস, পরিই ছিল?

ভোরের দৃশ্যটা একবার মনে করে নেয় বরুণ। বলে, খুব কুয়াশা হয়েছিল তো, পরির মতো মনে হল। আমরা ঢুকেছি বুঝে পরি উড়ে গেল।

ডানা ছিল?

মনে তো হয়। না হলে উড়বে কেমন করে?

পরনে কী ছিল?

আবার একটু ভাবে বরুণ। দৃষ্টি শূন্যে রেখে বলে, সাদা মতো শাড়ি, না কি .... অত মতো মতো করলে হয় না। ভাল করে ভেবে বল। রীতিমতো ধমকে উঠলেন অবিনাশ।

বরুণের কান্না আসব আসব করছে। ঠোঁট কাঁপছে। চোখ ছল ছল। অবিনাশ ছেলের হাত থেকে আটকড়াইয়ের চুপড়িটা নেন, পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, চোখ বন্ধ করে একটু ভাব তো, ঠিক কী দেখেছিস?

বাবার নির্দেশে বরুণ চোখ বন্ধ করে ঠিকই, মন পড়ে থাকে চুপড়িতে। এখনও জানে না

কত পয়সা দেওয়া আছে ওতে। হবে তো দুজনের ফুচকা!

এমন সময় প্লেট হাতে ঘরে ঢোকেন বিভাবতী, অবিনাশের জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন সম্ভবত।

ঘরের দৃশ্য দেখে তিনি স্তম্ভিত। ধ্যান করছে বরুণ, অবিনাশ কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে ছেলের দিকে।

ও মা, এ কী সর্বনাশ কাণ্ড! বলে, দ্রুত ঘর ছাড়লেন বিভাবতী।

॥ আঠাশ ॥

সন্ধে হতেই জব্বর ঠান্ডা পড়েছে। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ডিসপেনসারিতে বসে 'গীতা' পড়ছেন শুকদেব। সুধার কড়া নির্দেশ, চেম্বারে রুগি না থাকলেও তুমি বসে থাকবে। আর যদি কোনওভাবে একটা পেশেন্ট চলে আসে, দ্বিতীয়টা না আসা অবধি ছাড়বে না। —এ কি কখনও সম্ভব, একটা রুগির সঙ্গে কত কথা বলা যায়! পেশেন্ট আটকে রাখার একটাই পদ্ধতি, তার রোগকে বড় করে দেখানো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, রুগির মনে যদি ঢুকে যায় অসুখ গুরুতর, সে কেন শুকদেবের মতো পসার কম ডাক্তারের কাছে বসে থাকবে? চলে যাবে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে। এখন কথা হচ্ছে এই জটিল বিষয়টা কে বোঝাবে সুধাকে! সে তো শুকদেবের বেশির ভাগ কথাকে ছুতো বলে উড়িয়ে দেয়। সন্ধেবেলা একা একা ডিসপেনসারিতে বসে থাকতে ভাল লাগে না। সুধা বলেছিল রুনুঝুনুকে তো পড়াতে পার। আপত্তি ছিল না শুকদেবের। রজত পাঠায়নি মেয়ে দুটোকে। পেশেন্ট পার্টির মতো বড়দাকে নিয়ে রজতও অনাস্থায় ভোগে।

কী আর করবেন শুকদেব, যদি বই পড়ে সময়টা কাটানো যায়, এই ভেবে বাবার আলমারির সামনে গিয়েছিলেন। বাঁধানো সব থেকে মোটা যে বইটা হাতে উঠে আসে, ‘গীতা’ বিস্তৃত টীকা সমেত। পরিশিষ্টও আছে।

এভাবে হাতে ধর্মগ্রন্থ উঠে আসাটাকে যে-কোনও ভক্ত মানুষ ভাবত, ভগবানের ইচ্ছে। শুকদেব তেমনটা ভাবেন না। যৌবনকালে এক-দুবার গীতা উলটে পালটে দেখেছেন, ভীষণ ইন্টারেস্টিং। প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে ম্যাথমেটিক্যাল লজিক আছে। সেই লজিক তুমি মানতেও পার, নাও পার। অঙ্কটায় কিন্তু কোনও ভুল নেই। এখন দুটি শ্লোকের টীকায় চোখ আটকে গেছে। শ্লোকদুটি হচ্ছে,

সমদুঃখসুখঃ স্বস্তঃ সমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়া প্রিয়ো ধীরগুল্যনিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োগুল্যগুল্যো মিত্রোরি পক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ, যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি সুখদুঃখে সমাভাবাপন্ন ও নিজস্ব রূপে স্থিত, যিনি মাটির ডেলা, পাথর এবং সোনায় সমভাবাপন্ন; যিনি প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে তথা নিজের নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব বজায় রাখেন; যিনি মান-অপমানে ও মিত্র-শত্রু পক্ষের সঙ্গে সমভাব রাখেন, যিনি সর্ব কর্মারম্ভ পরিত্যাগ করেন, এই রূপ ব্যক্তিকেই গুণাতীত বলা হয়।... পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে শুকদেবের, এই শ্লোক দুটিতে যেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন, আমি তো এরকমই। তাও কেন লোকে আমাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে? আজ সকালেই রজত বলেছে, তুমি যদি একটু সুস্থ হতে, মিশ্রাদের আমি দেখিয়ে দিতাম। একা একা লড়া যায় নাকি?

ঘটনাটা হয়েছে কী, বাড়ির উলটো দিকে সীতারাম মিশ্রার বাড়ি। খুবই ভাল সম্পর্ক এ-বাড়ির সঙ্গে। মিশ্রাজির ছেলেরা এখন ডাকাবুকো হয়েছে। ব্যবসা করছে সিমেন্ট-বালির। প্রথমে খুব বিনয়ের সঙ্গে ভাড়া নিতে এসেছিল এ-বাড়ির বাগানের কিছু অংশ। গোলা করবে। এক কথায় না করে দেয় রজত। তারপর আসেন মিশ্রাজি নিজে, অনুরোধ করেন শুকদেবকে। আর্জি নিয়ে শুকদেব যান ভাইয়ের কাছে। রজত বলে, তোমার মাথাটা দেখছি পুরোটাই গেছে। বুঝতে পারছ না বাহানা নিয়ে ঢুকছে জমিতে। কিছুদিন পর পুরো বাগানটাই গাপ করে দেবে। ভুলে যেও না এটা ওদের দেশ।

কথা শুনে থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন শুকদেব। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, আমাদের ‘দেশ’ তাহলে কোথায়?

উত্তর দেয়নি রজত। হয়তো শুনতে পায়নি। শুকদেবের অনেক কথাই এ-বাড়ির লোক শুনতে পায় না।

কিছুদিন মিশ্রাজিরা চুপচাপ ছিল। কোনও তদবির করেনি। গতকাল বাগানে তিরিশ বস্তা সিমেন্ট ফেলে গেছে। সৌজন্যের কিন্তু কোনও ত্রুটি নেই, বস্তা ফেলার পর মিশ্রাজির দুই ছেলে ডিসপেনসারিতে হাজির। বড়টাই কথা বলল, নমস্তে ডাগতর চাচা, আচানক মাল লে কর লরি আগয়ি। হামারা গুদাম ভর্তি হ্যায়। ক্যায়া করে, ত্রিশ ঠো প্যাকেট আপকা বাগিচা মে রাখনা পরা। ইয়ে হরকত অগর আপকো পসন্দ না হো তো, বস্তা উঠাকে ফেক দিজিয়েগা।

কথা শেষ করে মেজাজে বেরিয়ে গেল দুই ছেলে। শুকদেবের মনে পড়েছিল দুটি ছেলের ছোটবেলার কথা। খুব ভুগত। কতবার ওষুধ নিয়ে গেছে ওর মা। কোনওবারেই পয়সা নেননি শুকদেব। —অভিমান বা আক্ষেপ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। পালটা যুক্তিও ভেবেছিলেন, ছেলে দুটো বড় হয়েছে। চাকরি পায়নি। খেটেখুটে ব্যবসা করছে। ওদের উপকারের জন্য প্রতিবেশী হিসেবে এটুকু করা তো কর্তব্য।

যুক্তিটা বলেছিলেন ছোটভাইকে। সে তখন সদ্য অপিস থেকে ফিরেছে। বাগানে বস্তা দেখে মাথায় আগুন জ্বলছে তার। শুকদেবের কথা যেন ঘৃতাহুতি হল। এমন রোষের চোখে তাকাল রজত, বাবাও কোনওদিন তাকাননি।

চা-জলখাবার না খেয়ে বেরিয়ে গেল সাইকেল নিয়ে। সুধা মালবিকা দুজনেই গজগজ করতে লাগল শুকদেবের এই আচরণে। রুনুঝুনু কিছু না বুঝে বলতে লাগল, বাবাকে কেন বকলে জেঠু? বাবা কেন চলে গেল?

সন্ধে বাড়তে লাগল, চা মুড়ি কিছুই আসছে না দেখে পকেটে খুচরো পয়সা নিয়ে বাইরে চা খেতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন শুকদেব। ভোলা টকিজের মোড়ে বহু পুরনো চায়ের দোকান। আলুর পাকোড়া দারুণ করে, চাটনিতেও সেই আগের টেস্ট। রাতে শুতে এসে সুধার অন্য মূর্তি। সন্ধেবেলার গজগজ, চা না দেওয়া, সব মালবিকার মন পাওয়ার জন্য। শুকদেব মোটেই তাতে কিছু মনে করেননি। যৌথ সংসারে থাকতে গেলে অনেক কায়দা করে চলতে হয়।

বিছানায় শোওয়ার কিছুক্ষণ পর সুধা বলতে শুরু করেছিল, বুঝলে, অবস্থা যা বুঝছি, মেজ ঠাকুরপোকে একটা চিঠি লেখ।

কী লিখব?

লিখবে, পুরোপুরি দখল হয়ে যাওয়ার আগে এখানকার বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া উচিত।

রজত কী বলছে?

ছোট ঠাকুরপো এখনও কিছু বলেনি। এত সহজে সে ছাড়বে না। আমাদের একটু আগেভাগে তৈরি থাকা ভাল।

কেন?

শুকদেবের দিকে পাশ ফিরে সুধা বলেছিল, বাড়ি বিক্রি করে নিজের অংশ বুঝে নিয়ে ছোট ঠাকুরপো চলে যাবে অন্য কোথাও। হয়তো এখানকার রেলের কোয়ার্টারেই থাকবে। আমরা কোথায় যাব বলতে পার?

শুকদেব তো অবাক, কোথায় কী, এখনই এত কিছু ভাবতে বসে গেল সুধা! এই তো সন্ধেবেলা লালার দোকানে বসে যখন চা খাচ্ছিলেন, কখনও মনে হয়নি, এই সমস্তিপুর তাঁর নিজের নয়। কত লোক এসে 'ডাগতর সাব নমস্তে বলে গেল। তিরিশ জনের বেশি। তাদের সবাইকে যদি রিকোয়েস্ট করতেন, একটা করে বস্তা বাগান থেকে নিয়ে বাইরে ফেলতে, অবশ্যই রাজি হয়ে যেত। কথামতো মিশ্রাজির ছেলে দুটো কিছু বলতে পারত না। --সুধা এই যুক্তি মানবে না। শুকদেবের নিজেরই মনে হচ্ছিল ভাবনায় কোথায় একটা গলদ থেকে যাচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে সুধার প্রশ্ন সুধাকেই ফিরিয়ে দেন, কোথায় যাব?

দেবপাড়ায়। মেজ ঠাকুরপো ছাড়া তো আমাদের গতি নেই।

তাতে কি আমরা সুখী হব? বলেছিলেন শুকদেব।

মানে! সুধা অবাক।

শুকদেব বললেন, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিল, সুখী কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, দিবসের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠভাগে মানে সন্ধ্যায়, নিজের গৃহে বসে যে শাকান্ন আহার করে, যে অঋণী, অপ্রবাসী, সেই সুখী। -জেনেশুনে আমি কেন প্রবাসী হতে যাব।

ধমকে উঠেছিল সুধা, রাখো তোমার মহাভারত, ওইসব কথা নিয়ে চললে তুমি একালে অচল হয়ে যাবে। যা বলছি ভাল করে শোনো, এখানকার যা পরিস্থিতি, তার থেকে একটু বাড়িয়ে মেজ ঠাকুরপোকে লেখো। সে যেন আমাদের জন্য দেবপাড়ায় একটা কাঠা 'দেড়েকের জমির ব্যবস্থা করে রাখে।

দেড় কাঠা? ঠিক শুনলেন কি না, ঝালিয়ে নেন শুকদেব, কেননা তাঁদের উঠোনটাই প্রায় তিন কাঠার।

সুধা বলেছিল, হ্যাঁ, দেড় কাঠা। তার থেকে বেশি কেনার টাকা কোথায়? এই টাকাই বা তুমি কোথায় পাবে? তা ছাড়া শুধু জমি কিনলে তো হবে না, বাড়ি করতে হবে। বলেছিলেন শুকদেব। গলায় ছিল চিন্তার ভান।

সুধা বলে, আমার যা কিছু সোনা দিয়ে জমিটা কিনব। এ-বাড়ি বিক্রির টাকায় তৈরি হবে বাড়ি।

সব সোনা বেচে দেবে। এত কটা ছেলেমেয়ে, তাদের বিয়ে-থা, উপনয়নে কী দেবে তাহলে!

ঘোর সংসারি মানুষের মতো সুধার কথায় সংগত করছিলেন শুকদেব। ছেলেমেয়ে বলতে উনি দুই ভাইয়ের সন্তানদের কথা বলেছিলেন। সুধা বলে, তোমার ছেলেমেয়েরা আমার সোনার আশায় বসে নেই। তখন হাতে যা থাকবে তাই দেব।

হিসেবে তখনও গরমিল থেকে যাচ্ছিল। শুকদেব বলেন, সোনা-টাকায় না হয়ে বাড়ি হল, তারপর আমরা খাব কি?

কেন, তুমি ওখানেও গিয়ে প্র্যাকটিশ করবে। তবে খামখেয়ালিপনাটা তখন ছাড়তে হবে।

সুধার কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করেছিলেন শুকদেব। পায়ের ওপর পা তুলে নাড়াচ্ছিলেন। এটা তাঁর চিন্তা করার ভঙ্গি। যত দ্রুত চিন্তা করেন, অস্থির হয় পা। ভাবা শেষ করে বলেছিলেন, ওখানকার জলহাওয়া, অসুখবিসুখের সঙ্গে কোনও পরিচয় নেই আমার। পারব প্র্যাকটিশ জমাতে?

খুব পারবে। জায়গাভেদে রোগ-নাড়া পালটে যায় নাকি! যত সব বাজে অজুহাত। বরং দেখবে, ওখানে তোমার পশার ভালই জমবে। বাঙালিরা গুণীর কদর করতে জানে।

সুধার ধারণা ভুল, বাঙালিরা ছিদ্রান্বেষী, ঘোড়েল প্রকৃতির না হলে ওই পরিবেশে থাকা যায় না। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন শুকদেব। বিহারের মানুষ এখনও ডাক্তারকে ভগবানের মতো ভক্তি করে, ভক্তি ধরে রাখতে না পারাটা শুকদেবের দোষ।

ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকার একটা সহজ পন্থা মাথায় এসেছিল শুকদেবের। সুধাকে বলেছিলেন, এক কাজ করা যাক, বিক্রিবাটা যা কিছু করে আমরা প্রথমে গিয়ে উঠি অবিনাশের কাছে। ভাড়ায় একটা ঘর নিয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করি। জমে গেলে তখন নয় বাড়ি করে নেওয়া যাবে।

সুধা তক্ষুনি বাতিল করে দেয় প্রস্তাব, না ও-বাড়িতে জায়গা বেশি নেই। তা ছাড়া ওরা আলাদা সংসার করবে বলেই পৃথক হয়েছে। আবার ওদের ঘাড়ে চাপার কোনও মানে হয় না।

শুকদেব বলতে পারতেন, আলাদা থাকার হলে অবিনাশ মজফফরপুরে অফিসের কাছে বাসা নিয়ে থাকতে পারত। ও পশ্চিমবঙ্গে গেছে বাংলা সংস্কৃতির টানে। কালচারাল ব্যাপারে

অবিনাশের বরাবরই ঝোঁক। এসব আবেগ সুধাকে স্পর্শ করবে না।

সে তখনও বলে যাচ্ছে, তোমার হাসি হাসি মুখের মেজ ভাইয়ের বউটি মহাস্বার্থপর। দিব্যি কেমন নিজেরটি গুছিয়ে নিল। আমরা যদি ওদের ওখানে গিয়ে উঠি, ইলা তিষ্ঠোতে দেবে ভেবেছ!

ঈর্ষা আসলে হতাশারই নামান্তর। ইলার মুখোমুখি হলে সুধার এই মনোভাব উধাও হয়ে যায়। ইলার মতো স্নিগ্ধ উপস্থিতি খুব কম মেয়েরই আছে। সে সুযোগ্যা স্ত্রী, স্বামীকে অনুসরণ করেছে মাত্র। সমস্তিপুর ছেড়ে যেতে ইলারও কি কম কষ্ট হয়েছে!

সুধার কথা থামছিল না। মালবিকার নামেও বেশ কিছু অনুযোগ করল। মেয়েদের এই ব্যাপারটা খুব অবাক করে শুকদেবকে, একে অপরকে অপছন্দ করলেও, এমন মিলেমিশে হাসি-আড্ডায় থাকে, দেখে বোঝার উপায় নেই, রাতে স্বামীকে বলার জন্য এত কথা জমা হচ্ছে। দুপক্ষই জানে তারা অভিনয় করছে, অভিনয়টাতেই মশগুল হয়ে যায়।

সুধার নানান অভিযোগের মধ্যেই কখন জানি ঘুম এসে গিয়েছিল। এল স্বপ্নও। এমনিতে স্বপ্ন-টপ্ন খুব একটা দেখেন না শুকদেব। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, দেখেন। মনে থাকে না। গত রাতেরটা এখনও আছে, স্বপ্নে বেশ কিছু বছর পিছিয়ে গেছেন। বাবা বেঁচে। দুপুরে খেতে বসেছেন, ইলা খাবার বেড়ে দিয়ে বসে আছে সামনে, আরও কিছু লাগলে দেবে। সুধা পাখার বাতাস করছে। বাবা খেতে খেতে নানান মজার কথা বলছেন। বউমারা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। ছেলেদের কাছে বাবা এত ফ্রি নন। সব সময় গুরুগম্ভীর। সমীহ করে ছেলেরাও দূরত্ব বজায় রাখত।

বাবার খাওয়ার মাঝপথে বাড়িতে ঢুকল দুই বোন, সঙ্গে তাদের ছোট ছোট মেয়ে। হইচই পড়ে গেল বাড়িতে। বোনেরা অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে এল। খুশি হয়েছেন বাবা। নাতি-নাতনিরা ঘিরে বসল দাদুকে। অংশুও ছিল ওদের সঙ্গে। বহুদিন বাদে বাড়ি আবার জমজমাট। বোনেরা বাড়ির সকলের জন্যে জামাকাপড় এনেছে। সামনে কারও বিয়ে অথবা পুজো। স্বপ্নে অনুষ্ঠানটা ঠিক পরিষ্কার হচ্ছিল না।

আভা, দোলা আসলে সৎবোন। বলে না দিলে কেউ বুঝতে পারবে না। বাবা কিন্তু সংশয়ে ভুগতেন, তাঁর ছেলেরা বোন দুটোকে কতটা আপন করে নিচ্ছে?

মনের উচ্ছ্বাস বাইরে প্রকাশ পায় না শুকদেবের। রজত বোনেদের ওপর দাদাগিরি ফলায়। অবিনাশের সঙ্গেই আভা দোলার জমে বেশি। যত আবদার মেজদার কাছে। মেজদাই ওদের বিয়েটা দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছে। বাবার হাবেভাবে অবিনাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে যেত। স্বপ্নে যেমন মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন মেজদার জন্য কী এনেছিস দেখা। বাকি দুই ছেলের জিনিস দেখতে চাইলেন না। তবে বোনেরা দুজনেই নিরপেক্ষ, তিন দাদার জন্যই একই দামের, একই ধরনের জিনিস আনে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাবা উশখুশ করতে লাগলেন। শুকদেবকে বললেন, বাইরে গিয়ে একটু দেখ না, অবিনাশ ফিরছে না কেন এখনও?

ও তো এত তাড়াতাড়ি ফেরে না বাবা। রজত এক্ষুনি চলে আসবে। ঠিক আছে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, রজত ফিরলেই তাকে বোলো অবিনাশের অফিসে যেতে। বোনেরা এসেছে। অবিনাশ যেন আবার ইউনিয়নের মিটিঙে না বসে যায়। বাবার নির্দেশমতো বাইরে এলেন শুকদেব। রজত সাইকেলে ফেরে, আবার ঠেঙিয়ে যেতে হবে অবিনাশের অফিস। রজতের জন্য খারাপ লাগছিল। শুকদেব একবার ভাবলেন, রজত ফিরলে সাইকেলটা চেয়ে নিয়ে নিজেই চলে যাবেন অবিনাশের অফিস। যদিও সাইকেল চালাতে এই মোটা শরীরে বেশ কষ্ট হয় তাঁর।

বাড়ির সামনে নালার ব্রিজের ওপর এসে, বাঁদিকে তাকাতেই শুকদেব রীতিমতো চমকে উঠলেন। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, আকাশ থেকে বিশাল এক খণ্ড কালো মেঘ খসে পড়েছে বুঝি, চাঁদসি ডাক্তারের বাড়ি, পানগুমটি, মিশ্রাজির বাড়ি, কালাকার গুপ্তার ফটো স্টুডিয়ো সব ঢুকে গেছে মেঘের ভেতর! -মেঘের শরীরে বনজঙ্গল দেখে সন্দেহ হয়। ভাল করে

খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারেন, ওটা কোনও মেঘ নয়, পাহাড়। আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, পাহাড়টা ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। গ্রাস করে ফেলছে বাড়ি-ঘরদোর। শুকদেবদের বাগানেও ঢুকে আসছে পাহাড়। চাপা পড়ে যাচ্ছে মিশ্রাজির ছেলেদের সিমেন্টের বস্তা।

ভয় পেয়ে বাড়িতে ঢুকে আসেন শুকদেব। বাবার কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, বাবা, পাহাড় এগিয়ে আসছে। চলুন পালাই। বাগান অবধি ঢুকে পড়েছে পাহাড়। বাবা বললেন, দাঁড়াও রজত অবিনাশ ফিরুক।

ভয়ার্ত স্বরে শুকদেব বলেন, ওরা বোধহয় আর ফিরবে না বাবা, পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে।

বাড়ির কেউ গুরুত্ব দিল না শুকদেবের কথায়। ভাবল বুঝি প্রলাপ। আবার দৌড়ে বাইরে গেলেন শুকদেব। পাহাড় বেড়েই চলেছে, ছুঁয়ে ফেলেছে বাড়ির দেওয়াল।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন শুকদেব। এত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন অনেকদিন পর দেখলেন। সুধা পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। খাপড়ার চালের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকেছে ভোরের আলো। পাখি ডাকছে গুটিকয়। দামার গলা শোনা যাচ্ছে না। পরিযায়ী হয়ে গেল নাকি? অবাক হওয়ার কিছু নেই, যা ঠান্ডা পড়েছে!

চাদর গায়ে খাট থেকে নেমে এলেন শুকদেব। বাগানের দিকের দরজা খুলে প্রথমেই দেখে নিলেন সামনের বাড়িগুলো। সব ঠিকঠাক আছে। এমনকী সিমেন্টের বস্তাগুলোও।

চটি গলিয়ে বাগানে নেমে এলেন শুকদেব। পিছন থেকে কে যেন কী বলল। ঘুরে তাকালেন, কেউ নেই। ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে, ঠোঁটের মতো। ঘরটাই কি কিছু বলল?

হাঁটু সমান গাঁদা, লিলি, জিনিয়া, কসমস, গোলাপ, বুকসমান সূর্যমুখি, জবা, সব রকম গাছেদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুকদেব শুনতে পেলেন সবাই যেন অস্ফুটে কী বলছে! আমলকি, আম, জাম, সুধার লাগানো ক্ষেতের ফসল, ইতিমধ্যে দামাটাও ফিরে এসে বলতে শুরু করেছে, তুমি নাকি চলে যাবে আমাদের ছেড়ে! তোমার আবাল্য ভূমি।

গাছ-পাখির সমস্বরে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন শুকদেব। টলমল পায়ে পৌঁছে যান কুয়োতলায়।

সেখানে গিয়েও থমকে দাঁড়ান। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে অতীত দৃশ্য, আগের রাতে বাবা তিন ছেলেকে দূর সম্পর্কের দিদির জিম্মায় রেখে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। তিন ছেলেকে সামলাতে না পেরে পিসি একটা ঘরে তিনজনকে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয়। শুকদেব তখন বারো। ছোট দুই ভাইকে বুকে আগলে বসে থাকেন।

সকালবেলা দ্বিতীয় মা বাড়ি ঢুকে খোঁজ করে ছেলে তিনজনের। দরজা খুলে দেয় পিসি। সংসারে মায়ের প্রথম কাজ, তিন ছেলেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় কুয়োপাড়ে। জামা-প্যান্ট খুলিয়ে সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে চান করায়। প্রথম মায়ের না থাকার শোক শ্যাওলার মতো জমেছিল গায়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন ভাই তরতাজা হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মাকে তাই আর কোনওদিন সৎমা মনে হয়নি। ফলে বোন দুটোকে নিজের মায়ের পেটেরই মনে হয়েছে।

কুয়োতলায় বসে পড়েন শুকদেব। কুয়োতলা বলে, ভুলে গেলে সেদিনের কথা। আজ সব ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছ। বউয়ের পরামর্শ ঠিক মনে করলে! হাঁটুতে মুখ গুঁজে ডুকরে ওঠেন শুকদেব। কান্নাকে বাধা দেন না। সৎমায়ের জন্য বড় মন খারাপ করে তাঁর।

এভাবে কতক্ষণ কেটেছিল কে জানে। এক সময় কনুইয়ে টান পড়ে, মুখ তুলে দেখেন, সুধা। বলেছিল, ভেতরে এসো, চা চাপিয়েছি।

রজত অফিস বেরোনোর আগে যখন ভাত খেতে বসেছিল, উঠোনে উদাসীন ভঙ্গিতে পায়চারি করছিলেন শুকদেব। আসলে জানার ইচ্ছে বস্তা ফেলা নিয়ে কী ব্যবস্থা করল রজত।

পৈতের পর থেকেই ভাত খেতে বসে কথা বলে না রজত। অসম্ভব ক্ষমতা! দাদার

পায়চারি দেখে প্রশ্নটা বুঝে নিয়েছিল রজত। খাওয়া শেষ করে আসনে বসেই শূন্যের উদ্দেশে বলে, আমাদের বাড়িটা বাঙালিটোলার বাইরে হয়েই মুশকিল হয়েছে। এখানকার বাঙালিরা ঝামেলাটায় মাথা গলাতে চাইছে না। বলছে, আমাদের এলাকাটা নাকি মিশ্রাজির ছেলে দুটোর দখলে।

শুকদেব তো অবাক, কোনও হইচই, মারপিট নেই, প্রতিরোধের কোনও প্রসঙ্গ উঠল না, এলাকা বেদখল হয়ে গেল। আর বাঙালিটোলা তৈরি হয়েছে শুকদেবের চোখের সামনে। এ-বাড়িটা বাবা কিনেছিলেন সেই কবে। তখন হাতে গোনা বাঙালি ছিল সমস্তিপুরে। খামোকা বাঙালিটোলার অনুগ্রহ কেন নিতে যাবেন শুকদেবেরা! এ-পাড়ার পুরনো প্রতিবেশীরা জানে শুকদেবদের এখানে কতদিনের বাস। তাদের কাছে গেলে, তারা কি পাশে এসে দাঁড়াবে না? শুধু ভাষার কারণে বাঙালিদের আপন মনে করতে হবে? এ তো এক ধরনের সংকীর্ণতা।

রজতের পরের কথাটা ছিল সুনির্দিষ্টভাবে শুকদেবকে লক্ষ্য করেই, তুমি যদি একটু সুস্থ হতে, মিশ্রাদের আমি দেখিয়ে দিতাম। একা একা লড়া যায় নাকি? এক সময় তোমার কত বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনাজানা ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার ছিলে তুমি। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাড়িতে অচল পাথরের মতো বসে থাক, উৎখাত তো হতেই হবে একদিন। আজ না হয় কাল।

রজতের সামনে আর দাঁড়াননি শুকদেব, না জানি আরও কী সব বলে দিত। নিজে এতদিন সমস্তিপুরে আছে, কোনও পজিশন তৈরি করতে পারল না। যত রাগ দাদার ওপর।

সারাটা দিন মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে রইল শুকদেবের। রুনু ঝুনু ঘাড়ে পিঠে উঠে মন ভাল করতে পারল না। সন্ধেবেলা বসলেন 'গীতা' নিয়ে। উদ্ধার হল, এই শ্লোক যার মধ্যে তিনি দিব্যমান। যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন ও নিজস্বরূপে স্থিত.... তবু কেন লোকে অসুস্থ বলে তাঁকে। তিনি অতি সুস্থ। কতটা স্বাভাবিক, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। সুস্থ আর স্বাভাবিকতার মধ্যে বিস্তর রাস্তা, প্রচুর খানাখন্দ। যারা সেই পথটুকু চালাকি করে পার হতে পারে, তারাই প্রকৃতিস্থ।

বই বন্ধ করে টেবিলে রাখেন। রুগির প্রত্যাশায় দরজার বাইরে তাকান, একজন আসছে। রুগি নয়। মৃগাঙ্ক। ওর খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখে অন্ধকারেও চেনা যায়। চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় মৃগাঙ্ক। এত ঠান্ডাতেও গায়ে চাদর নেই। এক মুখ হেসে বলে, বড়দা, ভাল আছ?

আছি এক প্রকার। আয়, বোস।

টেবিলের ও প্রান্তে পেশেন্টদের চেয়ারে বসে মৃগাঙ্ক। হাসিটা লেগেই আছে মুখে, আপনভোলা হাসি।

বেশি করে শ্বাস নেন শুকদেব। আন্দাজ মিলে যায়। মৃগাঙ্ক টেনে এসেছে। জিজ্ঞেস করেন, তা কী মনে করে হঠাৎ?

হাসিটা অনেক কষ্টে পাট করে মুখে পোরে মৃগাঙ্ক। এর ফাঁকে আর একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন শুকদেব, মেয়ে-বউয়ের শরীর ভাল তো?

ঘাড় হেলান মৃগাঙ্ক। শুকদেব বলেন, তা তুই কী বলতে এলি? বিশেষ কোনও খবর?

কলকাতায় যাচ্ছি। বলেন মৃগাঙ্ক।

কেন, তোর আবার কী হল?

কিছু না, অবিনাশদা অনেকদিন ধরে বলে একবার দেবপাড়ায় ঘুরে যেতে। তাই ভাবলাম যাই ঘুরে আসি মেয়ে-বউ নিয়ে। ওদের সব খবর ভাল তো?

তক্ষুনি উত্তর দেন না শুকদেব, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর কেমন একটা আশঙ্কা হয়, মৃগাঙ্ক পাততাড়ি গোটাচ্ছে সমস্তিপুর থেকে। অবিনাশের বাড়ি গিয়ে ডেরা বাঁধবে। তারপর যদি শুকদেব সুধাকে যেতে হয়, জায়গা সংকুলান হবে না। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হয়। শুকদেব জিজ্ঞেস করেন, কবে যাচ্ছিস? ওরা সবাই ভালই আছে।

দিন দশেক পরে। এখনও টিকিট কাটা হয়নি। দেখি, রিজার্ভেশন কবে পাওয়া যায়। আর

ফিরবি কবে নাগাদ?

এখনও ঠিক হয়নি। হপ্তা দুয়েক থাকব। বলে, কী একটু ভেবে নেন মৃগাঙ্ক। তারপর বলেন, হ্যাঁ, যে কারণে আসা, যদি তোমাদের দেবপাড়ায় কিছু পাঠানোর থাকে রেডি করে রেখো, আমি এসে নিয়ে যাব।

সন্দেহটা এখনও মাথা থেকে গেল না শুকদেবের, ঠিক করলেন সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেলা যাক, হ্যাঁ রে, সত্যি করে বল তো, সমস্তিপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছিস না তো? আবার আগের হাসি ফেরত আসে মৃগাঙ্কর মুখে, এবার আর ততটা সরল মনে হচ্ছে না, বেশ রহস্যময়।

কী রে, হাসছিস কেন? জানতে চান শুকদেব।

উত্তর আসে, সমস্তিপুর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কেন যাব? এখানে আমার জন্ম, পৈতৃক বাড়ি, চিনি মিলের কাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন... এত খাতির কেউ করবে না।

কথা বেলাইন হব হব করছে মৃগাঙ্কর, শুকদেব লাইনে আনেন। বলেন, আমাদের বোধহয় সমস্তিপুর ছাড়তে হবে, বুঝলি। অবিনাশ ছাড়া আমার তো কোনও গতি নেই। রজত বদলি নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও।

কেন, ছাড়তে হবে কেন? কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চান মৃগাঙ্ক।

আমাদের বাগানে তিরিশ বস্তা সিমেন্ট ফেলে গেছে মিশ্রাজির দুই ছেলে। এই শুরু, এর পর ফেলবে স্টোনচিপ, বালি, গোলা বানিয়ে দেবে বাগানটাকে। আজ স্বপ্নে দেখলাম পাহাড় ফেলে দিয়ে গেছে।

শেষের কথাটা কানে না নিয়ে মৃগাঙ্ক জিজ্ঞাসা করেন, পারমিশন নেয়নি? নিতে এসেছিল, আমরা দিইনি। কেয়ার করেনি ওরা, জোরজবরদস্তি সিমেন্টের বস্তা ফেলে দিয়ে গেছে।

গম্ভীর হয়ে একটু চিন্তা করে নেন মৃগাঙ্ক। অভয় দেওয়ার সুরে বলে, এ নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই, দেখছি আমি, কী করা যায়।

মাতাল আশ্বাস দিচ্ছে পাগলকে, সমাজের এতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু একজন কাউকে তো বলতে হবে সমস্যার কথা। শুকদেব বলেন, দেখ না ভাই একটু। রজত একা দৌড়ঝাঁপ করছে, ধরাধরি করছে একে তাকে। আমার তো মাথার ঠিক নেই, লোকে আমার কথা শুনবে কেন!

ভারী বিস্ময়ে মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করেন, তোমার মাথার ঠিক নেই, তুমি বুঝতে পার?

কেন পারব না, ভুলে যাস না আমি একজন হাই মার্কস পাওয়া ডাক্তার। কথা শুনে ধাঁধা লেগে যায় মৃগাঙ্কর। দিশা খুঁজে পেতে জিজ্ঞেস করেন, তা হলে তুমি নিজেকে সারিয়ে তুলছ না কেন?

কী লাভ, আমি নিজেকে সারিয়ে নিলে পাগলামি চলে যাবে রজত নয়তো অবিনাশের মাথায়। তুই তো জানিস, আমাদের বংশে প্রত্যেক প্রজন্মে কেউ একজন পাগল হয়। আমার ছেলেপুলে নেই, তাদের মানুষ করার ঝামেলা নেই, একদম ঝাড়া হাত-পা। পাগলামিটা না হয় আমিই 'আগলে রাখলাম।

কানাইয়ার ঠাররা হার মেনে গেল। নেশা চৌপাট। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মৃগাঙ্ক। শুকদেব বলেন, চললি? ভেতর বাড়িতে দেখা করবি না?

আজ থাক, কলকাতায় যাওয়ার আগে একদিন তো আসব। তোমরা সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখো।

দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন মৃগাঙ্ক। শুকদেব উঠে আসেন। রাস্তায় লোকজন কম। ঘোলাটে হিম ভাব নেমে এসেছে। লাইট পোস্টের আলো ঠান্ডায় জবুথবু। শুকদেব বলেন, নিজের বাড়িতে গিয়েছিলি?

মাথা নাড়েন মৃগাঙ্ক। বলেন, কী হবে গিয়ে, ওরা আমার খবর নেয়? ছোট্ট ভাইঝিটার

কথা ভেবেও তো একবার আসতে পারে।

তৎক্ষণাৎ চেপে ধরেন শুকদেব, তুই যে একটু আগে বড় মুখ করে বললি, এখানে তোর জন্ম, কর্ম, পৈতৃক ভিটে... যে ভিটেতে তোর যেতে ইচ্ছে করে না, তা নিয়ে এত গর্ব কীসের?

ভিটের ওপর কোনও রাগ-অভিমান নেই আমার, অসুবিধে মানুষগুলোকে নিয়ে। ওরা যেদিন শোধরাবে, ভাল মনে স্বীকার করে নেবে যমুনা, মেয়েটাকে। আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব।

আর তুই কবে শোধরাবি? আজও তো খেয়ে এসেছিস। ভুরভুর করে গন্ধ ছাড়ছে। একটু যেন লজ্জা পেয়ে যান মৃগাঙ্ক। বলেন, এ আর বেশি দিন চালাতে পারব না। গায়ে গন্ধ পেলে এখনই মেয়েটা ছটফটিয়ে পালিয়ে যায়। আর একটু বড় হলে ছেড়ে তো দিতেই হবে। তারপর স্কুল কলেজে যাবে, সেখানেও তার একটা মানসম্মান আছে।

কথাগুলো শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে যায় শুরুদেবের। সত্যি, সন্ততিও নতুন করে জন্ম দেয় পিতার। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার সে পিতা যদি পালকপিতাও হয় তাতে কিছু যায় আসে না। মৃগাঙ্ক অবশ্য জানে না শুকদেব টের পান মেয়েটা ওর ঔরসে নয়।

বারান্দা থেকে নেমে গেছে মৃগাঙ্ক। পিছু ডাকেন শুকদেব, অ্যাই শোন, গায়ে গরম কিছু দিসনি কেন, আমার চাদরটা নিয়ে যা। পরে এক সময় এসে ফেরত দিস। আপত্তি জানানোর সুযোগই পান না মৃগাঙ্ক। শুকদেব চাদর খুলে ততক্ষণে পরিয়ে দিয়েছেন।

পাগলের উষ্ণতা মাতালের গায়ে চলে যায়। রাস্তার ওপারে হিমে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্ট অবাক হয়ে দেখে।

ডিসপেনসারিতে ফিরে এসে তড়িঘড়ি চিঠি লিখতে বসেন শুকদেব। মৃগাঙ্ক দেবপাড়ায় পৌঁছনোর আগেই অবিনাশের কাছে চিঠিটা পৌঁছে যাওয়া দরকার। মৃগাঙ্ককে পাকাপাকি থাকতে না দিয়ে দেয় অবিনাশ।

পেন, প্যাড নিয়ে চিঠিটা মনে মনে মকশো করতে থাকেন শুকদেব। চোখ আপনা আপনি বুজে গিয়েছিল, হঠাৎ সুধার গলা, ও মা, একী, তোমার চাদর কোথায়?

চোখ খোলেন শুকদেব। বলেন, মৃগাঙ্ককে দিয়েছেন। একই সঙ্গে এটাও বলেন, মৃগাঙ্ক কথা দিয়েছে, মিশ্রাজির ছেলেদের ব্যাপারটা দেখবে। ——কথা দুটো পর পর বলার কারণ, চাদর দেওয়াটা আসলে ঘুষ, সুধার কাছে এটা প্রমাণ করলেন।

কোনও ভাবান্তর হল না সুধার। থমথমে মুখে বলল, ভেতরে একবার এসো, ছোট ঠাকুরপো ফিরেছে।

শুকদেব অবাক হন, কখন ফিরল রজত! তাকে বাড়ি ঢুকতে হলে তো ডিসপেনসারির সামনে দিয়েই যেতে হবে।

কী হল, ওঠ।

রজত ফিরেছে তো আমি কী করব? বিরক্তির সুরে জানতে চান শুকদেব।

সুধা বলে, ছোট ঠাকুরপো থানায় গিয়েছিল। ওরা কথা দিয়েছে, ব্যবস্থা নেবে। কালকের মধ্যেই খালি করে দেবে বাগান। পুলিশের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হতে পারে। কী বলবে না বলবে ছোট ঠাকুরপোর থেকে বুঝে নাও।

গুম মেরে যান শুকদেব। একটু পরে বলেন, তুমি যাও, আমি একটু বাদে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি এসো। চাদর দান করে নিজে তো ঠান্ডা লাগাচ্ছ বসে বসে। বলে চলে যান সুধা। শুকদেবের মাথায় চিঠির জরুরি কয়েকটা লাইন টাইপ রাইটারের মতো বাজতে থাকে... এদিককার খবর খুব একটা ভাল নয়। পৈতৃক ভিটে রক্ষা করতে হচ্ছে পুলিশের সাহায্য নিয়ে। আমাকে সুধাকে হয়তো তোর কাছে গিয়েই থাকতে হবে। স্বেচ্ছায় যাওয়া আর বাধ্য হয়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। বড় অপমানিত লাগছে নিজেদের। তুই থাকলে এই পরিস্থিতি হত না। তুই চলে গিয়ে আমাদের খোঁড়া করে দিয়ে গেছিস৷

'খোঁড়া” শব্দটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওটা লিখতেই হবে। নয়তো মৃগাঙ্কর সমকক্ষ হওয়া

যাবে না। গুরুত্ব আদায় করে নেবে মৃগাঙ্ক। গুরুত্ব, নাকি করুণা।

তাজপুর রোডে কিছু দূর অন্তর কাঠকুটোর আগুন জ্বলছে। তাপ পোহাচ্ছে গরিবগুর্বো মানুষ। কুয়াশার মধ্যে ধোঁয়ার ভেজাল। চাদর মুড়ি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মৃগাঙ্ক। শীত যে পড়েছে জমিয়ে চাদরটা গায়ে দেওয়ার পর মালুম হল। বেশ আরাম হচ্ছে এখন। তার আগে সিঁটিয়ে ছিলেন।

যমুনা সম্ভবত একটা চাদর বা সোয়েটার দিয়েছিল, কানাইয়ার ঠেকায় ফেলে এসেছেন মনে হচ্ছে। মদ খাওয়ার পর তো আর চাদরের দরকার লাগে না। আজ তবে এমন নেশা করেননি যে, সাদা ঘোড়া তাঁকে নিতে আসবে। হেঁটেই এসেছেন শুকদেবদার কাছে। আসার মূল উদ্দেশ্য অবিনাশদার খবর নেওয়া।

এতদিন বাদে কলকাতার কোর্ট ডেট দিয়েছে। সকালে খবর নিয়ে এসেছিল নিত্যানন্দ। বলল, বিকেলবেলা আমার কোয়ার্টারে এস, তখন বসে সব আলোচনা করা যাবে। শ্যামলও থাকবে কোর্টের কাগজপত্তর নিয়ে।

কোর্ট-কাছারির ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ মৃগাঙ্ক। জীবনে কোনওদিন কোর্টে যাওয়ার দরকার পড়েনি। এই প্রথমবার রাজি হয়েছেন। তাও যমুনা বলেছে বলে।

শ্যামলের বউকে না দেখেই যমুনা তার প্রতি সহানুভূতিশীল। মেয়েটার ওপর অত্যাচার হয়েছে বর্ডারে। যার ফসল এখন যমুনার কোলে। যমুনা চায় অত্যাচারীদের শাস্তি হোক। তাতেই পরিশুদ্ধ হবে শিশুকন্যা। জন্ম-কলঙ্ক মুছে যাবে তার।... ভাবতে শুনতে যতই চমকপ্রদ লাগুক, হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেওয়া মুখের কথা নয়। কলকাতার নাম শুনলেই মাথা কেমন ঝাঁ-ঝাঁ করে, সেখানে হাইকোর্ট যে কী বস্তু হবে ভাল করেই টের পাচ্ছেন মৃগাঙ্ক।

এই প্রথমবার কলকাতায় যাবেন, লোকমুখে এত কথা শুনেছেন, ছবিটা পরিষ্কার। বাচাল, বেতাল, চোর, বদমাশ, জ্ঞানী, মানী, ঠগবাজ, উপকারী, দয়ালু মানুষে গিজগিজ করছে শহর। মৃগাঙ্কর সব থেকে অবাক লেগেছে শ্যামলকে দেখে, বিদেশ থেকে এসে কেমন কলকাতা, সমস্তিপুর, এমনকী জেলেতেও কটা দিন কাটিয়ে ফেলল। শ্যামলকে দেখেই সাহস সঞ্চার করছেন মৃগাঙ্ক।

নিত্যানন্দর কথামতো আজ বিকেলবেলা গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি। সঙ্গে অবশ্যই বলাইদাকে নিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে মিটিং হল। কেসের দুটো হিয়ারিং হয়ে গেছে। শ্যামল অনেকটাই এগিয়ে, মৃগাঙ্ক সাক্ষী দিলেই কেস এসে যাবে মুঠোয়।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী কী বলতে হবে, মোটামুটিভাবে বুঝিয়ে দিল শ্যামল। বাকিটা বোঝাবে উকিল, কলকাতায় যাওয়ার পর। মৃগাঙ্ককে সব সত্যি কথা বলতে হবে, গুছিয়ে ভালভাবে চিন্তা করে, বিপক্ষ উকিলের প্রশ্ন ঠিকমতো বুঝে সত্যি কথা গুছিয়ে পর পর বলা বেশ খাটনির ব্যাপার। নিজের মতো বলতে পারলে ভাল হত। উপায় নেই, যে পুজোর যে মন্ত্র।

ঠিক তেরো দিনের দিন শুনানি। কাল টিকিট রিজার্ভেশন করবে ওরা। যমুনাও যাচ্ছে। নয়তো বাচ্চাকে সামলাবে কে? মেয়েটাকে একবার চোখের দেখা দেখাতে হবে জজকে। —এই জায়গাতেই এসে বড্ড চিন্তা হচ্ছে মৃগাঙ্কর। জজসাহেব যদি বলেন, মেয়েটাকে তার আসল মায়ের কাছে দিয়ে দেওয়া হোক তখন কী হবে? প্রশ্নটা আজকের মিটিংয়ে তুলেছিলেন। শ্যামল আগের মতোই আশ্বাস দেয়, মেয়ে আপনাদেরই থাকবে।

মেয়েকে কোল আগলে রাখার জন্য যমুনাকে বিশেষ করে নিয়ে যাওয়া। ওর থেকে মেয়ে ছিনিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

শ্যামল নিত্যানন্দ বলেছে, আপনাদের থাকা, খাওয়া, যাওয়া-আসার টিকিট, কলকাতায় ঘোরার সমস্ত খরচা আমাদের।

মৃগাঙ্ক এ নিয়ে বিশেষ কথায় যাননি। উনি ঠিকই করে রেখেছেন, উঠবেন অবিনাশদার বাড়িতে। শুনানির দিন অবিনাশদাকে সঙ্গে নিয়েই সাক্ষী দিতে যাবেন। এক ঢিলে দুই পাখি,

অবিনাশদার কাছে যাওয়া হল, সাক্ষী দেওয়াও... কতদিন ইলা বউদির সঙ্গে দেখা হয়নি। রান্নার হাত যা একখানা, ভোলা যায় না। মুখে সব সময় মিষ্টি হাসিটা লেগে আছে। ভাইপো দুটো অনেকদিন হয়ে গেল আসেনি সমস্তিপুর। নিশ্চয়ই হাতখানেক করে বেড়ে গেছে। অংশুর বোঝার বয়স হয়েছে এখন, ওকে গিয়ে এবার নিজেদের ছোটবেলার গল্প বলবেন, ওর বাবা কেমন একগুঁয়ে, জেদি টাইপের ছিল। খেলাধুলোয় চৌখস, তারপর সেই জুড়িগাড়ি কাঁধে চাগিয়ে তুলে ফেলে দেওয়া। টমিদের ফায়ারিংয়ের গল্পটাও বলবেন। নিজের পায়ে গুলি লাগা জায়গাটা দেখাবেন... চিন্তাটা এখানে এসে থমকে যায়। দরকার নেই ওই ঘটনা বলার, ঠিকমতো বলতে না পারলে, অংশু দায়ী করে ফেলতে পারে বাবাকে। যমুনাকেও ঘটনাটা বলেছিলেন খুব সর্তকভাবে।

অবিনাশদার বাড়ির কথা চিন্তা করলে, সাক্ষী দিতে যাওয়ার ভয়টা অনেক কমে যাচ্ছে। আর একটা ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে রেখেছে বলাইদা। নিত্যানন্দর কোয়ার্টার থেকে বেরোনোর পর বলেছিল, সব কথাই তো হল, ওরা কিন্তু তোর প্রোটেকশনের কোনও ব্যবস্থা করেনি।

প্রোটেকশন? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন মৃগাঙ্ক। বলাইদা বলে, তুই এই কেসে একজন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। বিরোধীপক্ষ যদি কোনওভাবে তোর বয়ান দেওয়া আটকাতে পারে, কেস ঝুলে যাবে। এবং সে চেষ্টা ওরা করবেই। কেসের দিন অবধি তোরা একটু সাবধানে থাকিস।

তুমি মিটিঙে এসব কথা তুললে না কেন? বিরক্তির সুরে জানতে চেয়েছিলেন মৃগাঙ্ক।

বলাইদা বলে, আজ এত আইনি কথাবার্তা হচ্ছিল সুযোগ পেলাম না বলার। কেসটা নিয়ে খুবই ভাবনাচিন্তা করছে ওরা, নতুন করে আর দুর্ভাবনা ঢোকালাম না মাথায়। মাথাটা একটু ঠান্ডা হোক কাল-পরশু করে বলব। তুই নিজের মতো একটু অ্যালার্ট থাকিস।

কতটা অ্যালার্ট। আবার লুকিয়ে থাকতে হবে নাকি?

অতটা নয়। রাস্তা হাঁটবি সামনে পিছনে লোক রেখে। খেয়াল করবি কেউ ফলো করছে কিনা। বাড়িতে যদি কেউ কড়া নাড়ে, তুই না গিয়ে যমুনাকে দরজা খুলতে বলবি।

বলাইদা যথেষ্ট টেনশন ঢুকিয়ে দিল মনে, সেটা হালকা করতে কানাইয়ার ঠেকে যাওয়া। কাজ হয়েছে। চাদরের সঙ্গে ভয়টাও ফেলে এসেছেন।

বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছেন মৃগাঙ্ক। পাঁচিলের গায়ে নিজেদের গেট খুলে ঢুকে পড়েন। বাড়ির সদর আধখোলা। আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। আলো যেন অপেক্ষা করছে মৃগাঙ্কর।

ঘরে ঢুকে মৃগাঙ্ক থ। মেয়ে টলমল পায়ে হাঁটছে, ফের হামাগুড়ি দিচ্ছে। একটু দুরে দাঁড়িয়ে হাসছে যমুনা।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মৃগাঙ্কর। সহাস্যে যমুনাকে জিজ্ঞেস করেন, কখন শিখল হাঁটতে?

কদিন ধরেই চেষ্টা করছিল। আজ দেখছি পারছে।

মৃগাঙ্ক তাকিয়ে থাকেন বৃষ্টির দিকে, হামাগুড়ি ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, দুপায়ে হেঁটে আসছে মৃগাঙ্কর দিকে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন মৃগাঙ্ক, মেয়ে এমনভাবে হাটছে, যেন কত যুগ, জনপদ, জাতি, দেশ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

দু হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নেন মৃগাঙ্ক। 'বা' শব্দটা একটু তফাতে দুবার বলে ওঠে বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মৃগাঙ্কর। ঠিক শুনলেন কি? একই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছেন আমেরিকান সৈন্যদের ট্রেনের শব্দ। টমিদের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে উঠছে বৃষ্টির বা... বা ডাক।

॥ ঊনত্রিশ ॥

সন্ধেবেলা দু ঘণ্টা বাড়িতে টিউশন পড়ায় সুধাংশু জ্যাঠা। রোজগারের জন্য যতটা না, তার থেকে বেশি শখ। ওপার বাংলায় থাকতে হাইস্কুলে পড়াত। এখানে চাকরি জুটেছে প্রাইমারি স্কুলে। বাকি বিদ্যেটুকুর ভারে আইঢাই করে, খুব কম মাইনে নিয়ে সন্ধের কোচিং ক্লাস বজায় রেখেছে। তাতেও ছাত্রের সংখ্যা বাড়েনি। জ্যাঠা পড়ায় ভাল, একটাই বদনাম, ভীষণ মারকুটে। ইলেভেন ক্লাসের ছেলেদেরও বেতের বাড়ি মারতে ছাড়ে না। —সন্ধের দু ঘণ্টা সুধাংশু জ্যাঠা তন্নিষ্ঠ শিক্ষক হয়ে যায়। কে বলবে, এই লোকটাই সারাদিন হাটে-মাঠে ঘুরে পার্টি সংগঠন সচল রাখে!

অপুর্ব হায়ার সেকেন্ডারির আগে বেশ কয়েক বছর জ্যাঠার কাছে পড়েছে। তখন জনা ছয়েক পড়ত, আজ সন্ধেবেলা এসে দেখে সংখ্যাটা বাড়েনি।

প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল অপুর্ব এসেছে, জ্যাঠা মুখ তুলে একবার দেখে, সেই যে পড়ানোয় ডুব দিয়েছে, ফিরেও তাকায়নি।

জ্যাঠা নিজেও জানে, অত্যন্ত জরুরি দরকারে এসেছে অপূর্ব। পরামর্শটা সেরে নিলেই পারে, গুরুত্বই দিচ্ছে না।

শীতকাল বলে তক্তপোশের ওপর পড়াচ্ছে জ্যাঠা। অপূর্ব পা ঝুলিয়ে বসেছিল কোনায়। মশার জ্বালায় বাবু হয়ে বসতে বাধ্য হয়। ঘরে এখনও জেঠিমার দেওয়া ধুনোর গন্ধ রয়ে গেছে। এত মশা হয়েছে আজকাল, ভীষণ বিরক্ত লাগছে। গলা ঝাড়া দেয় অপূর্ব, যদি মনোযোগ কাড়া যায় জ্যাঠার।

লাভ হল না। একজনের অঙ্ক খাতা দেখতে দেখতে জ্যাঠা বলল, শুনছি। একটু অপেক্ষা কর।

অপূর্ব পড়েছে অনিশ্চিত অবস্থায়। জ্যাঠার সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত কিছুই ঠিক করতে পারছে না। ঘটনা হয়েছে কী, অন্যান্য দিনের মতো আজও যখন নদীর ধার থেকে কুন্তলার সঙ্গে হেঁটে আসছিল, দেখতে পায় দূর থেকে একজন সাইকেল চালিয়ে তাদের লক্ষ করে এগিয়ে আসছে। কেমন যেন তড়িঘড়ি আসা। হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে থামে ছেলেটা। সিপিএম পার্টির ছেলে। অল্প বয়স। অপূর্বর সঙ্গে তেমন আলাপ নেই। দেওয়াল লেখা, স্ট্রিট কর্নারে থাকে এই যা। ছেলেটা বলল, অপূর্বদা, পুলিশ এসেছিল পাড়ায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেড করেছে। তোমাদের বাড়িতেও গিয়েছিল। তোমার এক্ষুনি বাড়ি না ঢোকাই ভাল।

কেন হঠাৎ এল পুলিশ? জানতে চেয়েছিল অপূর্ব।

মনে হচ্ছে নকশালদের ব্যাপারে কোনও খবর আছে। বিমলদা, অলকেশদার বাড়িতে গিয়ে সব কিছু সার্চ করেছে। বাড়ির সমস্ত মাল টেনে নামিয়েছে উঠোনে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধক্ করে উঠেছিল অপূর্বর, তাদের বাড়ি সার্চ করেনি তো? রিভলবার আর ভোজালিটা আছে বড় ঘরের মাচায়। সযত্নে লুকিয়ে রাখা আছে। তবু পুলিশের ওপর কোনও বিশ্বাস নেই, শালারা যেন গন্ধ পায়।

খবরটা দিয়ে সাইকেল ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল ছেলেটা। কুন্তলা বলে, ও কী করে জানল আমরা এদিকে এসেছি?

উত্তর দেওয়ার মুড ছিল না অপূর্বর, সে তখন খুবই দুশ্চিন্তায় রয়েছে, অস্ত্র দুটো আছে তো? যদি পেয়ে যায় পুলিশ আবার পালিয়ে বেড়াতে হবে অপূর্বকে। কুন্তলা ফের বলেছিল, তার মানে পাড়ার লোক জানে আমরা এখানে বেড়াতে আসি। সব জানাজানি হয়ে গেছে।

তো? বলে খেঁচিয়ে উঠেছিল অপূর্ব।

কুন্তলা বলে, আর আমাদের এভাবে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। তোমার জামাইবাবু যে চাকরিটার কথা বলছিল, খোঁজ নাও।

বিয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত করছে কুন্তলা, বুঝতে অসুবিধে হয়নি অপূর্বর। গ্রামের দিকে

হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, সেসব অনেক পরের কথা, আগে দেখতে হবে পুলিশ কেন এসেছিল, আমার জন্যই কি?

তোমার বাড়িতে আগের পার্টির লিফলেট, বইপত্তর কিছু নেই তো? জানতে চেয়েছিল কুন্তলা।

অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নেড়েছিল অপূর্ব। তার মন পড়ে আছে বড় ঘরের মাচায়। আজ আর ঘুরপথ ধরেনি কুন্তলা, অপূর্বর সঙ্গে হেঁটে ঢুকল পাড়ায়। বাড়ি ঢোকার আগে মনে করিয়ে দিল, পারলে কালই দিদির বাড়ি চলে যাও, খোঁজ নাও চাকরিটার।

অপূর্বকে এখন পুরোটাই অধিকার করে বসে আছে কুন্তলা। সেটা কি শুধুই শরীরের বিনিময়ে? অপূর্ব কি ভালবাসে কুন্তলাকে? এখনও নয়, যৌনতায় বশ হয়ে আছে। এ তো এক ধরনের স্লেভারি। যৌনতাকে ভালবাসার মোড়ক দিয়েছে কুন্তলা, সে জানে বিয়ে তাদের হবেই, হয়তো সত্যিই কুন্তলাকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে অপূর্ব। মনে খচখচানি থেকে যাবে একটাই, তীর্থর সঙ্গে কথা বলে নিলে হত। তীর্থর সম্বন্ধে এখন যে বিরুদ্ধ ভাব দেখায় কুন্তলা, তা কতটা সত্যি? এতদিন এক তরফা শুনেছে অপূর্ব, তীর্থর তো কিছু বলার থাকতে পারে... ভাবতে ভাবতে খেয়াল করে, বাড়িতে পুলিশ ঘুরে যাওয়ার ঘটনাটা তাকে সেভাবে কাহিল করেনি। সুধাংশু জ্যাঠার ছত্রচ্ছায়ায় অপূর্ব তার মানে নিজেকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করে। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে তার। শুধু সুধাংশু জ্যাঠার পরামর্শ মতো কাজ করে গেলেই হবে। তাই বাড়িতে না ঢুকে জ্যাঠার কাছে এসেছে।

ভেতরবাড়ি থেকে একটা ফ্রক পরা মেয়ে এসে দু কাপ চা দিয়ে গেল। মেয়েটাকে আগে দেখেছে বলে মনে পড়ে না, হয়তো দেখেছে, জ্যাঠারই কেউ হবে, এখন বড় হয়ে গেছে বলে চিনতে পারছে না। প্রায় পাশের বাড়ির মেয়েকে চিনতে পারছে না অপূর্ব, কথা ছিল খুব কাছ থেকে দেশের সকল মানুষকে চেনার, বোঝার...

হ্যাঁ, কী বলবি বল? চায়ের কাপ হাতে তুলে অপূর্বর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করে জ্যাঠা।

শুনলাম পুলিশ এসেছিল সবার বাড়িতে? তোমার সঙ্গে কিছু কথা হল না কি?

দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে কপাল কুঁচকে আছে জ্যাঠা। একটু পরে শুধু 'হুম' বলে।

তারপর অনেকক্ষণ কোনও কথা নেই। ছাত্ররা বইপত্তর গুটিয়ে একে একে 'স্যার আসি' বলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ছেলেগুলোও অপূর্বর অপরিচিত।

সবাই চলে যাওয়ার পর জ্যাঠা বলে, মনে হচ্ছে পুলিশ কিছু একটা খবর পেয়েছে। নইলে হঠাৎ আমাদের এলাকায় ঢুকল কেন?

চায়ে চুমুক মেরে অপূর্ব বলে, কী খবর?

নকশালদের কোনও লিডার লুকিয়ে আছে এখানে অথবা যারা এলাকা ছাড়া হয়েছিল, তাদের কেউ ফিরে এসেছে।

কাপ ঠোঁটে ছোঁয়ানোর আগে একটু থমকায় অপূর্ব। জ্যাঠা চোখ তুলে পড়ে নেয় অভিব্যক্তি। বলে, কাউকে পায়নি। কিছুই পায়নি। তোদের বাড়িও গিয়েছিল, তুই তো এখনও বাড়ি ঢুকিসনি, না?

মাথা নাড়ে অপূর্ব। সুধাংশু জ্যাঠা বলে, তোদের বাড়ি তেমন করে সার্চ করেনি। তীর্থদের বাড়ি, অলকেশ, বিমল – সবার বাড়ির জিনিসপত্তর উঠোনে টেনে নামিয়ে দিয়েছে। পাড়ার অন্য সব বাড়িতে ঢুকলেও, বেছে বেছে নকশাল ছেলেদের বাড়িতেই বিচ্ছিরিভাবে তল্লাশি চালিয়েছে। তুই ঘরে এমন কিছু রাখিস না, যাতে ওদের ভুল সন্দেহ হয়।

আবার অস্ত্র দুটোর কথা মনে পড়ে অপূর্বর। এখন পর্যন্ত শুনে যা মনে হচ্ছে, জিনিস দুটো স্বস্থানেই আছে। জ্যাঠা সন্দেহ করছে, অপূর্বর কাছে আগের পার্টির কিছু থেকে গেলেও যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই পরের প্রশ্ন মাথায় আসে অপূর্বর, পুলিশ কি আবার আসবে মনে করছ?

যা খুঁজছে না পেলে তো আসবেই। বলে, চা শেষ করে জ্যাঠা। কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরায়। বিড়ির গন্ধ নাকে যেতে অপূর্বর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। জ্যাঠার সামনে

সম্ভব নয়, মাথায় ঢুকে গেছে অস্বস্তি, পুলিশ আবার আসতে পারে... মেয়েটাকে চিনতে পারলি?

জ্যাঠার প্রশ্নে ভাবনায় ছেদ পড়ে, অপূর্ব বলে, কোন মেয়েটা?

যে চা দিয়ে গেল।

অবাক হয়ে মাথা নাড়ে অপূর্ব, মুখে বলে, না তো!

অলকেশের মেয়ে। ওর মাকেও নিয়ে এসেছি বাড়িতে। পুলিশ ওদের বাড়ি সার্চ করে যাওয়ার পর। আর কত সহ্য করবে বল তো ওরা? ওদের কী দোষ? পুলিশ জেরা করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। এক মাস হল অলকেশ আন্ডারগ্রাউন্ডে। এ কী ধরনের পার্টি করছে অলকেশ! মেয়ে-বউকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

না থেকেও তো উপায় নেই। বেরিয়ে এলেই তো পুলিশ ধরবে এবং শেষ করে দেবে। বলে, অপূর্ব।

তা হলে তুই স্বীকার করছিস, ওরা নিজেদের বাঁচাতে লুকিয়ে রয়েছে। শুধু সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সমাজবিপ্লব হয় না, সেটা ওরা বুঝেছে। যদি বুঝেই থাকে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে না কেন? আমাদের ভাবাদর্শ গোড়াতে এক। আমাদের প্রধান শত্রু ভেবে রেখেছে কেন?

এত প্রশ্নের উত্তর অপূর্বর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, পার্টির থেকে সে এখন অনেক দুরে। জ্যাঠা কি জানে না অপূর্বকে এসব বলা আর শূন্যকে বলা প্রায় এক। জানে, না বলেও পারছে না। ভ্রাতৃপ্রতিম সেইসব কমরেডদের অনেক কিছু বলার আছে জ্যাঠার। যেমন এখনও বলে যাচ্ছে, 'খতম'-এর লাইন শ্রেণিসংগ্রামের লাইন নয়, বরং তা শ্রেণিসংগ্রাম অবরুদ্ধ করারই লাইন। এই হঠকারি নীতি জনগণকে দূরে সরিয়ে দেয়। দৃঢ় বিপ্লবী সংগঠন ছাড়া বিপ্লব কখনও সফল...

কথার মাঝে গলা ঝাড়া দেয় অপূর্ব। জ্যাঠার বক্তৃতা সহজে থামবে না। খাট থেকে নেমে এসে অপূর্ব বলে, যাই, দেখি বাড়িতে, মা হয়তো চিন্তায় আছে। সুধাংশু জ্যাঠার সংবিৎ ফেরে। বলে, হ্যাঁ আয়। যা বললাম মনে আছে তো? এমন কিছু রাখিস না বাড়িতে....

মনে আছে। বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অপূর্ব। রাস্তায় পা দিয়েই খেয়াল হয় অলকেশদার মেয়ে-বউয়ের কথা, বউদির সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হত। কিছুদিন আগেও অলকেশদার বাড়িতে কত সময় কাটিয়েছে, খেয়েছে দুপুরে, রাত্রে। এখন খবর না নিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়েটাকে তো চিনতেই পারল না। —দাঁড়িয়ে পড়েছে অপূর্ব, ভাবছে, ফিরে যাবে কি? পরক্ষণেই মাথায় আসে, সুধাংশু জ্যাঠার ইঙ্গিতবাহী নির্দেশ, এমন কিছু রাখিস না... মানে, আগের পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ভুলে যেতে হবে। জীবনের বিগত পাঁচটা বছরের ওপর নিজের হাতে আলকাতরা মাখাতে হবে অপূর্বকে। যেমন বরানগরে তাদের কমরেডদের খুন করে আলকাতরা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুখে, যাতে চিনতে না পারা যায়।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অপূর্ব পৌঁছয় বাড়ির সামনে। বেড়ার গেট খুলতে খুলতে খেয়াল করে বাড়িটা আজ কেমন যেন চুপচাপ। অন্য দিন সামনের ঘরটায়, মানে অপূর্ব যে ঘরে শোয়, সন্ধেবেলা আলো জ্বলে, অপূর্ব না ফেরা পর্যন্ত সিধু ওঘরে পড়াশোনা করে। আজ স্বাধীনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরটাও অন্ধকার। স্বাধীন বোধহয় হেঁশেলে। ভীষণ মা ন্যাওটা।

বাড়ির লোক সদরদরজা ব্যবহার করে না, বাঁপাশে গিয়ে বড় ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকে।

অপূর্ব সেইমতো বড় ঘরে ঢুকতে যাবে, মা বেরিয়ে এল হেঁশেল থেকে, তর লইগা একজন আইছে। বসাইয়া রাখছি সামনের ঘরে। হ্যারিকেনডা বড় ঘর থেইকা লইয়া যাস।

কে?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেন না বিভাবতী। কেমন করে যেন তাকান। অপূর্ব বুঝতে পারে, যে এসেছে, কাঙ্ক্ষিত নয়।

বড় ঘরে দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে। একটা নিয়ে বউদি পড়াচ্ছে পুতুলকে। অপূর্ব ঘরে ঢুকতে বউদিও কেমনভাবে যেন দেখে, চাউনিতে অশুভর ছায়া। কে এল?

অন্য হ্যারিকেনটা নিয়ে সামনের ঘরে পা রাখে অপূর্ব। চমকে ওঠে। চেয়ারে বসে থাকা তীর্থ হাসছে। সেই অকৃত্রিম হাসি। একমুখ চুল-দাড়ি হাসিটাকে অচেনা করে দিতে পারেনি। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে অপূর্বর, কোনও রকমে বলে, তুই কী করে.... বলছি, আলোটা ওঘরে রেখে আয়। বলে তীর্থ। গলার স্বর পালটে গেছে। কর্কশ অথচ নিস্তেজ।

হ্যারিকেনটা এই ঘরেই রাখে অপূর্ব, পলতে নামিয়ে। বলে, ছেড়ে দিল ওরা?

ম্লান হাসে তীর্থ। তার মধ্যেও ঝিকিয়ে ওঠে ঘৃণা। বলে, অত সহজে ছাড়ে কখনও! তা হলে?

পালিয়ে এলাম। সেন্ট্রাল জেল থেকে নিয়ে যাচ্ছিল অন্য কোথাও। ছজন ছিলাম।'

চারজন পালিয়েছি। দুজন শেষ অবধি পারেনি। শ্যুট করে দিয়েছে... সে অনেক গল্প। পরে বলা যাবে।

তুই এখন কী করবি, মানে কোথায় থাকবি? গভীর উৎকণ্ঠায় জানতে চায় অপূর্ব।

বাড়ি যাব।

তোর মাথা খারাপ, আজই পুলিশ রেড করে গেছে বাড়ি বাড়ি।

জানি। আমার খোঁজেই এসেছিল। এখন কদিন আর আসবে না। ভাল করে ঘুমিয়ে নিই। কতদিন ঠিকমতো ঘুম হয়নি।

ঘুমের জায়গা আমি বন্দোবস্ত করে দেব। বাড়ি ফেরা এখন তোর উচিত হবে না। বেশ দৃঢ় স্বরে বলে অপূর্ব।

অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া জানায় তীর্থ, তোর কোনও শেল্টারে আমি যাব না। আমারটা আমায় বুঝতে দে।

তা হলে এলি কেন আমার কাছে?

জবাব দিতে সময় নিচ্ছে তীর্থ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপূর্বর মুখের দিকে। অপূর্ব কিছু বলতে যাবে, তীর্থ বলে ওঠে, আর্মস দুটো দে।

একটুও দেরি না করে অপূর্ব বলে, ওগুলো তো আমার কাছে নেই। ফেরত দিয়েছি স্কোয়াডে।

বিচ্ছিরিভাবে হাসে তীর্থ। বলে, আমি জানতাম তুই এরকমই কিছু একটা বলবি। ধরা পড়ার পর তুই আমার খোঁজ না রাখলেও স্কোয়াড থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত। আমাদের কমরেডরা মছলন্দপুর ছেড়ে কলকাতায় ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। আমাদের পালানোর ব্যবস্থা করেছে তারাই।

শেষ একটা চেষ্টা চালায় অপূর্ব, আমি কিন্তু অলকেশদাকে ....

বাজে কথা ছাড়, অলকেশদার সঙ্গে আজই আমার দেখা হয়েছে।

অলকেশদা কোথায়?

তোকে বলতে যাব কেন?

অপুর্ব এতক্ষণে বুঝে গেছে আর্মস দুটো ফেরত দিতেই হবে। কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে। তুই জানিস, অলকেশদার মেয়ে-বউকে বাড়ি এনে রেখেছে সুধাংশু জ্যাঠা?

জানি, নিজের প্রোটেকশনের জন্য করেছে। আমরা যাতে ওঁর প্রতি সফট হয়ে প্রাণে না মারি।

এইভাবে ভাবার প্র্যাকটিশটাও চলে গিয়েছিল অপূর্বর। তাদের গোপন মিটিংয়ে এইভাবেই অ্যানালিসিস করা হত যে-কোনও বিষয়কে।

যা নিয়ে আয়। দেরি করিস না। তাড়া দেয় তীর্থ।

অপূর্ব দ্রুত চিন্তা করতে থাকে অস্ত্রগুলো কার ওপর প্রয়োগ করা হবে, প্রথমেই নিশ্চয়ই তার নাম, তারপর সুধাংশু জ্যাঠা, কুন্তলাকেও ছাড়বে না তীর্থ। যদিও তর্ক করা যেতেই পারে, কুন্তলার বিষয়টা পার্টির বাইরের, সেখানে বুলেট অপচয় করার কোনও এক্তিয়ার নেই

তীর্থর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে তীর্থ। বলে, তাড়াতাড়ি যা, আমি একটানা বসতে পারি না আজকাল। এত টর্চার করেছে।

তুই তো এখানে একটু রেস্ট নিতে পারিস। বলে, নিজের বিছানাটা দেখায় অপূর্ব। তীর্থ হাসে। হাসির মধ্যে স্পষ্ট পড়া যায়, তোকে বিশ্বাস করি না। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে তুই পুলিশ বা বিপক্ষ পার্টির কাউকে ডেকে নিয়ে আসতে পারিস।

অস্ত্র দুটো মাচা থেকে পেড়ে আনতে যায় অপূর্ব। মাথায় একবার ঝিলিক মারে, রিভলবারটা নিয়ে এসে প্রথমেই শ্যুট করে দেবে তীর্থকে। পারবে না। বাড়িতে জানাজানি, লাশ সরানো, অনেক ঝঞ্ঝাট। অপূর্বর পক্ষে যদি এসব সম্ভব হত তীর্থ এরকম সরাসরি আর্মস ফেরত নিতে আসত না। অপূর্বর ক্ষমতা তীর্থ জানে। কুন্তলার ব্যাপারটাও কি জেনেছে তীর্থ? এখনও কিছু বলছে না কেন?... এসব ভাবতে ভাবতে কখন জানি মাচায় সিঁড়ি লাগিয়ে অস্ত্র দুটো নিয়ে বাইরের ঘরে আসে অপূর্ব। তীর্থ দাঁড়িয়ে আছে, হাত বাড়ায়। গামছা মোড়া জিনিস দুটো তীর্থর হাতে দিয়ে অপূর্ব বলে, চারটে বুলেটই আছে।খরচা হয়নি।

ঠিক আছে। বলে, গামছা থেকে অস্ত্র দুটো বার করে তীর্থ। আর কিছু খতিয়ে না দেখে পকেটে ঢোকায়।

অপূর্ব মনে মনে বলে, কাকে দিয়ে শুরু করবি, কুন্তলা, আমি না জ্যাঠা? তবু একটা বুলেট বেঁচে যাবে, একটা বুলেটে বিপ্লবকে কতটুকুই বা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবি?

এদিকের দরজাটা খুলে দে তো। বলে তীর্থ।

নির্দেশমতো দরজার খিল খুলে ছিটকিনি নামায় অপূর্ব। তীর্থ এক পা টেনে টেনে চৌকাঠে দাঁড়ায়। কোনও কপটতা নয়, অপূর্বর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে একটা কথা, খুব অত্যাচার করেছে, না রে ওরা?

অত্যাচারের মাত্রা কমানো যেত, যদি তোর নামটা বলে দিতাম। বলে, উঠোনের অন্ধকারে নেমে যায় তীর্থ।

ব্যাগ গুছিয়ে ভোররাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে অপূর্ব। সারা রাত একফোঁটা ঘুম হয়নি। উৎকর্ণ হয়েছিল একটা অথবা দুটো বুলেটের শব্দের জন্য। তা যখন পেল না, নিশ্চিত হল কুন্তলা সকাল হলেই বাড়ি চলে আসবে। তার আগে মছলন্দপুর থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে সেই মাঠে চলে এসেছে, এবারে মছলন্দপুরে এসে যে মাঠে রাত কাটিয়েছিল অপূর্ব। ঠিক করেছিল যা হয় হোক, মছলন্দপুরেই থেকে যাবে। পারল না। তবে এই প্রত্যাবর্তনে অপূর্ব সংগ্রহ করেছে বেঁচে থাকার অভিলাষ। অনেকদিন বাঁচতে চায় অপূর্ব, দেখতে চায় মানুষকে, দুনিয়াকে, নিরন্তর বদলকে। এ সুযোগ সে ছাড়বে না। আজ আকাশের ঢালুতে ঝুলে আছে তালশাঁস রঙের অর্ধেক চাঁদ, আশপাশে টিমটিম করছে চার-ছটা তারা। চাঁদটা সুধাংশু জ্যাঠা, বাকিরা অপূর্বর পরিজন। কী শান্ত সহাবস্থান ওদের। অপূর্ব মনে মনে তীর্থকে বলে, তুই ভুল লক্ষ্যে নিশানা করিস না যেন। আমিই তোর টার্গেট। আমাকে খুঁজে ফেরা তোর কাজ।

চাষের জমির আল ধরে স্টেশনের দিকে এগোতে থাকে অপূর্ব।

॥ তিরিশ ॥

বেশ কিছুদিনের জন্য দুরে কোথাও গেলে বাবার ফটোতে প্রণাম করে যান অবিনাশ। আজও করলেন। সেই জন্যই বোধহয় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইলা আর একবার জানতে চাইলেন, হ্যাঁ গো, পরশুই ফিরবে তো?

হ্যাঁ, চিন্তা কোরো না। আর এমন কিছু তো দুরেও যাচ্ছি না। বলে, ইলার কোলে ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করতে যান অবিনাশ।

কোল সরিয়ে নেন ইলা। বলেন, ঘুমিয়ে আছে, এখন আদর করতে নেই।

অবিনাশের ঠোঁটে চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। মনে মনে বলেন, বেরোনোর সময় মেয়েকে সামনে আনার মানে কি আমি বুঝি না! মুখে বলেন, আসি, সাবধানে থেকো। ইলা এখনও মনে করে, কন্যাজন্মের কারণে অবিনাশ অসুখী।

সদরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। অংশু, বরুণ আর সায়ক। শীলা এসেছিল বোনঝিকে দেখতে, সায়ককে রেখে গেছে। দাম্পত্যজীবনে অশান্তিতে আছে শীলা। এটাই ভবিতব্য ছিল।

তিন ছেলেই পরপর প্রণাম করে অবিনাশকে, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে গিয়ে লক্ষ করেন, সায়কের বেলায় তিনি স্পর্শ বাঁচিয়ে গেলেন। কেন এমনটা হচ্ছে কে জানে। বিপুল-শীলার ছেলেকে তিনি ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। বিতৃষ্ণা জয় করতে ফের একবার সায়কের গাল টিপে আদর করেন অবিনাশ। বরুণের বুঝি হিংসে হয়, ঘেঁষে আসে বাবার কাছে। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, সোনামুখিতে কি সোনা পাওয়া যায় বাবা?

হাসেন অবিনাশ। বলেন, না রে 'সোনামুখি' মানে সোনার মতো মুখ যার। জায়গাটায় গিয়ে দেখি সত্যি কি না।

গেট খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অবিনাশ ঘুরে তাকান স্ত্রী, সন্তানদের দিকে। সবাই কেমন আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে। বড়ছেলে অংশুটা অন্তরমুখী, আবেগটা সহজে টের পেতে দেয় না। চোখ ছলছল করছে ছেলেটার।

এসব দেখেই সংসারী মানুষ কৃতার্থ হয়, নিজেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। অবিনাশ জানেন, এই আবেগের মধ্যে ফাঁক আছে বিস্তর। এই মায়া পুঞ্জীভূত স্বার্থেরই নামান্তর। স্টেশনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অবিনাশের মনটা কেমন যেন ফুরফুরে হয়ে ওঠে, অনেকদিন পর একা একা এমন কোথাও যাচ্ছেন, যেখানে তাঁর বিশেষ কোনও কাজ বা দায়িত্ব নেই। নিছকই ঘুরতে যাওয়া। গত চার-পাঁচ দিন আগে ডাকে একটা আমন্ত্রণপত্র এল বাড়িতে। সোনামুখি চিদানন্দ ধাম, ঠাকুর শ্রীশ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্মোৎসব। চিঠির শেষে ইতি বিনীত অখিলানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম না থাকলে বুঝতে অসুবিধে হত।

কার্ডটা উলটে অবিনাশ যখন দেখলেন অখিলানন্দ নিজে হাতে ছোট্ট করে লিখেছেন, পারলে এস, ভাল লাগবে। —মনটা টানল। মনে হল ঘুরেই আসি। স্বামীজির সঙ্গে দুবার মাত্র দেখা হয়েছে। তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ভরিয়ে দিয়েছে মন। সব থেকে বড় কথা ওঁর আপাত সস্নেহ ভাবটার গভীরে লুকিয়ে আছে অন্য একটা বিদগ্ধ মন। সেই মনটার হদিশ তিনি সকলকে দেন না, দুবার সাক্ষাতে অবিনাশকে কিছু নমুনা দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে ভক্তির আড়ম্বরকে তিনি অপছন্দ করছেন, আবার প্রশ্রয়ও দিচ্ছেন। যেমন বালি স্টেশনে নামার আগে বলেছিলেন, তুমি এসো না, ভাল লাগবে না, ওরা আমায় নিয়ে এখন অনেক হইচই করবে। বন্যা বইয়ে দেবে ভক্তির। এই দ্বিচারণ অখিলানন্দকে আরও বেশি রহস্যময় করেছে।

কিছুদিন ধরেই অবিনাশের মনটা বিক্ষুব্ধ ছিল। কোনও কিছুই যেন মনোমতো হচ্ছে না তাঁর। ওপর ওপর এক ধরনের সমীহ দেখালেও ইলা চলছে নিজের খেয়ালে। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ, শীলার কিছুদিন এ-বাড়িতে থেকে যাওয়া এবং অবশেষে ছেলেকে

অনির্দিষ্টকালের জন্য দেবপাড়ায় রাখা। হয়তো শীলাও থেকে যেত যদি না অবিনাশ ওর সঙ্গে কথা বন্ধ রাখতেন। শীলার এভাবে নির্দ্বিধায় দিদির বাড়ি চলে আসা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ইলা বেশ ভালই যোগাযোগ রাখত ওর সঙ্গে। শীলার দাম্পত্যকলহ নিয়ে ইলা কিছু কথা বলতে এসেছিল, অবিনাশ সাফ জানিয়ে দেন, ওর ব্যাপারে আমায় কিছু বলতে এসো না।

ইলা কষ্ট পেয়েছে নিশ্চয়ই। সামনাসামনি কিছু বলেনি। শীলাও ফিরে গেছে নিজের বাড়ি। শীলার কথা ভেবে খারাপ লাগে অবিনাশের, সাফার করছে মেয়েটা। এটাও মনে হয় শীলার প্রতি সহানুভূতি দেখানো মানে আবেগের বশে একটা অনাচারকে মেনে নেওয়া। এভাবে এটা-সেটা মানতে মানতে অবিনাশ হয়ে উঠবেন কলুষিত সমাজের অংশীদার। আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ইতিমধ্যে সমস্তিপুর থেকে দাদার চিঠি এসেছে, ও-বাড়ির পরিস্থিতিও ভাল না। বেদখল হয়ে যেতে পারে জমি। যথেষ্ট উৎকণ্ঠার বিষয়। দাদার চিঠিতেই জানা গেল মৃগাঙ্ক সপরিবারে দেবপাড়ায় আসছে। জেনে মোটেই আনন্দিত হননি অবিনাশ। মৃগাঙ্ক একা এলে আলাদা কথা ছিল, খুব মজায় কাটত কটা দিন। মেয়ে-বউ নিয়ে আসা মানেই নানান বিষয়ে জড়িয়ে থাকবে মৃগাঙ্ক, ঠিকমতো নিজেকে মেলে ধরতে পারবে না। আর একটা অস্বস্তি মৃগাঙ্কর পালিতা কন্যাকে নিয়ে, জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কোন ঘৃণ্য ব্যক্তির ঔরসে যে মেয়েটার জন্ম কে জানে। মেয়েটা এ-বাড়িতে এসে যথেচ্ছ শুয়ে-বসে থাকবে, ভাবতে গেলেই কেমন যেন ঘিনঘিন করছে মন। একই সঙ্গে মৃগাঙ্কর উদারতার কাছে হেরে যেতে খারাপ লাগছে। সব মিলিয়ে অবিনাশ আছেন মহা অশান্তিতে। ক্রমশ সংসারের কুম্ভীপাক তাঁকে টেনে নিচ্ছে প্রবল বেগে। এই জীবন তো চাননি অবিনাশ, এই গণ্ডিবদ্ধতা তাঁকে ক্রমশ ছোট, সংকীর্ণ করে দিচ্ছে। ইলার ভালবাসাকেও আজকাল কেমন যেন কৃত্রিম, বাধ্যতামূলক মনে হয়। জীবনটা বৈশিষ্ট্যহীন, বিস্বাদ হয়ে উঠছে। বিশাল, পরিব্যাপ্ত প্রেক্ষাপট জীবনের কাছে আশা করেছিলেন অবিনাশ, হয়তো এ-জন্মে আর হল না। বিষণ্ণতা যখন এভাবে গ্রাস করেছে, তখনই এল চিদানন্দ আশ্রমের চিঠি। অবিনাশ ঠিক করে নিলেন, যাবেন। ইলা একটু আশ্চর্য হয়েছিল, তবে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। খালি বলেছিল, কী ব্যাপার বল তো, হঠাৎ সাধু-সন্ন্যাসী, আশ্রম নিয়ে পড়লে! অবিনাশ নিঃশব্দে হেসেছিলেন। মনে মনে ইলাকে বলেছিলেন, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার মতো মনের জোর আমার নেই তুমি ভাল করেই জান। তাই নিশ্চিন্তে সাধুসঙ্গে যেতে দিতে পারছ। সংসার করতে করতে আমি এখন ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছি।

স্টেশনের আগে সবজিবাজার। এখনও ঠিকমতো বসেনি। রবিবার বলেই বোধহয়। ক্রেতারাও আসবে অনেক দেরিতে। রবিবারের আয়েস ফেলে অবিনাশ চললেন অজানা মুক্ত পরিবেশে। আজ লাগেজও ভারহীন। কাঁধঝোলায় একদিনের পোশাক আর টুকিটাকি। পায়ে সাধারণ চটি। পাঞ্জাবির ওপর ঘিয়ে রঙের চাদর। অফিসে শাল বা চাদর পরে যান না। সব মিলিয়ে একটা বেশ পরিব্রাজক ভাব।

টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে এসেছেন অবিনাশ। সাড়ে ছটায় বর্ধমান লোকাল। এখনও মিনিট দশেক বাকি। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা, গুটিকয় যাত্রীর ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে হোঁচট খান অবিনাশ, বুকে ব্যাজ এঁটে এক ভদ্রলোক বসে আছেন বেঞ্চে। মানুষটি চেনা নন, ব্যাজটা চিনলেন, করতলপ্রমাণ কাগজে অন্ধ বাচ্চার মুখ।

ভদ্রলোকের সামনে গেলেন অবিনাশ, ব্যাচের ওপর লেখাটা পড়া যাচ্ছে, চিদানন্দ চক্ষু হাসপাতাল।

মুখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোক। অবিনাশ বলেন, সোনামুখি যাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ, আপনি?

আমিও যাচ্ছি। চলুন ট্রেনে যেতে যেতে কথা হবে।

বলতে বলতে এসে গেল বর্ধমান লোকাল। উঠে পড়লেন দুজনে।

ট্রেন প্রায় ফাঁকা। সহজেই সিট পাওয়া গেল। প্রাথমিক আলাপটা সারা হয়ে গেল দু-তিনটে স্টেশন যেতেই। ভদ্রলোকের নাম চিন্ময় ঘোষ। থাকেন দেবপাড়া কলেজের কাছে। স্বামীজির সঙ্গে প্রথম দেখা কিছুদিন আগে বালির দিবাকর মণ্ডলের বাড়ির উৎসবে। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক একবার সোনামুখিতে ঘুরে এসেছেন। দেখে এসেছেন হাসপাতাল, আশ্রম, স্কুল, মেয়েদের হাতের কাজের জায়গা। স্বামীজির মহিমায় চিন্ময় ঘোষ মুগ্ধ।

মহিমা বলতে? জানতে চান অবিনাশ।

জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে নিয়ে চিন্ময় বলতে শুরু করেন, আমার ছোটছেলে বুঝলেন, ভীষণ ভোগে। মেন রোগ হাঁপের টান। অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়। ক্লাস টেনে পড়ে, চেহারা ডিগডিগে, মনে হবে যেন সিক্সে বা সেভেনে পড়ছে। কত ডাক্তার দেখিয়েছি, কোনও লাভ হয়নি। ওপরে দুটি মেয়ে। একজনের বিয়ে হয়ে গেছে, মেজ-র দেখাশোনা চলছে। ছেলেই আমাদের শেষ বয়সের সম্বল। বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম, জানেন। দিবাকর আমার বন্ধু, জানত আমার মনের অবস্থা। বলল, ঠাকুর আমাদের বাড়িতে পা রাখছেন, তুই ছেলেকে নিয়ে আয়। গেলাম। প্রথম দর্শনেই বড় ভাল লেগে গেল। সব কথা শুনে, ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, চিন্তার কিছু নেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখ। তারপর ছেলেকে মন্ত্র দিলেন আর কয়েকটা আসন দেখালেন। বললেন, মন্ত্র পড়ে, সকাল-রাত্রিতে আসনগুলো করতে হবে। —বিশ্বাস করবেন না মশাই, ছেলে এক সপ্তাহের মধ্যে চাঙ্গা!

এই সময় একটি কূট প্রশ্নের লোভ সামলাতে পারলেন না অবিনাশ। বললেন, আপনার কী মনে হয়—মন্ত্রে কাজ হল, নাকি আসনে?

দুটোতেই। যে-কোনও একটায় এরকম ফল পাওয়া যেত না।

সহজ, সরল উত্তর। অন্তর্নিহিত গভীরতা টের পেলেন অবিনাশ। ইতিমধ্যে কিছু অল্পবয়সি চ্যাংড়া ছেলে উঠেছে কম্পার্টমেন্টে। কেউ সিটে বসেনি, দরজার সামনেটায় হুড়োহুড়ি করছে, চটুল হিন্দি গান আর সিগারেটের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে ওদের মধ্যে। ফিস্ট করতে যাচ্ছে সম্ভবত। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে প্যাসেঞ্জার উঠতে দিচ্ছে না। –মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। অবিনাশ মন ফেরালেন চিন্ময়বাবুর দিকে। এন্ডির চাদরটা প্রায় মাফলারের মতো পরে আছেন, পাঞ্জাবির বুকে দৃশ্যমান সেই ব্যাজ। অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, আপনি এটা লাগিয়ে রেখেছেন কেন? এরকম কোনও নিয়ম বা নির্দেশ আছে নাকি?

একমুখ হেসে চিন্ময় বলেন, না না, সেরকম কিছু না। যাচ্ছি যখন আশ্রমের কাজে, লাগিয়ে নিলাম ব্যাজটা। বেশ একটা এম্বু পাওয়া যায় আর কি।

কাজ মানে? অবাক হয়ে জানতে চান অবিনাশ। কেননা তিনি জানেন, উৎসব। সেটাকেই কি কাজ বলছেন চিন্ময়বাবু!

উত্তর এল, কাজ বললে কম বলা হয়, কেন, আপনি জানেন না? স্বামীজি বলেননি আপনাকে?

না। প্রথমেই বললাম না, ওঁর সঙ্গে আমার মাত্র দুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, স্টেশনে আর ট্রেনে। খুব অল্প সময়ের জন্য। তাতেই ওঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। কার্ড পেয়েই তাই বেরিয়ে পড়লাম।

ভালই করেছেন। শুনুন তা হলে, আচ্ছা, আগে বলুন তো চিদানন্দ ব্রহ্মচারী কে?

অখিলানন্দর গুরু সম্ভবত।

হল না। গুরুর গুরু। আমাদের স্বামীজির গুরু সোমানন্দ। তো যাই হোক, শ্রীশ্রীঠাকুর চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্মদিবস ঊনত্রিশে মাঘ। ওই দিন আশ্রমে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন হয়। দুপুরে আশপাশের চার-পাঁচটা গ্রাম থেকে সমস্ত মানুষ ভোগ খেতে আসে। প্রায় হাজার পাঁচ-ছয়েক লোক। ঠাকুরের শিষ্যরাই রান্না করে, পরিবেশন করে। সে এক এলাহি কাণ্ড। তবে এসবই আমার দিবাকরের মুখে শোনা, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার এক বছরও হয়নি। উৎসবের পরের দিন সকালে হাসপাতালের জেনারেল বড়ির মিটিং। দুপুরের খাওয়াদাওয়া করে যে যার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়া।

ওখানে থাকার কী বন্দোবস্ত? জানতে চান অবিনাশ।

শুনেছি এই সময়টা স্কুল ছুটি থাকে। টিনের চালের স্কুলবাড়ির ঘরেই আমরা থাকব।

এসব শুনে ভেতর ভেতর একটা উত্তেজনা হচ্ছে অবিনাশের। একই সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছে, স্বামীজিকে একলা পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে। ওঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারলে ভাল হত। অবিনাশ জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, আমি যদি একটা দিন বেশি থেকে যাই, অসুবিধে আছে?

অসুবিধে কিছু নয়, সমস্যা হবে আপনারই।

কীরকম।

উৎসবের সময় খাওয়াদাওয়া একটু ভাল হয়। এমনি দিনে মোটা চালের ভাত, ট্যালট্যালে ডাল আর ঘ্যাট। জলখাবারে মুড়ি-বাতাসা, আমি তো দুবার এসে দেখে গেছি। আশ্রমের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। একটু থেমে চিন্ময় বলেন, আপনার কি আরও একটা দিন থাকার প্ল্যান আছে নাকি?

এখনও কিছু ভাবিনি। গিয়ে ঠিক করব। বলে, ট্রেনের জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন অবিনাশ। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে কম্পার্টমেন্টে। হাওয়ায় জল, জমি, গাছের গন্ধ। ফিস্ট পার্টির ছেলেরা এখনও হইচই করে যাচ্ছে। অন্য যাত্রীদের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট। যাত্রাপথের অস্বস্তি ওরাই। সামনে গিয়ে ধমক দেবেন কি? – নিজেকে নিবৃত্ত করেন অবিনাশ। দরকার নেই, মুডটাই নষ্ট হয়ে যাবে। অবিনাশের চোখে ভাসছে, পাঁচটা গ্রামের মানুষ হেঁটে আসছে আশ্রমে। সারি দিয়ে খেতে বসছে সবাই। ব্যস্তসমস্ত হয়ে পরিবেশন করছেন অবিনাশ। এককালে তিনি এরকম অনেক করেছেন, তবে এত মানুষ আগে খাওয়াননি। কী মনে হতে অবিনাশ চিন্ময়কে বলেন, আপনার কাছে আর একটা ব্যাজ হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে। নিন না। বলে, নিজের ঝোলা খুলে ব্যাজ খোঁজেন চিন্ময়। অবিনাশও তাকিয়েছিলেন ঝোলার দিকে, চোখে পড়ে চাঁদার কৌটো। জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার, কালেকশনের কৌটো নিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে!

এটা আজকাল সবসময় কাছে রাখি। সহৃদয় কাউকে দেখলেই চাঁদা চাই। রসিদ বইও আছে কাছে।

ব্যাজ বার করে অবিনাশের বুকে আঁটতে থাকেন চিন্ময়। মানুষটার মুখে সবসময় একটা হাসির সর লেগে আছে। এই প্রলেপটা বেশি দিনের সংগ্রহ নয় মনে হয়। অখিলানন্দের সান্নিধ্যে আসার পরই হয়েছে। আলাপের গোড়ায় চিন্ময়বাবু বলেছেন, জেনারেল পোস্টাফিসের কেরানি তিনি। সরকারি কেরানির মুখে এই হাসি দুর্লভ। বোঝা যায় জীবনকে অনাড়ম্বরে উপভোগ করেছেন বেশ।

অবিনাশের বুকে এখন অন্ধ শিশুর মুখ। নিজেকে দায়িত্ববান নাগরিক মনে হচ্ছে। উলটোদিকে বসা যাত্রীদের কৌতূহলী দৃষ্টি ব্যাজের ওপর। একজন জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, এটা কীসের ব্যাজ?

উত্তর দিচ্ছেন চিন্ময়, অবিনাশের চোখ চলে গেছে ফিস্ট পার্টির দিকে। প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি করছে ওরা। সিটি দিচ্ছে, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে সিটে বসা মেয়েদের লক্ষ করে। বিষিয়ে দিচ্ছে গোটা পরিবেশ। কাদের সন্তান এরা, বাবা-মার কপালে কত দুঃখ আছে কে জানে। সমাজের পক্ষেও এরা কলঙ্ক। — মাথাটা শেষমেশ গরম হয়েই গেল। প্রতিবাদের পদ্ধতিটা একটু পালটে নেবেন ঠিক করলেন অবিনাশ। চিন্ময়বাবুকে বললেন, আপনার চাঁদার কৌটোটা বার করুন দেখি।

চিন্ময়বাবু অবাক হয়েছেন। বলেন, কেন?

করুন বলছি। ঝোলা থেকে কৌটো বার করলেন চিন্ময়। হালকা ঝনাত শব্দ হল। কৌটোর পুরোটাই কাগজে মোড়া, ওপরে পয়সা ফেলার কাটা জায়গা। অন্ধ বাচ্চার মুখের ছাপ কৌটোর গায়ে। অবিনাশ কৌটো হাতে চিন্ময়বাবুকে বললেন, আমার সঙ্গে আসুন তো?

কিছু না বুঝে চিন্ময় অনুসরণ করলেন অবিনাশকে। চ্যাংড়া ছেলেগুলোর সামনে গিয়ে

দাঁড়ালেন অবিনাশ। কৌটো নাড়িয়ে বললেন, তোমরা তো আনন্দ-স্ফুর্তি করতে যাচ্ছ। অন্ধদের হাসপাতালের জন্য কিছু দান করে যাও।

মুহূর্তে হইচই থেমে গেল। পিতৃস্থানীয় ভদ্র, সভ্য দুটি মানুষকে এভাবে চাঁদা চাইতে দেখে ওরা রীতিমতো ক্যাবলা মেরে গেছে। মুখ থেকে কথা সরছে না। কৌটোর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওরা একে একে খুচরো পয়সা ফেলতে লাগল ফুটোর মধ্যে।

পরের স্টেশন আসতেই চিন্ময়বাবুর হাত ধরে টান মারলেন অবিনাশ। প্ল্যাটফর্মে নেমে উঠলেন পরের কম্পার্টমেন্টে। দুই মাঝ বয়সি খুব হাসছেন। ওঁদের যৌবন বয়সের মতো। চিন্ময় বলছেন, আপনি তো আচ্ছা মজার লোক মশায়! আমি একটুও বুঝতে পারিনি এই কাণ্ড করতে চলেছেন।

অনেকদিন পর প্রাণ খুলে হাসছেন অবিনাশ। হাসছে ট্রেনের বাইরের বিস্তীর্ণ প্রকৃতি। বর্ধমান পর্যন্ত দুজনে কম্পার্টমেন্টে কৌটো নাড়িয়ে চাঁদা তুলে গেলেন।

বর্ধমান থেকে বাস ধরে অবিনাশ আর চিন্ময় যখন সোনামুখিতে পৌঁছলেন দুপুরের রোদে বিকেলের ছোপ ধরেছে। খিদেও পেয়েছে বেশ। চিন্ময় বললেন, আরও কিলোমিটারটাক হাঁটতে হবে। রানির বাজার দিয়ে হেঁটে শ্রীপুর গ্রাম। আশ্রম, হাসপাতাল ওখানেই। চিন্ময়বাবুর সঙ্গে হাঁটা শুরু করলেন অবিনাশ। ক্লান্তি গায়ে লাগছে না। বাসে আসতে আসতে চোখ ভরে গেছে প্রকৃতির শোভায়। বাংলার এত গভীরের গ্রাম অবিনাশ দেখেননি। বিহারের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে এখানকার প্রকৃতির কোথায় একটা যেন মিল খুঁজে পাচ্ছেন। বাসের জানলার পাশে বসে দেখেছেন। প্রকৃতি কখনও কখনও ভীষণ রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। যত দূর চোখ যায় পাথুরে জমি। মাঝে মাঝে শাল, শিমুল, পলাশ হাহাকার করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তবে বিহারের শুখা গ্রাম আরও ভয়ানক, কর্কশ।

বাসে আসতে আসতে অখিলানন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলেন অবিনাশ। চিন্ময়বাবু বলছিলেন এমনভাবে যেন স্বামীজি একজন জীবন্ত কিংবদন্তী। হয়তো কিছুটা ফোলানো-ফাঁপানো। শুনতে খারাপ লাগছিল না। অখিলানন্দ ছিলেন খুবই সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। আদি নিবাস কলকাতায়। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার কলেজে। খুবই মেধাবি ছাত্র ছিলেন। কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন বাঁকুড়ায়। ইংরেজ সিপাহি তাঁকে ভুলক্রমে গ্রেপ্তার করে। অবিকল অখিলানন্দর মতো দেখতে এক মারাত্মক বিপ্লবীকে তারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

বন্ধুর বাড়ি থেকে পুলিশকে অনেক করে বোঝানো হল, তারা শুনল না। হাতে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘষটাতে ঘষটাতে ঘোড়ায় চাপা পুলিশ নিয়ে চলল স্বামীজিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারালেন তিনি। এমন অবস্থা হল, পুলিশ ভাবল বুঝি মরেই গেছে। কিন্তু তাদের ওপর আদেশ আছে জ্যান্ত ধরে নিয়ে আসার।

ঝামেলা এড়াতে পুলিশ স্বামীজিকে শ্রীপুর অঞ্চলে ফেলে পালাল। তখন শ্রীপুরে কয়েকটি আদিবাসী পরিবার ছাড়া আর কোনও জনমানস ছিল না। চাষের চিহ্ন নেই। জঙ্গলের কাঠকুটো, বুনো ফলমূল ছিল আদিবাসীদের বেঁচে থাকার রসদ। নিজেদের সেই সামান্য সম্বলটুকু দিয়ে তারা সেবা করতে লাগল অচেতন অখিলানন্দকে! পনেরোদিন পর জ্ঞান ফিরল তাঁর। আগের মানুষটি বদলে গেলেন। বিপুল পরিবর্তন হল তাঁর মনে। কলকাতায় বাড়ি ফিরে মন টিকল না। বেরিয়ে পড়লেন ভারত ভ্রমণে। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে ঘুরলেন। হরিদ্বারে সাক্ষাৎ হল সোমানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। ওঁর কাছে দীক্ষিত হলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন সন্ন্যাস নেবেন। গুরু আপত্তি করেননি। সন্ন্যাস নিয়ে কিছুদিন হিমালয়ে কাটানোর পর সিদ্ধিলাভ করে চলে আসেন শ্রীপুরে। এখানেই আশ্রম তৈরি করেন। শ্রীপুরের আদিবাসীদের ভুলতে পারেননি তিনি। তারাই তো ধনী পরিবারের সন্তানকে পুনর্জন্ম দিয়েছিল এই মাটিতে।

গল্প করতে করতে আশ্রম চৌহদ্দিতে পৌঁছে গেলেন দুজনে। খড় ও টিনের চালের ছোট

ছোট কুটির। মাঝখানের মন্দিরটি আগাগোড়া সিমেন্ট বাঁধানো। তেমন বড়সড় কিছু নয়। সদ্য এলামাটির রং হয়েছে। মাথার ত্রিশূলটিও চকচক করছে লাল রঙে। ম্যারাপ বাঁধার তোড়জোড় চলছে। ভক্তবৃন্দ তদারকি করছেন ব্যস্ত পায়ে। ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ চিন্ময়বাবুকে চেনেন। 'জয়গুরু' বলে সম্ভাষণ করলেন নিজেদের মধ্যে। এমনটা বাবার গুরুভাইদের মধ্যে করতে দেখেছেন অবিনাশ।

চিন্ময়বাবু বললেন, চলুন, স্বামীজির সঙ্গে আগে দেখা করে আসি।

মন্দিরের পিছনে আটচালা ঘরে থাকেন স্বামীজি। মাটির দাওয়ায় পা দিতেই এতটা পথের তাপিত শরীর জুড়িয়ে গেল। নিচু দরজা, মাথা নামিয়ে স্বামীজির ঘরে ঢুকলেন অবিনাশরা। অখিলানন্দ বসে আছেন ইজিচেয়ারে। আবছা আলোতেও মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চিন্ময়বাবুকে বললেন, পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো?

না না, কোনও কষ্টই হয়নি। বলে চিন্ময় প্রণাম করলেন স্বামীজিকে।

অবিনাশও করতে যাবেন, দেখেন অদ্ভুতভাবে হাসছেন। যেন কতদিনের চেনা। জন্মান্তরের বুঝিবা! পায়ে হাত দিয়ে সোজা হতে, স্বামীজি বলেন, শেষ পর্যন্ত এলে তা হলে!

অবিনাশ অনাবিল হাসেন। চিন্ময় বসে পড়েছেন মাটিতে, দেখাদেখি অবিনাশও বসতে যাবেন। অখিলানন্দ বললেন, তোমরা আবার বসছ কেন! কত বেলা হয়ে গেল, চানটান করে খেয়েদেয়ে নাও। একটু বিশ্রাম নিয়ে লেগে পড়বে কাজে। বিকেলে মেলা কাজ।

এক বৃদ্ধা এলেন দু গ্লাস জল নিয়ে। অবিনাশ চিন্ময় জল খেয়ে উঠে পড়লেন।

রান্নাঘর, খাওয়ার জায়গা আলাদা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দুশো মতো লোক বসে খেতে পারে। রোজ পাত পড়ে প্রায় দেড়শো। আশ্রমিক এবং স্কুল হোস্টেলের ছাত্রদের নিয়ে। আজ বেশি লোক খাচ্ছে, শিষ্যরা সব এসেছে বাইরে থেকে।

ইঁদারার জলে স্নান করে অবিনাশরা বসলেন খেতে। উৎসবের সময় বলেই ছাত্ররা পরিবেশন করছে। পদ খুবই সামান্য, ভাত, ডাল, ছ্যাঁচড়া, চাটনি। শোনা গেল শেষ পাতে আসবে টক দই।

পরিবেশনরত ছাত্রদের কী উৎসাহ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে সব। হঠাৎ যেন অবিনাশ দেখতে পেলেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বরুণ। ওর পরনেও আশ্রমের পোশাক। সবার মধ্যে বরুণই সব থেকে উজ্জ্বল। নজর কাড়ে প্রথমে। বরুণ বলছে, বাবা একটু ভাত দিই?

গলা বুজে আসছে অবিনাশের। পাতের ওপর হাত নাড়ছেন, অর্থাৎ নেবেন না। পাশে বসা চিন্ময় বলে ওঠেন, কী হল মশাই, হাত নাড়ছেন কেন? অপ্রস্তুত হন অবিনাশ। বলেন, কিছু না, একটা মাছি।

গ্রাহ্য না করে চিন্ময় উৎসাহী কণ্ঠে জানতে চান, দারুণ টেস্ট হয়েছে না! এ জিনিস বাড়িতে খাবেন মুখে লাগবে না।

একটা বড় ঘরে কুড়িজনের থাকার ব্যবস্থা। খাওয়া-দাওয়ার পর শীতলপাটির ওপর চাদর বিছিয়ে অবিনাশ মারলেন লম্বা ঘুম। চিন্ময়বাবু ঠেলে তুললেন, চলুন মশাই, চা খেয়ে কাজে লেগে পড়ি।

পাতলা ঘুমে ঘণ্টির শব্দ শুনেছেন অবিনাশ। ভেবেছিলেন স্কুল ছুটি হল। জেগে ওঠার পর খেয়াল হয়, উৎসবের কারণে স্কুল এখন ছুটি চলছে। চিন্ময়কে জিজ্ঞেস করেন, কীসের ঘণ্টা বাজল?

ওই তো, চায়ের। এখানে চা থেকে রাতের খাবার সবেতেই ঘণ্টা মেরে ডাকা হয়। উঠে পড়ুন।

চা খেয়ে সবার সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন অবিনাশ। কাজ বলতে গোটা আশ্রমচত্বর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা। নামসংকীর্তনের জায়গা সাজানো। আগামীকালের দরিদ্রনারায়ণ সেবার কলাপাতা কেটে রাখা। মেয়েরা সাজাচ্ছে ঠাকুর-দেবতার ছবি। কয়েকজন ভিয়েন চত্বরে গিয়ে কাটছে সবজিপাতি। বোঝাই যাচ্ছে কত বড় মচ্ছব অপেক্ষা করছে কালকের জন্য।

গায়েগতরে এত পরিশ্রম বহুদিন করেননি অবিনাশ। কোমর ধরে আসছে। তবু করে যাচ্ছেন কাজের আনন্দে। এখানে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়নি। আলাপের অবসরটুকু পাওয়া যায়নি। অথচ সবাই ভীষণ পরিচিতের হাসি নিয়ে অবিনাশের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। যেন পূর্বপরিচয়ের কোনও দরকার নেই। ইতিমধ্যে বালির দিবাকর মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। খুবই এনার্জেটিক। গোটা আশ্রম চত্বর জুড়ে দৌড়ঝাঁপ করে যাচ্ছেন। বালিতে গ্রিল ফ্যাক্টরি আছে তাঁর। উনিই মাঝে মাঝে এসে দেখাচ্ছেন, ওই যে দূরে ফরসা মতো ভদ্রলোককে দেখছেন, কলকাতার নামকরা ডাক্তার আর উনি ব্যারিস্টার, ওই যে মোটা মতন, বড় ইঞ্জিনিয়ার। সবাই কেমন মিশে গেছে দেখেছেন! এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই।

অবিনাশ ভাবছেন উলটোটা। সমাজের উঁচুতলার লোক আজ মাটিতে নেমে এসেছে দেখে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি হচ্ছে দিবাকরবাবুর।

সন্ধে উতরে যাওয়ার পর অখিলানন্দ এসে দাঁড়ালেন অবিনাশের সামনে। বললেন, স্কুলবাড়ি, হাসপাতাল সব দেখেছ?

না, এখনও দেখার সুযোগ হয়নি। বলেন, অবিনাশ।

চলো আমার সঙ্গে, আমি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি। স্কুল, হোস্টেলটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

স্বামীজিকে অনুসরণ করেন অবিনাশ। তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন আলোড়ন তুলছে, এই ফাঁকে যদি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করা যায়।

কে বলবে অখিলানন্দর বয়স আশির কাছাকাছি! সোজা হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন। পাশে হাঁটতে থাকা অবিনাশ বলেন, আমার কিছু কথা জানার আছে আপনার কাছে।

স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

হয়তো কিছু প্রশ্ন অর্বাচীনের মতো হয়ে যাবে, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না দয়া করে। মৃদু হেসে অখিলানন্দ বলেন, তোমার সকল প্রশ্ন আসলে আমার পরীক্ষা। ভগবান তোমার মধ্যে দিয়ে আমায় পরীক্ষা করছেন।

একটুক্ষণ চুপ থাকেন অবিনাশ। কথা গুছিয়ে নেন মনে মনে। তারপর বলেন, আপনার যে এই বিশাল কর্মকাণ্ড যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেবা, এর সঙ্গে ঈশ্বরকে মেশানো কি এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি! যাতে আপনার কাজ ত্বরান্বিত হয়! ধর্মপ্রাণ মানুষ ঈশ্বরপ্রাপ্তির ঘোরে আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে!

অবিনাশের মুখের দিকে তাকান স্বামীজি, নির্লিপ্ত দৃষ্টি। মোরাম বেছানো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বলেন, ঈশ্বরকে আমি এই কাজে মেশাইনি, উনিই এই কাজে আমায় নিযুক্ত করেছেন।

সন্ধ্যা এখন ঘন। আশপাশের কুটির থেকে হ্যারিকেনের নরম, নিস্তেজ আলো এসে পড়েছে পথে। অন্ধকারের আড়াল থেকে স্বামীজির কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর শোনায়, যেন বাণী। অবিনাশ অবশ্য এত সহজে প্রভাবিত হওয়ার মানুষ নন। গভীর চিন্তাক্ষমতা তাঁর যথেষ্ট। তাঁর জ্ঞানগম্যি বলে, জন্মের পর থেকেই মানুষকে নজরে নজরে রাখে মৃত্যু। তার চোখের আড়াল হতেই মানুষ সৃষ্টি করেছে ভগবানকে, ঈশ্বর আখ্যা সত্যিই যদি কাউকে দেওয়া যায়, তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাবান, মঙ্গলময় মানুষ। তিনি কোনও ধারণা নন, সজীব, বাস্তব। স্বামীজির ঈশ্বর কত পলকা, সেটা প্রমাণ করতেই অবিনাশ বলে ওঠেন, অনেকেই তো বলে, ঈশ্বর হচ্ছেন সরল, দুর্বল মানুষের অলীক আশ্রয়। এর উত্তরে আপনি কী বলবেন?

দেখ, এই মহাবিশ্বের আমরা কতটুকুই বা জানি। এই যে নক্ষত্রের আলো, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জীবন্ত, বর্তমান—আসলে তা অতীত। নক্ষত্রটি হয়তো বিনষ্ট হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। এরকম কত আশ্চর্য ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলেছে বিশ্ব জগতে, আমাদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে। ভগবানকে স্বীকার করতেই আমাদের এত আপত্তি কেন? স্বামীজি যে অত্যন্ত বাক্‌পটু তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আবেগ এবং কল্পনার মিশেলকে কী সুন্দর যুক্তির

মোড়কে পরিবেশন করেন। অবিনাশ হাল ছাড়েন না। জানতে চান, আপনার ঈশ্বর কে? এঁর স্বরূপ কী?

অবিনাশের প্রশ্নে একটু হলেও চ্যালেঞ্জের স্বর এসে গিয়েছিল। স্বামীজির তাতে কোনও হেল-দোল নেই। শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ভগবান কখনও সাকার কখনও বা নিরাকার। আমার গুরুদেব বলতেন, ঈশ্বর আছেন মানুষের আশেপাশেই। বিজ্ঞানের হাত ধরে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে গিয়ে মানুষ চলে যাচ্ছে ঈশ্বরের থেকে দূরে। আমিও তাই মনে করি।

আপনি কি ঈশ্বরকে পেয়েছেন?

ওঁকে পাওয়া যায় না। নিজের মধ্যে, বাইরের জগতে উপলব্ধি করা যায়। সর্বদা, সর্বক্ষেত্রে তাঁকে অনুভব করি আমি।

আপনার এই অনুভব বিভ্রমও হতে পারে। কেন না, আপনার ব্যাখ্যায় যুক্তির স্থান প্রায় নেই।

কোনও উত্তর দেন না অখিলানন্দ। আহত হয়েছেন হয়তো। আলো-অন্ধকারে মুখটা ঠিক পড়া যায় না। ছাত্রসুলভ বিনয়ের ভান করে অবিনাশ জানতে চান, কর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী? ঈশ্বরকে পেতে গেলে একান্তে সাধনা করলেও তো হয়। স্তিমিত কণ্ঠে অখিলানন্দ বলতে থাকেন, দেখ, মানুষ হয়ে যখন জন্মেছ, কর্তব্যকর্ম না করে তুমি থাকতে পারবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তুমি বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে কামনা, মমতা এবং সন্তাপ পরিত্যাগ করে যুদ্ধরূপে কর্তব্যকর্ম করো।—অর্থাৎ যে-কর্মের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেই কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই সমর্পণ। কর্মের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কটা কেমন জান, ধর তুমি একটা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছ, যত দূরেই আগুপিছু কর না কেন, দোলনার ওপরে বাঁধা দড়িটার সঙ্গে তুমি একই সরলরেখায় থাকছ। ওপরের গিঁটটি হল ঈশ্বর।

ব্যাখ্যাটায় চমক থাকলেও নতুন কিছু পান না অবিনাশ। বাবা একটু সাদামাটা বাক্যবন্ধে 'গীতা'র এই অংশটুকু বুঝিয়ে দিতেন। অর্থাৎ বলার ধরনটুকুই আসল। তারপর আছে স্বামীজির বেশবাস, অতি সাধারণ সন্ন্যাস জীবনধারণ। কথাগুলো বিশ্বস্ততা পেয়ে যায়। স্কুলবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে দুজনে। সমবেত পড়াশোনার আওয়াজ ভেসে আসছে। চারপাশ শান্ত, নির্জনতার মধ্যে ওই কচি কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, অতীতের কোনও বৌদ্ধবিহারে পাঠরত শ্রমণগণ।

পরের জিজ্ঞাসায় যান অবিনাশ, আচ্ছা, আপনার এত গভীর তত্ত্বকথা তো সাধারণ বুদ্ধির শিষ্যরা বুঝবে না। তারা মনে করে আপনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। আপনার অনেক ক্ষমতা, আপনার নির্দেশে অজ্ঞানে কাজ করে যায়। এতে কি প্রকৃত কর্ম হয়? আপনার মতো ঈশ্বর-উপলব্ধি আসে?

হয়তো আসে, অথবা আসে না। তবে ওরা কাজ শুরু করে দেয় আমাতে অর্পণ করে। ওদের সকল অহং কার?—না আমার। এতে সুবিধেই হয় ওদের। আমরা সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষ। বয়স এবং অভিজ্ঞতার কারণে কিছু ক্ষমতা আমি অর্জন করেছি। তবে সে সব ক্ষমতা কখনওই অলৌকিক কিছু নয়। একজন চাষি যেমন বীজ দেখে শস্যকে কল্পনা করতে পারে, আমিও মানুষের ক্ষেত্রে তাই পারি।

যেমন? যেন দৃষ্টান্ত চাইলেন অবিনাশ।

অখিলানন্দ বলেন, ধর না, আমি তোমাকে দেখে, তোমার জিজ্ঞাসাগুলো শুনে বলে দিতে পারি, তুমি একজন উচ্চবংশের জাতক। তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ ছিলেন। একই সঙ্গে তোমাদের বংশে কারও কারও মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতিও দেখা গেছে। কী ঠিক বলছি কি না?

পা চলছে না অবিনাশের। যেন মাটিতে বসে গেছে। ইনি কি অন্তর্যামী? নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন এতক্ষণ? তাই যদি হয়, তা হলে কেন এখনও বলছেন না, তোমাদের বংশে

অবতার পুরুষের জন্ম আসন্ন!

অখিলানন্দ জানেন না তাঁর বিদগ্ধ সঙ্গীটির মনের কোমলতম অংশ স্পর্শ করে ফেলেছেন। ঠিক এইখানে এসে বিচার শক্তি লোপ পায় অবিনাশের, অথবা এই অন্ধত্বে জীবনের সার্থকতা খোঁজেন অবিনাশ। সঙ্গীকে থতমত খেয়ে যেতে দেখে অখিলানন্দ খানিক অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হন। বলেন, তুমি আবার আমাকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ভেবে বোসো না। কিছুক্ষণ আগে যে চাষির কথা বলছিলাম, আমি হচ্ছি তাই। মানবজমিন আবাদের চেষ্টা করি।

কোনও লাভ হল না। অবিনাশ ঘোরে পড়ে গেছেন। পুরোপুরি মোহাচ্ছন্ন অবস্থা। স্বামীজির উচ্চতা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে তাঁর সামনে।

পাঁচিলঘেরা বিদ্যালয় অঙ্গন। দরজা দিয়ে ঢুকে এলেন দুজনে! অবিনাশ ভেবেছিলেন, ক্লাসে বসে পড়া করছে ছাত্ররা। তা নয়, যে যার ঘরে হ্যারিকেন জ্বেলে পড়ছে। হোস্টেল আর স্কুল এক কম্পাউন্ডেই।

ছাত্রদের ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে যান অবিনাশ আর অখিলানন্দ। ছাত্ররা পড়া থেকে মুখ তুলে হাতজোড় করে দুজনের উদ্দেশে। পরিবেশ দেখে বুক ভরে যায় অবিনাশের। দুপুরবেলা খেতে বসার সময় বরুণকে দেখার ঘটনাটা মনে পড়ে। সেই সূত্রেই স্বামীজিকে বলেন, আমার দুই ছেলে এক মেয়ে। আপনি যদি অনুমতি দেন মেজছেলেকে এখানে রাখতে পারি।

আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে বুঝতেই তো পারছ আমাদের যা সংস্থান ছাত্রদের বিভিন্ন পদ খাওয়াতে পারি না, আলো ফ্যান নেই। তোমার ছেলে কি এত কষ্ট করতে পারবে?

পারবে। পারতেই হবে। আমার মেজছেলেটা একটু অন্য রকম। ওকে শৃঙ্খলা, কষ্টের মধ্যে মানুষ করতে চাই। বলে, থেমে গেলেন অবিনাশ। মনে রয়ে গেল, বংশের জমা শ্যাওলা ঘষে নিলেই আমার ছেলে সোনার মতো চকচক করবে। সে সম্ভাবনা ওর মধ্যে আছে। বংশের শ্যাওলা অর্থে সেই অভিশাপ, প্রত্যেক প্রজন্মে কেউ না কেউ পাগল হবে। অবিনাশ কল্পনা করেন, বৈদিক যুগে কী তারও আগে তাদের কোনও পূর্বপুরুষ শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। সেই ধারা প্রত্যেক প্রজন্মের মতো এই প্রজন্মেও ছোবল তুলছে অবিনাশের দুই পুত্রের ওপর। ওরাই বংশের শেষ বংশধর। অংশুকে নিয়ে ততটা সংশয় হয় না, ওর চেহারায় মামারবাড়ির ছাপ বেশি। এমনিতে স্থিতধী, বাধ্য। নিজের জীবনটা নিস্তরঙ্গভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে। বরুণকে নিয়েই চিন্তা, ডাগর চোখ দুটিতে গভীর অনুসন্ধিৎসা। এই বয়সেই ভীষণ সংবেদনশীল মন। বরুণই সেই আধার, যেখানে অবতার পুরুষ প্রকাশিত হতে পারেন অথবা শয়তান, পাগল। বরুণকে অখিলানন্দর সংসর্গে রাখতেই হবে।

স্কুলবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন দুজনে। এখন যেদিকে হাঁটছেন স্বামীজি, অবিনাশ আন্দাজ করেন এটা হাসপাতালের পথ। আশ্রম, হাসপাতাল, স্কুল মিলিয়ে অনেকটাই জমি। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, পথের ধারেই চাষের জমি, একটু দূরে অল্প কিছু গাছ নিয়ে জঙ্গল মতন, সন্ধে এখানে অনেকক্ষণ ধরে জিরিয়ে নেয়। বরুণ থাকবে শ্রীপুরে। ইলাকে রাজি করানোই একটু মুশকিল হবে।

জঙ্গলের মাথায় সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে স্বামীজির উদ্দেশে অবিনাশ বলেন, আমাদের বংশে যে লক্ষণের কথা আপনি বললেন, তা সত্যি। আমার বাবার শেষ বয়সে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের জেনারেশনে আমার বড়দা, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আক্রান্ত। তবে বদ্ধ উন্মাদ নয়। এর থেকে উদ্ধারের পথ কী?

ওই যে বললাম, কর্মযোগ। নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে, সৎকর্ম, নিষ্কাম কর্ম। মায়ের পেটে থাকতে থাকতেই শিশু হাত-পা ছুড়তে শুরু করে, কাজ করতে চায় সে। মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয় তার চঞ্চলতা। এই কর্মস্পৃহা ভুল পথে চালিত হলে, মানুষ অপরাধ, অন্যায়, নানাবিধ পাপ করে। আলোকহীন পথে ঢুকে পড়ে, যেখানে ঈশ্বর নেই। সেই অন্ধকার পথেই টেনে আনে উত্তরপুরুষদের।

বুকটা কেমন যেন ছমছম করে ওঠে অবিনাশের। এক লহমায় নিজের অপরাধগুলো মনে পড়ে যায়, ভাল কাজগুলোও প্রাণপণে স্মরণে আনেন। প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ। মানুষ তো এরকমই হয়। অবিনাশ বলেন, যে-নিষ্কাম কর্মের কথা আপনি বলছেন, তা কি বাস্তবিক সম্ভব! ভগবানকে যদি নাই পেলাম, কলুর বলদের মতন কাজ করে কী লাভ, যদিও অনেকে পুণ্যার্জনের কথা বলে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরক। আমি সেই অলীক কল্পনায় বিশ্বাস করি না।

অখিলানন্দ স্মিত হেসে অবিনাশের দিকে তাকান। চাঁদের আবছা আলোয় হাসিটি অনন্যসুন্দর লাগে। বলেন, পাবে। জীবদ্দশাতেই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবে। আমি প্রথম তাঁকে কোথায় দেখতে পেয়েছিলাম জান, এই শ্রীপুরে। সন্ন্যাস নেওয়ার পর শ্রীপুরে যখন ফিরে এসেছিলাম, তখন বসন্তকাল। এখানকার আদিবাসীরা, যারা আমাকে কয়েক বছর আগে শুশ্রূষা করে নতুন জীবন দিয়েছিল, তারা তো সন্ন্যাসীবেশে আমাকে চিনতেই পারে না। অনেক কষ্টে চেনানো গেল। ওদের বললাম আমি এখানে একটা আশ্রম গড়তে চাই। তোমরা আমাকে সাহায্য কর। ওরা বলল, আমাদের পরবটা চলে যাক তারপর তোমার সঙ্গে কাজে লাগব। প্রাচীন উৎসবটা ওদের সঙ্গেই কাটালাম। বাহা পরব। ওদের এক দেবী বসন্তকালের একটা সময় পৃথিবীতে নেমে আসেন। গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা শালফুলে ছেয়ে যায় গাছ, পলাশ শিমুল রাঙিয়ে দেয় দেবীর আগমনের পথ। মহুয়ার মাতাল গন্ধ ভেসে বেড়ায় বাতাসে। আমি সত্যিই একদিন দেখলাম দেবী হেঁটে আসছেন এই পথ দিয়ে। সেই প্রথম আমার দেখা বা অনুভব বলতে পার। সাধুসঙ্গ করেও যে-উপলব্ধি আমার আগে হয়নি। গুরুর কাছে যে উপাসনার রীতি শিখেছিলাম, তা হচ্ছে 'হোম'। দেবতারা আকাশে থাকেন, অগ্নি তাঁদের দূত। বেদি তৈরি করে তাতে কাঠের আগুন জ্বেলে দুধ, ঘি, সোমরস দেওয়া হবে, দেবতারা আগুন মারফত সেসব পেয়ে খুশি হবেন। আমার দেবতা তখন ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, পুষা, অগ্নি, ঊষা বিবিধ

এখানে এসে আমি পূজার রীতি পালটে দিলাম, এরা যেভাবে মূর্তি অথবা প্রতীকের পূজা করে, সেইভাবেই আরাধনা করতে লাগলাম। তুমি যদি আমার পূজাপদ্ধতি দেখ, একটু অবাক হবে।

অবাক অবিনাশ হবেন না, উনি জানেন আর্যরা পুরাকালে তাদের পূজাপদ্ধতি সমেত ঠিক এইভাবেই মিশে গিয়েছিল অনার্যদের সঙ্গে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে শ্রীপুরে। আসলে ইতিহাসের কোনও কিছুই মুছে যায় না, তরঙ্গ ওঠেই।

হাসপাতাল বাড়িটা একতলা, পাকা ছাদের। ইলেকট্রিসিটি আছে। তবে ভোল্টেজ খুব কম। বারান্দায় উঠে অবিনাশ জানতে চাইলেন, হাসপাতাল অবধি যখন কারেন্ট এসেছে, আশ্রমেও তো নেওয়া যায়।

কাছেই একটা জেলা অফিস আছে। ওরাই দয়া করে লাইন দিয়েছে আমাদের। আশ্রমে ইলেকট্রিক লাইনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি অনেকদিন হয়ে গেল। দেখি কী হয়! বলে, হাসপাতালে ঢুকে গেলেন অখিলানন্দ। অফিসঘরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন ফাইলপত্তর নিয়ে। দু-একজন তাঁকে সাহায্য করছে। কাল জেনারেল বডির মিটিং। স্বামীজিকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না, অফিসের বাস্তববাদী বড়বাবুর মতো একে তাকে ধমক দিচ্ছেন। একটু আগের দার্শনিক মানুষটি এখন পুরোপুরি নীরস কাজের মানুষ হয়ে গেছেন।

অবিনাশ ঘুরে ঘুরে হাসপাতালটি দেখলেন। ছটা বেড। সব কটাতেই পেশেন্ট আছে। দিবারাত্রের ডাক্তার আছেন। পাশেই তাঁর টিনের চালের কোয়ার্টার। এদের আউটডোরটা খুব বড়, প্রচুর পেশেন্ট হয় দিনে। অপারেশন থিয়েটারও আছে। একজন আদিবাসী নার্স অবিনাশকে মোটামুটি সব বুঝিয়ে দিলেন। নিজের থেকে অবিনাশ যেটা লক্ষ করলেন, অন্ধ বাচ্চার মুখটা বিরাট পোস্টারে ছাপা। সাঁটা আছে হাসপাতালের দরজায়, দেওয়ালে। প্রিন্টটা যেহেতু ভাল, মুখটা বড় জীবন্ত মনে হচ্ছে। যেন টের পেয়েছে, অবিনাশ এসেছেন হাসপাতালে।

মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই স্বামীজির কাজ সারা হয়ে গেল। অবিনাশকে ডেকে বললেন, চল, আশ্রমে ফেরা যাক। সন্ধ্যারতি শেষ হতে চলল।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেই বাকি পথটুকু নরম চাঁদের আলোয় মাখা। অল্প শীত শীত করছে। আবহাওয়াটা বেশ মনোরম। আজ সকালেও অবিনাশ কল্পনা করেননি এত কাছাকাছি এরকম সুন্দর একটা জায়গায় এসে পৌঁছবেন। আনন্দ আসলে থাকে কাছেই, বেরিয়ে আসতে হয় রোজকার অভ্যেস থেকে, মায়াপাশ সরিয়ে

আশ্রমে এসে ঠাকুরদালানের দিকে এগোতে এগোতে কানে এল সন্ধ্যার্চনার গান। গাইছে সুন্দর এক পুরুষকণ্ঠ। গানের বাণী শুনে অবিনাশ অবাক, অন্ধজনে দেহ আলো/ মৃতজনে দেহ প্রাণ... রবীন্দ্রনাথ। কী আকুল হয়ে গাইছে গায়ক, কী অসম্ভব চাওয়া! অখিলানন্দের পূজার রীতি সত্যিই অন্য রকম।

॥ একত্রিশ ॥

মা মাগো ভিক্ষে দেবে মা, মা মাগো... গলাটা অচেনা লাগে ইলার। কর্তা অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর পাঁচ-ছজন ভিখারি আসে। দুটো বুড়ো, দুটো বুড়ি, একজন হাড্ডিসার বউ। প্রত্যেককে ভিক্ষে দেন ইলা। কুনকেতে চাল তোলাই থাকে। আজকের গলাটা অচেনা মেয়ের গলা, একটু যেন বেশিই কাতরতা মিশে আছে।

তরকারি কষছিলেন ইলা, এখনও জল ঢালার সময় হয়নি। বাইরে মেয়েটা ডেকেই যাচ্ছে। রান্নাঘরে বসে আরও দুজন, সন্ধ্যা আর সন্ধ্যার মা। সন্ধ্যার মা বলল, দাও বউদি, ভিক্ষেটা আমি দিয়ে আসি।

না থাক, তুমি তরকারিটা ততক্ষণ নাড়ো। বলে, চালের ড্রামের ওপরে রাখা কুনকে নিয়ে ভিক্ষে দিতে যান ইলা। ভিক্ষে দিতে তাঁর ভাল লাগে। ভিখিরির মুখের হাসিটি বড় তৃপ্ত করে তাঁকে। মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে যায় একটা কথা, ভাগ্যিস এমন দুঃখ ভগবান আমাকে দেননি।

আজকের ভিখিরিকে দেখে চোখ কোঁচকালেন ইলা, অল্পবয়সি রোগা বউ, কোলে মাস ছয়েকের বাচ্চা।

চাল ওর ঝোলায় ঢালতে ঢালতে ইলা জানতে চাইলেন, ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে। বলে, ভিখারিণী।

ওইটুকু বাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছ! একটু পরেই তো রোদ চড়ে যাবে।

ওকে দেখেই তো ভিক্ষে দেয় লোকে।

চরম সত্যের সামনে খানিক থমকে যান ইলা। শিশুবয়স থেকেই মেয়েটা নিজের খাবার নিজেই রোজগার করছে। ইলা জিজ্ঞেস করে বসেন, ওর বাবা কোথায়? ভিখারিণী যেন শুনতেই পায় না, ঘুরে যায় সেনবাড়ির দিকে। হাঁক দেয়, মা, মাগো ভিক্ষে...

ইলা ফিরে আসেন রান্নাঘরে। সন্ধ্যার মা মালতী বলে, এত দেরি হল! কষা হয়ে গিয়েছিল, জল দিয়ে দিয়েছি।

ভাল করেছ। বলে, পাশের চুলোয় ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে খুন্তি ডোবান ইলা। খুন্তির ডগায় ভাত তুলে এনে দেখেন সেদ্ধ হয়েছে কি না। ইলার এখন গ্যাসের উনুন। দুটো চুলো, তবু কর্তাকে অফিস যাওয়ার আগে ভাত দিতে পারছেন না। কোলের মেয়েটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে যান সকাল থেকে। কর্তা বলেছিল, কটা মাসের জন্য রান্নার লোক দেখি?

ইলা 'না' করেছেন। কেননা, অন্যের রান্না কর্তার মুখে রুচবে না ভাল করেই জানেন। সকালে চার-ছটা রুটি আর আলুভাজা খেয়ে অংশুর বাবা বেরিয়ে যায়। ভাত খায় অফিসের ক্যান্টিনে। ওখানকার খাবার নাকি ভাল। কিন্তু দিনের পর দিন বাইরে খাওয়া তো ঠিক নয়। তাই ইলা স্থির করেছেন মেয়েটাকে দেখার জন্য লোক রাখবেন। কথাটা বলেছিলেন মালতীকে, যদি লোক দেখে দেয়। মালতী বলেছে, বাইরের লোকের কী দরকার বউদি, আমার সন্ধ্যাই না হয় দেখবে। ও তো আমার পিছন পিছন কাজের বাড়িতে ঘোরে। এ-বাড়িতেই খাওয়া পরায় থাকবে। তবে রাতে ওকে আমি নিতে আসব। ও বিছানায় না থাকলে আমার ঘুম আসতে চায় না।

সন্ধ্যার জন্মের পরই মালতীর বর নিরুদ্দেশ হয়েছে। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে মালতী লোকের বাড়ি কাজ করা শুরু করে। মালতীর ডাঁটো চেহারা, যৌবন এখনও ডগমগ করছে শরীরে। ওদের ক্লাসের অনেক লোক বিয়ের প্রস্তাব দেয় ওকে, মালতীই গল্প করেছে। মালতীর শর্ত একটাই মেয়েকে সঙ্গে রাখতে হবে। রাজি হচ্ছে না কেউ। বিয়ের একটু-আধটু ইচ্ছে থাকলেও, করা হয়ে উঠছে না মালতীর। মেয়ে কোনও বদমাইশি করলে, মালতীর হুঁশ থাকে না। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মারে। অনেক সময় ইলাকে গিয়ে বাঁচাতে হয়েছে। অথচ মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

ভিখারি মা যেমন মেয়েকে কোলে করে বেরিয়ে পড়েছে। ইলার যে কেন মেয়ের ওপর মায়া জাগছে না কে জানে। সবসময় মনে একটা খোঁচা থাকছে, কর্তা বোধহয় মেয়ে চাননি। মেয়েটার মুখেভাতের সময় চলে এল, এখনও নাম ঠিক হয়নি। ছেলে দুটোর নাম দিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই। মেয়ের নাম দেবেন অবিনাশ, এমনটাই ভেবেছিলেন ইলা। কর্তাকে বলতে যেতে, বললেন, তুমিই রেখে দাও না একটা।

ইলা রাখেননি। নানা রকম ডাকনাম দিয়েই আদরটাদর করা হচ্ছে। কর্তাও মেয়েকে আদর করেন, ইলার মনে হয়, অন্তর থেকে করছেন না। ইলার মন রাখার জন্য করছেন। তা হলে বউদি, সন্ধ্যা আজ থেকেই কাজে লেগে গেল। বলে মালতী।

গ্যাসওভেন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফেন গালতে বসেন ইলা। বলেন, হ্যাঁ, আজ থেকেই লেগে যাক না। — তারপর সন্ধ্যাকে বলেন, যা, বোনের কাছে গিয়ে বোস। দেখ, কাঁথাটাথা ভিজিয়েছে কি না। ভেজালে বদলে দিস।

সন্ধ্যা উঠে যায় রান্নাঘর থেকে। মালতী বলে, সন্ধ্যাকে কদিনের জন্য রাখবে বউদি? হাঁড়ি উপুড় দিয়ে তরকারির দিকে মন দেন ইলা। বলেন, কেন?

গলায় ময়ম মিশিয়ে মালতী বলে, এক বাড়িতে সন্ধ্যাকে সারা দিনের জন্য চাইছিল। আমি অবশ্য বলেছি, ইলা বউদির মেয়েটা একটু বড়সড় হয়ে যাক, তারপর....

ইলা বোঝেন সন্ধ্যার দর বাড়াতে চাইছে মালতী। ভাবছে, ভাল সম্পর্কের সুবাদে বউদি যদি ঠকিয়ে দেয়। ইলা বলেন, কাউকে কোনও কথা দিও না। সন্ধ্যা আপাতত আমার কাছেই থাকবে। টাকা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মালতীর গলায় গদগদ ভাব। বলে, সে আমি জানি। তোমার মতো মানুষ আমি খুব কম বাড়িতে দেখেছি।

ঠিক আছে। এখন যাও। ঘর ঝাড়ামোছা কর, অংশুকে বল চান করতে যেতে। স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে!

মালতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, একটু দাঁড়ায়, বলে, সন্ধ্যাকে রাখার যুক্তিটা দাদাবাবুর, না গো?

বিস্মিত হয়ে ইলা বলেন, হঠাৎ একথা!

না, আসলে দাদাবাবু বুঝতে পেরেছেন, এত ধকল নিলে সোনার প্রতিমা ফিকে পড়ে যাবে। বলে, ফিকফিক করে হাসে মালতী।

ইলা ভেতর ভেতর বিরক্ত হন। বলেন, যাও তো কাজে, ফাজলামি কোরো না। রান্নাঘরের কম আলোয় মালতী ধরে নিল, বউদি তার কথায় আরক্ত হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মালতী।

ইলা সন্ধ্যাকে রাখছেন নিজের ইচ্ছায়, এখনও কর্তাকে কিছু বলা হয়নি। বললে, আপত্তি করবেন না। একটু অবাক হবেন, যে-ইলা সংসারের সব কাজ হামলে পড়ে করতে যায়, সে হঠাৎ আলগা দিচ্ছে কেন?

কারণটা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন না। পাছে ইলা মনে করে কর্তা পয়সার কথা ভাবছে। হয়তো জিজ্ঞেস করার কথা মনেও আসবে না, কর্তা এখন ব্যস্ত হয়েছেন সোনামুখির আশ্রম নিয়ে। চোখের হাসপাতালের জন্য চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছেন। স্ত্রীর দিকে খেয়াল রাখার সময় কোথায় তাঁর! ইদানীং আধ্যাত্মিক বই পড়ছেন খুব। ইলা আধ্যাত্মিকতা খুব একটা বোঝেন না, তাঁর একটা ধোঁয়াটে ধারণা আছে, আধ্যাত্মিক ব্যাপার মানেই স্ত্রীর থেকে মন উঠিয়ে নেওয়া। মেয়ে হওয়ার জন্যই কি কর্তার এমন বদল হল?

ইলাও পালটে গেছেন ভেতর ভেতর। বিশেষ করে যেদিন শীলা নিতে এল ছেলেকে। জানাল, আলাদা বাসা ভাড়া করেছে। ওর স্কুল সেক্রেটারি করে দিয়েছে বন্দোবস্ত। একা মেয়ের পক্ষে বাড়ি ভাড়া পাওয়া খুব ঝামেলার। সায়ককে নিয়ে এবার থেকে একলাই থাকবে শীলা। —কথাগুলো যখন বলছিল মুখে কোনও বিষণ্ণতা ছিল না শীলার। বরং মুক্তির, নাকি স্বাধীনভাবে বাঁচার আনন্দে খুশি উপচে পড়ছিল চোখে।

এ-কথা সে-কথার পর ইলা বলেছিলেন, দ্যাখ না, আমার যদি কোনও একটা কাজ হয় তোদের স্কুলে। সেক্রেটারির সঙ্গে তোর তো ভালই আলাপ আছে মনে হচ্ছে।

শীলা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কথা। বলেছিল, তুই যে রকম সংসারে জড়িয়ে পড়েছিস পারবিই না বাইরে গিয়ে চাকরি করতে। তা ছাড়া অবিনাশদা তোকে ছাড়বে কেন?

ইলা মনে মনে বলেছিলেন, তুই তো আমায় চিনিস শীলা, জীবনে যতটুকু চেয়েছি আদায় করে ছেড়েছি। পাকিস্তান থেকে এপারে এসে পরীক্ষাগুলোয় পাস করেছি ভালভাবেই। অবিনাশদাকেও পেয়েছি। নিজের আলাদা সংসার, বাড়ি করেছি এখানে। যদি জেদ ধরি, তোর অবিনাশদা আমার চাকরি করা আটকাতে পারবে না।—মুখে মৃদু হাসি এনে বলেছিলেন, ও আমার ইচ্ছায় সহজে বাধা দেয় না। তুই সেক্রেটারিকে বল। ইলা জানতেন বোন কোনও চেষ্টাই করবে না, দিদির খেয়াল ভেবে উড়িয়ে দেবে।

নিজের তাগিদ বোঝাতে ইলা মাঝে একদিন পৌঁছে গেলেন শীলার স্কুলে। ঘটনাচক্রে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উনি কথা দিয়েছেন মাস ছয়েকের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করবেন। তখন থেকেই ইলা সিদ্ধান্ত নেন, মেয়ের দেখাশোনার জন্য লোক রাখবেন। মেয়েটা যেন শুধু মায়ের গন্ধে অভ্যস্ত না হয়ে যায়।

চাকরিটা নিশ্চিত হওয়ার পর কর্তাকে সব জানাবেন ইলা। যদি উনি মেনে না নেন, উত্তর রেডি করা আছে ইলার। বলবেন, তুমি তোমার আধ্যাত্মিকতা নিয়ে থাকতে পার, আমি আমার পছন্দমতো কাজ করতে পারব না!

ওপরে শান্ত ভাব বজায় রাখলেও, ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা সবসময় কাজ করছে ইলার। কাল্পনিক সওয়াল-জবাব করছেন কর্তার সঙ্গে। এর মাঝে এমন একটা কথা তুললেন অবিনাশ, ইচ্ছে না হলেও সায় দিতে হল।

সোনামুখি থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা পাড়েননি, আশ্রমের খুব প্রশংসা করছিলেন। দু-চার দিন পর ইলার মুড বুঝে বললেন, বরুণকে ভাবছি সোনামুখির হোস্টেলে রেখে মানুষ করব। শৃঙ্খলা, কৃচ্ছ্রতার ভেতর বড় হবে। মানুষ তৈরি হবে খাঁটি।

শুনেই বুকটা হায় হায় করে উঠেছিল, এ কী কথা বলছেন কর্তা! ওইটুকু ছেলে, পারবে মাকে ছেড়ে একা থাকতে?

মুখ দেখে মনের কথাটা পড়ে নিয়েছিলেন উনি। বললেন, এই বয়সটাতে হোস্টেলে পাঠানো ভাল। ও হচ্ছে এখন কাদার মণ্ড, ইচ্ছেমতো গড়া যাবে ওকে। মা-বাবার আদর, প্রশ্রয়ে মানুষ হলে, পরে জীবনের সঙ্গে যুঝতে বেগ পেতে হবে। দেখছই তো দিনকালের অবস্থা। লাখো লাখো বেকার। চাকরি না পেয়ে হয় গুণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, নয়তো পার্টিতে ঢুকে বোমাবাজি, খুনজখম ...

বরুণের কথাই শুধু ভাবছ কেন? আর একটা ছেলেও তো রয়েছে। বলেছিলেন ইলা উত্তরে উনি বলেন, অংশু বড় হয়ে গেছে, হঠাৎ করে হোস্টেল লাইফের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না। তা ছাড়া ও অনেক বোঝদার। নিজের পায়ে জীবনে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।

'নিজের পায়ে দাঁড়ানো' কথাটা সামলে দেয় আবেগ। ইলাও তো কিছুদিন পর স্বনির্ভর হতে চাকরি করতে বেরোবেন, অনেকটা সময় থাকতে হবে ছেলেমেয়ে ছেড়ে, অভ্যেসটা এখন থেকেই করে নেওয়া ভাল। নিজের ছোটবেলার কথাটাও মনে পড়ে, কদিনইবা মা-বাবার সান্নিধ্য পেয়েছেন! বরুণের পক্ষে হোস্টেলে থাকা ভালই হবে। শক্তপোক্ত হবে মন। একটু সময় নিয়ে ইলা জানতে চেয়েছিলেন, ওখানকার ব্যবস্থা কেমন? সব দেখে নিয়েছ তো?

বাড়ির মতো সুবিধে কখনও পাবে না। ফ্যান, লাইট নেই। কারেন্ট এসে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তবে খোলা মাঠ পাবে, বিশাল আকাশ, গাছপালা, পাখি... বলতে বলতে কর্তা যেন আবার করে দেখতে পাচ্ছিলেন আশ্রমটা। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেন, বরুণকে যখন ভর্তি করতে নিয়ে যাব, তুমিও যেয়ো সঙ্গে। জায়গাটা পছন্দ না হলে ছেলেকে ফেরত নিয়ে এস।

ইলা তখনই ঠিক করে নেন, যাবেন না। বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে ছেলের যাওয়া আর ছেলেকে একা কোথাও ফেলে আসার মধ্যে অনেক তফাত।—স্বামী অখিলানন্দ সম্বন্ধে অনেক গুণগান করছিলেন কর্তা। বলছিলেন, ওঁকে একবার দেখলেই তোমার ভরসা জাগবে। মনে হবে ছেলেকে অনায়াসে ওঁর তত্ত্বাবধানে রেখে আসা যায়।

স্বামীজিকে একপলক দেখার ইচ্ছে আছে ইলার, কী জাদু উনি করলেন, কর্তার সেই আগের তেজ, কামনা সব কেমন মিইয়ে গেল। রাতে আর সেভাবে কাছে টেনে নেন না, হয়তো কখনও হঠাৎ খেয়াল হল, ভালবাসাহীন, কৃপণ আদরে মৈথুনে রত হলেন। সুখ হয় না ইলার, বড় অপমানিত লাগে।

মা, আমার চান হয়ে গেছে। রান্নাঘরে মুখ বাড়িয়ে বলে গেল অংশু।

তাড়াতাড়ি ওর জন্য খাবার বাড়তে থাকেন ইলা। ছেলেটার দেরি হয়ে যাবে স্কুলে। মুখ নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে অংশু। ঘড়িতে দশটার ঘন্টা বাজল। ইলার খেয়াল হয়, বরুণ এখনও স্কুল থেকে ফিরল না। অন্য দিন তো এসে যায়। অংশুকে বলেন, কী রে তোর ভাই যে এখনও ফিরল না।

উত্তর দেয় না অংশু। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে যাচ্ছে।

কী রে খাচ্ছিস না যে বড়! খারাপ হয়েছে রান্না?

তাও কোনও উত্তর নেই। মাথাটা আরও নিচু করে নিয়েছে অংশু। সন্দেহ হতে, ওর মাথাটা তুলে ধরেন ইলা, চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে অংশুর।

গভীর উৎকণ্ঠায় ইলা জানতে চান, কী রে, কাঁদছিস কেন! কী হয়েছে তোর? তখনই উত্তর দিতে পারে না অংশু। নীচের ঠোঁট চেপে আছে দাঁতে। ইলা আরও দু-চারবার জিজ্ঞেস করার পর সে কোনওক্রমে বলে, ভাইকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিচ্ছ কেন? কী দোষ করেছে ও?

বুকের কোথাও একটা চিনচিন করে ওঠে ইলার। বড় ছেলেকে সান্ত্বনা দেন, মন খারাপ করছিস কেন, ও তো ছুটিছাটায় আসবে। তুইও যাবি ওদের ওখানে। তোর ভাই যেরকম ফাঁকিবাজ, ওর হোস্টেলে থেকেই মানুষ হওয়া উচিত।

ইলার কথায় কাজ হল না, খেতেই পারছে না অংশু, সমানে হিক্কে তুলে যাচ্ছে। ইলা বলেন, কী হল খা, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। — পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বলেন, হ্যাঁ রে, তুই যে ওর জন্য এত কষ্ট পাচ্ছিস, এমনিতে তো খালি ওর পিছনে লাগিস।

একটু সময় নিয়ে অংশু বলে, আর লাগব না, তুমি বাবাকে বারণ কর ওকে আশ্রমের স্কুলে ভর্তি না করতে, ও না থাকলে ভীষণ মন খারাপ হবে আমার।

অংশুর মাথায় হাত বুলিয়ে ইলা বলেন, কষ্ট কি আমাদের হচ্ছে না। কিন্তু যা করা হচ্ছে ওর ভালর জন্যই...

প্রায় আধপেটা খেয়ে উঠে গেল অংশু। ছেলেটা যে ভেতর ভেতর ভাইকে এত ভালবাসে, বোঝাই যায় না। ভীষণ চাপা স্বভাবের। কর্তাকেও বলিহারি, কখন যে মাথায় কী চাপে, এতটা খেয়ালি টাইপের মানুষ ছিলেন না। দেবপাড়ায় আসার পর থেকেই ক্রমশ বদলে গেছেন। এর জন্য ইলা নিজেকেও দোষ দেন, কেন যে সমস্তিপুরের বাড়ি ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তে তালে তাল মিলিয়েছিলেন, ওখানে থাকলে এমনটা বোধহয় হত না। এখানে এসে কর্তা একা হয়ে গেছেন, সেই একাকিত্ব কাটানোর ক্ষমতা ইলার নেই। এঁটো বাসনগুলো তুলে কলতলায় যান ইলা। এখনও কেন এল না বরুণটা! মনের মধ্যে খিচখিচ করতে থাকে। ওদের স্কুলটা কাছেই, মিনিট দুয়েকের পথ, যাবেন কি একবার?

অংশু স্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার পর ইলাও বেরোলেন। হেঁটে যাচ্ছেন বরুণের স্কুলের উদ্দেশে। মর্নিং সেকশনের কোনও ছেলেকেই রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না। সবাই ফিরে গেছে বাড়ি, কোথায় যে গেল ছেলেটা। বুকে মৃদু হাতুড়ির শব্দ শুরু হওয়ার আগেই ইলা দেখতে পান বরুণকে, কীরকম অলস চলনে চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে হেঁটে আসছে।

দত্তবাড়ির বেড়ার ধারে কাঠমল্লিকা গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। হাঁ করে কী

যেন দেখছে।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে বরুণের হাত ধরেন ইলা। বলেন, কী করছিস এতক্ষণ রাস্তায়! সব ছেলে বাড়ি ফিরে গেছে!

নির্মল হাসে বরুণ। কী যেন একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। কথা গুছোতে পারেনি সে, গুছিয়ে বললে এরকম হয়, আর কদিন পরেই দেবপাড়া ছেড়ে চলে যাব তো, সব কিছু ভাল করে দেখে নিচ্ছি।

বরুণের হাত ধরে বাড়ি ফিরে আসছেন ইলা। বরুণকে বলছেন, ওখানে কিন্তু এসব চলবে না। আশ্রমে সব টাইম মতো, ঠিক সময় ঘুম থেকে ওঠ, পড়তে বস, খেলার জন্যও টাইম বেঁধে দেওয়া থাকে।

মা! হঠাৎ ডেকে ওঠে বরুণ।

ভ্রূ কুঁচকে ইলা বলেন, কী?

মন্দিরাটা না খুব বদমাইশ।

কেন রে?

কাল আমায় বলেছে তোর বাবা-মা তোকে ভালবাসে না বলে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

হাঁটা থেমে যায় ইলার। অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকেন বরুণের দিকে। ভীষণ রাগ হয়ে যায় পাশের বাড়ির মেয়েটার ওপর। বরুণের সঙ্গে মন্দিরার মেশার ব্যাপারে কর্তা সতর্ক করেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, তিনি ভুল কিছু আশঙ্কা করেননি। বরুণ এখানে থাকলে মেয়েটাই ওর মাথাটা খেত।

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা, চড়ে দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে টগবগিয়ে....

দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ আবৃত্তি করছে বরুণ। মেঝেতে মাদুরের ওপর বসে শেখাচ্ছে দীপালি, পাশে অংশু, ভাইয়ের আবৃত্তিতে মুগ্ধ। কোথায় একটা কম্পিটিশন আছে। দীপালি নিয়ে যাবে বরুণকে। এর আগেও নিয়ে গেছে। প্রাইজ পেয়েছে বরুণ। এখনই স্পষ্ট উচ্চারণ, গলাটাও মিষ্টি। হবে না কেন, বাবার ধারা তো একটু পাবেই। বিছানায় বসে মেয়েকে কোলে দোলাতে দোলাতে চোখ বুজে বরুণের আবৃত্তি শুনছেন ইলা। ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে কবিতাটা। বরুণ বলে যাচ্ছে. ...মেঘ উড়িয়ে আসে সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,/ এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে / ধুধু করে...

বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ে। থেমে যায় আবৃত্তি। চোখ খোলেন ইলা। অংশু উঠে যায় দরজা খুলতে। কর্তা এলেন কী! এই দরজা দিয়ে তো আসেন না। একটু পরেই ঘরে এসে দাঁড়ায় অপূর্ব। সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উশকোখুশকো চুল। কাঁধের ঝোলাটা এবার যেন একটু বড়। আবার হয়তো কোনও গ্রামট্রাম থেকে ঘুরে এল।

কী রে, কোথা থেকে এলি এবার? জানতে চান ইলা।

ঝোলাটা দেওয়ালের ধারে নামিয়ে রেখে হাঁফ ছাড়ে অপূর্ব। বলে, কলকাতা থেকে। বন্ধুর বাড়ি। -

অপুর্ব ঘরে ঢুকতেই দীপালি কেমন যেন উশখুশ করছে। ইলার মনে পড়ে অপূর্বর প্রতি দীপালির দুর্বলতার কথা।

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে অপূর্ব বলে ওঠে, এই রে, খেয়ালই করিনি তোর কোলে পুঁচকিটা শুয়ে আছে। দেখি দেখি কেমন হয়েছে দেখতে?

বরুণ মামার পাশে এসে দাঁড়ায়। অপূর্ব ভাগ্নিকে আদর করতে যাবে, বরুণ বলে ওঠে, খালি ঘুমোয় জান মামা!

তুইও এরকম ছিলি। বলে, ভাগ্নেকেও আদর করে অপূর্ব।

দীপালি উঠে দাঁড়িয়েছে। নিচু গলায় ইলাকে বলে, আজ আসি বউদি।

বিছানায় বসে অপূর্ব ঘুরে তাকায় দীপালির দিকে, সহাস্যে বলে, কেমন আছ? গভীর নিরাশার চোখ তুলে দীপালি বলে, ভাল। আপনি?

আই অ্যাম ফাইন। চেষ্টাকৃত প্রগলভতায় বলে অপূর্ব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দীপালি বরুণকে বলে, আরও প্র্যাকটিশ কর। ভাল হচ্ছে। ফার্স্ট হতে হবে কিন্তু।

ঘাড় হেলায় বরুণ। দীপালি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বাইরের গেটের আওয়াজ অবধি ওর যাওয়ার পথে তাকিয়ে রইল অপূর্ব, ভ্রূ কোঁচকানো কপাল নিয়ে দিদির চোখাচোখি হল, বলল, কী ব্যাপার রে, মেয়েটার মুড একদম অফ মনে হচ্ছে। পাত্তাই দিল না আমাকে!

ওর বিয়ের ঠিক হয়েছে। বলেন, ইলা।

তা হলে তো ওর খুশিতে থাকা উচিত।

পাত্র ওর পছন্দ নয়।

কেন? কীরকম পাত্র? আমার থেকেও খারাপ দেখতে, বেকার?

ইলা মজা পান, অপূর্ব আবার আগের মতো ইয়ার্কি ঠাট্টা করছে। বলেন, বাজে বকিস না, তোর মতো পাত্র পেলে মেয়ের বাড়ি বর্তে যাবে। রাজপুত্রের মতো দেখতে তোকে।

বাড়াবাড়ি করিস না দিদি, ম্যাক্সিমাম কোটালপুত্রের মতো দেখতে, তাও দাড়িটাড়ি কেটে, চান করার পর। ওসব ছাড়, দীপালির পাত্রের অসুবিধেটা কোথায়?

দোজবরে। একটা ছেলেও আছে।

একটু যেন নিভে যায় অপূর্ব। বড় করে শ্বাস ফেলে। অংশু বরুণ চলে গেছে সামনের ঘরে। কোনও খেলায় মেতেছে হয়তো। একটু সময় নিয়ে অপূর্ব বলে, জামাইবাবু যে চাকরিটা আমার জন্য দেখেছিল, সেটা আছে এখনও?

কেন রে? জানতে চান ইলা।

আছে কি না বল না।

এ নিয়ে তো অনেকদিন কথা হয়নি, ঠিক বলতে পারব না। জামাইবাবু এলেই না হয় জিজ্ঞেস করিস।

জামাইবাবু কখন আসে?

ইলা দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকান। পৌনে সাত। বলেন, আসার তো সময় হয়ে এল। চাকরিটা থাকলে কি তুই করবি?

হ্যাঁ। আর বরুণদের মাস্টারনিকে বলে দে দোজবরেকে ক্যানসেল করতে। ওকে আমি বিয়ে করব।

ইলা বুঝতে পারেন, ভাই এখনও ঠাট্টার মুডে আছে। ভর্ৎসনার সুরে বলেন, কারও দুর্ভাগ্য নিয়ে ইয়ার্কি করা উচিত নয় অপু।

না, বিশ্বাস কর আমি সিরিয়াস, জামাইবাবু যদি চাকরিটা দেয়, আমি ইমিডিয়েট বিয়ে করব ওকে।

এরকম হঠাৎ করে একটা মেয়েকে বিয়ে করব বললেই হয় নাকি। সেভাবে তুই চিনিস না জানিস না।

অপু অবাক ভঙ্গিতে বলে, বিয়ে তো এভাবেই হয়। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ যেমন। ছেলে মেয়ে কেউ কাউকে চেনে না। তাদের বাড়ির লোককেও না। সানাই, কাঁসি বাজিয়ে, লোক জানিয়ে, এক ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

কাঁসি আবার কখন বাজতে দেখলি তুই? হাসতে হাসতে বলেন ইলা।

ওই হল। বলে, অপূর্ব বিয়ের পক্ষে যুক্তি সাজায়, তবু তো মেয়েটাকে আমি চিনি। এ-বাড়িতে এতদিন ধরে আসছে। ওর যদি একটা উপকার হয়।

করুণা করছিস? কপালে ভাঁজ ফেলে বলেন ইলা।

হ্যাঁ, করছি। 'করুণা' কি খারাপ জিনিস? তবে এসবই সম্ভব যদি জামাইবাবু আমাকে করুণা করে চাকরিটা দেয়। এ-বাড়িতে থেকেই অফিস করব। তোদেরও একটা খরচা বেঁচে যাবে।

ধরতে না পেরে ইলা জানতে চান, কীসের খরচা?

ছেলেদের পড়ানোর, মেয়েটাও বড় হবে। মাস্টারনি থাকছে বাড়িতেই।

হয়েছে, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল', আগে তো চাকরিটা পা। —বলে ইলা তাড়া দেন ভাইকে, যা যা বাইরে হাতমুখ ধুয়ে নে। তোকে কিছু খেতে দিই। তোর জামাইবাবুর আজ এত দেরি হচ্ছে কেন কে জানে।

বিছানা থেকে উঠে আসে অপূর্ব। বাথরুম যাবে। তার আগে বলে, জামাইবাবু কি এখনও নাটক নিয়ে মেতে আছে? লিখছে নতুন কিছু?

হতাশা এবং সংশয় নিয়ে ইলা বলেন, তোর জামাইবাবু ইদানীং খুব সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ে পড়েছে। বাঁকুড়ার সোনামুখিতে একটা আশ্রম... বলে, থেমে যান ইলা। অপূর্বকে বলেন, বাথরুম থেকে ঘুরে আয় তাড়াতাড়ি, তোকে সব বলব, ব্যাপারটা আলোচনা করার আছে।

আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন জামাইবাবু। অপূর্বর ততক্ষণে চা-মুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে। জামাইবাবু আগের মতোই সস্নেহে কুশল নিলেন। কিন্তু কোথায় যেন উদাসীনতার প্রলেপও লক্ষ করল অপূর্ব। দিদি ইতিমধ্যে এ-বাড়ির সব খবরই জানিয়েছে। তার সঙ্গে বলেছে ছোড়দির খবর। অপূর্বর অজান্তে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। নিকটজনদের জন্য অপূর্ব আজ পর্যন্ত তেমন কিছুই করেনি, কোনও উপকারে লাগেনি। বরং অনুগ্রহ নিয়ে গেছে। আজও নিতে হল। জামাইবাবু বলেছেন চাকরিটা হয়ে যাবে। দীপালিকে বিয়ের কথাটা অবশ্য জামাইবাবুকে বলেনি, তাড়াহুড়ো শোনাবে। বড়দিকে নিয়েই এখন বেশি ভাবছে অপূর্ব। সংসারপ্রিয় বড়দি জামাইবাবুর নতুন রূপ দেখে বেশ ঘাবড়ে আছে। ভাবতে ভাবতে রেডিয়োর খবরটাও শুনছিল অপূর্ব। তালতলার কাছে আজ বোমা পড়েছে ফের। লুট হয়েছে একটা দোকান। চারজন উগ্রপন্থীর কাজ। তিনজন আহত, একজন নিহত। আহতদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহতর পরিচয় এখনও জানা যায়নি....

খরবটা শুনেই সাধারণ মানুষ 'নকশালদের' কাজ বলেই ধরে নেবে। খবরটা পরিবেশন করা হল সেইভাবে। কোনও প্রমাণ ছাড়াই। অপূর্ব কিন্তু ঘটনার সামান্য বিবরণ শুনেই বুঝতে পারে, কোনটা নকশালদের অ্যাকশন, কোনটা নকশাল পার্টিতে ঢুকে আসা লুম্পেনদের।

দিদি চা নিয়ে যাচ্ছিল সামনের ঘরে। জামাইবাবু ওখানে বসে কীসব হিসেব-টিসেব করছে, সম্ভবত আশ্রমের কাজ। দিদির পথ আটকায় অপূর্ব। বলে, চা-টা দে। আমি দিয়ে আসি। জামাইবাবুর সঙ্গে কিছু কথাও আছে আমার।

টেবিলে কাপ-ডিশ নামাতে, চোখ তুললেন জামাইবাবু। সভা-সমিতির হাসি হাসলেন। সোফায় গিয়ে বসে অপূর্ব। চা খেতে খেতে কাজ করে যাচ্ছেন অবিনাশদা। অপূর্বর উপস্থিতি খেয়ালই করছেন না।

গলা ঝাঁকি দিয়ে শুরু করে অপূর্ব, শুনলাম বরুণকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। মুখ তোলে জামাইবাবু। কাপে চুমুক মেরে বলে, হ্যাঁ।

আপনার কি মনে হয়, ওকে এই পরিবেশ থেকে সরিয়ে দিলে ভালভাবে মানুষ হবে?

সেরকমটা ভেবেই তো সিদ্ধান্ত নেওয়া। বেশ কাটা কাটা করে বলেন জামাইবাবু। অপূর্ব চাইছিল অবিনাশদা এই লাইনেই কথা বলুন। পরের প্রশ্নে যায়, এই যে আলাদা করে কাউকে বিশেষ নজর দেওয়া, বিশিষ্টতা আকাঙক্ষা করা, এটা কি প্রেশারে রাখবে না বাচ্চাটাকে?

কপাল কুঁচকে যায় জামাইবাবুর। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন অপূর্বর দিকে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছেন প্রসঙ্গ উত্থাপনের মূল উদ্দেশ্য।

নিজের বক্তব্যকে আর একটু পরিষ্কার করতে অপূর্ব বলে, বরুণের আর পাঁচটা বন্ধুবান্ধব এখানে যেভাবে পরিবারের ভেতরে থেকে বড় হচ্ছে, তেমন হলে অসুবিধে কী ছিল?

বরুণ আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। বলেন অবিনাশ।

কী লক্ষণ দেখে বুঝলেন?

এটা ঠিক মুখে বলে বোঝানো যায় না। বাবা হও, তখন বুঝবে।

একটু বিরতি নেয় অপূর্ব। ভেবে নেয় পরের যুক্তি। বলে, সমষ্টির মধ্যে থেকে কি বরুণ ওর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলত?

হ্যাঁ। এই বিপুল জনসংখ্যা, এত কলুষতা, বরুণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেত। সেই জন্যই আমি ওকে একটু নিভৃত শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ করতে চাই। সম্ভাবনাপূর্ণ চারাগাছকে মালি যেভাবে পৃথক করে রোপণ করে, যত্ন করে।

বরুণ বড় হয়ে কী হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

তেমন কিছুই না, ভাল মানুষ হবে, দেশের, দশের কাজে লাগবে, এইটুকুই। একজন পিতা হয়ে এই সামান্য প্রত্যাশা আমি করতেই পারি, কী বল?

শালাবাবু একদম চুপ করে গেল। অবিনাশ মুখে যে-প্রত্যাশার কথা বললেন, তার থেকে অনেক বেশি আশা করেন, খামোকা সেটা বলতে যাবেন কেন অপূর্বকে। প্রত্যাশা কখনও প্রকাশ করে ফেলতে নেই, তীব্রতা কমে যায়। আর অপূর্ব এখন যেসব কথা বলছে, সবই ইলার অব্যক্ত ভাষণ। এটুকু বোঝার বুদ্ধি অবিনাশের আছে।

অপূর্ব হাল ছাড়েনি। ফের বলে, সমষ্টিকে যদি শক্তিশালী করা যায়, তাতেও তো উপকার হয় সমাজের।

শক্তিশালী করবে কে? সেই একটি মানুষ। তার বিকাশ খুব জরুরি। যুগান্তকারী কোনও আবিষ্কারের পিছনে থাকে একটি মানুষ, বিপ্লবের জন্য ডাক দেয় প্রথম একজন। এই জনটাকে আমি গুরুত্ব দিই, সমষ্টিকে নয়, ওর মধ্যে অনেক ভেজাল মিশে আছে।

একটু থেমে অবিনাশ ফের বলেন, তার মানে এই নয় যে আমি বরুণের থেকে বিশাল কিছু আশা করছি। আমি বুঝি ছেলেটা অত্যন্ত সংবেদনশীল, ওকে ঠিকঠাক, নিষ্কলুষ পরিবেশে মানুষ করলে, গুটিকয় মানুষের মঙ্গলের কারণ হবে।

জামাইবাবুর যুক্তিতে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়েছে অপূর্ব। জানে, যুক্তির ভিতটা আবেগের ওপর স্থাপিত। তবু কী মজবুত, দুর্ভেদ্য। অন্য পন্থা নেয় অপূর্ব। বলে, মছলন্দপুর ছেড়ে এলাম একটাই কারণে, এখানে ভাগ্না-ভাগ্নিদের নিয়ে থাকব, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে চাকরি করতে যাব, বরুণটাই যদি না থাকে...

তুমি এখানে থেকে চাকরি করতে পারবে না। ওদের প্রথম শর্ত, কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকতে হবে। অগত্যা... বলে থেমে গেলন অবিনাশদা। অপূর্ব ভাবে, যে লোকটা এই চাকরিটা এতদিন ধরে কুক্ষিগত করে রাখতে পারে, শর্ত বদলানোর ক্ষমতা তার নিশ্চয়ই আছে। ক্ষমতা ব্যবহার করবেন না অবিনাশদা, দূরে সরিয়ে রাখতে চান অপূর্বকে। মানুষটাকে বড় অচেনা লাগে আজ।

॥ বত্রিশ ॥

ভোর। আকাশে লাঙল চষা জমির মতো মেঘ। মিষ্টি একটা হাওয়া বইছে। সূর্য উঠতে এখনও ঢের দেরি। কোলে মেয়েকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মৃগাঙ্ক, পাশে যমুনা।। ওঁরা যাচ্ছেন বুড়িগণ্ডকে চান করতে। আজ রাত্তিরের ট্রেনে রওনা দেবেন কলকাতায়। যমুনার খুব ইচ্ছে দূরযাত্রার আগে গণ্ডকে স্নান করে ছটমাইয়াকে একবার স্মরণ করবে। ছটমাইয়াকে খুব মানে যমুনা। প্রত্যেক বছরে ব্রত রাখে।

যমুনার জন্যই আজ ভোর থাকতে উঠতে হল মৃগাঙ্ককে। সুর্যোদয় হয়ে গেলে ছটমাইয়ার উপাসনা শুদ্ধ হয় না।

কাল সন্ধেবেলা কানাইয়ার ডেরায় গিয়ে আলজিভ অবধি মদ খেয়েছেন মৃগাঙ্ক, এতদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, ফের কবে খাওয়া হবে কে জানে! দেবপাড়ার বাড়িতে ইলাবউদির সামনে মদ খেয়ে ঢোকা যাবে না। প্রেস্টিজ যাবে অবিনাশদার।

এত নেশা করলে কি ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে চায়! জোর করে ঠেলে তুলে দিল যমুনা। চোখ কড়কড় করছে এখন। ঠান্ডা হাওয়াটা মুখে লাগতে এক প্রকার আরামও হচ্ছে। যেন জ্বরতপ্ত কপালে মায়ের হাত।

টমিদের গুলি খেয়ে মৃগাঙ্ক যখন পড়েছিলেন হাসপাতালে, মা রোজ ফল, দুধ, পেঁড়া নিয়ে আসত বিকেলবেলা। কপালে হাত বোলাতে বোলাতে আক্ষেপ করত, তোর মতো বোকা মানুষের কি স্বদেশি করা মানায়, ওইসব হচ্ছে অবিনাশদের জন্য। কত উঁচু বংশের ছেলে ওরা। অবিনাশের একদিন কত নাম হবে। দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে তখন। তোকে ওরা পুছবেও না।

মা এখন বেঁচে থাকলে দেখত, বড় বংশের ছেলে হয়েও, মদোমাতাল মৃগাঙ্ককে অবিনাশদা আজও ভোলেনি।

ওল্ড পোস্টাফিসের রাস্তা থেকে বাঁদিকে ঘুরে যান মৃগাঙ্করা। কাঁচা পথটা নেমে গেছে নাবাল জমিতে।

ফাঁকা মাঠে হাওয়াটা আরও খোলতাই হয়েছে। মৃগাঙ্কর কাঁধে মাথা রেখে বৃষ্টি এখন অঘোর ঘুমে। বাবার খুঁড়িয়ে হাঁটাটায় বোধহয় দোলনার আরাম পায়। মৃগাঙ্ককে দেখলেই ঝাঁপিয়ে আসতে চায় কোলে।

এবড়োখেবড়ো জমি। খোয়ারির কারণে এক-দুবার পা পড়ল এলোমেলো। যমুনা বলে, আমার কোলে দাও। তোমার অসুবিধে হচ্ছে।

না, না, ঠিক আছে। চল না। বলে, চরাচরের দিকে তাকান মৃগাঙ্ক। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। ডান ধারে নদীর ওপর রেল ব্রিজ ফার্স্ট দ্বারভাঙা লোকালের অপেক্ষা করছে। ১৯৬২ সালে দ্বারভাঙা রাজ্যের প্রায় আঠারো মন সোনা এই লাইন দিয়ে সরকারের ঘরে বন্ড হিসেবে জমা পড়েছিল। কথাটা মনে পড়লেই নদীর ওপারটা বড় অনুজ্জ্বল, বর্ণহীন লাগে। আজ লাগছে না। সূর্য না উঠলেও, ছিটকে আসা প্রথম কিরণ আটকে গেছে মেঘের খাঁজে। আকাশ জুড়ে স্বর্ণচ্ছটা। যমুনাকে দেখাতে যাবেন, সে বেচারি ঝিমোচ্ছে। এখনও ঘুম লেগে আছে চোখে। ওর দোষ নেই, কাল অনেক রাত অবধি জেগে দেবপাড়ার বাড়ির জন্য ঠেকুয়া, গজা, নাড়ু বানিয়েছে। দুধের ফাঁকা ডিবেতে ভরা হয়েছে সব। কিছুটা আলাদা রাখা হয়েছে, ট্রেনে যেতে যেতে খাওয়া হবে। মৃগাঙ্কদের সঙ্গে যাচ্ছে শ্যামল। সারা রাস্তা জুড়ে কানের মাথা খাবে, সাক্ষী দেওয়ার আগে কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করবেন না। কেউ যদি কিছু খাওয়াতে চায়, এমনকী চা, তাও খাবেন না। উকিলের জেরার উত্তরে এই এই বলতে হবে...ধাঁধা লেগে যাচ্ছে মৃগাঙ্কর। সব শেষে শ্যামলের একটাই কথা, কেসটাতে যদি জিততে পারি, জানব 'ন্যায়' বলে পৃথিবীতে এখনও কিছু আছে। দেখবেন, এই কেসের ফলাফলে দেশব্যাপী কেমন হইচই পড়ে যায়। সব কিছু নির্ভর করছে আপনার ঠিকমতো

সাক্ষী দেওয়ার ওপর।

এই গুরুভারে ভীত, বিব্রত হন মৃগাঙ্ক। মনে হয় কেন যে মরতে মেয়েটাকে রাস্তা থেকে তুলেছিলাম। মেয়েটা যখন পড়েছিল রাস্তার ধারে, আমার আগে অনেকেই হয়তো হেঁটে গেছে, ছুঁয়েও দেখিনি। তারা সব চালাক ভারতবাসী। মা ঠিকই বলত, আমি হচ্ছি বোকা। বড়সড় ধরনের কাজ আমায় মানায় না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধমকান মৃগাঙ্ক, ছিঃ, এতদিন হয়ে গেল এখনও মেয়েটাকে নিজের ভাবতে পারলে না! মেয়েটা কিন্তু তোমাকেই 'বাবা' বলে ডেকে কথা বলা শুরু করেছে।

বাঁধের ওপর উঠে এসেছেন মৃগাঙ্করা। নদীর জল স্থির। দূরে ভাসছে মাছ ধরার দুটো নৌকো। আরও দুরের ঘাটে বিন্দু বিন্দু মানুষ। বুক ভরে শ্বাস নেন মৃগাঙ্ক, স্মৃতির গন্ধ এসে লাগে নাকে। চারপাশটা সেই আগের মতো। অবিকল। ভোরবেলা কি একটুক্ষণের জন্য স্মৃতিরা জাগ্রত হয়! নিজের বয়স হয়ে যাওয়া চেহারাটাকেই আজ এখানে বেমানান লাগছে।

দাও, মেয়েটার মাথায় একটু জল ছিটিয়ে আনি। তুমি কাপড় জামা চটি নিয়ে এখানেই বোসো। বলে, মেয়েকে কোল থেকে নিয়ে নিল যমুনা। নদীর দিকে যেতে যেতে বলল, আমি ফিরে এলে তুমি চানটা করে নিয়ো

বাঁধের ঢালুতে বসে পড়লেন মৃগাঙ্ক, জলের কাছে চলে গেছে যমুনা। ভয়ের কিছু নেই, নদী এখন শান্ত। জলের গভীরতা নেই। অনেক দূর অবধি হেঁটে চলে যাওয়া যায়। বৃষ্টির মাথায় জল দিতেই 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলে। যমুনা কিন্তু হাসছে, জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মজা করছে ওর সঙ্গে। দূরে বসে মৃগাঙ্কও হাসেন।

হঠাৎই চোখে ভেসে ওঠে সেই লাগামহীন সাদা ঘোড়া, মৃগাঙ্কর স্বপ্নে যে রাস্তার এমাথা ও-মাথা ছুটে বেড়ায়। জাগ্রত স্বপ্নেও ইদানীং ঘোড়াটা আসছে। কানাইয়ার ঝোপড়ায় বেসামাল হয়ে গেলে পৌঁছে দিচ্ছে বাড়ি। ঘোড়াটা এখন জলের কাছে, মা মেয়ের খেলার সামনে। যমুনা ঘোড়াটাকে দেখে অবাক হয়নি। বৃষ্টিকে চাপিয়ে দিল ওর পিঠে। ভয় পেয়ে গেছে বৃষ্টি, মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে কাঁদছে। যমুনা ফের কোলে নেয় মেয়েকে।

এত সুন্দর দৃশ্যের ছন্দপতন হয় ধপাধপ শব্দে। কান পাতেন মৃগাঙ্ক, মনে হয় যেন একদল মানুষের পায়ের শব্দ। মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ান, ঠিকই ধরেছেন, একপাল লোক ছুটে আসছে। তাদের হাতে লাঠিসোটা, উন্মুক্ত ভোজালি। প্রথমটায় মনে হয়েছিল দাঙ্গার স্মৃতি উঠে এল বুঝি। ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। দলটা এগিয়ে আসছে মৃগাঙ্ককে লক্ষ্য করে, মুখে কোনও রে রে শব্দ নেই। পুরো দলটাই যেন বোবা!

দৌড় লাগিয়েছেন মৃগাঙ্ক। প্রাণপণে দৌড়। মনে পড়ছে বলাইদার সতর্কবাণী, মৃগাঙ্ক, তুই হচ্ছিস এই কেসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। তোকে সরিয়ে দিতে পারলে... মনে পড়ছে শ্যামলের অস্থিরতা, অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করবেন না...

করতে তো যাননি, প্রথম আলাপে তারা এত ব্যগ্র, ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে আসবে কী করে জানবেন মৃগাঙ্ক! অনেকদিন পর খোঁড়া পাটার জন্য আপসোস হচ্ছে মৃগাঙ্কর, পিছনের দলটার পায়ের শব্দে মাটি যেন দুলে উঠছে। আর একটু দৌড়তে পারলে নেমে যাবেন বাঁধ থেকে। সামনেই খ্রিস্টানদের কবরস্থান। জীবনে কতবার যে আত্মগোপন করেছেন ওখানে। একবার ঢুকে গেলে কেউ খুঁজে পাবে না।

মেয়েকে নিয়ে নদী থেকে উঠে আসছিলেন যমুনা, বাঁধের দৃশ্য দেখে চমকে ওঠেন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রাণান্তকর দৌড়ে যাচ্ছে কর্তা। পিছনে ধেয়ে যাচ্ছে একপাল লোক, তাদের হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠছে অস্ত্র। -মেয়েকে বুকে আঁকড়ে চিৎকার করে ওঠেন যমুনা। কোনও আওয়াজ বের হয় না। কর্তা নেমে গেল বাঁধের ওপারে। একটু পরেই কান ফুঁড়ে দিয়ে গেল আর্তনাদ। খুব কম অভাগীর এমন কপাল হয়, কর্তার শেষ কণ্ঠস্বব চিনতে ভুল হয় না।

যমুনা যেমনটি দেখলেন, শুনলেন মৃগাঙ্কর বেলায় তেমনটি হল না। আততায়ীরা ছুঁয়ে ফেলার আগেই মৃগাঙ্ক দেখলেন সাদা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে পাশে পাশে। উঠে পড়লেন ওর

পিঠে। হাওয়ার চাদর চিরে ছুটে চলল ঘোড়া। কার সাধ্য মৃগাঙ্ককে ধরে। ঘোড়া দৌড়চ্ছে অতীত লক্ষ্য করে, মৃগাঙ্ক দেখছেন তাঁর চারপাশে সেই পুরনো সমস্তিপুর, খেলার মাঠ, কিং এডওয়ার্ড হাইস্কুল, আমবাগান, মকাইয়ের ক্ষেত... ফাঁকা মাঠে এসে থামল ঘোড়া। ক্লান্ত মৃগাঙ্ক ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাঠে শুয়ে পড়লেন, এক বুক শ্বাসের সঙ্গে মুখ থেকে ছোট্ট দুটি শব্দ বেরোল। মা গো।

শব্দ দুটি ঘাসের শিকড় বেয়ে সেঁধিয়ে গেল ধরিত্রীর বুকে।

॥ তেত্রিশ ॥

রবিবার। বিকেল ফুরিয়ে এল। নতুন নাটক লেখায় হাত দিয়েছেন অবিনাশ। ইচ্ছে ছিল না। ছাড়ল না অফিস কলিগরা। বলল, দুর মশাই, কী রাতদিন হাসপাতাল, আশ্রম, চাঁদা করে বেড়াচ্ছেন। নাটক লেখাটাও তো একটা ভাল কাজ, নাকি?

কাজটা মহৎ তাতে কোনও সন্দেহ নেই অবিনাশের, কিন্তু ভীষণ কাদা ঘাঁটতে হয়। মানুষের মনের ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, লোভ খনন করে বার করতে হয় 'ন্যায়'কে। কেন, কী জানি, ইদানীং এগুলোকে পণ্ডশ্রম মনে হয়। সরল সত্যের সন্ধান পেয়েছেন অবিনাশ, স্বামীজি বলেছেন নিরন্তর সেবা করে যাও মানুষের। দেখবে ক্লান্ত হচ্ছ না। প্রশান্তিতে ভরে উঠবে মন।

স্বামীজির কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। আজকাল আশ্রমের জন্য এত খাটাখাটি করছেন, গায়েই লাগছে না। কলকাতা এবং শহরতলির শিষ্যদের জড়ো করে একটা শাখা সংগঠন করেছেন অবিনাশ। কলেজ স্ট্রিটে ছোট অফিস মতো করা হয়েছে। প্রত্যেক শনিবার সকলে মিলে সেখানে জমা হন। আশ্রম, হাসপাতাল নিয়ে আলোচনা, পরিকল্পনা হয়। স্বামীজির হয়রানি একটু কমেছে, আশি বছরের শরীর নিয়ে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয় না।

এত কাজের মধ্যেও অবিনাশ লক্ষ করলেন নাটকে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়গড় করে লেখা এগিয়ে যাচ্ছে। এর মূলেও সেই প্রশান্তি। আগে যে কাজগুলোকে দায় মনে হত, এখন সেগুলোকে কর্তব্য মনে হয়। কোনও কাজ করে বাহবা পাওয়ার আশা জাগে না। একবারও মনে হয় না আমাকে মানুষ বিশেষভাবে লক্ষ করুক। এমনকী নিজের কর্মক্ষমতার দিকে ফিরে দেখেন না অবিনাশ, অবতার পুরুষ মাঝেমধ্যে তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন কি না, সেটা খেয়াল করারও ইচ্ছে নেই। যে আধারে তাঁর প্রকাশের সম্ভাবনা প্রবল। সেই বরুণকে তিনি রেখে এসেছেন উপযুক্ত পরিবেশে। আশ্রমের হোস্টেলে ভালই আছে সে।

প্রথম প্রথম বাড়িটা একটু ফাঁকা লাগত। মুখ ভার করে থাকত ইলা। ধীরে ধীরে গুমসানি ভাবটা কেটেছে। আবার হাসছে-টাসছে আগের মতো। বাচ্চা মেয়েটাই বোধহয় ভরাট করে দিচ্ছে বরুণের শূন্যস্থান। বিষয়টা ভেবে খারাপ লাগে, আবার এ কথাও মনে হয়, হয়তো একেই বলে সন্ন্যাস, অঘোষিতভাবে যা শুরু হয়ে গেছে বরুণের জীবনে।

পাশের বাড়ির মেয়েটা ইলার কাছে উত্তর না পেয়ে অথবা ইলাই পাঠায় বলে অবিনাশের কাছে আসে, প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, বরুণ আশ্রমে কেমন আছে জ্যাঠাবাবু? গরমের ছুটিতে বরুণ আসবে তো বাড়িতে?

নিশ্চয়ই আসবে। বলেন অবিনাশ। মনে মনে বলেন, তখন তোর বন্ধুকে তুই চিনতে পারবি না।

মেয়েটার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে বরুণ। সেটাই স্বাভাবিক। এই বয়সেই বরুণের চেহারায় একটা ঐশীভাব লক্ষিত হয়। যে-কেউ আকৃষ্ট হবে।

ভোরবেলা মন্দিরা বরুণ ফুল তুলতে যেত। এখন সেইসব ফুল বরুণের অপেক্ষায় নিঃশব্দে ঝরে যায়।

বরুণের কিন্তু এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আশ্রমে পৌঁছে এক ঘণ্টার ভেতরেই বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল। অবিনাশ যখন ফিরে আসছেন, তখন এসে বলেছিল, মাকে কাঁদতে বারণ করবে। আমার এই জায়গাটা ভালই লেগেছে। মায়ের যদি খুব মন খারাপ হয়, বোনকে সঙ্গে নিয়ে যেন চলে আসে। এখানকার বন্ধুরা বলছিল, তাদের মায়েরা মাঝেমধ্যে এসে থাকে।

কথাটা বড়মুখ করে ইলাকে বলেছিলেন অবিনাশ। ইলা সাফ জানিয়ে দেয়, সে আশ্রমে কোনওদিনই যাবে না।

আশ্রম ব্যাপারটাকে এখনও ভালভাবে নিতে পারছে না ইলা। তবে অবিনাশের স্থির বিশ্বাস, স্বামীজিকে যদি কোনওভাবে এ-বাড়িতে আনা যায়, তাঁর ক্ষমাসুন্দর চেহারা দেখে ইলাও মোহিত হবে।

ইতিমধ্যে অবিনাশ যে স্বামীজির থেকে দীক্ষা পেয়েছেন, ইলা জানে না। রোজ নিয়ম করে সকালবেলা ঠাকুরঘরে গিয়ে বসছেন অবিনাশ। ইলা ভাবছে বুঝি গায়ত্রী নাম জপ করছেন। একদিন কটাক্ষ করে বলেছে, কী হল, খুব তো নিজের বাবার পুজো-আচ্চাকে ভড়ং বলতে, এখন যে....

অবিনাশও একটা ব্যাপারে খুব অবাক হয়েছেন, বরুণকে যখন রেখে আসতে গেলেন, স্বামীজি ডেকে বললেন, মন্ত্রটা নিয়ে নাও

এত তাড়াতাড়ি কেন! আমি তো শুনেছি সহজে আপনি কাউকে মন্ত্র দেন না। বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন অবিনাশ।

স্বামীজি বলেছেন, আধার বুঝেই দিই, তোমার মন চঞ্চল। এদিক-ওদিক ঘুরে মরে, বনে-বাদাড়ে হারিয়ে যায়। মন্ত্র হচ্ছে খুঁটি। যেখানেই যাও না কেন, খুঁটিতে টান পড়বে। আবার অন্য রকমভাবেও ভাবতে পার। মন্ত্র হল গিয়ে পদ্মপাতার ওপর এক ফোঁটা জল, গড়িয়ে গেলেই পাতাটা শ্রীহীন হয়ে পড়বে। যে মানুষ সুন্দরের উপাসনা করে, জলবিন্দুকে গড়িয়ে পড়তে দেবে না। মন সদা নিবদ্ধ থাকবে ওই পাতায়।

এই দার্শনিক তত্ত্ব সামনে এলেই দাদার অভাব বোধ করেন অবিনাশ। অসংলগ্নভাবে হলেও দাদা এর বিপক্ষে কোনও কোনও যুক্তি খাড়া করত। নিজেকে ঝালিয়ে নিতে সুবিধে হয় তাতে।

দাদার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমস্তিপুরের বাড়ি নিয়ে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, অনেকটাই সামলে নিয়েছে রজত। অবিনাশকে ঘিরে থাকা সমস্ত পারিবারিক সমস্যা আপাতত শান্ত। অপূর্বকে নিয়ে দুশ্চিন্তা মিটেছে, দিব্যি বেহালার কোয়ার্টারে থেকে অফিস করছে। ছুটিছাটায় এ-বাড়িতে আসে, সারা বেলা হইচই করে কাটিয়ে যায়। প্রবাল সামন্ত ওর খোঁজে দেবপাড়ায় আসেননি।

চারপাশের অবস্থা অনুকুল বলেই অবিনাশ দ্রুত নাটকটার মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছেন। মনে শুধু একটা খচখচানি রয়ে গেছে, মৃগাঙ্ক আসবে বলেও এল না তো! কোনও চিঠিপত্রও দেয়নি। একদিক থেকে এক্ষুনি না এসে ভালই হয়েছে, নাটকটা নিয়ে বসতে দেরি হয়ে যেত।

লিখতে লিখতে মনটা হারিয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ। ফের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েন অবিনাশ। লেখা শুরু করতে গিয়ে দেখেন, পেনটা ডিসটার্ব করছে, কালি আসছে না ঠিকমতো। হাঁক দেন, বরুণ, বরুণ তোদের কোনও একটা পেন দিয়ে যা তো।

একটু পরে পেন হাতে টেবিলের সামনে দাঁড়ায় অংশু। মুখ গম্ভীর। অবিনাশ অস্বস্তিতে পড়ে যান, ভুল করে ডেকে ফেলেছেন বরুণকে।

ঘরে বসে শুনতে পান গেটের কাছে কোনও রিকশা এসে থামল। এখন কে এল আবার! লেখায় ব্যাঘাত হবে। একটু পরে গেট খোলার আওয়াজ। অবিনাশ অংশুকে বলেন, দেখ তো কে এল?

ভেতরঘর থেকে বেরিয়ে আসে ইলা। বলে, আমি দেখছি।

দরজা খুলে বারান্দায় যায় ইলা। তারপর থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ারে বসে আছেন অবিনাশ।

সাড়া কী করে থাকবে! গেট খুলে যে ঢুকল, তাকে দেখে বিস্ময়ের চূড়ান্ত সীমায় চলে গেছেন ইলা। যমুনা! পাশে হাত ধরে ছোট্ট মেয়েটা। মৃগাঙ্ক ঠাকুরপো কই? যমুনার পরনে সাদা থান কেন? ব্যাপারটা বুঝেও যেন বুঝতে পারছেন না ইলা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবিনাশ এলেন বারান্দায়। যমুনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শক্ লাগল। ওর সাদা শাড়ি যেন বিদ্যুৎঝলক, শব্দহীন বজ্রপাত। কোটরাগত শুকনো

পুকুরের মতো চোখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল যমুনা। বলল, খবর বোধহয় এখনও পাননি। চলে এলাম। জানি, এখানে এলেই উনি পরলোকে বসে সব থেকে বেশি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

অবিনাশ মুহূর্তের জন্যও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না বাইরে। ছুটে গিয়ে উপুড় হলেন বিছানায়। শিশুর মতো কাঁদতে থাকলেন।

শোক থিতোতে রাত হয়ে গেল। যমুনার মুখে সব কথা শুনলেন অবিনাশ। বললেন, ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ এখানে চলে এসে। তুমি এখানেই থাকবে।

যমুনার শুকিয়ে যাওয়া চোখে ফের জল এল। কুলকুল করে।

যমুনা আর মেয়েটাকে নিয়ে একটু বেশিই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অবিনাশ। ওদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, মনে না হয় তারা আশ্রিত। যদিও বারেবারেই তাঁর মনে হচ্ছিল, এসবই বিভ্রম। হঠাৎ মৃগাঙ্ক এসে চমকে দিয়ে বলবে, কেমন খেল দেখালাম। কিন্তু যমুনার সাদা থান, একটা অক্ষরও লেখা নেই অথচ ধারণ করে আছে খোঁড়া, সরলপ্রাণ এক ভারতবাসীর ইতিহাস।

কর্তার বাড়াবাড়ি ইলার চোখ এড়ায়নি। নির্বাক থেকে শুধু লক্ষ রেখে যাচ্ছেন। ফোঁসানি জমা হচ্ছে মনে। তিনি শীলার মতো বেআক্কেলে নন। অবিনাশকে নাগালের বাইরে যেতে দেবেন না কিছুতেই। মাতৃভূমির সন্তাপ ভোলাতে ভগবান অবিনাশকে দিয়েছিলেন, কেড়ে নিলেই হল!

শোক যমুনার শরীরে ভাঁটা আনতে পারেনি। বরং বৈধব্য ওর যৌবনকে আরও ধারালো করেছে। আশ্রিতের কোনও বিনয় দেখা যাচ্ছে না ওর আচরণে। যেন এমনটাই কথা ছিল। ইলার এমনও আশঙ্কা হয়, পূর্বে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে কর্তা যমুনার কাছে যৌনঋণী হয়ে পড়েননি তো, সেটার শোধ দিতেই অবিনাশ এত উদগ্রীব!

॥ চৌত্রিশ ॥

কথা রাখতে পারলেন না অবিনাশ। এক সপ্তাহের মধ্যেই যমুনা আর মেয়েটাকে নিয়ে উঠলেন ট্রেনে। সমস্তিপুরের ট্রেন নয়, যাবেন সোনামুখিতে।

যমুনার দেবপাড়ায় থেকে যাওয়াটা মেনে নেয়নি ইলা। দিন চারেক পরেই এক রাতে বিছানায় শুয়ে ইলা বলে, যমুনার কিন্তু এখানে থাকা চলবে না।

কেন, ও কি কোনও খারাপ ব্যবহার করেছে? জানতে চেয়েছিলেন অবিনাশ। উত্তর না দিয়ে পরের সিদ্ধান্ত জানায় ইলা, যমুনা যদি এ-বাড়িতে থাকে, আমি চলে যাব মছলন্দপুরে।

কেন, বলবে তো? অধৈর্য হয়েছিলেন অবিনাশ।

ইলা বলে, এ-বাড়িতে তো শীলাকে থাকতে দাওনি, অপূর্বকেও না। নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছ আশ্রমে। যমুনারা ওদের থেকেও আপন হয়ে গেল তোমার!

অবিনাশ বুঝেছিলেন, ইলা শোধ নিচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক। মৃগাঙ্ক তো ইলার কেউ নয়। সংসারটা ইলার। কর্তা হিসাবে জোরজার করে রাখতে পারতেন যমুনাকে। অসুবিধে হত যমুনারই, ইলা ওর সঙ্গে হয়তো কথাই বলত না।

সেদিন রাতেই বিছানায় স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে অবিনাশ ঠিক করেন যমুনাকে মেয়েসুদ্ধু আশ্রমে রেখে আসবেন। মাসে মাসে যা খরচা লাগে দেবেন আশ্রমের ফান্ডে। এখন একটাই চিন্তা, স্বামীজি যদি রাজি না হন এদের রাখতে, কোথায় যাবেন তা হলে?

যমুনা পরম নিশ্চিন্তে চলন্ত ট্রেনের জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে। পিছিয়ে যাচ্ছে ঘাট, মাঠ, বন, জঙ্গল। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এমন যেন কথা ছিল, মৃগাঙ্কর অবর্তমানে ওদের ভার নেবেন অবিনাশ। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়, যমুনার যাবতীয় দায়দায়িত্ব ওর আত্মীয়দের, ওদেরই ভার নেওয়া উচিত। কথাটা বলা যেতে পারত, মৃগাঙ্কর মুখটা মনে পড়তে, বলতে পারেননি অবিনাশ। যমুনা যে সমস্তিপুরে ফিরতে চাইবে না এটা মেনে নেওয়া যায়। মৃগাঙ্কর স্মৃতি এবং আততায়ী দুটোই তাড়া করবে যমুনাকে। বাকি রইল যমুনার দিদির বাড়ি আর বাপের বাড়ি। দেবপাড়ায় ঠাঁই না হলে যমুনা কোন বাড়ি বেছে নেবে, জানার মতো মনের জোর নেই অবিনাশের। উনি সরাসরি প্রস্তাব দেন, এ-বাড়িতে তো জায়গা কম যমুনা, তোমাকে যদি আমাদের আশ্রমে রেখে আসি কোনও অসুবিধে হবে?

শুধু মাথা নেড়েছিল যমুনা। দু-চারদিনেই বুঝে গেছে ওর উপস্থিতি পছন্দ করছে না ইলা। যেখানে অবিনাশ তাকে দিয়ে আসবে, সেখানেই থাকবে। অবিনাশ যেন তার বিধাতা। এই নির্ভরতা মোটেই ভাল লাগছে না অবিনাশের। সত্যি কথা বলতে কী, প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর, মৃগাঙ্ক ব্যতিরেকে ওর মেয়ে-বউয়ের ওপর তেমন কোনও মায়া জন্মাচ্ছে না অবিনাশের। বরং অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি হচ্ছে, যমুনার নিয়তি মৃগাঙ্কর মৃত্যুর কারণ। একটু যেন বিরাগ জাগছে যমুনার ওপর। এমনটাই হয়। প্রিয়জন কেউ মরে গেলে, রাগ হয় তার সব থেকে কাছাকাছির মানুষজনের ওপর। অযৌক্তিক রাগ, তবু হয়।

সব থেকে অস্বস্তি হচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে। বিছানায়, রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে, বাথরুমে সর্বত্র অবাধ বিচরণ। যমুনা নীরব আদিখ্যেতা করে যাচ্ছে ওর সঙ্গে। অবিনাশের মনে হচ্ছে, মেয়েটা যেন প্রতিবেশীর এঁটো। কাকে মুখে করে এনে ফেলে দিয়ে গেছে বাড়িতে। — জানেন, এটা তাঁর নীচতা। বারবার চেষ্টা করছেন মনের এই ভাবটা কাটিয়ে ফেলতে, সমর্থ হচ্ছেন না। —এখন আবার একবার মনের সঙ্গে লড়াইয়ে নামেন। যমুনাকে জিজ্ঞেস করেন, ওকে দুধটুধ কিছু খাওয়াবে না?

খাওয়াব। গরমজল নেওয়া হয়নি যে। বলে যমুনা।

অবিনাশ ভাবেন, সত্যি, ইলার মনে করে ফ্লাস্কে গরম জল দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যমুনা লজ্জায় চাইতে পারেনি। অবিনাশ বলেন, আর কয়েকটা স্টেশন বাদেই বর্ধমান। প্ল্যাটফর্মে নেমে টি-স্টল থেকে গরম জল নেবখন।

ঘাড় হেলায় যমুনা। মেয়েটা এতক্ষণ জানলায় হাওয়া খাচ্ছিল। বড়দের কথোপকথন শুনে ফিরে তাকায়। মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনও খিদে পায়নি। হঠাৎ যমুনার বুকের ওপর ঘুরে, গাল ধরে আদর করতে থাকে। ভাল মুড়ে আছে। —অন্যমনস্ক হন অবিনাশ। মনে পড়ে দাদার কথা। যমুনারা আসার একদিন পর দাদার টেলিগ্রাম এল, মৃগাঙ্ক সিরিয়াসলি উভেড। কাম সুন। মৃগাঙ্কর মৃত্যুটা যে ভাইয়ের কাছে কত বড় দুঃসংবাদ দাদা জানে। তাই আঘাত বাঁচিয়ে করেছে টেলিগ্রাম। দাদা বোধহয় এখনও জানে না, টেলিগ্রাম পৌঁছনোর অনেক আগেই পাথরের চেয়েও ভারী শোক চলে এসেছে দেবপাড়ায়।

পাঞ্জাবির হাতায় টান পড়ে। ঘুরে তাকান অবিনাশ, মেয়েটা টানছে, আধোবুলিতে কী যেন বলছে। যমুনা আলতো করে মেয়েটাকে সরিয়ে নিতে যায়। মেয়েটা পাঞ্জাবির দিকে হাত বাড়িয়ে স্পষ্ট বলে ওঠে, বাবা! অবিনাশ চমকে ওঠার আগেই যমুনা হাত দিয়ে চাপা দিয়েছে মেয়েটার মুখ। ভয় মেশানো অপরাধী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে অবিনাশের দিকে।

মুখ ঘুরিয়ে নেন অবিনাশ।

মাথায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদ নিয়ে আশ্রমে পৌঁছলেন অবিনাশ। যমুনাদের নিয়ে সোজা চলে গেলেন স্বামীজির ঘরে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে স্বামীজি তাকিয়ে ছিলেন জানলার বাইরে। ধুধু করছে রোদজ্বলা মাঠ। কী দেখছেন কে জানে।

কেউ ঘরে ঢুকেছে বুঝে ঘুরে তাকালেন স্বামীজি। কপালে ভাঁজ পড়ল, মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। বললেন, এসো।

অবিনাশ স্বামীজির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। যমুনাও করল। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। যমুনার কোল থেকে মেয়েটাকে নিজের কোলে নিলেন অখিলানন্দ। মৃদু হাসি সহযোগে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, বল, কী খবর?

অবিনাশের কেন জানি মনে হল, যা বলতে এসেছেন, সবই জানেন স্বামীজি। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না অবিনাশের। অখিলানন্দ আবার বললেন, হঠাৎ হুটতে-পুটতে চলে এলে, সমস্যাটা কী?

মেঝের শেতলপাটিতে বসে ধীরে ধীরে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন অবিনাশ। কিছুই লুকোন না। মেয়েটার জন্মসূত্র, সব। বলতে বলতে অবিনাশ লক্ষ রাখছিলেন স্বামীজির প্রতিক্রিয়া, কোনও ভাবান্তর হচ্ছিল না, মুখে সেই নির্মল হাসির আভা।

মেয়েটা স্বামীজির কোল থেকে নেমে টলমল পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘর। যমুনার সেদিকে লক্ষ নেই, ভীষণ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে আছেন স্বামীজির দিকে। পরের কথাটা কী বলবেন উনি।

স্বামীজি সোজা হয়ে বসলেন। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনও আশ্রমটাকে নিজের ভাবতে পারলে না!

অবোধ দৃষ্টি মেলে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে থাকেন অবিনাশ। কথাটা তিনি ধরতে পারেননি। স্বামীজি ফের বলেন, এটাও তো তোমার একটা বাড়ি। সেখানে প্রিয়জন কাউকে রাখতে এসেছ, এতে কুণ্ঠার কী আছে।

বুক থেকে জগদ্দল পাথর নেমে যায় অবিনাশের। পরমুহূর্তে মনে পড়ে ছেলের কথা। বলেন, বরুণদের কি এখন ক্লাস হচ্ছে?

হ্যাঁ, এখনই টিফিনের ঘণ্টা পড়বে। টিফিনের ঘণ্টা শোনার জন্যই তো আমি জানলায় কান পেতে বসেছিলাম। ছেলেগুলো খেতে আসবে এখন। তোমরাও চানটান সেরে নাও। ওদের সঙ্গে খেয়ে নেবে।

অবিনাশ উঠে পড়েন। যমুনাও কোলে তুলে নেয় মেয়েকে। মাথা নিচু করে চৌকাঠ পেরোতে যাবেন অবিনাশ, স্বামীজি পিছু ডাকেন। বলেন, তুমি যে বললে ওদের থাকাখাওয়ার খরচ পাঠাবে, সেটা বোধহয় বেশিদিন পাঠাতে হবে না। তোমার বন্ধুপত্নী যদি হাসপাতালের কাজ একটু শিখে নেয়, নিজের খরচটা নিজেই দিতে পারবে।

একটু থমকালেন অবিনাশ। স্বামীজির মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন কথার

অন্তর্নিহিত মানে। ভর্ৎসনা করলেন কি? হতেই পারে।

স্নানটান সেরে খাওয়ার জায়গায় এসেছেন অবিনাশ। সঙ্গে যমুনা, মেয়েটাও আছে। টিফিনের পর সব স্টুডেন্ট জমা হয়েছে এখানে। হুটোপাটি করছে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে যমুনা পরিচিত হচ্ছে পরিবেশটার সঙ্গে। অবিনাশ খুঁজছেন ছেলেকে।

খানিক পরেই বরুণ এসে দাঁড়ায় সামনে। গায়ের রং একটু তামাটে হয়েছে। আক্ষেপ হয় না অবিনাশের। রংটাকে মনে হয় প্রকৃতির নিবিড় ছায়া।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বরুণ। এটা বোধহয় আশ্রমের শিক্ষা। তারপরই বাবার একটা হাত ধরে ঘনিষ্ঠ হয়। যেমন বাড়িতে হত। জিজ্ঞেস করে, মাকে আনোনি? না রে, মা আসেনি। পরের বার আসবে।

কবে?

এই তো এক মাস পরেই। আমি আসব হাসপাতালের কাজে, তখন নিয়ে আসব। বললেন বটে অবিনাশ, তবে সন্দেহ আছে ইলা আদৌ আসবে কি না। বরুণ জানতে চায়, দাদা কেমন আছে?

ভাল।

বোনটা!

সবাই ভাল আছে বাবা।

মন্দিরা আছে, না চলে গেছে?

এই প্রশ্নটায় হোঁচট খান অবিনাশ। বলেন, চলে যাবে কেন?

বলছিল, আমি হোস্টেলে চলে এলে, মন্দিরাও চলে যাবে মামারবাড়ি। ছেলেমানুষি ভেবে অবিনাশ হাসেন। খেয়াল হয় না তাঁর হাতেই বিনষ্ট হয়েছে পবিত্র প্রেমাঙ্কুর।

বরুণের এতক্ষণে চোখে পড়েছে একটু পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা যমুনা আর তার

মেয়েকে। বাবার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকায়, চোখ বলে, এরা কে?

অবিনাশ বলেন, উনি হচ্ছেন তোমার এক কাকিমা। মেয়েটা তোমার বোন। এঁরা এবার থেকে এখানেই থাকবেন।

বরুণের মুখে খুশির পরশ। এগিয়ে গিয়ে বোনের হাত ধরে।

অনেকদিন পর ছেলের পাশে বসে তৃপ্তি করে খেলেন অবিনাশ। দুপুরে শুলেন না। ছেলের হাত ধরে ঘুরলেন গোটা আশ্রম চত্বর। চলে গেলেন তার বাইরেও। বরুণই আজ তাঁর গাইড।

সন্ধের মুখে স্বামীজির কাছে বিদায় নিতে গেলেন অবিনাশ। স্বামীজি বললেন, একটা রাত থেকে গেলে পারতে।

উপায় নেই। কাল অফিস যেতেই হবে। বললেন অবিনাশ। আসলে দায়িত্বটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একবার যদি এখান থেকে চলে যাওয়া যায়। যমুনাদের এখানে থাকাটা পাকা হয়ে যাবে।

গেটের কাছে পৌঁছে দিতে এল বরুণ, যমুনা। ছেলেকে হাত নেড়ে যমুনার দিকে তাকালেন অবিনাশ, চোখে কোনও ভাষা নেই, কৃতজ্ঞতাও না।

মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা দিলেন অবিনাশ। উনি জানতেই পারলেন না, আসন্ন সন্ধ্যায় যমুনা তাঁর দিকে সাপিনীর মতো তাকিয়ে আছে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

বাড়িটা হঠাৎ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে। অনেকটা ইলার বুকের খাঁচার মতো। কদিন ধরেই ইলার মনে হচ্ছে কাজটা তিনি ঠিক করেননি, এত তাড়াতাড়ি উৎখাত করা উচিত হয়নি যমুনাদের। যে ভয়ে কাজটা তিনি করলেন, সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁর মনে হয়েছিল যমুনাদের আশ্রমে রেখে আসার পর অবিনাশ মনমরা হয়ে থাকবেন, রাগ করে ইলার সঙ্গে কথা বলবেন কম। সেসবের কোনও লক্ষণ নেই। বরং ইদানীং উনি একটু বেশিই কথা বলছেন। ইলা এটাও লক্ষ করছেন, কথা বেড়ে গেলে শরীরের ভূমিকা কমে আসে।

তিন সন্তানের মা ইলা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতায় জানেন, কীভাবে হাতের ভাষা পালটে ফেলে কর্তার শরীর জাগাতে হয়। কোন প্রত্যঙ্গে লুকিয়ে থাকে সুপ্ত আগুন। দুরাত আগে সে চেষ্টা তাঁর বিফল হয়েছে। সে রাতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন অবিনাশ। কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। ইলার চোখে বান ডেকেছিল তখন। অথচ কর্তা যা যা বলছিলেন সবই ইলার পক্ষে যাচ্ছিল। ইলার তাতে আশ্বস্ত হওয়ার কথা। বদলে কেঁদে ভাসালেন। তাঁর খালি মনে হচ্ছিল, কর্তার মনের গতি আয়ত্তে রাখতে, শরীর দিয়ে যে বাঁধ তিনি তৈরি করেছিলেন, আর প্রয়োজন নেই। সুশৃঙ্খল চলমান এক নদ-এর মতোই এখন অবিনাশের মনের স্থিতি।

তারপর থেকে কর্তার সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছেন ইলা, পাছে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু করে দেন। সেই রাতে সামান্য একটা প্রশ্ন, যা নেহাতই পূর্বরাগ, ইলা আদুরে গলায় জানতে চেয়েছিলেন, তোমার আমার সম্পর্কটা কি আগের মতোই আছে?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? বিস্মিত হন কর্তা।

দ্বিধাগ্রস্তের ভান করে ইলা বলেছিলেন, না, মানে আমি বলতে চাইছি, স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা, টান কতদিন অবধি থাকে?

উত্তর দিতে সময় নিচ্ছিলেন অবিনাশ। অন্ধকার ঘরে কর্তার মুখ দেখতে না পেলেও, ইলা জানেন উনি মাস্টারমশাইয়ের হাসিটা হাসছেন। অবিনাশ কখনও ভোলেন না, একসময় ইলাকে পড়াতেন। মাস্টারি ঢঙে বলতে শুরু করলেন, স্বামী, স্ত্রী সম্পর্কের মূল ব্যাপারটা কী জানো, এরা দুজনেই ভাল, মন্দ মিশিয়ে মানুষ। স্বামীর প্রয়োজনে স্ত্রী তার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও ঘটে তাই। এখানে প্রয়োজনটাই হল আকর্ষণ। আকাশের দুটি তারা যেমন পাশাপাশি থাকে অনন্তকাল, একইরকম আকর্ষণে। প্রয়োজন থাকলে স্বামী, স্ত্রী সেরকমই থাকবে।

কথাগুলোর মধ্যে ভালবাসার নামগন্ধ না থাকলেও, অদ্ভুত নির্ভরতা পাচ্ছিলেন ইলা।

যে মানুষটা সম্পর্ক নিয়ে এত গভীরভাবে ভাবতে পারেন, তার পক্ষে অন্যের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ ধরনের নীচ কাজ তাঁকে মানায় না। তখনই ইলার মনে হয়, বড় ভুল হয়ে গেছে যমুনাকে উৎখাত করে। একই সঙ্গে আর একটা আশঙ্কা হামাগুড়ি দিচ্ছে মনে, আশ্রমে গিয়ে যমুনা বরুণের ওপর শোধ নেবে না তো? ভাবলেই খালি হয়ে যাচ্ছে বুক। বরুণকে আশ্রমে যেতে দেওয়াই তাঁর উচিত হয়নি। তখন ভেবেছিলেন স্কুলের চাকরি নিয়ে শীলার মতো স্বনির্ভর হবেন, মেনে নিয়েছিলেন বরুণের দুরে থাকা। কিন্তু সবার সবকিছু হয় না। মৃগাঙ্ক ঠাকুরপো মারা যাওয়া, যমুনার এ-বাড়িতে আসা, তাকে আবার তাড়ানোর বন্দোবস্ত, মাঝখান থেকে চাকরির ইচ্ছেটাই বিলীন হয়ে গেল। কোলের মেয়েটাকে দেখাশোনার জন্য সন্ধ্যাকে রাখতে হয়নি। আগের মতোই চলছে সংসার। শুধু বরুণটাই নেই। আছে ওর থালা, বাটি, গ্লাস, কিছু জামা, কাপড়, ছোটবেলার খেলনাপাতি ... ভাবনার মাঝে রান্নাঘরের দোর থেকে ভেসে এল ডাক, মা, মা। বরুণের গলা। পেছন ফিরবেন না ইলা। কদিন ধরে এই এক বিভ্রমে পেয়েছে তাঁকে,

কখনও আচম্বিতে বরুণের ডাক শুনতে পাচ্ছেন। এ-বাড়ির বাতাসে মিশে থাকা বরুণের

গলা হঠাৎই উঠছে জেগে।

এতক্ষণ আটা মাখছিলেন ইলা। অবিনাশ অফিস থেকে ফেরার আগে কাজটা সেরে রাখেন। কর্তা কোনও কোনও দিন মুড়ির বদলে রুটি খেতে চান। না খেলে এই আটায় রাতের রুটি হবে।

হাত ধুয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ইলা। বড়ঘরে যেতে যেতে বাইরের গেটের আওয়াজ পান। না, কর্তার গেট খোলার শব্দ নয়। কে এল এই ভর সন্ধেবেলা? ঘরে এসে দেখেন মন্দিরা এসেছে। ইলা বলেন, কী রে, তুই এখন!

বোনকে দেখতে এলাম। বলে, মন্দিরা উঠে পড়ে বিছানায়। অংশু এতক্ষণ নিজের পড়া করতে করতে বোনকে পাহারা দিচ্ছিল। মন্দিরা এসে যাওয়াতে বইখাতা গুটিয়ে চলে গেল সামনের ঘরে।

ইলা বিছানায় বসেন। মন্দিরা ছোট্টটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আদর করছে। খিলখিল করে হাসছে মেয়ে। মন্দিরার জন্য কষ্ট হয় ইলার, বরুণ আশ্রমে যাওয়ার পর থেকে বড্ড একলা হয়ে পড়েছে মেয়েটা। বিকেলে পাড়ার রাস্তায় একা একা ঘোরে, দোকানটোকান যায়। ওর সেরকম কোনও বন্ধু হয়নি। ভোরের আকাশে তারার মতো মন খারাপ করে থাকে মেয়েটা। এ-বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসে, হয়তো গন্ধ পায় বরুণের।

হঠাৎ আলো চলে গেল। লোডশেডিং। সামনের ঘর থেকে অংশুর গলা পাওয়া গেল, যাঃ, মা, হ্যারিকেন....

অন্ধকারে ভয় পেয়ে মেয়েটা কাঁদছে। কোলে তুলে নিচ্ছে মন্দিরা। ইলা বলেন, চ, সবাই মিলে বারান্দায় বসি।

অংশুও চলে আসে বারান্দায়। কদিন ধরে দিনেরবেলাটা অসহ্য গরমের পর সন্ধের দিকে দারুণ হাওয়া বইছে। বেশ লাগে বারান্দায় বসে থাকতে।

বাড়ির সামনে সরু রাস্তা। আবছা অন্ধকারে মানুষের চলাচল দেখছেন ইলা। ভালই লাগে। চোখাচোখি হওয়ার ব্যাপার নেই।

খানিক পরে একটা চেনা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। দীপালি। নড়েচড়ে বসেন ইলা। দীপালি তো বলেছিল আপাতত পড়াতে আসবে না। দোজবরের সঙ্গে বিয়েটা ক্যানসেল করতে পারলে, তবেই আসবে। বিয়ের দিনক্ষণ, কেনাকাটা সব রেডি। অপু দীপালিকে বলেছিল, চলো আমি আর দিদি গিয়ে তোমার বিয়ে বানচাল করে, আমার প্রস্তাবটা রাখি।

দীপালি রাজি হয়নি। বলেছিল, না, যা বলার বা করার আমিই করব। বাড়ির লোক যদি আপনাদের অপমান করে, খারাপ লাগবে আমার।

আর যদি বাড়ির লোক তোমার কথা না শোনে? জানতে চেয়েছিল অপু। উত্তরে দীপালি বলে, তা হলে ওই পাত্রকেই বিয়ে করতে হবে।

কথাটা ঠাট্টার মতো শোনালেও, একটু আশঙ্কা ছিলই। রেজাল্ট কী হল এখন জানা যাবে।

গেট খুলে অলস পায়ে দীপালি এসে বসল বারান্দায়। সাবধানী গলায় ইলা জানতে চান, কী বলল বাড়িতে?

একটু সময় নেয় দীপালি। লাজুক হেসে বলে, ক্যানসেল করে দিলাম।

খানিকক্ষণ ধরে জমিয়ে রাখা শ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হন ইলা। একই সঙ্গে অন্য আশঙ্কাও উকি মারে মনে। তাঁর ভাইটি যা চিজ, দীপালিকে দেওয়া কথাটা মনে রেখেছে তো? নিশ্চয়ই রেখেছে, অপূর্ব যতই বাউন্ডুলে হোক, কোনও মেয়ের ভাগ্য নিয়ে ছেলেখেলা করার মতো লঘু মনের সে নয়।

ইলার কোল থেকে মেয়েটাকে নিজের কাছে নেয় দীপালি। নেওয়ার ভঙ্গির মধ্যে বাড়তি আন্তরিকতা, যেন আজ থেকেই এ-বাড়ির একজন হয়ে গেল। ইলা এখন পর্যন্ত দীপালি-অপূর্বর ব্যাপারটা কর্তাকে বলেননি। বললে আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। শ্বশুরবাড়ির খুঁটিনাটি বিষয়ে নাক গলাতে অপছন্দ করেন উনি। ওঁর সমস্ত চিন্তা নিজের পরিবারকে

ঘিরে। অপূর্বকে যে চাকরিটা করে দিয়েছেন তাই ঢের।

ইলা হালকা মেজাজে দীপালিকে জিজ্ঞেস করেন, দান-এর জিনিসপত্র তো সব কেনা হয়ে গিয়েছিল, ওগুলো নিয়ে কী করবে এখন?

কেন, সব আপনার ভাই পাবে।

মাথা খারাপ তোমার। সে কিছুই নেবে না। ওদের সি পি এম পার্টিতে ওসব নেওয়া বারণ।

তা হলে কী হবে? চিন্তিত গলায় জানতে চায় দীপালি। একটু ভেবে নিয়ে বলে, পাঞ্জাবি, ধুতি, আংটি কিচ্ছু নেবে না?

মজা করার লোভ সামলাতে পারেন না ইলা। বলেন, তোমার আগের পাত্র কি অপূর্বর সাইজেরই ছিল?

হেসে ফেলে দীপালি বলে, আপনি না বউদি, ভীষণ....

বিয়ে বিষয়ে টুকটাক কথা, গল্প চলতে থাকে। সন্ধের অন্ধকার হঠাৎ যেন ফিকে হয়। নরম আলোর জাল চারপাশে। এতক্ষণ কোনও বড়সড় মেঘ বোধহয় আড়াল করেছিল চাঁদটাকে।

একসময় কর্তা ফেরেন। বারান্দায় সবাইকে বসে থাকতে দেখে বলেন, ভালই করেছ এখানে বসে। যা গরম, তার ওপর লোডশেডিং।

অবিনাশও অফিসের ব্যাগ, পোশাক সুদ্ধু বসে পড়েন বারান্দায়। বেশ কাহিল দেখাচ্ছে তাঁকে। ইলা ওঠেন কর্তার জন্য জল আনতে। একটা কথা মুখে এসে পড়েছে, বলব না, বলব না করেও বলে ফেলেন, তোমাদের আশ্রমে তো কারেন্টই নেই।

খোঁচাটা তেমনভাবে বিঁধল না অবিনাশের বুকে। বরুণের কষ্ট মনে করিয়ে দিল ইলা। বরুণকে নিয়ে কোনও বেদনা বা অনুতাপ হয় না অবিনাশের। এইসব তুচ্ছ ঠান্ডা, গরম নিয়ে বরুণের বিচলিত হলে চলবে না। সে এখন বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে উপনীত হয়েছে। অবিনাশ চোখ বুজে ইচ্ছেমতো দেখে নেন ভবিষ্যৎ, দূর দূর গ্রাম থেকে দিন পার করে অন্ধ মানুষ হেঁটে আসছে বরুণের কাছে। প্রত্যেকের চোখে আঙুল ছুঁয়ে আলো দিচ্ছে বরুণ।

॥ ছত্রিশ ॥

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। আজ রবিবার। বরুণের স্কুল ছুটি। ছুটির দিনগুলোয় সকালে আশ্রমের দেবদেউলে প্রার্থনা। দু ঘণ্টা হোস্টেলের ঘরে এসে পড়া। তারপর থেকে শুধু খেলা সন্ধে পর্যন্ত। আবার দু ঘণ্টা পড়তে বসা। বরুণ আজ সকাল থেকেই পড়ায় মন বসাতে পারছে না। একটা কোকিল ভোর থেকেই বরুণের কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। প্রথমে বসেছিল যে-ঘরে ওরা চার বন্ধু এক সঙ্গে থাকে তার গা লাগোয়া আমগাছে। তারপর থেকে বরুণ যেখানে যাচ্ছে, আশপাশের গাছে চলে আসছে পাখিটা। আর তারস্বরে চিল্লে যাচ্ছে। পাখিটা কী বলতে চায় বরুণ জানে। কিন্তু কে বোঝাবে বোকা কোকিলটাকে!

আজ মাকে সঙ্গে নিয়ে বাবা আসবে। এ আর নতুন কথা কী, স্বামীজি বরুণকে ডেকে কালই বলে দিয়েছেন। সকালের পড়া কোনও রকমে করে বরুণ এসে দাঁড়িয়েছে আশ্রমের গেটে। বাবা-মার এখনও দেখা নেই।

একটু আগে হাসপাতালের কম্পাউন্ডারকাকু এখান দিয়ে আশ্রমের ভেতর ঢুকল। বরুণকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, বাবা আসবে বুঝি?

হ্যাঁ।

ঘড়ি দেখে কম্পাউন্ডারকাকু বলল, এখনও আধঘণ্টা বাকি কলকাতার লোকাল আসতে।

আধঘণ্টা যেন শেষ হতে চায় না। দূরে ধুধু রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে বরুণ, মাথায় কাঠ নিয়ে গ্রামের এক-দুজন হেঁটে গেলেও বাবাদের দেখা নেই। রাস্তার কিছু দূর উঁচু অবধি আলো কাঁপছে, হাওয়ায় উড়ছে ধুলো।

হঠাৎই চোখে পড়ে ফুলে ভরা শিমুলগাছের নীচ দিয়ে তিনটে লোক হেঁটে আসছে। আর একটু ভাল করে লক্ষ করতেই বুঝতে পারে, কাঁধে ঝোলা নিয়ে মাঝের লোকটা বাবা। মা কই?

রাস্তায় চোখ রেখে অপেক্ষা করে বরুণ। মা যদি হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে পড়ে থাকে। নাঃ মায়ের কোনও চিহ্ন নেই। অনেকটা এগিয়ে এসেছে বাবারা। ভীষণ রাগ হয়ে যায় বরুণের, গলা উপচে কান্না চলে আসছে চোখে। দৌড়ে ঢুকে আসে আশ্রমের ভেতরে। বাবার সঙ্গে সে কথাই বলবে না। কেন নিয়ে আসেনি মাকে?

হোস্টেল বাড়ির দিকে ছুটছিল বরুণ। কে যেন হাত ধরে নেয়। চোখ তুলে দেখে কাকি, জানতে চায়, কী রে দৌড়চ্ছিস কোথায়?

বাবা আসছে। মাকে নিয়ে আসেনি। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে ওঠে বরুণ। হাত ছেড়ে দেন যমুনা। দৃষ্টিতে ভাবনা ভর করে।

বৃষ্টি আশ্রমের ধুলো উঠানে অন্যান্য সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খেলছে। যমুনা এগিয়ে যান স্বামীজির ঘরের দিকে।

আধ হাত উঁচু টেবিলটা বুকের কাছে নিয়ে বিছানায় বসে কী যেন লেখালিখি করছেন স্বামীজি। যমুনা সামনে এসে দাঁড়াতে মুখ তুলে তাকান, কিছু বলবে?

উনি আসছেন!

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকান অখিলানন্দ। বলেন, ও তাই তো, ওদের আসার সময় হয়ে গেছে।

এবার আপনি ওঁকে কথাটা বলুন। বলেন যমুনা।

বলব! স্বামীজির কণ্ঠে দ্বিধামিশ্রিত দুশ্চিন্তা। যমুনা জোর দেন, বলেই রাখুন। পরে যদি আর...

ঠিকই বলেছ, আমি কতদিন থাকি না থাকি। বয়স তো হয়েছে।

আমি সেকথা....

হাত তুলে যমুনাকে থামান অখিলানন্দ। বলেন, বলব, আজই, ঝড় উঠবে। সামলাতে পারবে তো?

পারব। মেয়ের মুখ চেয়ে পারতেই হবে। সত্যি পরিচয় দিলে মেয়েটার কোনওদিনই বিয়ে হবে না। চেপে গিয়ে বিয়ে দিলে জানাজানি হবেই। ফের আঁস্তাকুড়ে জায়গা হবে ওর।

ঠিক আছে তুমি যাও। আমি দেখছি।

যমুনা চলে যাওয়ার খানিক পরে অবিনাশ সহ দুজন শিষ্য স্বামীজির ঘরে ঢুকলেন। প্রণাম সেরে তিনজনে স্বামীজির সঙ্গে হাসপাতাল সংক্রান্ত আলোচনায় বসে গেলেন। আধুনিক কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা হবে, কলকাতার অফিসের কালেকশন ভালই। টোটাল কালেকশন অবিনাশরা নিয়ে এসেছেন। আজই হাসপাতালের অ্যাকাউন্টেন্টকে সব বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

স্বামীজি অন্য দুই শিষ্যকে বললেন, তোমরা গিয়ে হিসেব বোঝাও। অবিনাশ থাক। ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

অবিনাশ স্পষ্টতই অবাক হলেন, কপালে ভাঁজ পড়ল, স্বামীজি তাঁর সঙ্গে কী কথা বলতে চাইছেন নিভৃতে?

দুজন চলে যাওয়ার পর সরাসরি তাকালেন অবিনাশের দিকে। বললেন, কথাটা আর কিছুদিন বাদে বললেও হত। ইদানীং কেন জানি মনে হচ্ছে, আমার কাজ বোধহয় ফুরিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে ডাক আসতে পারে পরপারের। কথাটা তোমায় বলে রাখাই ভাল।

কী কথা স্বামীজি? একটু যেন ভয়ধরা গলায় জানতে চান অবিনাশ।

স্বামীজি বলেন, আমার কিছু ক্ষমতা আছে। সেটাকে তুমি অলৌকিকও বলতে পার। অভিজ্ঞতালব্ধও বলা যায়। বর্তমানকে আমি খুব নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করলে, অনেকটা দূর অবধি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। একদম স্পষ্ট।

স্বামীজি কেন যে এসব তাঁকে বলছেন, কিছুই বুঝতে পারেন না অবিনাশ। অবুঝ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। গুরুজিকে আজ বড় বিষণ্ণ লাগছে যেন!

অখিলানন্দ বলে যান, ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলেছে তোমার জীবনে, মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয় তোমার কাছে। কিন্তু ঘটবেই। মনটা প্রস্তুত রাখা ভাল। আমার দায়িত্ব শিষ্যকে আগে থাকতে সব বলে রাখা, যাতে সে মনটা তৈরি করার সময় পায়।

এবার সত্যিই ভয় পেয়ে যান অবিনাশ। শুকিয়ে যাওয়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন, কীঘটবে আমার জীবনে? খুব অশুভ কিছু?

অশুভ নয়। তবে তোমার মানতে অসুবিধে হবে।

সেটা কী? অধৈর্য হয়ে জানতে চান অবিনাশ।

তোমার বরুণ এবং যমুনার মেয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে। কথাটা ইতিমধ্যে যমুনাকে আমি বলেছি।

মাথায় যেন বাজ পড়ল অবিনাশের। উঠে দাঁড়িয়েছেন মেঝে থেকে। বলেন, এ হতে পারে না। হতে দেব না আমি। বরুণকে পৃথিবীর সমস্ত কলুষতা থেকে আমি বাঁচাবই। মেয়েটার জন্মসূত্র মনে পড়লে, গা ঘিনঘিন করে আমার। ও হচ্ছে মানব সভ্যতার গরল। বর্বরতা, হিংস্রতা, কামান্ধ পাপ থেকে মেয়েটার জন্ম। এসব জানা সত্ত্বেও কেন আমি বংশের রক্তস্রোতে ওকে মিশতে দেব।

এটাই যে নিয়তিনির্দেশ।

নিয়তিকে আমি গ্রাহ্য করি না। ভয়ঙ্কর উপেক্ষায় বলে ওঠেন অবিনাশ।

স্বামীজি বলেন, তাহলে যাও নিয়তির সঙ্গে লড়তে। আজ পর্যন্ত কেউ জয়ী হয়নি। অন্ধ আক্রোশে সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে অবিনাশের। খানিকক্ষণ অস্থির পায়চারি করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সামনে আবছা অন্ধকারে প্রতিপক্ষ নিয়তিকে দেখতে পান না। তবুও সিদ্ধান্ত নেন, লড়বেন। নিয়তির সঙ্গেই লড়বেন। দেখা যাক কী হয়!

মনের ইচ্ছেটাকে অবতারের একঝলক প্রকাশ বলেই ধরে নেন অবিনাশ।

পরের দিন দুপুরবেলা চিতাবাঘের একাগ্রতায় যমুনার ঘরের দিকে চেয়ে বসেছিলেন অবিনাশ। কোনও একটা কাজে যমুনা বেরোল বাইরে। ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকে গেলেন অবিনাশ। পদ্ধতি ভাবাই ছিল, বালিশটা চেপে ধরবেন মেয়েটার মুখে। বালিশ হাতে তুলে নিয়েও থমকে গেলেন, ঘুমন্ত মেয়েটার মুখের সঙ্গে হাসপাতালের অন্ধ বাচ্চার ছবির মিলটা ফের চোখে পড়ল। এই কালক্ষেপটুকুর জন্য ধরা পড়ে গেলেন যমুনার কাছে। ঘরে ঢুকে ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে যমুনা, ও কী করছেন আপনি।

করিনি। দেখছিলাম করতে পারব কি না। আগুনচোখে বলেন অবিনাশ। দৌড়ে এসে মেয়েকে কোলে নেয় যমুনা। বলে, কেন এ কাজ করতে এসেছিলেন? মেয়েটা কী ক্ষতি করেছে আপনার?

স্বামীজির ভবিষ্যদ্বাণী তুমিও তো শুনেছ যমুনা। বুঝতেই পারছ কেন...

কথা কেড়ে নিয়ে যমুনা সবিস্ময়ে বলে, আপনি এত নিষ্ঠুর! যে মানুষটা আপনাকে দেবতার মতো দেখত, তার মেয়েকে খুন করতে এলেন!

মেয়েটা মৃগাঙ্কর নয়। ওকে মারতে আমার এতটুকু অনুতাপ হত না।

ঘেন্না মাখানো শ্লেষে যমুনা বলে, অনুতাপ যে আপনার শরীরে নেই, ভাল করেই টের পেয়েছি এই কদিনে। আপনি ভাল করেই জানেন, বন্ধুর মৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ী, তার বউ-মেয়েকে এক সপ্তাহের বেশি রাখতে পারলেন না বাড়িতে।

আমি দায়ী। অবাক কণ্ঠে বলেন অবিনাশ।

হ্যাঁ, আপনিই দায়ী। আপনার আদেশে ও গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েছিল, আমেরিকান সৈন্যদের গুলি লাগে পায়ে। জীবনভর খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে হেঁটে, শেষমেশ পারল না নিজেকে বাঁচাতে। ও যদি খোঁড়া না হত, অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারত সেদিন।

মানসচোখে মৃগাঙ্কর মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে পান অবিনাশ, প্রাণপণে ছুটছে বাঁচার জন্য, পারছে না। কালো মেঘের মতো একপাল লোক ওকে তাড়া করছে। এ-ও কি সেই নিয়তির খেলা! তা যদি হয়, হিসেবমতো অবিনাশ এখানে নিয়তির ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ মানতে গিয়ে মৃগাঙ্ক পায়ে গুলি খায়।

মাথা গুলিয়ে যায় অবিনাশের, তিনিও যদি নিয়তি হন, তাহলে কীসের লড়াই, কার সঙ্গে লড়াই? নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে কে জেতে? জেতে কি কেউ?

যমুনার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন অবিনাশ। সারা বিকেল হানটান করেন চতুর্দিক। বরুণের সঙ্গে দেখা করারও ইচ্ছে জাগে না। সন্ধে নেমে আসে সদানন্দ আশ্রমে। অবিনাশ ফের পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ান যমুনার দরজায়। টোকা মারেন। একটু পরে দরজা খুলে যায়। যমুনাই খুলেছে। বলে, আবার কেন এলেন?

একটা বুদ্ধি বার করেছি যমুনা। কুচক্রীর মতো বলেন অবিনাশ।

বুদ্ধি। বিস্মিত হয় যমুনা।

হ্যাঁ। বুদ্ধিটা কাজে লাগিয়ে আমরা অনায়াসে নিয়তিকে ফাঁকি দিতে পারি।

আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। অসহায় কণ্ঠে বলে যমুনা। প্রায় ফিসফিস করে অবিনাশ বলেন, আমি যদি তোমায় বিয়ে করি। বরুণ আর তোমার মেয়েটার বিয়ে সিদ্ধ হয় না।

কথাটা শুনে আঁতকে উঠেছেন যমুনা। একটু থেমে অবিনাশ বলেন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, আমি কখনওই তোমাকে শয্যাসঙ্গিনী হতে বলব না। আমরা আইনের কাছে ধর্মের কাছে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হব। আমার বিশ্বাস বরুণের ভালর জন্য ইলা এটুকু মেনে নেবে। ডিভোর্স দেবে আমাকে।

আপনি পাগল হয়ে গেছেন অবিনাশদা। সাফ জানিয়ে দেন যমুনা। হাল ছাড়েন না অবিনাশ। বলেন, পাগল আমি হইনি। সে চান্স আমার নেই। দাদা পালন করছে বংশের দায়িত্ব।

অবিনাশের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন যমুনা।

সারারাত ঘুম হয়নি অবিনাশের। ভোরের দিকে একটু চোখ লেগেছিল। হইহট্টগোলে ঘুম ভেঙে যায়। আশ্রমের কিছু আবাসিক এসে ঠেলে তোলে অবিনাশকে। বলে, আপনার বন্ধুর স্ত্রী পালিয়ে গেছে মেয়েকে নিয়ে।

ঘটনাটা বোঝার আগেই, আর একটা দুঃসংবাদ এসে পৌঁছয়, বরুণকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

এত বড় শোধ নিল যমুনা। পায়ের নীচে ক্রমশ যেন বালি সরে যায় অবিনাশের দৌড়ে যান স্বামীজির কাছে। মাথা হেঁট করে বসে আছেন অখিলানন্দ। চেহারা দেখলে বোঝা যায় সব শুনেছেন। অবিনাশ আকুল আগ্রহে জানতে চান, এরপর আমি কী করব স্বামীজি? কোথায় যেতে পারে ওরা?

মাথা নিচু অবস্থায় মাথা নাড়েন অখিলানন্দ। একটা কথাই বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে, জানি না।

কালকেই তো আপনি বললেন, সব আপনি দেখতে পান, বুঝতে পারেন।

পারি। এবার কিন্তু নিয়তি অন্য খেলা খেলছে, খেলতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ বিধির বিধান পালটানোর চেষ্টা করেছিলে তুমি। নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ ভাবতে বসেছিলে। বলতে বলতে মুখ তোলেন স্বামীজি। অবিনাশ কাতর কণ্ঠে বলেন, আমি তো বিশেষ কিছু চাইনি স্বামীজি। চেয়েছিলাম সন্তান আমার বিশুদ্ধ আধার হোক। এতটাই কলুষহীন, ওর মধ্যে ঐশী ক্ষমতা প্রকাশ পাক। মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করুক ও এই চাওয়া কি খুব বেশি চাওয়া?

শেষ প্রশ্নের ধার দিয়ে গেলেন না স্বামীজি। বললেন, কীসের বিশুদ্ধতা অবিনাশ? তুমি কি জান না, আমাদের এই দেশ হাজার হাজার বছর ধরে লুণ্ঠিত, অপমানিত, ধর্ষিত হয়েছে। কত ধরনের রক্ত মিশেছে এই দেশের মানুষের মধ্যে। এর ভেতরে বিশুদ্ধতা খোঁজা অবাস্তব চিন্তা। তবু তো মানুষ সুখে দুঃখে আছে, ফুল ফুটছে, গান গাইছে পাখি, কিছু মানুষ সর্বদাই মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তুমি কেন তাড়াহুড়ো করে নিজের বংশের মধ্যে করুণাময়কে খুঁজতে গেলে? এ এক ধরনের করুণা করার কর্তৃত্ব আদায় করা।

এত গভীর দার্শনিক চিন্তা করার সময় নেই হাতে। অবিনাশ বেরিয়ে এলেন স্বামীজির ঘর থেকে। প্রতিজ্ঞা করলেন ছেলে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত এখানে আর আসছি না। গোটা সোনামুখি চষে ফেললেন অবিনাশ এবং তাঁর গুরুভাইরা। কেউ দেখেনি, এক বিধবা দুটি বাচ্চা নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। দোকানদার, বাসস্ট্যান্ডের লোক, কেউ কোনও হদিশ দিতে পারল না।

বাসে করে বর্ধমান ফিরলেন অবিনাশ। সঙ্গে কেউ আসেনি। অবিনাশই এড়িয়ে গেছেন গুরুভাইদের। তাঁর মাথায় এখন ঘুরছে একটাই কথা, ইলাকে গিয়ে কী বলব? ট্রেনে উঠেও অবিনাশ একই কথা ভেবে যাচ্ছেন। বুকের মধ্যে তৈরি হয়েছে অদৃশ্য খোঁদল। সেখানে অন্ধকার, বরুণ পড়ে আছে সেখানে। এবার মাটি চাপা দেওয়া হবে। বরুণ বলছে, বাবা, এ তুমি আমায় কোথায় এনে ফেললে। অবিনাশের বুক থেকে দু হাত বাড়িয়ে বরুণ কাঁদছে...

ভীষণ অস্থিরতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অবিনাশ। তখনই মাথার পিছনে কে যেন দংশন করল। অন্ধকার হয়ে গেল গোটা ট্রেন। কিছুক্ষণ আগে যেসব নিপাট, সুশৃঙ্খল সহযাত্রীদের দেখেছিলেন, গাছের বাকল খোলার মতো তাদের শরীর থেকে খুলে পড়তে লাগল পোশাক। মানুষগুলোর আচার-আচরণ পালটে গেল। আবছা অন্ধকারে তারা ট্রেনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৌড়চ্ছে। কখনও হাসছে, কাঁদছে, নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে। ওদের মধ্যে কেউ একজন এসে অবিনাশকে খবর দিল, এই ট্রেনের ড্রাইভার ফাঁকতালে নেমে গেছে। এমনটাই নির্দেশ ছিল। পৃথিবীর কাছে অপ্রয়োজনীয়, অপ্রকৃতিস্থ মানুষগুলোকে এই ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রেন চলতে চলতে এক সময় পৃথিবীর মাটি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। কত দিন মাস বছর ধরে ট্রেনটা চলছে হিসেব রাখতে পারেননি অবিনাশ।

এই ট্রেনে শুধু দিন আর রাত হয়। ভোর, বিকেল, সন্ধে নেই। দিনটাও খুব একটা পরিষ্কার নয়। ধোঁয়াশা মতন। রাত যত বাড়ে অন্ধকারও নিকষ হয়। অসম্ভব জোরে ছুটতে

থাকে ট্রেন। প্রথম প্রথম ভয় পেয়ে অবিনাশ বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার জুড়ে দিতেন। এখন ভয় পান না। চিৎকারটা করে যান, নিজেকে নিজেই জানান দেন, এখনও বেঁচে। তিনি আছেন।

কদিন ধরেই এক ভদ্রলোক এসে বলে যাচ্ছেন, আপনি ভাল হয়ে গেছেন।

কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারেন না অবিনাশ। শুধু টের পান ট্রেনের গতি কমছে। দিনের আলো আগের থেকে অনেক পরিষ্কার। 'বাঁচাও' বলে চিৎকারটা ছেড়ে দিয়েছেন অবিনাশ।

কাল নতুন একজন এসেছিল। বলল, জামাইবাবু, আপনি ভাল হয়ে গেছেন। কাল এসে বাড়ি নিয়ে যাব।

'জামাইবাবু, বাড়ি' শব্দ দুটো চেনা-চেনা লেগেছিল। লোকটার চেহারা বেশ বিশ্বস্ত। দিন ফুটতেই ট্রেনে গতি গেছে আরও কমে। এখন গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। যে-কোনও সময় আসতে পারে লোকটা। অবিনাশ অপেক্ষা করছেন।

ট্যাক্সি করে জামাইবাবুকে নিয়ে দিদির বাড়ি ফিরছে অপূর্ব। মানুষটা এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি। চিনতে পারেননি অপূর্বকে। তবে বেশ ব্যগ্র হয়ে ট্যাক্সিতে উঠে এসেছেন। তার মানে ভেতর ভেতর বাড়ি ফেরার তাগিদ হয়েছে। জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন এখন। চেনার চেষ্টা করছেন কলকাতাটাকে।

কিছুদিন ধরেই অ্যাসাইলামের ডাক্তারবাবু বলছেন, এবার নিয়ে যান ওঁকে। বয়স হয়েছে, আগের মতো আর ভায়োলেন্ট নন। মাঝেমধ্যেই সাড়া দিচ্ছেন বাইরের জগতের ডাকে। এবার মনে হয় বাড়ির পরিবেশে থাকতে পারলে অনেকটাই সুস্থ হয়ে যাবেন।

ইলা অপূর্ব পরামর্শ করে বরুণকে আনিয়েছে দিল্লি থেকে। অংশু তো বিদেশে থাকে, এখনই আসার প্রশ্ন নেই। বরুণও আসতে চাইছিল না। দশ বছর বয়সের পর থেকে সে বাবাকে দেখেনি। গত বাইশ বছরে বাবাকে সে ভুলেই গেছে। স্কুল, কলেজ, হোস্টেলে মানুষ হয়েছে। ইতিমধ্যে তার বাবা বাড়িতে কিছুদিন থেকেছে, বেশির ভাগটাই অ্যাসাইলামে। বরুণকে দিল্লি থেকে আনানোর কারণ, অপূর্ব ইলার ধারণা, একমাত্র বরুণকে দেখলেই সহজে চিনতে পারবেন অবিনাশ। ফিরে আসতে থাকবে স্মৃতি। বরুণ এসব ব্যাপারে এতটাই উদাসীন, বাবাকে নিতেও এল না অ্যাসাইলামে। মামাকে বলল, তুমি যাও, এতটা জার্নি করে এসেছি, খুব টায়ার্ড। ঘুম মেরে নিই।

সালের এপ্রিল মাসে অবিনাশ যে ঘটনার অভিঘাতে পাগল হয়েছিলেন, ব্যাপারটা ছিল খুবই তুচ্ছ। যমুনা অবিনাশের অসংলগ্ন কথাবার্তায় ভয় পেয়ে বরুণকে সুদ্ধু নিয়ে চলে এসেছিল দেবপাড়ায়।

অবিনাশকে উদ্ধার করা হয় রেল পুলিশের হেফাজত থেকে। বদ্ধ উন্মাদ।

অপূর্ব চলে এসেছিল দেবপাড়ায়। দীপালিকে বিয়েও করে সে। অবিনাশ না থাকলেও দেবপাড়ার সংসার হয়ে গিয়েছিল বড়। যমুনা, বৃষ্টি এ-বাড়িতেই থেকেছে। সুপাত্রস্থ হয়েছে বৃষ্টি। অবিনাশের অফিসের টাকা আর অপূর্বর রোজগারে চলেছে সংসার। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অংশু, বরুণ। দুজনেই বিবাহিত, বরুণের বউ এবারে আসেনি। পরে হয়তো আসবে শ্বশুরকে দেখতে। মন্দিরার বিয়ে হয়েছে অন্যত্র। সে এখন ডাক্তার। তার বাল্যপ্রেম সফল হয়নি বলে দায়ী করে না বরুণের বাবাকে। প্রেম যখন নষ্ট হয়, বিচার করার বয়সই তার হয়নি। তবু কোনও এক অপূর্ণতাবোধ জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখে বরুণ, মন্দিরাকে। ওরা যদি একে অপরকে বিয়ে করত, হতেও পারত পৃথিবীটা আর একটু সুন্দর।

আজ বাড়িতে অবিনাশের পথ চেয়ে আছেন ইলা, যমুনা, দীপালি এবং বরুণ। ট্যাক্সিতে বসে অবিনাশ অবাক হয়ে দেখছেন জনসংখ্যা। কত মানুষ, ড্রাইভার নিপুণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। শহরের চারপাশটা আগের থেকে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। কত দোকানপাট, সবাই কি ব্যস্ত!

দেবপাড়ার বাড়ির গলিতে বড় গাড়ি ঢোকে না। জামাইবাবুকে নিয়ে অপূর্ব নেমে পড়েছে

আগেই। অবিনাশ একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। অ্যাসাইলামে থাকতে কত ধরনের রোগ হয়েছে, সব কি আর সারানো যায়!

বাড়ির সামনে এসে অপূর্ব দেখে, চারজনেই এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে। গাড়ির শব্দ পেয়ে নিশ্চয়ই। অবিনাশকে জিজ্ঞেস করে অপূর্ব, বাড়িটা চিনতে পারছেন জামাইবাবু? অপূর্বর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক নির্মল হাসি হাসেন অবিনাশ। যার অর্থ, হ্যাঁ বা না দুটোই হয়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে যমুনা দেখেন, অনেকটা তাঁর কর্তার মতো হেঁটে আসছেন অবিনাশদা। বরুণ তার বাবার চেহারায় দেখতে পায় তারই ভবিষ্যৎ প্রতিচ্ছবি। ইলা দেখেন, তাঁর স্বামীর শরীর থেকে প্রকৃত যোগী পুরুষের আভা বেরোচ্ছে। দীপালির চোখ জলে ঝাপসা। আকুল চেষ্টায় এই অবিনাশদার চেহারায় খোঁজে বাইশ বছর আগের ঝকঝকে পুরুষটিকে।

অপূর্ব গেট খোলার পর সবাইকে অবাক করে উপুড় হন অবিনাশ। কান পাতেন উঠোনে। কী যেন শোনার চেষ্টা করেন। বারান্দায় এসে সেই একই ভঙ্গি। তারপর কান রাখেন বাড়ির দেওয়ালে। বিদ্যুচ্চমকের মতো ইলার মনে পড়ে যায়, শ্বশুরবাড়ির সেই গল্পকথা।

এক সন্ন্যাসী এসে ভাগলপুরের বাড়িতে কান পেতে বলেছিলেন, এই বংশে অবতার জন্ম নেবে। তারই পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে বাড়ির আনাচে-কানাচে। কর্তার মাথায় সেই গল্প ঘুরছে এখনও।

ঘরে এনে বসানো হয়েছে অবিনাশকে। বরুণ ছাড়া সবাই মিলে চেষ্টা করছে নিজেদের চেনাতে। কোনও ভাবান্তর নেই অবিনাশের। মুখে সেই হাসি, হ্যাঁ অথবা না। হাল ছেড়ে দিয়ে সবাই বরুণকে ডাকে, আয় সামনে। দেখ তোকে চিনতে পারে কি না।

সোফায় বাবার পাশে বসে বরুণ। মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে, বাবা!

অ্যাঁ। এই প্রথম কথা বলেন অবিনাশ। সবার মুখে আশার আলো ফোটে। বরুণ বলে, আপনি আমায় চিনতে পারছেন?

মাথা নাড়েন অবিনাশ।

বরুণ অবাক হয়ে জানতে চায়, সাড়া দিলেন যে বড়!

আমি বাবা বলে।

প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারে না বরুণ, কথাটা পাহাড়ের থেকেও ভারী। বাবা কি জগৎপিতার কথা বলছেন?